বিজ্ঞান ভাবনায় কলকাতা

সম্পাদনা

অরূপরতন ভট্টাচার্য

মান্না পাবলিকেশন

৩০/১ বি, কলেজ রো • কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ লেখক
প্রচ্ছদ ঃ সন্দীপ রায় চৌধুরী ও জয়দীপ রায় চৌধুরী

প্রকাশক ঃ অশোক মান্না
মান্না পাবলিকেশন, ৩০/১বি, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ৯৪৩৩১৮৬০৬৪

টাইপসেটিং ঃ স্বস্তিকা এন্টারপ্রাইজ
১৯/১, নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রণ ঃ নবলোক প্রেস
৩২/২ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

ভূমিকা

আমাদের দেশে বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রাথমিক ইতিহাস মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক। বিজ্ঞানের আলোক প্রবেশ করেনি এমন এক সময় থেকে গত ৩০০ বছর ধরে ধারাবাহিক অগ্রগতিতে কলকাতা তার বিকাশ ও বৈচিত্র্যের ইতিহাসে আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে, সেখানে বিজ্ঞানের বহুমুখী ভূমিকাকে অস্বীকার করা চলে না।

আজ কলকাতার সঙ্গে বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সচেতন বা অবচেতন—যে কোনো ভাবে হোক, বহু বিচিত্র কর্মধারার মধ্যে তার নিত্য অভিব্যক্তি লক্ষ্য করার মত। অথচ স্বতন্ত্রভাবে তা আমাদেব নজরে আসে না। তার সামগ্রিক বিকাশেব ইতিহাস নিয়ে আজ পর্যন্ত তেমন কোনো মূল্যায়নও হয়নি। বস্তুত কলকাতাকে ঘিরে বিজ্ঞানচর্চার যে ইতিহাস তা কলকাতার সংস্কৃতি চর্চারই অঙ্গ। আজ কলকাতার পরিচয়ের ক্ষেত্রে তত্ত্বগত ও প্রায়োগিক দিক দিয়ে বিজ্ঞানের যে নিরলস ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়, তার মূল্য অপরিসীম। অথচ সভ্যতার ইতিহাসে কলকাতার বয়স বেশি নয়।

তা ছাড়া কলকাতা সম্পর্কে আর একটি কথা বলার আছে। কলকাতায় বিজ্ঞানচর্চার সূচনা হয় শাসন ও শোষণকে অবলম্বন করে। আজ থেকে তিনশো বছর আগে জোব চার্নক যে কলকাতায় পদার্পণ করেন তার সঙ্গে বর্তমান কলকাতাব মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে সে কলকাতা জনমানবহীন, জঙ্গলাকীর্ণ, ভূখণ্ড মাত্র ছিল না। সেখানে মানুষের বসবাস ছিল। আর এই বসবাসের সঙ্গে খাদ্য, পানীয় এবং বাসস্থানের প্রাথমিক সম্পর্ক থাকবেই—সামান্যতম জীবিকা নির্বাহের পক্ষে যা একান্ত অপরিহার্য।

কিন্তু কলকাতার এ পরিচয়ে বিজ্ঞানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়। ইউরোপীয় বণিককুলের মাধ্যমে সে দেশের রেনেশাঁসের প্রভাব আমাদের পূর্বাঞ্চলে এসে না পড়লে পরবর্তীকালের কলকাতা কি চেহারা নিত, বলা মুশকিল। হয়তো কলকাতার আধুনিকীকরণ শুরু হত কয়েক শতাব্দী পর থেকে। বস্তুত সতেরো শতকের শেষ দশকেব আগে পর্যন্ত যে পূর্বাঞ্চল তেমনভাবে গুরুত্বলাভ করেনি, চার্নকের তৃতীয়বার সুতানুটির ঘাটে অবতরণের সময়কাল থেকে তার ক্রম-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

১৬৯০ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ—এই দশ বছর কলকাতার ইতিহাস একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। এই পর্বে ইংরেজ কোম্পানি কলকাতায় দুর্গ নির্মাণের অধিকার লাভ করল। তা ছাড়া সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারি স্বত্ব অর্থাৎ খাজনা আদায় ও জমা দেবার অধিকারও লাভ করেছিল কোম্পানি। সেই সঙ্গে মাদ্রাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কলকাতা সেটেলমেন্টে স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি টাউন গঠিত হল ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে। প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন একটি প্রেসিডেন্সি টাউন, শুরু থেকেই যে অঞ্চলটি ছিল আইনত মাদ্রাজ সেটেলমেন্টের কর্তৃত্বাধীন। এই প্রেসিডেন্সি টাউন পূর্বাঞ্চলে তো বটেই, এ দেশেও ইংরাজদের বিজ্ঞান-ভাবনার ভিত্তিভূমি। এখানেই কলকাতার আধুনিকীকরণের

ছোঁয়া লাগে এবং তা ক্রমে হয়ে ওঠে বিকাশের কেন্দ্রস্থল। তবে প্রথম দিকে তার গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ।

কলকাতার পরিচয়ের ক্ষেত্রে তার বহুমুখিনতা ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মত। ইংরাজদের স্বার্থপ্রণোদিত পরিচর্যায় কলকাতা এক সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি রূপে চিহ্নিত হল, ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। সে কারণে স্বাভাবিকভাবে কলকাতার আনুপূর্বিক পরিবর্তন ঘটে যায়। ক্রমে কলকাতার রূপরেখা, বাড়িঘর, লোকজন, যানবাহন, সমাজ-সংস্কৃতি সর্বত্রই তার ছাপ পড়ে। ফলে শিক্ষার চর্চায়, শিল্পের সাধনায়, সংস্কৃতির অনুশীলনে এবং বাণিজ্যের সেবায় ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানকেন্দ্রেব পীঠস্থান রূপে কলকাতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

কিন্তু বর্তমানে সামগ্রিকভাবে কলকাতার যে চেহারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাতে পরিকল্পনার অভাব লক্ষ্য করা যায়। সেইজন্যে তার বিকাশের চিত্রটি আমাদেব কাছে উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট নয়। জোব চার্নকের পদার্পণের পর থেকে কলকাতার বিকাশ এবং বিস্তৃতি ঘটেছে তার প্রয়োজন অনুসারে। ফলে হুগলির পূর্বতটে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উত্তরের এই শহবটিকে ঘিরে উদ্দেশ্যমূলক নানা ধবনেব পবিকল্পনা গৃহীত হয় ইংরাজ শাসনেব বিভিন্ন পর্যাযে। সেইজন্যে জ্ঞানের যে অন্বেষণ দেখা যায় ইংরাজ আমলে, যুগেব প্রয়োজনে তা ছিল মূলত আপন স্বার্থসিদ্ধিব উদ্দেশ্যে। সুতরাং পরিকল্পিত কোনো নগরী হিসাবে কলকাতার কোনো চিত্ররূপ আমাদের নজবে আসে না। অবশ্য এই পবিস্থিতি এবং পরিবেশে কলকাতার নিজস্ব এক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। কলকাতাব বিজ্ঞান-ভাবনা তার অংশমাত্র।

আজ পর্যন্ত কলকাতাব বিজ্ঞান-ভাবনাকে অবলম্বন কবে তেমনভাবে কেউ উদ্যোগী হননি। এই অঞ্চলেব বিজ্ঞান-মনীষাদেব নিযে কিছু কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতার বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে বিক্ষিপ্ত আলোচনাও নজবে আসে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত যে অগ্রগতি কলকাতাকে আজকেব কলকাতায় নিযে এসেছে, তাকে উপস্থাপনেব তেমন কোনো উদ্যোগ ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি। বর্তমান সংকলনে কলকাতার বিজ্ঞান ও তাব ইতিহাসকে একই সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা কবা হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, কলকাতাকে নিয়ে এ ধবনের উদ্যোগ এই প্রথম। এতে কলকাতার বিজ্ঞানচর্চা ও ভাবনার সামগ্রিক রূপটি যেমন পবিস্ফুট, তেমনি কলকাতাব মূল্যায়নেরও একটা চেষ্টা হয়েছে।

কলকাতার বিজ্ঞান-ভাবনার ক্ষেত্রে বিষয়েব যে বৈচিত্র্য নজরে আসে সেখানে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিভিন্ন প্রবন্ধকে একই সূত্রে গ্রথিত করা সহজ কথা নয়। সংকলনে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার একটা চেষ্টা করা হয়েছে। যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। তাঁদের প্রবন্ধগুলিতে ইতিহাস-আশ্রিত কলকাতাব যে বৈজ্ঞানিক পরিচয় উপস্থাপিত, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত তা বিস্তৃত।

সংকলনের বিভিন্ন প্রবন্ধকে সাধারণভাবে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। একটি শ্রেণীতে তার আদি প্রকৃতি, ভৌগোলিক অবস্থিতি এবং প্রাথমিক ও স্বাভাবিক পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যটিতে তার চর্চা ও উন্নয়নের বৃত্তান্ত নজরে আসে। মূলত এই দুটি শ্রেণী-বিভাগ অবলম্বনেই কলকাতার বিজ্ঞান-ভাবনা ও বিকাশের ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমান সংকলন তেরোটি প্রবন্ধ সংবলিত। বিষয়-নির্বাচন এবং বিন্যাসের ক্ষেত্রে এই

প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে কলকাতার একটি সম্যক এবং ধারাবাহিক পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব হবে বলে মনে হয়েছে। সংকলনের প্রথম প্রবন্ধ 'কলকাতার মাটি' প্রথম শ্রেণীটির অন্তর্ভুক্ত। এটিতে কলকাতার ভূ-প্রকৃতি ও তার চরিত্রের পরিচয় আছে। এরই উপরে গড়ে উঠেছে একদা সুন্দরবনের অংশবিশেষ বর্তমান 'কলকাতার গাছপালা'। এই পরিবেশেই 'কলকাতার পাখি' এবং 'কলকাতার প্রাণিজগৎ' -এর ভূমিকা। কলকাতার এই পরিচয় পর্বে প্রকৃতির ভূমিকাই মুখ্য।

তারপরে এসেছে মানুষ। 'কলকাতার মানুষ ও সমাজ' শুধু জোব চার্নকের আমলের মানুষের উত্তরসূরী নয়, কলকাতা যখন থেকে ইংরাজদের উন্নয়নের লক্ষ্যস্থল হয়ে ওঠে, তখন থেকে দেশের নানা অংশের মানুষ, বিদেশের মানুষ মিলে কলকাতার 'মানুষ' এক আন্তর্জাতিক চেহারা পায়। কলকাতায় বিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে সংস্কারপ্রয়াসী এই মানুষই কাণ্ডারীর ভূমিকা গ্রহণ করে।

কিন্তু সংস্কারের উদ্যোগ একমুখীন নয়। 'কলকাতার স্থাপত্য' তার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিকাশ লাভ করে। 'কলকাতার সংগ্রহশালা'-য় তার কীর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। উন্নয়নের আর এক মাপকাঠি তার গতি এবং 'কলকাতার যানবাহন'। 'কলকাতার বাতি-ব্যবস্থা'-তেও তার বিশেষ পরিচয় লক্ষণীয়। এবং সর্বোপরি শিল্পনগরী হিসাবে কলকাতার ভূমিকা তার জীবনযাত্রায় অভিনবত্ব নিয়ে আসে 'কলকাতার শিল্পায়ন'-এ। শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক দূষণের। পরিকল্পনাহীন এক শহরে শিল্প এবং সভ্যতা যখন বিকাশ লাভ করে, তখন অনিবার্য ফল হিসাবে আমাদের চারপাশের পরিবেশ দূষিত হয় এবং দূষণ সেখানে এক উল্লেখযোগ্য মাত্রা পায়। তার পরিণতি 'কলকাতার পরিবেশ ও দূষণ'। কলকাতার বিজ্ঞান-ভাবনা বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের গবেষণাগারগুলির ভূমিকা কম নয়। সেই সব গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার পিছনে উদ্যোগ-পর্বে যেমন ইংরাজ আছে, তেমনি পরবর্তী কালে এ দেশীয় স্থানীয় মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও দেশপ্রেম লক্ষ্য করা যায়। সব মিলিয়ে 'কলকাতার গবেষণাগার'। কলকাতার বিজ্ঞান-ভাবনার সামগ্রিক পরিচয় প্রসঙ্গে এখানে যে বিজ্ঞান শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন ও গবেষণার সূচনা হয়, তার কথা উল্লেখ করা দরকার। কলকাতার বিকাশের ক্ষেত্রে তার মূল্য অপরিসীম। তাই সংকলনের শেষ প্রবন্ধ 'কলকাতায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা'।

বর্তমান কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা ও কৃষ্টির সঙ্গে কলকাতার বিজ্ঞান আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে, তার অগ্রগতির ধারাটি অনুধাবন করতে হলে পাশাপাশি কলকাতার ইতিহাস ও রাজনৈতিক পটভূমিটি তুলে ধরা প্রয়োজন। সেই কারণে সংকলনের পরিশিষ্টে উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জীর সাহায্যে কলকাতার ইতিহাস ও বিজ্ঞানকে কালানুক্রমে স্তম্ভাকারে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ফলে পাঠক এটির সাহায্যে সহজেই কলকাতার বিজ্ঞান-ভাবনা ও প্রাসঙ্গিক ইতিহাসের ক্রমবিকাশের পরিচয় পাবেন।

আজ বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কলকাতা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকলেও প্রাক্-স্বাধীন ভারতে কলকাতা ছিল বিজ্ঞান-ভাবনার পাদপীঠ এবং গবেষণার প্রধান কেন্দ্র। জোব চার্নকের পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞান-ভাবনার সূচনাকাল থেকে প্রয়োগে এবং গবেষণায় কলকাতা এক সময়ে শুধু বাংলায় বা ভারতে নয়, সমগ্র এশিয়াতেই অগ্রগণ্যের খ্যাতি ও সম্মান লাভ করে। বিজ্ঞানের বহু মনীষার একত্র সমাবেশ ঘটে আমাদের এই কলকাতা শহরে। আমাদের দেশের প্রান্ত-প্রত্যন্তের মানুষও যেমন আছেন তার ভিতরে, তেমনি একাধিক বিদেশীর কথাও স্মরণ করতে হয়। ফলে একটি শহরে

একসঙ্গে বিজ্ঞানের নানা শাখায় গবেষণার সূচনা ও বিকাশ—কোথাও তা পথিকৃতের ভূমিকায়, কোথাও আবার অন্যত্র আবিষ্কারের সঙ্গে একযোগে—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছে। সে দিক দিয়ে কলকাতার বিজ্ঞান অনুশীলনের নানা পর্বে একাধিক দিক্‌চিহ্ন এবং উজ্জ্বল মুহূর্ত রয়ে গেছে। কলকাতার তিনশো বছরের ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাসে তার মূল্য কম নয়।

বর্তমান সংকলনটিকে কলকাতার বিজ্ঞান বিষয়ক একটি প্রামাণ্য দলিল হিসাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। নানা চিন্তা-ভাবনা, প্রকল্প রূপায়ণ ও ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষ্য নিয়ে সংকলনে এক একটি বিষয়ের বিন্যাস এবং আলোচনা করা হয়েছে, কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে যার পরিকল্পনা ; কিন্তু তিনশো বছরের পরেও কলকাতার ইতিহাস আবিষ্কার ও পর্যালোচনায় যার অবশ্যম্ভাবী একটা মূল্য থেকে যাবে।

সূচীপত্র

কলকাতার মাটি সুনীল ভট্টাচার্য ১
কলকাতার গাছপালা নন্দদুলাল পাড়িয়া ১৯
কলকাতার পাখি মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ৪৫
কলকাতার প্রাণিজগৎ স্বপনকুমার দাশ ৭২
কলকাতার মানুষ ও সমাজ অশোককুমার ঘোষ ৯২
কলকাতার স্থাপত্য দুর্গা বসু ১০৯
কলকাতার সংগ্রহশালা অমিত চক্রবর্তী ১২৫
কলকাতার যানবাহন নিখিলেশ মিত্র ১৪০
কলকাতার বাতি-ব্যবস্থা অনীশ দেব ১৫২
কলকাতার শিল্পায়ন সিদ্ধার্থ ঘোষ ১৮১
কলকাতার পরিবেশ ও দূষণ অশোক মুখোপাধ্যায় ১৯৮
কলকাতার গবেষণাগার অরূপরতন ভট্টাচার্য ২২০
কলকাতায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা বিনয়ভূষণ রায় ২৪৬
তিনশো বছরের ভারতীয় ইতিহাসের পটভূমিতে কলকাতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী দিব্যেন্দু হোতা ও অনীশ দেব ২৭২
গ্রন্থপঞ্জী ২৮৩
নির্দেশিকা ২৯৫

কলকাতার মাটি

সুনীল ভট্টাচার্য

মাটির তলার পৃথিবী মানুষের কাছে চিরকালই রহস্যময়। যে-কলকাতা শহরে আমরা বাস করি, যে-মাটির বুকে আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, যে-মাটিতে আমাদের ওঠা-বসা, শয়ন-জাগরণ, রহস্যময় সেই মাটির তলার কলকাতা সম্পর্কে কতটুকু জানি আমরা ? বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে তার ভূতাত্ত্বিক পরিচয়ই বা কী ?

উত্তর-পূর্ব ভারতের বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মিলিত সমভূমির এক ভগ্নাংশ জুড়ে রয়েছে এই কলকাতা শহর। সমভূমি অর্থ পলিমাটিতে ভরা জমি—যেখানে চড়াই-উতরাই বিশেষ নেই বলা চলে। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মধ্যজীবীয় অধিযুগের শেষদিকে, অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় আট কোটি বছর আগে থেকেই, এই সমভূমিতে ভরাট এলাকাটি ছিল বঙ্গোপসাগরের ধারে একটা বড় খাঁড়ির মত। এখন থেকে প্রায় সাত কোটি বছর আগে নবজীবীয় অধিযুগে উত্তরদিকে হিমালয় পর্বতমালা ধীরে ধীরে উঠে আসছিল। পশ্চিমদিকেও বিহার, ওড়িশার পাহাড় এলাকা উন্নত হচ্ছিল, আর মাঝখানের এই বিস্তীর্ণ নীচু এলাকাটির মধ্যে বেশ কয়েকটি উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছিল। এই সব উপত্যকা অঞ্চলের সাধারণ ঢাল ছিল উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বের বঙ্গোপসাগরের দিকে। আবার উত্তর দিকের, অর্থাৎ বর্তমান উত্তরবঙ্গ, আসাম ও বাংলাদেশের, হিমালয়ের লাগোয়া উঁচু জমিও ঢালু হয়ে কলকাতার পূর্ব অঞ্চলে এসে মেশে। প্রকৃতির নিয়মেই পাহাড়-পর্বতের উচ্চভূমির এলাকা থেকে নদী-উপনদী পলিমাটি বয়ে আনতে থাকে নিম্নভূমি এবং সমুদ্রের দিকে। সেই সঙ্গে এই নিম্নভূমির কিছুটা অংশ সমুদ্রের নীচ থেকে জেগে ওঠে। ফলে নবজীবীয় অধিযুগের প্রথমদিকের কিছু সামুদ্রিক পাললিক শিলা রয়ে গেছে কলকাতার নীচে। এই শিলাগুলি জমাট বেঁধে অনেকটা শক্ত হলেও এর উপরের দিকে জমা হওয়া পলিমাটি সে-রকম জমাট বাঁধেনি। ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সেগুলি নরম ধরনের শিলা। প্রথমদিকে এই পলিমাটি উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিমদিক থেকে এলেও পরে জমির মূল ঢাল দাঁড়িয়ে যায় সাধারণভাবে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে। সুতরাং কলকাতা এলাকা পলিতে ভরাট হয়েছে প্রধানত গাঙ্গেয় বদ্বীপ সৃষ্টির ক্রিয়াকলাপের ফলেই। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম থেকে বিভিন্ন নদী-উপনদীই শুধু পলিমাটি বয়ে আনেনি, ক্রমশ নতুন নতুন অনেক শাখানদী তৈরি হয়ে পলিমাটি চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। পলিতে ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে বদ্বীপের এলাকা ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বৃদ্ধি পেয়েছে, আর সেই সঙ্গে সমুদ্রের তটভূমি ধীরে ধীরে সরে গেছে। এই এলাকা সমুদ্রতল থেকে ক্রমে উঠে আসার মুখে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার প্রভাবে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত করেছিল। এর ফলে কলকাতার নীচের পলিমাটিতে মিশে আছে অনেক ভৌগোলিক প্রভাব, অনেক বিচিত্র নিদর্শন।

দেখা যাচ্ছে, কলকাতার নীচে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রকম শিলা ও ভূস্তর রয়েছে। ভূস্তরের পাললিক শিলা প্রধানত মধ্যজীবীয় অধিযুগের শেষ দিক থেকে নবজীবীয় অধিযুগ পর্যন্ত, অর্থাৎ গত সাত-আট কোটি বছর ধরে এসব ভূস্তর তৈরি হয়েছে। পাতলা পাললিক শিলার স্তর তৈরি হতে অবশ্য অনেক সময়ে হাজার বছর কেটে যায়। আবার হয়ত একশো-দু'শো বছরেও তা হতে পারে। তবে সমুদ্রে বা কোনো জলাশয়ের নীচে পলি এসে জমা হওয়ার হারের উপরেই তা নির্ভর করে। বর্তমান (Recent) ও প্রাক-বর্তমান (Pleistocene) ভূতত্ত্বীয় যুগে নদীবাহিত পলিতে তৈরি স্তরগুলি অপেক্ষাকৃত কম সময়ে তৈরি হয়েছে। এগুলিকে নরম ধরনের শিলা বলা হয়। উপরের পাললিক স্তরের যথেষ্ট চাপে নীচের স্তরের শিলা থেকে জলীয় অংশ সাধারণত বেরিয়ে যায়, আর তা যথেষ্ট পাতলা হয়ে আসে। আবার সমুদ্র সরে গেলে বা স্থলভাগের কোনো অংশ আগের অবস্থান থেকে বেশি উপরে উঠে গেলেও সেখানে পলিস্তরের আর কোনো চিহ্ন থাকে না। কিন্তু প্রাকৃতিক খেয়ালে সে জায়গা সমুদ্র বা জলাশয়ের নীচে চলে গেলে আবার সেখানে পলি জমা শুরু হয়। পলি জমার সময়ে সে এলাকায় জলের নীচের জীবজন্তু, গাছপালা এসে চাপা পড়লে তা জীবাশ্মে বা ফসিলে পরিণত হতে পারে। এই ফসিল থেকেই ওই স্তর ভূতত্ত্বীয় কোন সময়ে তৈরি, তার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়।

কলকাতার ভূতত্ত্বীয় বিষয় প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন সূত্র অবলম্বন করে। শহর কলকাতার বুকে ও আশেপাশে প্রচুর নলকূপ বসানো হয়েছে এবং সেই সব কূপ খননের সময়ে বিভিন্ন জায়গায় নীচের পলিমাটির স্তরের নমুনা ও গভীরতা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে। কলকাতার কাছাকাছি খনিজ তেলেরও অনুসন্ধান করা হয়েছে কয়েকবার। সে-সময়ে ড্রিলিং ছাড়াও ভূ-পদার্থ (Geophysical) বিষয়ক অনুসন্ধান চলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে। এর ফলে কলকাতার নীচের ভূস্তর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি বৃহৎ নির্মাণ-কার্য তথ্যের দিক থেকে আমাদের বারবার সমৃদ্ধতর করেছে। গঙ্গার উপর নির্মিত বিখ্যাত 'ক্যান্টিলিভার ব্রিজ' বা হাওড়া ব্রিজ তৈরির কাজে বা মেট্রোরেল প্রকল্প রূপায়ণে কিংবা সুউচ্চ অট্টালিকার ভিত তৈরি করার সময়ে শহরের জমি বা নীচের অংশ কিভাবে গড়ে উঠেছে তার উল্লেখযোগ্য সন্ধান পাওয়া গেছে।

কলকাতার বুকে প্রচুর নলকূপ খননের ফলে ভূতত্ত্বীয় বর্তমান যুগে সঞ্চিত পলি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা গেছে। কলকাতার আশেপাশে খনিজ তেলের অনুসন্ধানের ফলেও আরো নীচের ভূস্তর সম্বন্ধেও কিছু তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এ-সব থেকে কলকাতা এলাকার নীচের ভূস্তরের একটা সামগ্রিক চেহারা ফুটে ওঠে। কলকাতা অঞ্চলে ক্রিটেশাস যুগের শেষ দিক, অর্থাৎ বলতে গেলে আট কোটি বছর পূর্বের সময়কাল থেকে প্রায় সব ভূতত্ত্বীয় যুগের শিলাই পরপর সাজানো রয়েছে। তার মাঝে মাঝে অবশ্য অঞ্চলটি যখন সমুদ্র বা জলাশয়ের নীচে ছিল না এমন সময় অতিবাহিত হয়েছে। তখন সমুদ্র নিশ্চয়ই দূরে সরে গেছে, এবং সেখানে সমুদ্র না থাকার জন্য ওই অল্প সময়ে কোনো পলি বা পাললিক শিলাও জমা সম্ভব হয়নি। এই অঞ্চলের ভূস্তরগুলি কেমন তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল.

ভূতাত্ত্বিক যুগ এবং আনুমানিক সময়ের ব্যাপ্তি	স্তরক্রম ও শিলার পরিচয়
বর্তমান ও প্রাক্-বর্তমান যুগের শেষাংশ (নতুন পলি, পুরাতন পলি) (প্রায় বিশ হাজার বছর আগে পর্যন্ত)	বালি. নুড়ি, সিল্ট, কাদা এবং 'কংকর'।[১] নীচের দিকের পলির রঙে বেশি বাদামীভাব।
প্লায়ো-প্লায়োস্টোসিন যুগ (এক কোটি বছর আগে থেকে প্রায় বিশ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত)	নীচে কংগ্লোমারেট. তার উপর মোটাদানা বালিপাথর, তার উপব কাদাপাথব. সিল্ট পাথর এবং কখনো কখনো ল্যাটেরাইট জাতীয় পাথব।
অলিগো-মায়োসিন যুগ (চাব কোটি বছব আগে থেকে দেড কোটি বছর আগে পর্যন্ত)	প্রধানত বালিপাথরের স্তব। তলায় লোহার অকসাইড মেশানো বালিপাথব, তার উপব লিগনাইট জাতীয় পদার্থ মেশানো বালিপাথর।
ইয়োসিন যুগ (সাত কোটি বছর আগে থেকে চার কোটি বছব আগে পর্যন্ত)	নীচে 'নুমুলাইট' গোষ্ঠীব ফোবামিনিফার সমেত চুনাপাথর, তাব উপব চুনাপাথব মেশানো কালো কাদাপাথর। একেবারে নীচে গ্লকোনাইট সমেত বালিপাথর।
ক্রিটেশাস যুগের শেষভাগ (প্রায় আট কোটি বছর আগে থেকে সাত কোটি বছর আগে পর্যন্ত)	উপরের অংশে লিগনাইট জাতীয় পদার্থ মেশানো কাদাপাথর। মধ্য অংশে কালো বা ধূসর রঙের চুনাপাথর; তা ছাড়া মাঝে মাঝে অল্প-স্বল্প কাদাপাথব ও বালিপাথর। নীচের অংশে লোহার অকসাইড মেশানো বালিপাথর।

ভূস্তরের এই সারণির একেবারে নীচে দেখা যায় ক্রিটেশাস যুগের শেষাংশের কিছু পাথর। এই যুগ শুরু হয়েছিল এখন থেকে প্রায় চোদ্দ কোটি বছর আগে। খনিজ তেলের অনুসন্ধানের সময় যেসব ড্রিলিং করা হয় তা থেকে বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেছেন ক্রিটেশাস যুগের ওই পাথরকে। কিন্তু তারও নীচে? আরো বেশি ড্রিলিং করে দেখলে হয়ত ক্রিটেশাসের নীচের দিক বা মধ্যজীবীয় অধিযুগের (প্রায় বারো কোটি বছর আগে থেকে সাত কোটি বছর আগে পর্যন্ত) অন্য যুগের শিলা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এখনও তা সম্ভব হয়নি। তবে এই সব ভূস্তরের নীচে আর্কিয়ান ও প্রোটারোজয়িক সময়ের, অর্থাৎ ষাট

১ কংকর. সিল্ট বা কাদাব সঙ্গে ক্যালসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ও লোহাব অকসাইড ইত্যাদি মিশে ছোট ছোট ধুঁটি যা প্রাকৃতিক ভাবেই তৈরি।

কোটি বছরেরও আগের সময়কালের শিলা অবশ্যই আছে। সব চেয়ে পুরাতন এই শিলা অন্য সব শিলার নীচে অবস্থিত।

পশ্চিমবঙ্গের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রের [চিত্র-১] দিকে নজর দিলে এ-ব্যাপারটা অনেকটা পরিষ্কার হবে। আর্কিয়ান-প্রোটারোজয়িক শিলার উপরই আমরা মধ্যজীবীয় বা নবজীবীয় অধিযুগের ভূস্তর দেখতে পাই। তবে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্লায়োস্টোসিন ও বর্তমান যুগের, অর্থাৎ বিগত প্রায় পনেরো লক্ষ বছরের পুরাতন ও নূতন পলি—বিশেষত নূতন পলি—এমনভাবে বিস্তৃত হয়েছে যে, সেই অঞ্চলের নীচের ভূস্তর বা শিলা পুরোপুরিই চাপা পড়ে গেছে। এ-অঞ্চলে ভরাট হওয়া জমির সাধারণ ঢাল উত্তর-পশ্চিম থেকে

চিত্র :
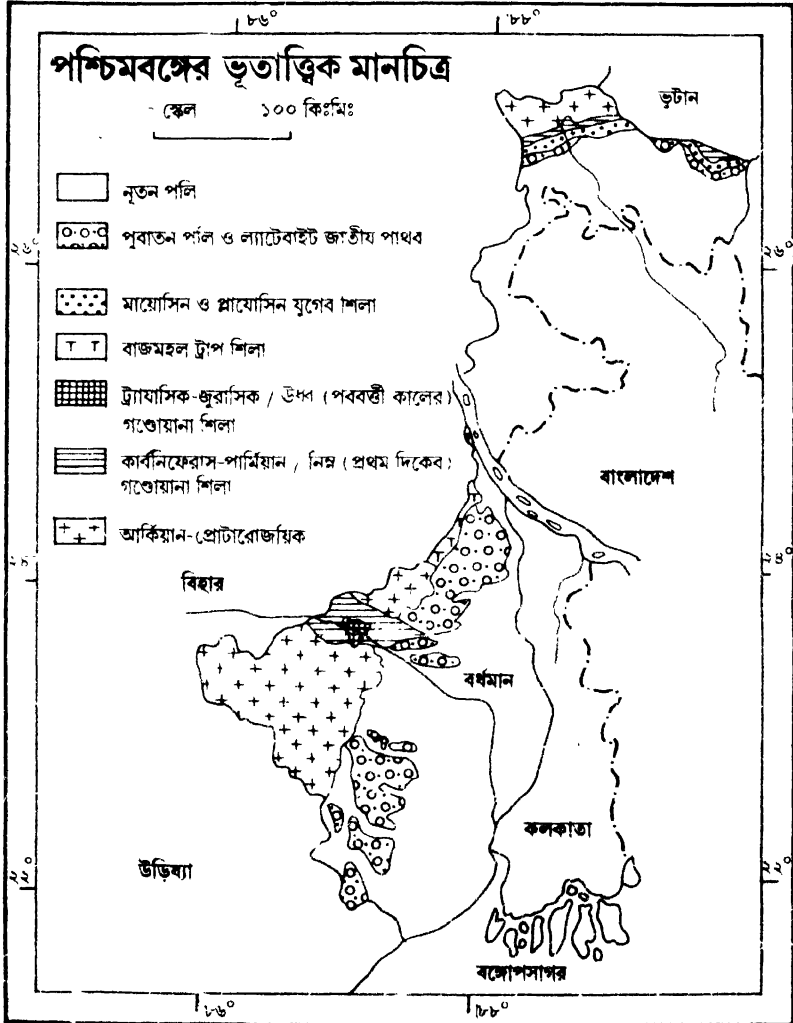
দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হওয়ার জন্যে নূতন পলি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যেমন পুরু হয়েছে উত্তর-পশ্চিম দিকে তেমনই পাতলা হয়ে গেছে।

কিন্তু 'আর্কিয়ান' সময়ের শিলার নীচে কি আর কোনো শিলা নেই ? ভূত্বকে আর্কিয়ান শিলাকেই সবচেয়ে পুরাতন শিলা বলে ধরা হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পশ্চিম দিকে যে আর্কিয়ান শিলা দেখতে পাওয়া যায় তা আর্কিয়ান শিলা গোষ্ঠীর উপরের দিকের শিলা। নীচের দিকেও আর্কিয়ান শিলা যথেষ্ট পাওয়া যাবে। কলকাতা অঞ্চলে ভূত্বক কতটা পুরু ? ভূতাত্ত্বিক পরিমাপে ২০ কিলোমিটারের কম হবে না। তার নীচে পৃথিবীর ম্যান্টল (Mantle)-এর গভীরতা ২৯০০ কিলোমিটাব। আর ম্যান্টলের নীচে পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলের ব্যাসার্ধ ৩৫০০ কিলোমিটার। অর্থাৎ ভূত্বকের নীচে প্রায় ৬৪০০ কিলোমিটার নামা সম্ভব হলে পৌঁছনো যাবে একেবারে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে। কেন্দ্রমণ্ডলে এবং ম্যান্টলে শিলা বেশ ভারি। প্রচণ্ড উত্তপ্ত আধা-তরল আধা-কঠিন তাব অবস্থা। তবে ভূত্বকের নীচের দিকে কঠিন বেসল্ট, গ্র্যানোডায়োবাইট এবং গ্রানিট জাতীয় শিলাব অবস্থান।

কলকাতা অঞ্চলের মাটি গড়ে উঠেছে প্রধানত গাঙ্গেয় সমভূমির পলিমাটিতে। এখানকার মাটিতে নিম্ন-গাঙ্গেয় সমভূমিব মাটিব সাধাবণ চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। অর্থাৎ এখানকার মাটি বালিপ্রধান লোম (loam) থেকে কাদাপ্রধান লোম শ্রেণীর মধ্যে। সিল্ট, বালি ও কাদার অনুপাত হিসাব করলে লক্ষ্য করা যাবে, সেখানে সিল্টের অংশই বেশি—প্রায় অর্ধেক। বাকি অংশের মধ্যে কখনো কাদার আধিক্য কখনো বালির। মাটিতে গাছপালা থেকে অল্প-স্বল্প কার্বনের অংশ, আর 'কংকর' থেকে অল্প ক্যালসিয়ামের অংশ এসে গেছে প্রায় সব জায়গাতেই। সমুদ্রের সান্নিধ্যের ফলে মাটিতে কোথাও কোথাও জোয়ার-ভাটার প্রভাব রয়েছে। তবে কোথাও বা সামান্য নোনা থাকলেও মাটি[১] সাধারণভাবে নোনা নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে মাটির pH মান ৭ থেকে ৮-এব মধ্যে অর্থাৎ মাটিতে সামান্য ক্ষারভাব আছে।

কলকাতার মাটির নীচেই যেসব ভূস্তর তা নরম জাতের শিলায় তৈরি। এই জমাট-না-বাঁধা অংশে দেখতে পাওয়া যায় বালি[২], নুড়ি, সিল্ট, কাদা, কংকর ইত্যাদির মেলা। কলকাতা এলাকায় এই নরম ভূস্তরের একেবারে উপরে রয়েছে একটা কাদামাটিব স্তর। আর কলকাতা অঞ্চলের অনেক জায়গাতেই এই কাদামাটির স্তরের মধ্যে পাওয়া গেছে 'পিট' (Peat)। পিট কয়লা গোষ্ঠীর একেবারে নিকৃষ্ট শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। কলকাতা অঞ্চলে এই কাদামাটির স্তর বেশ পুরু। এতে কখনো বা সিল্ট ও কদাচিৎ অল্প-স্বল্প বালি এবং কংকর দেখা গেছে। এর মধ্যে পিট যে-স্তর হিসাবে বরাবর বিস্তৃত রয়েছে তা নয়।

---

১. মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ বেশ কম (নাইট্রোজেন ০ ০২%-০.০৫%, ফসফোবাস পেন্টকসাইড ০ ১০%-০.১৫%, পটাশ ০.৩%-০.১০%)। ক্যালসিয়াম অকসাইড ও কার্বনেব পবিমাণও বেশি নয় (ক্যালসিয়াম অকসাইড ১.০%-৫ ০%, কার্বন . ০.১০%-০ ৩%)

২. বালি, কাদা, সিল্ট আসলে কণার মাপের হিসাবেব হেবফের। কণাব গড ব্যাসেব মাপ অনুযাযী হিসাবটা মোটামুটি এই রকম ·

Pebble/নুড়ি— ২ মিলিমিটাবের বেশি
Sand/বালি — ২ মিমি থেকে ১/১৬ মিমি
Silt/সিল্ট— ১/১৬ মিমি থেকে ১/২৫৬
Clay/কাদা—১/২৫৬ মিমি থেকে ছোট

কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন গভীরতায় পিট পাওয়া গেছে। এখানে এর কিছু নমুনা-পরিচয় দেওয়া হল। তবে কলকাতার মাটির নীচে অনেক জায়গায় যে 'পিট' পাওয়া গেছে তা বেশির ভাগই ১০-১২ মিটার গভীরতার মধ্যে।

কলকাতার পিট-এর কার্বন-ডেটিং করে এদের সৃষ্টির সময় হিসাব করার চেষ্টাও করেছেন বিজ্ঞানীরা। গাছপালার শরীরের মধ্যে C^{14} আইসোটোপ থাকে। গাছ মরে যাওয়ার পরে ওই আইসোটোপ নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই পরিবর্তনের জন্যে যতটা সময় লাগে তার অর্ধেক সময়ের হিসাব নিয়ে যে-গাছ-গাছালি থেকে পিট তৈরি হয়েছে তা কবে ওই জায়গায় এসে পড়েছিল, বা কোন সময়ে ওই পিট তৈরি হওয়া শুরু হয়েছিল তার একটা মোটামুটি হিসাব অনেক সময়েই পাওয়া যায়। কলকাতার পিট থেকে কার্বন-ডেটিং করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, এই পিটগুলি দুটি পর্যায়ে গঠিত হয়েছে : এখন থেকে প্রায় ছ' হাজার বছর আগে এবং এখন থেকে প্রায় ন' হাজার বছর আগে।

যে-সব গাছ-গাছালি থেকে পিট সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে সুঁদরী জাতীয় গাছ (যেমন, Heritiera) অন্যতম। বর্তমানে কলকাতা অঞ্চল থেকে অনেকটা দক্ষিণে গেলে এই জাতীয় গাছ বেশি করে লক্ষ্য করা যায়। তবে একশো-দেড়শো বছর আগেও আজকের দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলে যে এই সুঁদরী গাছের প্রাচুর্য ছিল তা পুঁথিপত্রেও পাওয়া যায়। অনুমান করা চলে যে, বিগত পাঁচ থেকে দশ হাজার বছর আগে বঙ্গোপসাগরের উপকূল এলাকা আরো কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে সরে ছিল, অর্থাৎ, তা ছিল বর্তমান কলকাতা অঞ্চলের খুব কাছাকাছি। তখন চারপাশে জলা-জায়গার মধ্যে সুঁদরী জাতীয় গাছের প্রাচুর্য ছিল। এরই মধ্যে কিছু কিছু জায়গা প্রাকৃতিক কারণে ৮-১০ মিটারের মত ধসে বা বসে গেছে। এই ধরনের বসে যাওয়ার কারণ হিসাবে বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ ডঃ সি এস ফক্স বলেছেন, গাঙ্গেয় বদ্বীপের নীচের দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণাঞ্চলে ক্রমাগত পলিমাটি জমে অত্যধিক ভার সৃষ্টি হওয়ার জন্যেই এমনটা হয়ে থাকবে। যাই হোক, বসে যাওয়া জায়গায় উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে নদীর প্লাবনের জলের সঙ্গে যেমন পলিমাটিও এসেছে তেমনি কিছু সুঁদরী ও অন্যান্য গাছের ডালপালাও এসে জমেছে। এছাড়া কিছু গাছ-গাছালি বসে যাওয়া খাদের মধ্যেও থেকে গেছে। এইসব গাছপালা-চাপা-পড়া জায়গায় কয়লা সৃষ্টি হবার মত কিছুটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি হচ্ছিল মনে হয়। আর সেইজন্যই সেই অবস্থা মাত্র পিট পর্যন্ত পৌঁছয়।

কলকাতার নীচে পিট যে-রকম ভাবে জ্বালানী হিসাবে আছে তাতে উৎসাহিত হবার কিছুই নেই। সংশ্লিষ্ট সারণিতে যে পিট স্তরগুলির কথা বলা হয়েছে সেখানে আসল পিট কতটা পুরু তা লক্ষ্য করলেই পিটের স্বল্পতার পরিচয় পাওয়া যাবে। এছাড়া পিট স্তরের একাদিক্রমে বিস্তারের কথাটাও চিন্তা করা প্রয়োজন, যা কলকাতার পিটে যথাযথ নেই। যাই হোক, পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এখানকার পিটে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ শতকরা ৮৫ ভাগ, উদ্বায়ী পদার্থ প্রায় ১০ ভাগ এবং স্থায়ী কার্বন শতকরা প্রায় ৫ ভাগ। সংগৃহীত পিটের নমুনাকে খোলা বাতাসে রাখলে জলীয় অংশ অনেকটাই বেরিয়ে যায় ও তার ফলে ছাড়া ছাড়া টুকরোতে পরিণত হয়। এগুলি থেকে গ্রাম প্রতি ২৫২ কিলোক্যালরি থেকে ৩০২ কিলোক্যালরি তাপ পাওয়া যেতে পারে।

হাড়গিলে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়ার সৌজন্যে

সাদা কাঁক

লক্ষ্মী পেঁচা

ছবি : কুশল মুখোপাধ্যায়
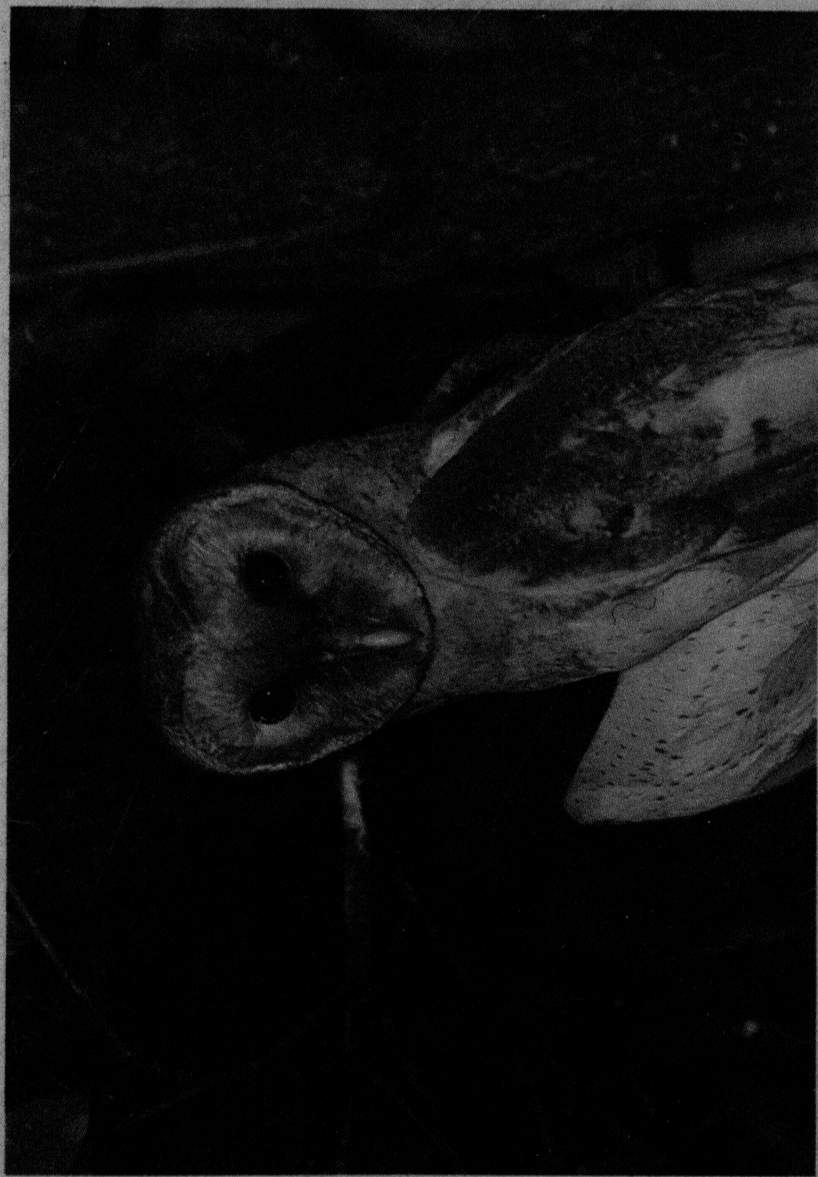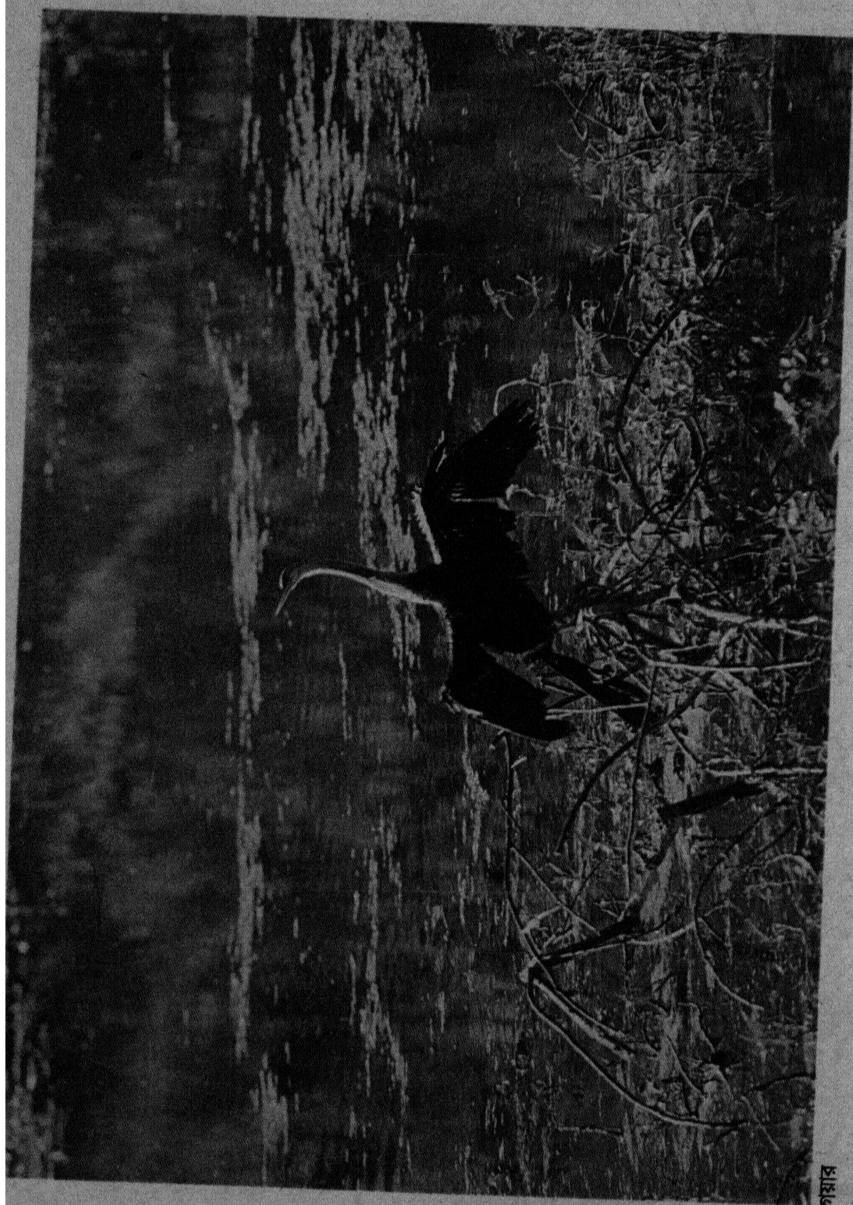
গয়ার

কলকাতার কয়েকটি স্থানে পিটের সংস্থান

কোথায় পাওয়া গেছে	গভীরতা (মিটার)			কী ভাবে অবস্থিত
	থেকে	পর্যন্ত	মোট বেধ	
ফোর্ট উইলিয়ামে নলকূপের জন্য খুঁড়তে গিয়ে	৩.০৫	৬.১০	৩.০৫	—
	১১০.৪১	১১৩.৪৬	৩.০৫	
শিয়ালদহে পুকুর খোঁড়ার ব্যাপারে	১.৭৬	৯.৬৯	৭.৯৩	বালি ও কাদার মধ্যে বসে থাকা গাছের গুঁড়ি
পুরাতন প্রস্তাবিত (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে) টিউব রেলের জন্য ১নং ট্রায়াল বোরিং যা শিয়ালদহ স্টেশনের কাছেই হয়েছিল	৫.৩৩	৭.১৬	১.৮৩	নরম কাদামাটির মধ্যে পচনধরা গাছের ডাল
পুরাতন প্রস্তাবিত (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) টিউব রেলের জন্য ২নং ট্রায়াল বোরিং করা হয়েছিল কলেজ স্ট্রিট ও বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের মোড়ে	৬.৮৩	১০.৪৯	৩ ৬৬	কাদামাটির মধ্যে পচনধরা গাছের ডাল
	১.৫৮	২.১৯	০.৬১	সিল্টের সঙ্গে মিশে থাকা কালো পিট
হাওড়া ব্রিজ তৈরির সময় হাওড়ার দিকে গঙ্গার পাড়ে বোরিং করা হয়	৩.৭৮	৫.৮৮	২.১০	সিল্ট ও কাদার মধ্যে বসে থাকা গাছের গুঁড়ি
কলকাতা বন্দরের কিং জর্জ	+ ০.০৩০[১]	০.০৬১	০.০৯১	কালো পিট
ডকের ১নং কূপ	১.৪৬	৭.২৫	৫.৭৯	কাদামাটির মধ্যে গাছের গুঁড়ি ও শিকড়
	৭.২৫	৭.৫৬	০.৩১	কালো পিট

১ ভূ-পৃষ্ঠতলের সাধারণ অবস্থিতি থেকে ০.০৩০ মি. উপরে

কলকাতার নীচের ভূস্তরের উপরের দিকে পিট আছে। কিন্তু পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাসের কথা বলতে গেলে আরো কিছুটা নীচের দিকে যাওয়া দরকার। কলকাতার আশেপাশে বেশ কয়েকবার পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য অনুসন্ধান চলেছে এবং কিঞ্চিৎ আশার বাণীও শোনা গেছে। নবজীবীয় ভূস্তরে পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই পেট্রোল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে। আর কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে সরাসরি ড্রিলিং ও ভূপদার্থ বিষয়ক অনুসন্ধানের ফলে বোঝা গেছে যে, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস থাকার মত অনুকূল ভূস্তর এ-অঞ্চলে আছে। তাছাড়া ড্রিলিং করার সময়ে কোথাও কোথাও প্রাকৃতিক গ্যাস উঠেও এসেছে।

আমাদের পাশের রাজ্য আসাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলে এই সব প্রাকৃতিক সম্পদ নবজীবীয় ভূস্তরের মধ্যে পাওয়া গেছে। নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর ছাড়িয়ে বার্মাতে গেলেও খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ওই নবজীবীয় ভূস্তরেই, অর্থাৎ এখন থেকে সাত কোটি বছর আগে পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে সঞ্চিত হতে দেখা গেছে। নবজীবীয় অধিযুগে এই এলাকাগুলি জুড়ে ভূতাত্ত্বিক ঘটনাবলীর মধ্যে অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। তাই সেই সব প্রাকৃতিক সম্পদ হয়ত একইভাবে সমস্ত এলাকা জুড়ে সৃষ্টি হয়েছিল বলে ধারণা করার কারণ আছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস যেসব ভূস্তরে বেশি করে পাওয়া গেছে সেগুলো ইয়োসিন (সাত কোটি বছর আগে থেকে প্রায় চার কোটি বছর আগে পর্যন্ত) থেকে মায়োসিন (আড়াই কোটি বছর আগে থেকে প্রায় এক কোটি বছর আগে পর্যন্ত) যুগের পাললিক শিলার মধ্যে। এই সময়ের বেশ কিছু শিলা কলকাতা অঞ্চলের নীচে আছে। [চিত্র—২]। তবে শিলাগুলি বঙ্গোসাগরের দিকেই ক্রমশ পুরু হয়ে গেছে।

চিত্র-২

কলিকাতার নীচের আনুমানিক ভূ-স্তর বিন্যাস
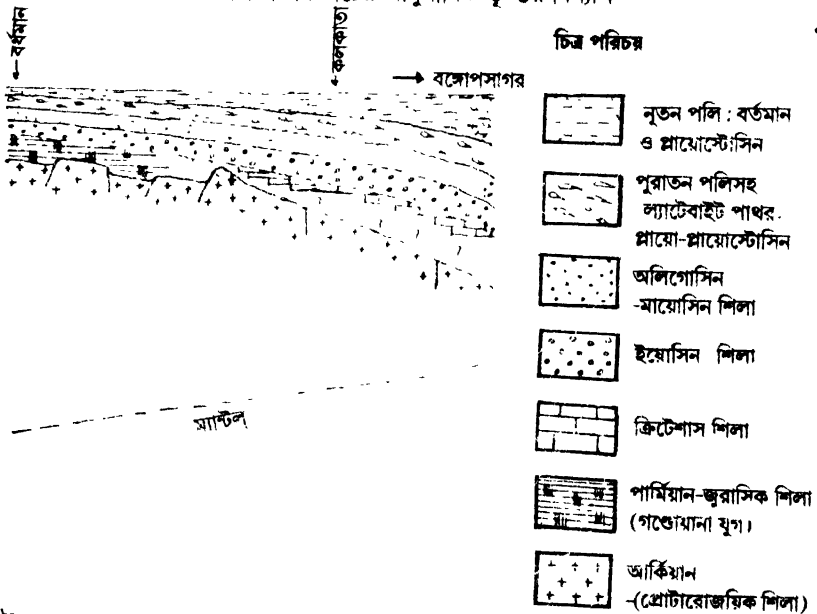
ভারতের আসাম-ত্রিপুরা অঞ্চল এবং বাংলাদেশ কলকাতার দক্ষিণের উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রায় লাগোয়া এবং নবজীবীয় অধিযুগের কিছুটা সময় এই অঞ্চলগুলির পক্ষে একই রকম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থাকা অসম্ভব নয়। আসাম-ত্রিপুরা অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস মোটামুটি অলিগোসিন (চার কোটি বছর আগে থেকে আড়াই কোটি বছর আগে পর্যন্ত) থেকে মায়োসিন (আড়াই কোটি বছর আগে থেকে প্রায় এক কোটি বছর আগে পর্যন্ত) যুগের শিলাতেই আমরা পেতে দেখি। তাই কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে অনুরূপ শিলায় অনুরূপ প্রাকৃতিক সম্পদ আশা করাটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার বলেই মেনে নেওয়া যায়। ইন্দো-স্ট্যানভ্যাক[১] সমীক্ষার কাজ এই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে শুরু হয়েছিল। তাঁদের সমীক্ষার পর সত্তর ও আশির দশকে অয়েল এনড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন ড্রিলিং ও নানারকম ভূ-পদার্থ বিষয়ক সমীক্ষা চালিয়েছেন। ভূ-পদার্থ বিষয়ক বিভিন্ন সমীক্ষার মধ্যে ভূস্তরে কম্পন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজই বেশি। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের ব্যাপারে একটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা হল এই প্রাকৃতিক সম্পদ জমা হওয়ার মত অনুকূল পরিবেশের অবস্থান, অর্থাৎ 'অয়েল ট্র্যাপ' লক্ষ্য করা। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে হয়ত 'অয়েল ট্র্যাপ' আছে।

যাই হোক, সব দিক খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয়, এই প্রাকৃতিক সম্পদ ভবিষ্যতে পাওয়া গেলেও তা কলকাতা থেকে বেশ কিছুটা দক্ষিণের দিকেই পাওয়া সম্ভব। শহর কলকাতার নীচের ভূস্তরে সামান্য পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ জমা হয়ে থাকলেও তার বাণিজ্যিক গুরুত্ব তেমন নেই বলেই ধরে নেওয়া যায়।

জ্বালানী সম্পদের ক্ষেত্রে কলকাতা তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও মাটির নীচের জল-সম্পদের ব্যাপারে কলকাতাকে ভাগ্যবান বলা চলতে পারে। মাটির নীচের জলের ক্ষেত্রে দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজের তুলনায় কলকাতার সুবিধা নিঃসন্দেহে বেশি। কলকাতার ভূ-জলসম্পদ মাটির নীচে ভূস্তরের উপরের দিকে নরম শিলার মধ্যে অবস্থিত। চিত্র—২-এ বর্তমান ও প্রাক-বর্তমান (Recent & Pleistocene) যুগের পলি যে-ভাবে দেখানো আছে তা পুরাতন অন্যান্য পাললিক শিলার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢাল তৈরি করেছে। এছাড়া উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নরম পাথরের ভূস্তর ক্রমশ পুরু হয়ে এসেছে। এই জমাট-না-বাঁধা নরম পাথরের ভূস্তরের মধ্যে আছে বালি, নুড়ি, সিল্ট, কাদা ইত্যাদি। কলকাতার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বৃষ্টির জল জমিতে পড়ে এই স্তরে ঢুকে পড়তে থাকে। উপরের জমি ও ভূস্তরের সাধারণ ঢাল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে থাকার ফলে জলের প্রবাহ ক্রমাগত দক্ষিণদিকেই এগিয়ে চলে।

ভূস্তরের মধ্যে জল থাকার মত জায়গা কোথায় পায়? এই জায়গা পাথরের মধ্যে কোনো ফাটল হতে পারে, কিংবা শক্ত বা নরম পাথরে বিভিন্ন দানার মধ্যেও হওয়া সম্ভব। বালিপাথর, বালি বা নুড়ির মধ্যে সাধারণত ছোট ছোট যে-সব ফাঁক থাকে সেগুলি জলে ভরে যায়। স্পঞ্জের মধ্যে জল যেভাবে থাকে এক্ষেত্রেও জল অনেকটা সেইভাবে থেকে যায়। কিন্তু জলের প্রবাহ কীভাবে চলেছে? ব্যাপারটা জলভরা স্পঞ্জের বলের অনুরূপ। জলভরা স্তরের বিস্তৃতি ও ঢাল যেদিকে হবে স্তরের মধ্য দিয়ে জল সেইদিকেই প্রবাহিত হবে।

১ ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে স্ট্যানডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানি ভারতে ১৯৫৮-৬০ সময়ে কয়েকটি অঞ্চলে খনিজ তেলের জন্য অনুসন্ধানের কাজ করে।

কলকাতা অঞ্চলে ভূস্তরের একেবারে উপরে কাদামাটির যে স্তর আছে তাতে মিশে আছে কোথাও কিছু সিল্ট, কোথাও কিছু বালি বা কংকর। এই কাদামাটির স্তরের মধ্যে অল্প পরিমাণে জল ঢোকার ফলে এর মাঝামাঝি অংশটা সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। কলকাতা অঞ্চলে কোথাও কুয়ো খুঁড়লে এই সম্পৃক্ত হওয়া জলের উপরের তলটা দেখতে পাওয়া যায়।

কলকাতার নীচে ৮০-৯০ মিটার গভীর নলকূপ খুঁড়ে যে-জল পাওয়া যায় তার সঙ্গে কিন্তু উপরের কাদামাটির স্তরের মাঝ-বরাবর জলের সঞ্চয়ের কোনো সম্বন্ধ নেই। সে-জল একেবারেই আলাদা। কলকাতার উপরের কাদামাটির স্তরটি প্রায় সমস্ত শহর ও তার আশেপাশের অনেকটা জায়গা ঢেকে রেখেছে। এর ফলে শহরের উপরেব নালা-নর্দমাব জল কাদামাটির স্তর ভেদ করে নীচের ভূস্তরের জলের সঙ্গে মেশার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। একটা কাদামাটির স্তরের তলায় চাপা থাকা নীচের জল সমেত ভূস্তরকে বিজ্ঞানীরা

চিত্র-৩
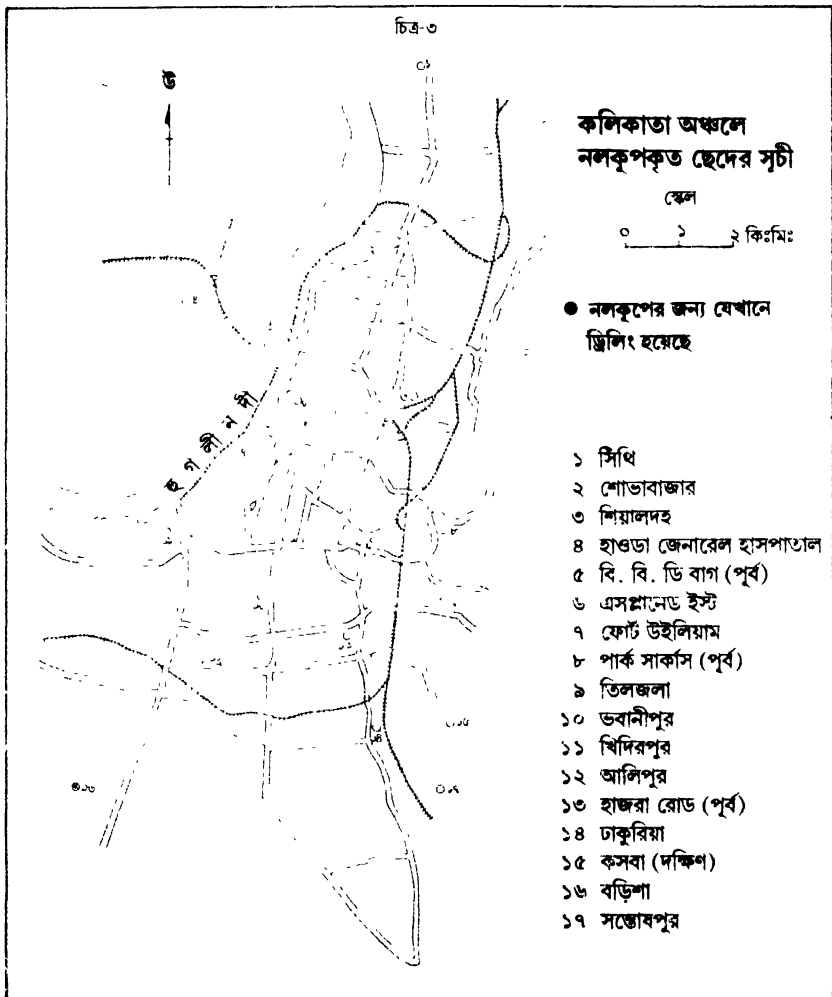
'কনফাইণ্ড অ্যাকুইফার' (Confined aquifer) বলে থাকেন। কলকাতা শহরের বাসিন্দারা যে-জল নলকূপ থেকে তুলে রান্না-খাওয়ার কাজে ব্যবহার করে থাকেন তা ওই উপরের কাদামাটির স্তর ভেদ করে নীচের ভূস্তর থেকে টেনে আনা জল। এই কাদামাটির স্তর কলকাতার সব জায়গায় একরকম নয়। সাধারণভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে এটা পুরু হয়েছে। আবার মধ্য কলকাতা থেকে পূর্ব কলকাতা অঞ্চলের মধ্যেও এটা উল্লেখযোগ্য রকম পুরু—কোথাও কোথাও তা প্রায় ৫০ মিটারের মত। এই কাদামাটির স্তরের নীচে, অর্থাৎ কলকাতার মাটির উপর থেকে প্রায় ৬০ মিটার থেকে ২০০ মিটার গভীরতার মধ্যে যে-বালি, নুড়ি, সিল্ট, কংকর ইত্যাদি আছে তা খুব জলবাহী ভূস্তরের কাজ করছে*। এর নীচেও অবশ্য জলবাহী স্তর রয়েছে, তবে নলকূপ বেশি গভীরে নিয়ে যাওয়া খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। তাই সহজে কেউ ২০০ মিটারের বেশি গভীরে যেতে চান না।

কলকাতার নীচের এই জলবাহী ভূস্তরের আসল চেহারাটা কী রকম? বালি, সিল্ট, কাদা, কংকর—সবই সেখানে আছে, কিন্তু তা কীভাবে? চিত্র—৩-এ কলকাতার কিছু নলকূপের জায়গা চিহ্নিত করা আছে। এইসব নলকূপের ছেদ (Section) থেকে ভূস্তরের চেহারা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব। চিত্র—৪ ও ৫ ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বালির দানা মোটা বা মিহি কোনো অবস্থাতেই অনেক দূর পর্যন্ত একই ভাবে বিস্তৃত থাকে না। প্রায়ই মোটাদানা বালি কিছুদূরে গিয়ে মাঝারি বা মিহি বালি হয়ে যায়। আবার কখনো দুটি আলাদা মিহি বালির স্তর এক জায়গায় এসে জোড়া লেগে যাওযার মত হয়ে মেশে। কখনো বালি বা সিল্টের মধ্যে ছোট কাদার একটা অংশ, কিংবা সিল্টের মধ্যে মোটাদানা বালির একটা অংশ অনেকটা লেন্সের মত হয়ে জমে যায়। ভূস্তরের একেবারে উপরের দিকে যে-কাদামাটির স্তরটি রয়েছে কোথাও কোথাও সেটি অল্প দূরত্বের মধ্যেই বেশি পুরু বা পাতলা হয়ে গেছে, এমন নজরে আসে। বর্তমান ও প্রাক্-বর্তমান সময়ে উপরের জমি যে মাঝে মাঝে কিছুটা বসে গেছে এটা সম্ভবত তারই ফল। বসে যাওয়া দিকটায় স্বভাবতই কাদামাটির স্তর বেশি পুরু হয়ে গেছে। চিত্র—৩-এর ৫ এবং ৬ নং নলকূপের ছেদের বিভিন্ন স্তরক্রম ও তার বিবরণ পরের পাতায় দেওয়া হল।

ছেদ দুটির স্তরক্রম ও স্তরের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, স্টিফেন হাউসে ৭৫.৯৪ মিটার থেকে ৯৪.৫৫ মিটারের যে-স্তরটি দেখানো হয়েছে তাকে ডেকার্স লেনের ১২২.০০ মিটার থেকে ১৪০.৩০ মিটার স্তরটির সঙ্গে এক বলে ভাবা যেতে পারে। স্টিফেন হাউস, বি বি ডি বাগ (পূর্ব) থেকে এসপ্লানেড (পূর্ব)-এর দূরত্ব কতটুকু? সম্ভবত ১ কিলোমিটারের বেশি হবে না। অথচ দেখা যাচ্ছে উপরের কাদামাটির স্তরটি ১৮.৩১ মিটার থেকে ৪২.৭০ মিটারে উন্নীত হয়েছে। নলকূপ খুঁড়ে কলকাতায় বালির স্তর ও জল পাওয়ার বিশেষ অসুবিধা হয় না, তবে মাঝে মাঝে ভূস্তরের সঙ্গতি খুঁজে পেতে অসুবিধা দেখা দেয়। কলকাতা অঞ্চলে প্রচুর নলকূপ করার ফলে ১৫০ থেকে ২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ভূস্তরের চেহারা মোটামুটি জানা গেছে। তবে অল্প দূরত্বের মধ্যে মোটা দানা বালি থেকে মিহিদানা, কিংবা মিহি বালি থেকে সিল্ট পর্যায়ে চলে যাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

কলকাতার নলকূপে যে-জল পাওয়া যায় তা আসে অনেক দূর থেকে। এ-জলের প্রবাহ শুরু কলকাতার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে। এই অন্তঃসলিলা ধারা মাটির নীচে নানা জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ভূস্তরের সংস্পর্শে আসে, তারপর সেই জল নলকূপের সাহায্যে তোলা হয়। এইভাবে প্রবাহিত হওয়ার পরে জলের রাসায়নিক চরিত্র সব জায়গায় একরকম থাকার কথা নয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে

নলকূপের স্থান			নলকূপের স্থান		
স্টিফেন হাউস, বি বি ডি বাগ (পূর্ব)			ডেকার্স লেন, এসপ্লানেড ইস্ট		
থেকে (মিটার)	পর্যন্ত (মিটার)	ভূস্তর	থেকে (মিটার)	পর্যন্ত (মিটার)	ভূস্তর
ভূপৃষ্ঠ	১৮.৩১	সিল্ট ও কাদা	ভূপৃষ্ঠ	৪২.৭০	কাদা
১৮.৩১	৩১.৪১	মিহি বালি	৪২.৭০	১০৩.৭০	মিহি বালি
৩১.৪১	৩৭.৮২	সিল্ট	১০৩ ৭০	১২২ ০০	মিহি ও মাঝারি দানাবালি
৩৭.৮২	৫০.৬৩	মিহি বালি			
৫০.৬৩	৭৫.৯৪	মাঝারি দানা বালি	১২২.০০	১৪০.৩০	মিহি ও মাঝারি দানা বালি, সঙ্গে কংকর
৭৫.৯৪	৯৪.৫৫	সিল্ট ও মাঝে কংকর			
৯৪.৫৫	১১৩.৪৬	মিহি বালি			
১১৩.৪৬	১৩৯.৯৯	মাঝারি দানা বালি			

লক্ষ্য করা যাবে যে, সব জায়গার জল একেবারে এক রকম নয়। ভূস্তরের গভীরতার হেরফেরের জন্যে জলের চরিত্রেও ভিন্নতা নজরে আসে। তবে সাধারণভবে বলা যায়, শহর কলকাতার কতকগুলি জায়গা ছাড়া বাকি জল প্রায় একরকম। এই জল মোটামুটি ঘরোয়া কাজের উপযোগী। জলের pH সাধারণত ৭ থেকে ৮-এর মধ্যে। অর্থাৎ জলে খুব সামান্য ক্ষার ভাব আছে। লক্ষ্য করা গেছে যে, কলকাতায় উত্তর থেকে দক্ষিণে জলের প্রবাহ-পথে রাসায়নিক লবণের পরিমাণ কিছুটা বাড়ে—বিশেষ করে ক্লোরাইডের পরিমাণ। কলকাতার বেশির ভাগ নলকূপই ৮০ থেকে ১৫০ মিটার গভীরতা থেকে জল টানে। এই গভীরতার জলে সাধারণত ৮০ থেকে ২০০ পি পি এম ক্লোরাইড এবং ২০০ থেকে ৫০০ পি পি এম[১] বাইকার্বনেট লক্ষ্য করা যায়। এই লবণগুলির বেশির ভাগেই সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের এবং এদের কার্বনেট প্রায়ই নজরে আসে। তবে সালফেট, নাইট্রেট, নাইট্রাইট ইত্যাদি লবণ খুব কম। ক্লোরাইড লবণও এমন বেশি নয় (০.১ থেকে ০.৩৫ পি পি এম) যা কলকাতার নাগরিকদের দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। তবে জলে লোহার পরিমাণ অনেক জায়গাতেই একটু বেশি। ঘরোয়া কাজের জন্য আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী লোহা ০.৩ পি পি এমের বেশি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু কলকাতার জলে লোহার মাত্রা প্রায়ই ০ ৫ পি পি এম ছাড়িয়ে গেছে এমন নজরে আসে। আবার কখনো কখনো তা ১.৫ পি পি এম পর্যন্ত বেড়ে যায়। তাই অনেক নাগরিকই লোহার অংশ কমাবার জন্য আয়রন ফিল্টার ব্যবহার করে থাকেন।

একটা কথা আগেও বলা হয়েছে যে গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে জলে রাসায়নিক লবণের পরিমাণ সাধারণভাবে বেড়ে যায়। কিন্তু দমদম, কাশীপুর, যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা, বজবজ এবং সল্ট লেক এলাকায় ক্লোরাইড লবণের মাত্রা বেশি। অনেক নলকূপেই তা

১ পি পি এম (P.P.M.) বলতে Parts per million, অর্থাৎ দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ বোঝায়।

কলকাতা অঞ্চলে কয়েকটি এলাকার ভূ জলের আংশিক রাসায়নিক পরিচয়

স্থান/এলাকা	জলবাহী স্তরের গভীরতা (মিটার)	pH	ক্যালসিয়াম কার্বনেট-এর হিসাবে জলে খরতার পরিমাণ (পি পি এম)	সিলিকা (SiO_2) (পি পি এম)	মোট লোহা (Fe) (পি পি এম)	ক্যালসিয়াম (Ca) (পি পি এম)	ম্যাগনেসিয়াম (Mg) (পি পি এম)	বাই-কার্বনেট (HCO_3) (পি পি এম)	ক্লোরাইড (Cl) (পি পি এম)
কাশীপুর গানশেল ফ্যাক্টরি	১৩০.১৭ – ১২২.৫০	৭.৫	৭৬২	২৯	০.৯	২৯৫	৮৪	৩৫০	৬৩১
শ্যামবাজার মোড়	৮২.৯৬	—	—	—	—	১০১.৬	২৯.৯	৮.৬	২০৮.৫
বিডন স্ট্রিট	৭৬.২৫	—	—	—	—	১০১	২৭.৫	—	৪৮.১
নারিকেল ডাঙ্গা (পূর্ব রেলওয়ে কলোনি)	—	—	[illegible]	১২	০.১২	১৯৮	৬৭	৪০৮	৫৭৭
কিড স্ট্রিট	—	৭.৮	৩৭৮	—	—	৯৪	৩৫	৫৩৬	৬০
তিলজলা	৪৮.৮ – ৯৭.৫	৭.৬	২৬০	—	—	৭৭	৭৪	৪৩৫	৩০৪
ভবানীপুর (হরিশ পার্ক)	৮২.৩৫ – ১০৭.৪২	৭.৯	৩১৭	৩০	০.১০	৭৯	২৯	৪৫০	৩১
আলিপুর (পূর্ব রেলওয়ে কলোনি)	৯১.৫০	—	—	—	২.০	৭৯.৫	৩১.১	—	২৫
লেক গার্ডেন্স	১০৩.৭০ – ১১৩.৪৩	৭.২	২২০	১৭	০.০৬	৩৪	২৮	৫২৭	৮৩
লেক রোড	৮৫.৪০	—	—	—	—	৪৭.৬	২৬.৪	—	৩৮.৮
যাদবপুর	১০৯.৪৯ – ১১৭.৪২	৭.২	১৪৪	১৯	০.২৯	৩৩	১৫০	৬৮২	১৮১
নাকতলা (টালিগঞ্জ)	২৪৪.০০	৭.৪	১১২৬	৫০	—	২৬৯	১১৩	৪২৭	১০৮

১০০০ পি পি এম ছাড়িয়ে গেছে, এবং কোথাও কোথাও তা ২০০০ পি পি এম-এর কাছাকাছি। এসব জায়গায় জল কীভাবে ব্যবহার করা যায় ভেবে দেখা দরকার।

রাসায়নিক চরিত্র সব সময়ে পছন্দমত না হলেও কলকাতার ভূজলের চাহিদা কিন্তু কম নয়। অসংখ্য নলকূপ দিয়ে প্রতি দিনই ভূজল টেনে তোলা হচ্ছে। কত জল রোজ উত্তোলন করা হয় তার সঠিক হিসাব পাওয়া মুস্কিল। কলকাতার পৌর সংস্থা দৈনিক ৭২০০ লক্ষ লিটার জল সরবরাহ করে থাকেন। তার মধ্যে ১৩৫০ লক্ষ লিটার জল কলকাতার নীচের ভূস্তর থেকে তোলা হয়। কলকাতা পৌরসংস্থার বাইরে ছোটখাটো মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায়, সংবদ্ধ আবাসন অঞ্চলে এবং বৃহৎ কলকারখানায় প্রয়োজন মেটানোর জন্যে বহু নলকূপ তৈরি হয়েছে। এসব নলকূপ মিলে বর্তমান কলকাতা অঞ্চলে দৈনিক যে-পরিমাণ জল উত্তোলিত হচ্ছে তা ৪৫ কোটি লিটারের কম হবে না। শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসংখ্যা, এবং সেই সঙ্গে জলের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ধরে নেওয়া চলে যে ভবিষ্যতে আরো বেশি জলের দরকার হবে। তবে প্রাকৃতিক সম্পদকে সব সময়েই পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করা দরকার। তা না হলে পরে বিপদের আশঙ্কা। এই জল খরচের ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে।

ভূজল সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে ভূস্তরে জল পরিবহণ, পরিচলন এবং ধারণ ক্ষমতা প্রভৃতি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রয়োজন। তবে সাধারণভাবে সতর্ক হবার জন্য ভূজলের সমচাপতল (Piezometric surface) বেশ কিছুকাল নিরীক্ষা করেও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। কনফাইনড অ্যাকুইফার অর্থাৎ উপরে অপ্রবেশ্য স্তর দিয়ে ঢাকা 'অ্যাকুইফার'-এর মধ্যে কোথাও নলকূপ তৈরি করলে নীচের ভূস্তর থেকে জল আপনা থেকেই উঠে আসে এবং নলের ভিতরে প্রাপ্তিসাধ্য অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট গভীরতায় পৌঁছয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে নলের ভিতরে জলের তল কতটা নীচে রয়েছে তা মাপা গেলে সেই জায়গার সমচাপতলের গভীরতা পাওয়া সম্ভব। যদি জল তোলার পরিমাণ একটি নিরাপদ সীমা ছাড়িয়ে না যায় তাহলে এই সমচাপতল মোটামুটি একই জায়গায় থাকার কথা।

শহর কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা	ভূপৃষ্ঠ থেকে সমচাপতলের গভীরতা (মিটার)	গড় সমুদ্রতল থেকে সমচাপতলের উচ্চতা/গভীরতা (মিটার)
খড়দহ থেকে দমদম	৫.৫৫ থেকে ৭.৭৫	-১.০ থেকে -২.০
শ্যামবাজার, বাজারাজার, শিয়ালদহ, বিবিডি বাগ, ধর্মতলা	৯.৫০ থেকে ১২.৫০	-৩.০ থেকে -৫.০
চৌরঙ্গি, পার্ক স্ট্রিট, পার্কসার্কাস	১১.৫ থেকে ১৩.৫	-৬.৫ থেকে -৮.৫
বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, বেহালা	১০.৫ থেকে ১২.০	-৪.০ থেকে -৫.৫

কলকাতা শহর এলাকাব বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলি নলকূপে প্রায় তিরিশ বছব ধরে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, আশিব দশকেব মাঝামাঝি সমচাপতল শহবের প্রায় সব জায়গাতেই কিছুটা নেমে গেছে। তবে মধ্য কলকাতা অঞ্চলে এই সমচাপতল খুব বেশি নেমে যাচ্ছে। এটা ভয়ের কথা। কলকাতাব উত্তর থেকে দক্ষিণে কয়েকটি এলাকায় সমচাপতলের বর্তমান অবস্থা কীরকম তার একটা হিসাব দেওয়া হয়েছে আগের পাতায়।

নলকূপ থেকে জল টানাব সঙ্গে সঙ্গে মাটিব নীচে জলেব সমচাপতল তাব গভীরতা যথাসম্ভব একই রাখাব চেষ্টা করে; আবাব ভূপৃষ্ঠেব ঢালেব সঙ্গেও একটা সমতা রাখে। দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত পরিমাণে জল টানাব ফলে সমচাপতল নেমে যেতে পারে, এবং পূরণ হবার সুযোগ না পেলে তা ক্ষতিব কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। উপরেব সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শহবেব উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত এলাকায় সমচাপতল নেমে গেলেও তা ভূপৃষ্ঠেব কাছাকাছি রয়েছে। অথচ কলকাতাব মাঝামাঝি জায়গায় পার্থক্যটা অনেক বেশি। এখন যেখানে সমচাপতল সমুদ্রতল থেকে -৩.০ মিটাব ও -৮.৫ মিটারেব মধ্যে রয়েছে, আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে সেখানে সমচাপতল ছিল সমুদ্রতল থেকে -১.০ মিটাব ও -৫.০ মিটারের মধ্যে। কলকাতার মধ্য থেকে দক্ষিণ-মধ্য অঞ্চলেব সমচাপতলের যে-অবনমন ঘটেছে তা অবশ্যই দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত মাত্রায় জল তোলার জন্য। আসলে জল তোলার ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত কোনো প্রথা কখনো অনুসরণ করা হয়নি। অবনমিত সমচাপতলকে স্বাভাবিক করে তোলাব জন্য অবিলম্বে নলকূপেব গভীরতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে নলকূপের অবস্থান বুঝে জল টানাব পরিমাণ নির্দিষ্ট করা দরকার। ঘাটতি এলাকার জন্য কিছুটা দূব থেকে সরকারি প্রচেষ্টায় জল আনাব ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে; কাছাকাছি বেশি ভূজল পাওয়াব এলাকাও বিজ্ঞানীরা নির্দেশ করে দিয়েছেন। কলকাতার কিছুটা উত্তর-পূর্বে বারাসাত-হরিণঘাটা অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে ভূজল পাওয়া সম্ভব। এই জল কলকাতাব বেশ কিছুটা ঘাটতি মেটাতে পারে।

কলকাতার সমচাপতল বেশি নেমে যাওয়ার ফল দু' দিক দিয়ে উদ্বেগেব কারণ হতে পারে। প্রথমত নলকূপগুলিব পাম্প ঠিকমতো চালিয়ে জল তোলার অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ের কারণ, সমুদ্রতল থেকে সমচাপতল বেশি নেমে গেলে কলকাতাব নীচেব ভূস্তরের জলে সমুদ্রেব লবণাক্ত জলেব প্রভাব এসে পড়বে। সে-অবস্থা অনুমান করতেও ভয় হয়। দ্বিতীয়ত, ভূস্তরের জলতল কোথাও বেশি নেমে গেলে সেখানে মাটি বা জমি ধসে যাওয়াব আশঙ্কা থাকে। নরম পাথরের জমিব নীচে ভূস্তব যদি জল ধরে রাখে তাহলে তাব ভাব বা চাপ সহ্য করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। নরম পাথরের ভিতরের বালি ও মাটির দানাগুলির চারপাশেব ফাঁকা জায়গা জলে ভরে থাকায় বেশি চাপ সহ্য করাব ক্ষমতা পায়। এই জল সরিয়ে নিলে, অর্থাৎ ভূস্তরের মধ্যে জল দিয়ে ভরাট হওয়া জায়গা ফাঁকা হয়ে গেলে, উপরের চাপ ধরে রাখাব ক্ষমতা অনেকটা কমে যায়। একদিকে কলকাতার ভূ-জলের সমচাপতল নেমে যাচ্ছে, আর অন্যদিকে কলকাতাব বুকে ঘরবাড়ি ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। একদিকে নরম পাথরের ভূস্তরে চাপ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে শহর কলকাতার ভিতের জোর কমছে। এর সম্ভাব্য ফলাফল অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। ফলে এ-শহরকে দীর্ঘজীবী করতে হলে এখনই সতর্ক হওয়া দরকার।

দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক বড় শহরেরই ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ সংক্রান্ত নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য

আছে। শহরের বিকাশ এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। আমাদের এই শহরও ব্যতিক্রম নয়। সেইজন্য আমাদের এই শহরের ভূতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কে আরো বিশেষভাবে জানা দরকার।

পরিশিষ্ট

॥ ভূতাত্ত্বিক সময় সারণি ॥

অধিযুগ	যুগ	কত বছর আগে শুরু	ব্যাপ্তি
সেনোজয়িক	বর্তমান বা হলোসিন (Holocene)	১০ হাজার	
(Cenozoic)	প্রাকবর্তমান বা প্লায়োস্টোসিন	২০ লক্ষ	১৯ লক্ষ
বা	(Pleistocene)		৯০ হাজার
টার্শিয়ারী (Tertiary)	প্লায়োসিন (Pliocene)	১.১ কোটি	০.৯ কোটি
বা	মায়োসিন (Miocene)	২.৫ কোটি	১.৪ কোটি
নবজীবীয়	অলিগোসিন (Oligocene)	৪ কোটি	১.৫ কোটি
	ইয়োসিন (Eocene)	৭ কোটি	৩ কোটি
মধ্যজীবীয়	ক্রিটেশাস (Cretaceous)	১৩.৫ কোটি	৬.৫ কোটি
(Mesozoic)	জুরাসিক (Jurassic)	১৮ কোটি	৪.৫ কোটি
	ট্রায়াসিক (Triassic)	২২.৫ কোটি	৪.৫ কোটি
পুরাজীবীয়	পার্মিয়ান (Permian)	২৭ কোটি	৪.৫ কোটি
(Palaeozoic)	কার্বনিফেরাস (Carboniferous)	৩৫ কোটি	৮ কোটি
	ডেভোনিয়ান (Devonian)	৪০ কোটি	৫ কোটি
	সিলুরিয়ান (Silurian)	৪৪ কোটি	৪ কোটি
	অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)	৫০ কোটি	৬ কোটি
	কেমব্রিয়ান (Cambrian)	৬০ কোটি	১০ কোটি
প্রোটারোজয়িক (Proterozoic) ও আর্কিয়ান (Archaean)		৬০ কোটির বেশি	

কলকাতার গাছপালা

নন্দদুলাল পাড়িয়া

তিনশো বছরের কলকাতা আজ তার বার্ধক্যের প্রতীক নয়, বরং আধুনিক সভ্যতার ক্রম-পরিবর্তন, রূপ-লাবণ্য ও বৈচিত্র্যের বহিঃপ্রকাশ। তার রত্নভাণ্ডারে আজ অজস্র সম্পদ। সেই সম্পদের মাঝে অসংখ্য উদ্ভিদ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রেখেছে। এখানকার আবহাওয়া ও পরিবেশ, বিশেষ করে মাটির গুণ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা এমন এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে, দেশ-বিদেশ থেকে নিয়ে আসা অসংখ্য গাছ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে এখানকার দেশজ গাছপালার সঙ্গে মিশে এক অপূর্ব উদ্ভিদসম্ভার গড়ে তুলেছে। রাজপথের দুধারে, পার্কে, বাগানে, ময়দানে, অলিতে-গলিতে বাড়ির ছাদে, ঘরের কোণে—কলকাতার সর্বত্র আজ নতুন করে সবুজের চর্চা লক্ষ্য করা যায়। রাজধানীর এই সবুজ আভরণ তার শৈশবের গৌরবকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও তা ছিল বন্য স্বভাবের। কলকাতার বর্তমান গাছপালার পরিচয় জানতে হলে তার অতীতের দিকে তাকাতে হবে। সেই পুরাতনের পটভূমিতে কলকাতার বর্তমান অসংখ্য গাছপালার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব।

জোব চার্নক যে সময়ে কলকাতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কলিকাতার সমস্ত জায়গাই ছিল গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। চৌরঙ্গি ও বর্তমান গভর্নমেন্ট ভবন অঞ্চল ছিল এক সময়ে জলাকীর্ণ, জঙ্গলময় এবং বাঘ ও শুয়োরের আবাসস্থল।

বস্তুত কলকাতা যে তার জন্মলগ্নে এবং শৈশবে বন-জঙ্গলে ভরা ছিল, এ-সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। একসময় কলকাতার জঙ্গলে সুঁদরী, গরাণ, গেঁও, খামো বা গর্জন, গরিয়া, কাঁকরা, বাইন, কেওরা, খলিস, হাড়গোজা, হেঁতাল, গোলপাতা ইত্যাদি গাছের প্রাধান্য ছিল। বলা বাহুল্য এগুলি লোনামাটির গাছ এবং বর্তমানে কলকাতার বাইরে সুন্দরবন অঞ্চলে পাওয়া যায়। লবণাম্বু উদ্ভিদ বা 'ম্যান গ্রোভ' নামেই এদের বিশেষ পরিচয়। জরায়ুজ (Viviparous germination) অঙ্কুরোদগম, বিশেষ ধরনের শ্বাসমূল (Pneumatophores) এবং লোনামাটিতে জন্ম এই ধরনের গাছগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিছু কিছু গেঁও এবং হাড়গোজা ছাড়া আর কোনো লবণাম্বু গাছ এখন অবশ্য কলকাতায় দেখা যায় না। তবে বর্তমানে রাজভবনের বাগানে গোলপাতা গাছ নজরে আসে। আর হাওড়ার শিবপুরে ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে কিছু লবণাম্বু গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত লবণাম্বু উদ্ভিদ শুধু যে কলকাতার জন্মলগ্নে ছিল তা নয়, তারও অনেক আগে কলকাতাকে নিয়ে বঙ্গদেশের বুকে তার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। এবং সে নিদর্শন মেলে রবীন্দ্রসরোবরের খননকার্যের সময়ে। তাছাড়া সম্প্রতি কলকাতার মেট্রোরেলের খননের কাজ চলার সময়ে ভবানীপুর ও দমদম সহ কয়েকটি অঞ্চলে মাটির গভীর থেকে যে পীটস্তর (Peat Layer) পাওয়া যায় তাতে মূল, পাতা, ফুল, ফল ও বিভিন্ন কাঠের

টুকরোর মত কিছু কিছু উদ্ভিদের দেহাংশ নজরে আসে। ওই সব দেহাংশ নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা গেছে, এগুলি বিভিন্ন লবণাম্বু গাছের অংশবিশেষ। এখন থেকে প্রায় পাঁচ থেকে সাত হাজার বছর আগে এই সমস্ত গাছপালা নিয়ে যে অরণ্য বর্তমান ছিল তা এখনকার সুন্দরবনের সঙ্গেই তুলনীয়। কাজেই এ-কথা অনস্বীকার্য যে, আজকের মহানগরী কলকাতা এক বিশাল বনভূমির উপর গড়ে উঠেছে। আর বিবর্তন, প্রগতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সেই বনভূমি ক্রমশ লুপ্ত হয়ে এসেছে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে অগাস্ট মাসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আদেশে ফোর্ট উইলিয়াম সংলগ্ন বিশাল বনভূমি পরিষ্কার করে তৈরি হল কলকাতার সর্ববৃহৎ ও উন্মুক্ত অঙ্গন ব্রিগেড ময়দান—'কলকাতার ফুসফুস'।

গোড়ার দিকে কলকাতা শহরে বসতিহীন ফাঁকা জায়গা যখন বেছে নেওয়া হল তখন নামকরণের জন্য স্থানীয় উল্লেখযোগ্য গাছের নাম বেছে নেওয়া হয় অনেক সময়ে। আর তার সঙ্গে 'তলা', 'বাগান', 'ডাঙ্গা' শব্দ যোগ করে এক একটি এলাকার নাম নির্দিষ্ট হল। এইভাবে এল বর্তমান কলকাতার আতাবাগান, পেয়ারাবাগান, হরতুকিবাগান এবং বকুলবাগান, এছাড়া ডালিমতলা, বটতলা, চাঁপাতলা, নেবুতলা, আমড়াতলা, বাঁশতলা, তালতলা, নিমতলা, বেলতলা, কেওড়াতলা, কেয়াতলা, নারকেলডাঙ্গা, পটলডাঙ্গা ইত্যাদি। এসব জায়গার নামের পিছনে রয়েছে আতা, পেয়ারা, হরতকি, বকুল, ডালিম, বট, চাঁপা, নেবু, আমড়া, বাঁশ, তাল, নিম, বেল, কেওড়া, কেয়া, নারকেল ও পটলের মত গাছের নাম। সুতরাং বোঝা যায়, এই গাছগুলি কলকাতার শৈশবে শহরের বুকে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এখন শহরের বুকে যে সমস্ত গাছপালা দেখা যায় তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সংগৃহীত হয়েছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রচেষ্টায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এবং এর পিছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে কলকাতার উপকণ্ঠে শিবপুর (হাওড়া) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরই প্রতিষ্ঠিত 'রয়াল বোটানিক গার্ডেন' অর্থাৎ বর্তমান ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান। কলকাতার গাছপালাকে জানতে গেলে এই উদ্যানের ক্রমবিকাশের কথা কিছুটা বলা দরকার।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় যে বাণিজ্য জাহাজ নির্মাণ করত, তা তৈরি হত বার্মা টিক বা সেগুন কাঠ দিয়ে। কিন্তু এই কাঠ আনা হত বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে অনেক দূর-দূরান্ত থেকে। তাতে অবশ্য ছিল অনিশ্চয়তা আর বিপদের ঝুঁকি। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলকাতার মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট অব ইনসপেকশন বিভাগের সম্পাদক রবার্ট কিড (১৭৪৬-১৭৯৩) পরামর্শ দেন, কলকাতার আশপাশে সেগুন গাছ উৎপাদন সম্ভব কিনা চেষ্টা করে দেখা দরকার। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের পয়লা তারিখে তিনি এই প্রস্তাব রাখেন এবং সেই সঙ্গে এ-ও উল্লেখ করেন যে, একটি নতুন উদ্ভিদ উদ্যানে সেগুনের চাষ সম্ভব। তাই কলকাতার অদূরে হুগলি নদীর তীরে নিজের বাগান সংলগ্ন প্রায় ৩৫০ একর (প্রায় ১৪২ হেক্টর) জমি তিনি বেছে নেন। এই বাগান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে এতই জরুরি মনে হয় যে, লণ্ডনের সরকারি আদেশ ছাড়াই তাঁর এই বাগান প্রতিষ্ঠা হল। কিড সাহেব এর দায়িত্বে রইলেন। এইভাবে বর্তমান ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঘটে। বাগানে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম সেগুন কাঠের চাষ শুরু হয় প্রায় ৪০ একর (প্রায় ১৬ হেক্টর) জায়গার উপরে। আজ কলকাতা মহানগরীর চারপাশে অনেক সেগুন গাছ নজরে আসে। সেগুলি এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিড তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৩০০ গাছ এই বাগানে রোপন করেন।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কিডের মৃত্যুর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন উইলিয়াম রক্সবার্গ। কলকাতাকে কর্মস্থল করে রক্সবার্গ বিভিন্ন বুনো গাছপালা সংগ্রহ, সেগুলির চিত্রাঙ্কণ এবং তাদের চাষ-প্রণালীতে মনোনিবেশ করেন। তাঁর পূর্ব কর্মস্থল মাদ্রাজ থেকেও তিনি কিছু কিছু গাছ কলকাতার বাগানে নিয়ে আসেন। শুধু তাই নয়, মালয়েশিয়া থেকেও অনেক মূল্যবান গাছ কলকাতায় এল। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের মিশনারিরা উইলিয়াম কেরির সঙ্গে যুক্ত হন। উদ্ভিদের উপর স্বাভাবিক আকর্ষণের ফলে উভয়ে পরস্পরের সান্নিধ্যে এলেন। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন সরকার রক্সবার্গের জন্য তাঁর ইচ্ছানুসারে হুগলি নদীর পাড়ে বাগানের মধ্যে একটি তিনতলাযুক্ত বাড়ি করিয়ে দেন। এই বাড়ির উপরতলায় রক্সবার্গ তাঁর সারা জীবনের সংগৃহীত উদ্ভিদ একত্রে রাখেন। এই সমস্ত গাছের তালিকা পরবর্তিকালে কেরির তত্ত্বাবধানে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে হোর্টাস বেঙলেনসিস (Hortus Bengalensis) নামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনাটির মধ্যে কেরিসহ প্রায় ষাটজন সহযোগীর নাম আছে। এঁরা অনেক সুন্দর, কাজের এবং অর্থকরী গাছপালা বা তাদের বীজ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাঠাতেন। রকসবার্গ তাঁর কর্মজীবনে যেসব গাছপালা সংগ্রহ করেন, সেগুলির বিবরণ ফ্লোরা ইন্ডিকা পুস্তকে প্রকাশিত হয়। এতে প্রায় ২৫৮৩টি প্রজাতির গাছের উল্লেখ আছে। এইসব গাছের বহুসংখ্যক প্রজাতি এখনও কলকাতায় বিরাজমান দেখতে পাওয়া যায়।

কলকাতায় রক্সবার্গ আসার পরই ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৬২-১৮২৯) ভারতবর্ষে আসেন কিন্তু তাঁকে পাঠানো হয় বার্মায়। বার্মায় থাকার সময়ে সেখানকার অনেক গাছের বীজ তিনি মাঝে-মাঝে উদ্ভিদ উদ্যানে পাঠাতেন। ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন শাক-সব্জির উপর জরিপের জন্য বুখাননকে চট্টগ্রাম যেতে হয়। এরপর ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার দক্ষিণে বারুইপুরে তিনি স্থানান্তরিত হন। কলকাতা থেকে বারুইপুরের দূরত্ব বেশি নয়। ফলে এই দূরত্ব থেকে কলকাতা উদ্ভিদ উদ্যানে রক্সবার্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। এরপর তিনি কাঠমাণ্ডুতে কিছুদিন কাটান। সেই সময়ে সেখানকার গাছপালা সংগ্রহ এবং পর্যবেক্ষণের কাজে তিনি অনেক দূর অগ্রসর হন। কিন্তু মাঝপথে বুখাননের ডাক পড়ে দক্ষিণ ভারতে। সেখানে টিপু সুলতানের জেলাগুলিতে কৃষি, শাক-সব্জি, গবাদি-পশু, প্রাকৃতিক সম্পদ (তুলা, লঙ্কা, চন্দন, এলাচ), খনি ও খনিজ পদার্থ, জলবায়ু, ঋতুবৈচিত্র্য, বনসম্পদ, লোকজনের অবস্থা, আচার-পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে এক বিশদ বিবরণ তৈরির দায়িত্ব পড়ে তাঁর উপরে। দক্ষিণ ভারতে থাকার সময়ে তিনি এসব এলাকা থেকে কলকাতার উদ্যানে রোপনের জন্য গাছ এবং বীজ পাঠাতেন। এছাড়া সিলেটের এম আর স্মিথ নামে বুখাননের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু কলকাতার বাগানে বছরে পঞ্চাশটি প্রজাতির গাছ পাঠাতেন। এইভাবে দেশ-বিদেশ থেকে গাছপালা সংগৃহীত হতে থাকে।

এদিকে কলকাতা থেকে সামান্য দূরে শ্রীরামপুরে ৫ একর (২ হেক্টর) জায়গায় উইলিয়াম কেরি একটি জাঁকজমকপূর্ণ বাগান তৈরি করেছিলেন। কলকাতার বাগানে এবং শহরে অনেক গাছ ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে কেরির এই বাগানের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বুখাননের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে নাথানিয়েল ওয়ালিচ (১৭৮৬-১৮৫৪) নামে এক ড্যানিশ যুবককে শ্রীরামপুরে পাঠানো হয়। তিনি নেপালে তিনজন যুবককে উদ্ভিদ সংগ্রহ করার জন্য নিয়োগ করেন। এঁরা নেপালের বিভিন্ন এলাকা এবং কাঠমাণ্ডু থেকে সংগৃহীত গাছপালা কলকাতার বাগানে লাগানোর জন্য পাঠাতেন। এইভাবে ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ করা নানা

গাছপালায় কলকাতা উদ্ভিদ উদ্যান (বর্তমান ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান) সমৃদ্ধ হল। এইসব গাছের ফল বা বীজ উদ্যানেই গণ্ডীবদ্ধ রইল না। নানা উপায়ে সন্নিহিত কলকাতা শহরে এবং অন্যান্য স্থানে সহজেই স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তিকালে এইসব গাছের বীজ বা চারা পরিকল্পিতভাবে শহরে রাস্তার দু'ধারে, বাগানে, পার্কে এবং বিভিন্ন জায়গায় রোপন করা হয়েছে। এখনও প্রতি বছর ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান থেকে বন-মহোৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন গাছের চারা সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

কলকাতা কর্পোরেশনের সৃষ্টি হয় ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে। সম্ভবত সেই সময় থেকে কলকাতার রাস্তার দু'ধারে প্রথম গাছ লাগানো শুরু হল। তারপর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার পরাজয় এবং ইংরাজদের জয় তদানীন্তন কলকাতার প্রগতির পথ প্রশস্ত করে দেয়। পলাশীর যুদ্ধের পর মিরজাফর প্রচুর অর্থসহ যে জায়গাগুলি ইংরাজদের উপঢৌকন দিয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিল ২৪ পরগণা, কলকাতা এবং সন্নিহিত কয়েকটি অঞ্চল। এর ফলে ধাপে ধাপে কলকাতার সম্প্রসারণ ও উন্নতি সাধন করা ইংরাজদের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে। কলকাতাকে সবরকম সুযোগ-সুবিধায় ঢেলে সাজানোর পরে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজ সরকার একে ভারতের রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করে। পরবর্তিকালে বিভিন্ন পর্যায়ে কলকাতা কর্পোরেশনের অনেক উন্নতি এবং পরিবর্তন ঘটে। ফলশ্রুতি হিসাবে বর্তমান সমগ্র কেন্দ্রীয় কলকাতা এবং উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার কিছু কিছু অংশ নতুন করে সংযোজিত হয়। ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (সি আই টি) সংস্থার সৃষ্টি হল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। সি আই টি ও কলকাতা কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে নতুন নতুন রাস্তা এবং শহরের মধ্যে অনেক পার্ক ও বাগান তৈরি হল ; সেই সঙ্গে রাস্তার ধারে গাছ লাগানোর প্রবণতাও বেড়ে চলল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার পর কলকাতা নগরী নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতাকে পৃথিবীর দ্বিতীয় জনবহুল শহরে পরিণত করল। ওই সময়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকসংখ্যা ছিল ৩২,২৭৬ জন। বর্তমানে এই সংখ্যা স্বভাবতই উর্ধ্বমুখীন। ক্রমবর্ধমান জনস্ফীতির সঙ্গে তাল রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হল ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন। এই সংস্থা এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে গঠিত ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির প্রচেষ্টায় কলকাতার মধ্যে আরো কিছু পার্ক, খেলার মাঠ তৈরি হয়। কলকাতা এবং পার্শ্বস্থ শহরতলী অঞ্চলগুলিকে গাছপালায় সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলা ছিল সি এম ডি এ-এর আর একটি উদ্দেশ্য। পরিশেষে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নব-নির্মিত 'পরিবেশ দপ্তর' সৃষ্টি হল। কলকাতার উদ্ভিদ সম্পদকে যথার্থভাবে রক্ষা করা এবং যথাস্থানে নতুন করে উপযুক্ত গাছ লাগানো এই দপ্তরের কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে কলকাতার মাটিতে গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে উদ্ভিদসম্ভার গড়ে উঠেছে, সেগুলির অধিকাংশ ভারতের নানা অঞ্চলের এবং পৃথিবীর একাধিক দেশের গাছ। 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান'-এর মত এগুলিও এক প্রাকৃতিক ঐকতান সৃষ্টি করেছে।

কলকাতার গাছ বললে প্রধানত বৃক্ষ ও গুল্ম জাতীয় গাছের দিকে সহজেই দৃষ্টি যায়। এর মধ্যে কিছু লতানে গাছও আছে। এগুলি রাস্তার ধারে, ময়দানে, পার্কে বিভিন্ন জায়গায় নজরে আসে। ছয় ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত গাছ পত্র পুষ্পে কখনো বা শুধু নানা বর্ণের ফুলে ভরে ওঠে। এগুলির রূপ-সৌন্দর্য কলকাতার ট্রামে-বাসে চলন্ত মানুষ

ছাতারে/সাতভাই
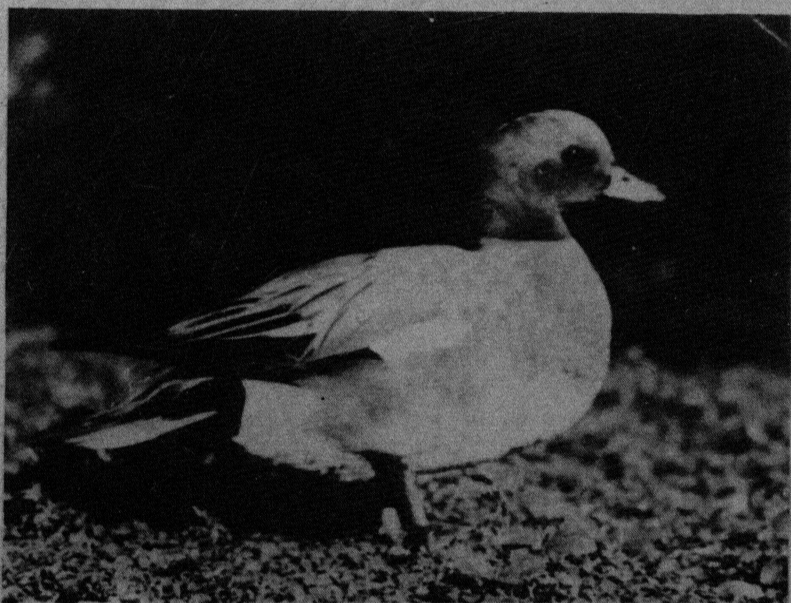
ছোট লালশির

ডাহুক

দেশি পাওয়ে

ওয়াক
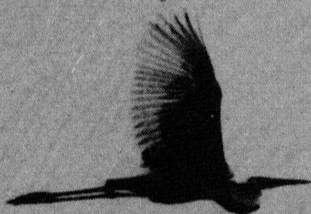
ঢল বক
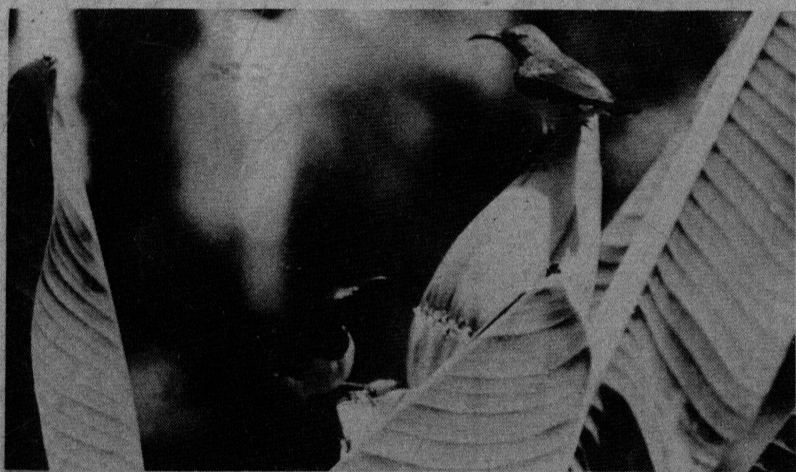
মৌচুকি/মৌটুসী

ছবি : কুশল মুখোপাধ্যায়
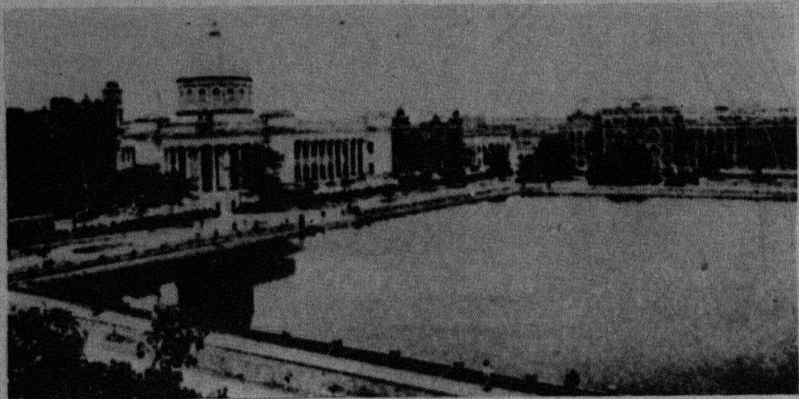
কলকাতা : সেকালের ডালহৌসি স্কোয়ার

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় চিৎপুরের বাজার

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে চিৎপুর রোডের চেহারা

কলকাতা নামে একটি পুরাতন জনপদ ছিল। শিল্পী : ড্যানিয়েল
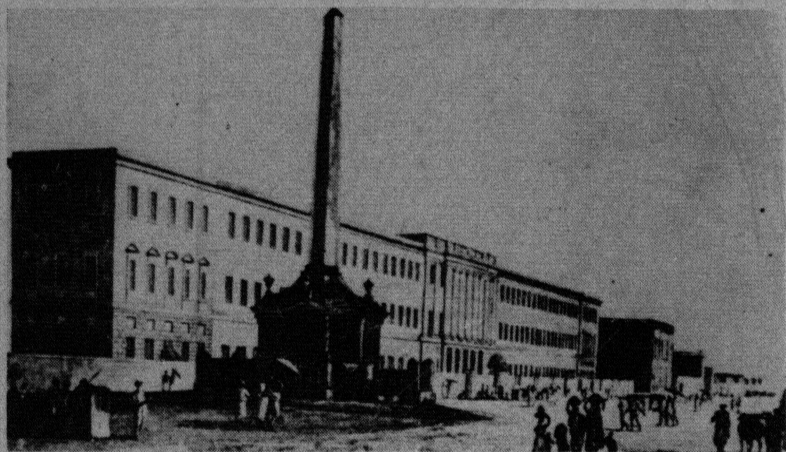
হলওয়েল মনুমেন্ট সহ রাইটার্স বিল্ডিংসের আদিরূপ

অক্টোরলোনি মনুমেন্টের থেকে কলকাতার দৃশ্য—১৮৫৭ : এইচ এল ফ্রেজার অঙ্কিত
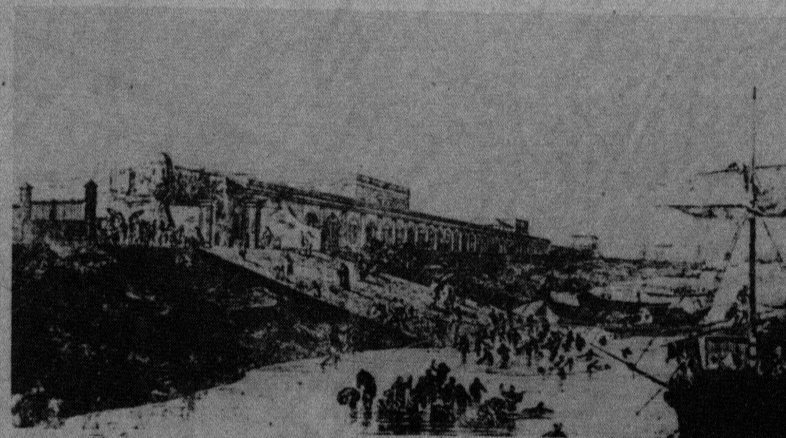
পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম—১৭৮৭ খ্রিঃ

দুর্গা, একাদশ শতাব্দী, বীরভূমের রাজনগর গ্রাম থেকে সংগৃহীত (গুরুসদয় সংগ্রহশালা)

চৈতন্য ও প্রতাপাদিত্য, কাষ্ঠ খোদিত, সপ্তদশ শতাব্দী, বীরভূম (আশুতোষ সংগ্রহশালা)
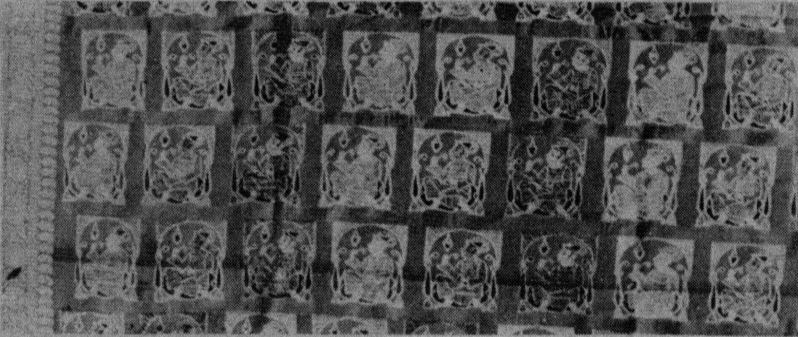
বালুচরী শাড়ির আঁচল, ঊনবিংশ শতাব্দী, মুর্শিদাবাদ (আশুতোষ সংগ্রহশালা)

টেরাকোটায় হরিণের পাল, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী, মথুরাপুর দেউল, বাংলাদেশ (গুরুসদয় সংগ্রহশালা)
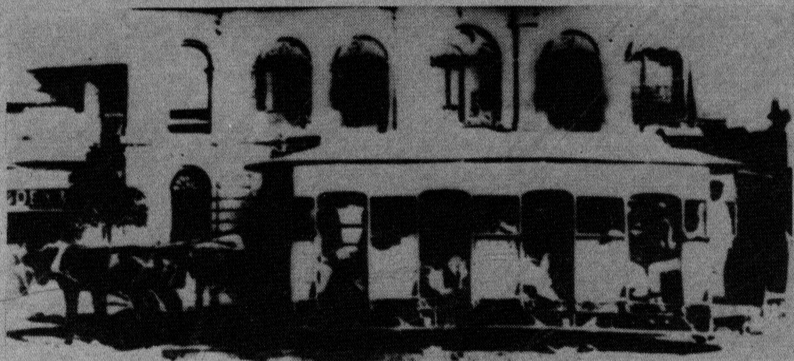
একটি ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি
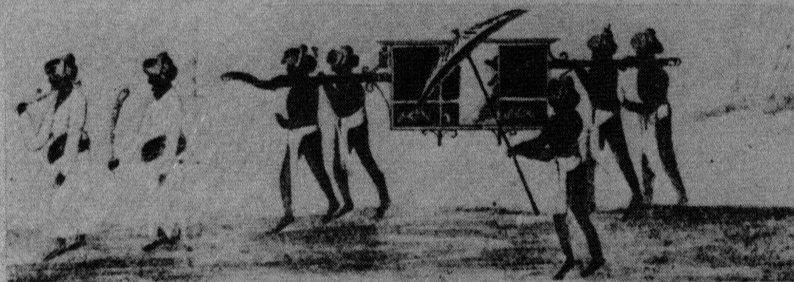
লং পালকি

কলকাতার প্রাইভেট ডবল ডেকার বাস

কলকাতার প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ি (১৯০২ খ্রিঃ) ফটো : দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে
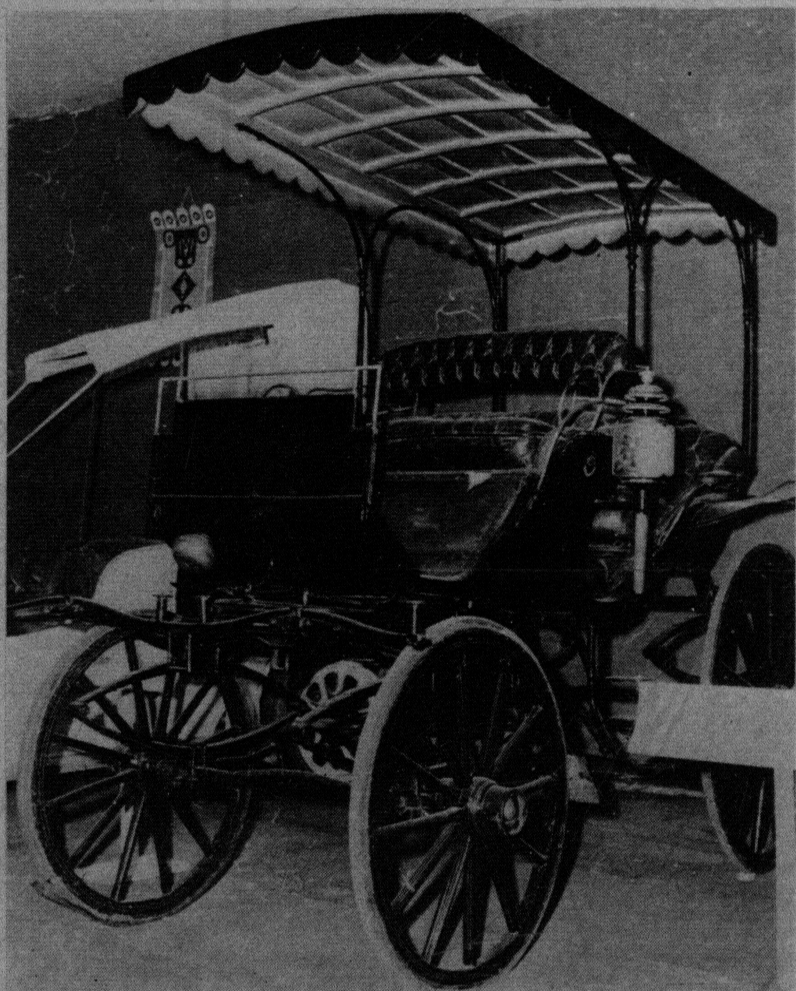
সেকালের বাবুগিরির শৌখিন ঘোড়ার গাড়ি : সারাভান [সৌজন্য : বি আই টি এম]

ছাতা বরগাদার
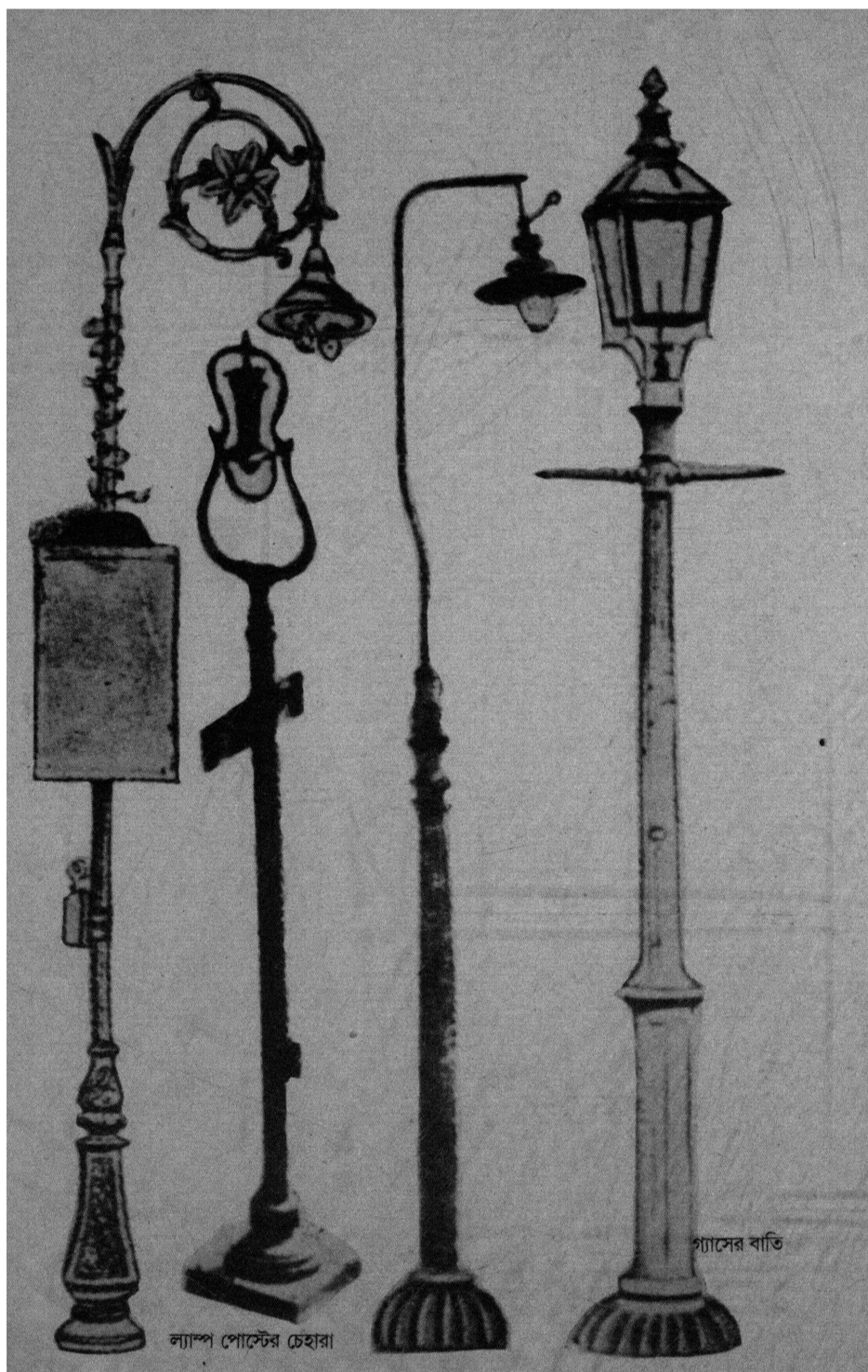
ল্যাম্প পোস্টের চেহারা

গ্যাসের বাতি

ম্যাথমেটিক্যাল ইন্‌সট্রুমেন্ট্‌স অফিস
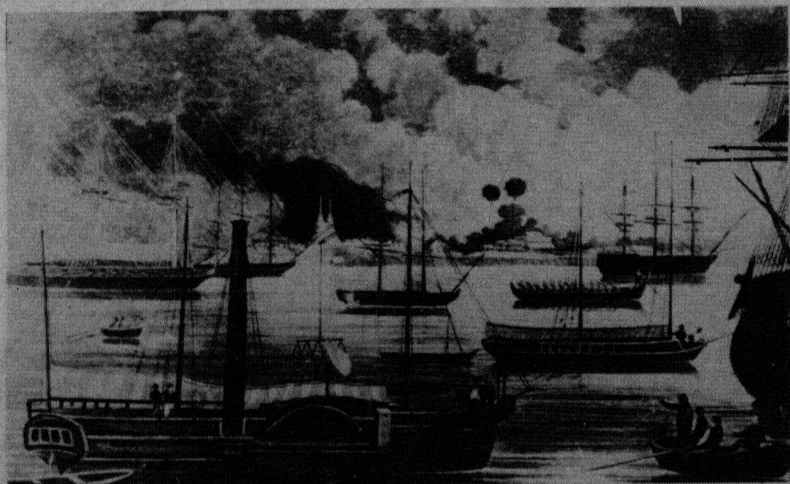
প্রথম বর্মীয় যুদ্ধে 'ডায়না' । কলকাতার প্রথম বড় মাপের কলের নৌকো ।

উড স্ট্রিটে সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রথম অফিস

কলকাতার উড স্ট্রিটে সার্ভে অব ইন্ডিয়া অফিসে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত ভারতের প্রথম ডাক-বিভাগীয় স্ট্যাম্প

কলকাতার উড স্ট্রিটে সার্ভে অব ইন্ডিয়া অফিসে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত ভারতের প্রথম ডাক-বিভাগীয় স্ট্যাম্প'
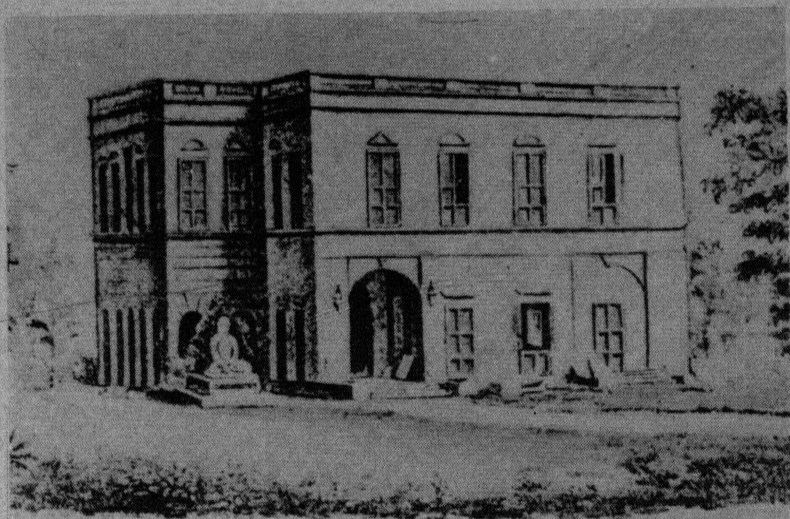
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে এশিয়াটিক সোসাইটির চেহারা
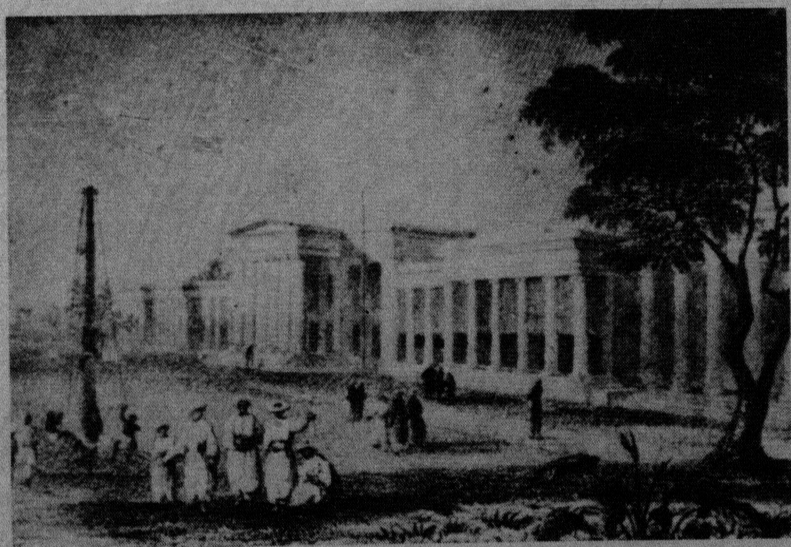
কলিকাতা গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজ

হিন্দু কলেজের ছাত্র। শিল্পী : এমিলি ইডেন

অথবা ত্রস্ত পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনেক সময়ে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এগুলি সবই সপুষ্পক উদ্ভিদ বা ফেনারোগ্যাম্‌স (Phanerogams)। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে এগুলি গুপ্তবীজী (Angiosperms) অর্থাৎ বীজ ফলের ভিতরে লুকনো থাকে। গুপ্তবীজী দুটি ভাগবিশিষ্ট : দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী। এছাড়া ব্যক্তবীজী (Gymnosperms) সপুষ্পক উদ্ভিদও আছে—এর বীজগুলি উন্মুক্ত বা অনাবৃত থাকে। অবশ্য কলকাতায় এ-ধরনের গাছ খুব বেশি দেখা যায় না। সাইকাস, থুজা, অরোকেরিয়া, জুনিপার এবং পাইন—এ-রকম কয়েকটি সুদর্শন গাছ বাড়ির সামনে বা বাগানে লাগানো হয়। আর এক ধরনের গাছের কথা বলা যায় যেগুলিতে সাধারণ গাছের মত ফুল-ফল ধরে না। এরা অপুষ্পক উদ্ভিদ বা ক্রিপটোগ্যাম্‌স (Cryptogams) নামে পরিচিত। কলকাতার বুকে এদের একটি বিরাট অংশ বিরাজমান। এগুলির মধ্যেও আবার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কয়েকটি ভাগ আছে, যেমন, শেওলা, ছত্রাক, মস ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ।

কলকাতার বৃক্ষ ও গুল্ম : বৃক্ষ ও গুল্ম কাষ্ঠল প্রকৃতির এবং এরা বহু বর্ষজীবী। এদের মধ্যে যেগুলি সাধারণত আকারে বড় সেগুলি বৃক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত ছোটগুলি গুল্ম নামে অভিহিত। একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী—উভয় শ্রেণীর মধ্যেই বৃক্ষ এবং গুল্ম পাওয়া যায়।

একবীজপত্রী : কলকাতার মধ্যে এই শ্রেণীর যে-সমস্ত গাছ দেখা যায়, তার মধ্যে পাম জাতীয় গাছের প্রাধান্য বেশি। সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে প্রথম বৃক্ষ ও পাম জাতীয় গাছ লাগানো শুরু হয়। ওই সময়ে পিটার গুড (১৭৯৬) এবং জন পট্‌স (১৮২২) নামে কলকাতার দুই উদ্যান-পরিচারক কলকাতা থেকে ব্রিটেনে বিভিন্ন গাছ সরবরাহ করতেন। হয়ত সেই সূত্রে ওখানকার কিছু কিছু গাছ কলকাতায় আনা হত। বর্তমানে পাম জাতীয় উল্লেখযোগ্য যেসব গাছ কলকাতায় চোখে পড়ে, তা হল ইণ্ডিয়ান সাগো পাম, বট্‌ল পাম বা রয়াল পাম, চায়না পাম, সুপারি, নারকেল, তাল, খেজুর, গোলপাতা। পাম ছাড়া অন্যান্য যে-একবীজপত্রী গাছ কলকাতায় দেখা যায়, তার মধ্যে কেয়া, পান্থপাদপ, স্বর্গীয় পাখি, ক্যানা, ড্রাসিনা, বাঁশ প্রভৃতির নাম করা চলে। এ-রকম কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

ইণ্ডিয়ান সাগো পাম : ভারতের উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলে জাত এই পাম কলকাতার অনেক রাস্তার ধারে কিংবা বাগানে নজরে আসে। তিভোলি কোর্টের কাছাকাছি ম্যাক্সমুলার ভবন এবং হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল-এর পাশে এই গাছ লক্ষ্য করা যায়। গাছের পাতাগুলি খণ্ডিত হয়ে মাছের পুচ্ছের মত আকার নেয়। আর সমগ্র পুষ্পবিন্যাসটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় ঘোড়ার লেজের মত মনে হয়। দেখলে চিনতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এলিস গুইনিনসিস বা অয়েল পাম : কলকাতায় অন্যান্য পামের তুলনায় এই পাম খুবই দুর্লভ। কিন্তু নারকেল, সুপারি, তাল, খেজুর—এইসব পামের মত অয়েল পাম বিশেষ উপকারি। পশ্চিম আফ্রিকার গিনি উপকূলের বাসিন্দা এই অয়েল পাম হঠাৎ নজরে এলে খেজুর গাছ বলে ভুল হতে পারে। অবশ্য এর কাণ্ড তুলনামূলকভাবে ছোট আর পাতাগুলি বেশ ঘন-সন্নিবেশিত। প্রতিটি পাতার শীর্ষ পত্রক সবচেয়ে লম্বা, কিন্তু অন্যান্য পত্রক পাতার গোড়ার দিকে ক্রমে ছোট হয়ে আসে। পরিশেষে তা কাঁটায় পরিণত হয়। এর ফল আর বীজ থেকে তেল পাওয়া যায়। সে তেল আফ্রিকার আদিবাসীদের দৈনন্দিন খাদ্য। এছাড়া এই গাছের পুরুষ-পুষ্পদণ্ড থেকে মাদক পানীয়, পাতা থেকে ঝুড়ি, ঝাঁটাও তৈরি হয়। নানা উপকারিতার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছের পরীক্ষামূলক চাষ হচ্ছে।

গোলপাতা বা গুলগা : কলকাতার বুকে এখন এই গাছ দুর্লভ, তবে রাজভবনেব উদ্যানে দেখা যায়। কলকাতা মহানগরীর জন্মের অনেক আগে এ-দিকে এক সময়ে গোলপাতা বা গুলগা গাছ ছিল অনেক। মাটির বাইরে এই গাছের কোনো কাণ্ড থাকে না, কিন্তু কিছুটা চাপা কাণ্ড মাটির তলায় ঢাকা থাকে। দেখলে মনে হয় মাটির উপর থেকে পাতাগুলি যেন সরাসরি বেরিয়েছে। এগুলি ৪ মিটার থেকে ৬ মিটারের মত লম্বা। দূর থেকে হঠাৎ চোখে পড়লে এই গাছকে ছোট নারকেল গাছের মত দেখতে লাগে। পক্ষল ধরনের পাতা—পাতার মধ্যশিরা বরাবর এক ধরনের দু'ভাগ করা, নরম, কাঁটার মত অংশ দেখা যায়। এর পুরুষ-ফুল ক্যাটকিন চেহারায় কিছুটা বেড়ালের লেজের মত এবং স্ত্রী-ফুল গোলাকার পুষ্পবিন্যাসে সজ্জিত থাকে। ফলগুলি তিন বা চার কোণা অনেকটা অমসৃণ। বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলে এই গাছ কিছু কিছু নজরে আসে।

চায়না পাম বা চিনে পাম : এই নামে কলকাতার বুকে দু' রকমের প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। একটি দক্ষিণ চিনের, অন্যটি মালয় ও ফিলিপাইন্‌স দেশজ গাছ ; এখন কলকাতার কিছু কিছু অভিজাত পরিবারের বাড়ির বাগানে অথবা রাস্তার ধারে, কোনো কোনো পার্কে এদের নজরে আসবে। পাতাগুলি দেখতে কিছুটা তালপাতার মত। তবে প্রথমটির ক্ষেত্রে পাতার ফলক সরু সরু অংশে খণ্ডিত হয়ে যায় আর এই খণ্ডিত অংশের অগ্রভাগ গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় নজরে পড়ে। অন্যটিব পাতার ফলক তুলনায় কম খণ্ডিত এবং অগ্রভাগটি আনত হয়ে যায় না। গ্রীষ্মকালে হাল্কা হলদে রঙের ফুল ফোটে। এই ফুল থেকে জুলাই মাসের দিকে প্রথমে গাঢ় লালচে-কমলা রঙের গোল গোল ফল হয়। পাকলে রঙ কালচে হয়ে আসে। প্রথম প্রজাতির ফুলেব রঙ সবুজ। ফলগুলি দেখতে এবং আকারে প্রায় অলিভ ফলের মত তবে পাকলে এগুলি নীলাভ-সবুজ রঙ ধরে।

টাইকোসপারমা ম্যাকারথুরি : অস্ট্রেলিয়াব এই ছোট এবং শৌখিন পামটি কলকাতার অনেক বাগানে দেখতে পাওয়া যায়। একসঙ্গে অনেকগুলি গাছ বাগানেব ধারে হয়ে থাকলে ছোটখাটো ঝোপের মত দেখায়। কাণ্ডগুলি অন্যান্য পামের তুলনায় সরু। বছরের প্রায় সব সময়ে, বিশেষ করে ফেব্রুয়াবি-মার্চ মাসে, গাছে ছোট ছোট সাদাটে ফুল আসে। ফলগুলি ডিম্বাকৃতি, পাকলে কমলা রঙ ধরে।

রয়াল পাম : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জাত এই পাম এখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রাস্তার ধারে, পার্কে, বাগানে, স্টেশনেব প্রবেশ দ্বারে লাগানো নজবে আসে। বিভিন্ন পামেব মধ্যে এগুলি সুদর্শন এবং আভিজাত্যপূর্ণ। কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায, পার্কে এই গাছ দেখা যায়। ছোট অবস্থায় গাছের গোড়াটি অন্যান্য অংশের তুলনায় প্রসারিত হয়, পরেব অংশ সরু এবং মাঝের অংশ বেশ স্ফীত হয়ে থাকে। অবশ্য পুরনো গাছগুলির কাণ্ডেব ব্যাস সর্বত্র প্রায় একই রকম। আর এ-রকম বৈশিষ্ট্যেব জন্য একে 'বটল পাম'-ও বলা হয়। এই পামেব কাণ্ড ছাই রঙের। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে গাছে ফুল জন্মায। স্টেটসম্যান অফিসের সামনে যে ছ'টি পাম গাছ আছে, তা এই রয়াল পাম।

উপরে যেসব পাম জাতীয় গাছের কথা বলা হল, তার বেশির ভাগ কলকাতার রাজভবন এলাকার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য একবীজপত্রী বৃক্ষ ও গুল্ম, কেয়া : অন্যান্য গাছের মত এখন এ-গাছ সচরাচর চোখে পড়ে না। তবে কলকাতাব কিছু কিছু বাগানে বা খোলা জায়গায় একেবারে বিরল নয়। অথচ প্রায ৫০০০ থেকে ৬২১০ বছর পূর্বেও বর্তমান কলকাতাব বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ পাওয়া যেত। হাল্কা বাদামি রঙেব কাণ্ডগুলি হেলানভাবে শাখা-প্রশাখাযুক্ত। তা

খাড়াভাবে মাটি থেকে উঠে আসা কিছু শক্ত ঠেস মূলের উপরে ভর করে বেড়ে ওঠে। সরু পাতার প্রান্তভাগে কাঁটা থাকে। ফুলে 'কেওড়া' সুগন্ধিপাওয়া যায় আর গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে ফোটে। ফলগুলি পাকলে লালচে-হলুদ রঙ ধরে এবং সবগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে এক সঙ্গে একটি আনারসের মত দেখায়। এই গাছের একটি প্রজাতি বেথুন কলেজের এলাকার ভিতরে চোখে পড়বে।

পান্থপাদপ : মাদাগাস্কারের এই গাছটি এখন কলকাতার অনেক পার্কে এবং বাগানে বিশেষ আকর্ষণীয়। কলাপাতার মত পাতা—কাষ্ঠল কাণ্ডের আগায় এক সারিতে চক্রাকারে সাজানো, কিন্তু পাতার বৃন্তগুলি দু' সারিতে বিন্যস্ত। বৃন্তের তলায় ভিতরের অংশ ফাঁপা। এর মধ্যে জলীয় রস জমা থাকে, বাইরে থেকে ফুটো করলে বৃন্তের এই অংশ থেকে ওই জলীয় রস বেরিয়ে আসে। মাদাগাস্কারের জঙ্গলের পথে তৃষ্ণার্ত পথিকরা সম্ভবত এই জল ব্যবহার করত। তাই এর নাম ট্র্যাভেলার্স ট্রি, বাংলায় 'পান্থপাদপ'। অনেকটা কলাগাছের মত গাছের মাথায়, খোলা পাখার মত পাতা সমেত এই গাছ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, সুরেন্দ্রনাথ পার্কে, তাছাড়া অন্যান্য জায়গায় এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

স্বর্গীয় পাখি : এই গাছের ফুলের গঠন অভিনব, দেখতেও আকর্ষণীয়। মহানগরীতে অকল্যাণ্ড স্কোয়ারে, চিড়িয়াখানায় ও ব্যক্তিগত কারোর বাগানেও এই ফুলের গাছ চোখে পড়বে।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই গাছটি ফুলের জন্য খুব বিখ্যাত। এর পাতা খানিকটা কলাপাতা ধরনের এবং দুই সারিতে বিন্যস্ত। নৌকোর মত সবুজ এক মঞ্জরীপত্রের মধ্যে হলুদ রঙের কয়েকটি ফুল, ফুলের ভিতর নীল রঙের তীরের মত ডিম্বাকৃতি অঙ্গ—সব জড়িয়ে অপূর্ব বর্ণ-বৈষম্য সৃষ্টি করে।

দ্বিবীজপত্রী : কলকাতার রাস্তার ধারে, পার্কে, বাগানে সচরাচর যে সমস্ত সপুষ্পক উদ্ভিদ দেখা যায় তার বেশির ভাগ এই শ্রেণীভুক্ত। এরা সংখ্যায় কম নয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গাছের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া হল।

অর্জুন : ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অর্জুন গাছ দেখা যায়। কলকাতায় রাস্তার ধারে, পার্কে এই গাছ নজরে আসবে। চিরহরিৎ এই গাছ স্বভাবে ছায়াপ্রদায়ী, গাছের ছাল মসৃণ ও বর্ণে ধূসর। ভেষজ হিসাবে এর ব্যবহার আছে। এছাড়া চামড়া 'ট্যান' করা ও কাপড়-চোপড় রঙ করার কাজেও লাগে। এর পাতা আয়তাকার এবং অভিমুখ পত্রবিন্যাসযুক্ত। ফিকে হলুদ বা সাদাটে রঙের বাটির মত ছোট ছোট ফুলগুলি ঠাসাঠাসি করে মার্চ থেকে জুন মাসে শাখার অগ্রভাগে ফুটতে দেখা যায়। জওহরলাল নেহরু রোড ও অন্যান্য বড় রাস্তার ধারে এই গাছ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অশোক : এটি ভারতের দেশজ গাছ। এছাড়া মালয়, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা, খাসিয়া পাহাড়ের চিরহরিৎ অরণ্যে প্রচুর জন্মায়। উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ, চকচকে ও ঘন পাতায় ছাওয়া চিরহরিৎ এই গাছটি মহানগরীর বিভিন্ন পার্কে দেখা যায়। গাছে নতুন পাতা হলে সেগুলি তামাটে রঙ ধরে এবং ঝুলন্ত অবস্থায় নজরে আসে। ফেব্রুয়ারি মাসে নারেঙ্গী লাল রঙের থোকা থোকা ফুল পাতার গুচ্ছের আড়ালে সুন্দর দেখায়। হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে এই গাছ পবিত্রতার প্রতীক। হিন্দুরা এটি কামদেবকে উৎসর্গ করেছে আর বুদ্ধদেব এই গাছের তলায় জন্মেছিলেন বলে বৌদ্ধরা একে পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে মনে করে। এর গাছের ছাল আর ফুল বিভিন্ন অসুখ-বিসুখে ব্যবহার করা হয়। ভগৎ সিং পার্কে (পূর্বতন মিন্টো পার্ক) রাস্তার

ধারে এই গাছ চোখে পড়ে।

আকাশ নিম : ব্রহ্মদেশের এই গাছটি এখন ভারতের বিভিন্ন শহরে 'এভিনিউ ট্রি' হিসাবে দেখা যায়। কলকাতা শহরের অনেক পার্কে, কিছু কিছু রাস্তার ধারে এই গাছ চারপাশের শোভা বাড়ানোর জন্য রোপন করা হয়েছে। সুদৃশ্য, দীর্ঘ, ঋজু, চিরহরিৎ এই বৃক্ষের কাঠ ভঙ্গুর স্বভাবের, তাই ঝড়ে সহজেই ডালপালা ভেঙ্গে যায়। এর পাতা পক্ষল ধরনের। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে পুরনো পাতা ঝরে গিয়ে নতুন পাতা গজায়। শাখা-প্রশাখার শেষ ভাগে সাদা রঙের সরু সরু ফুলগুলি নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে গুচ্ছাকারে ফোটে আর রাত্রে সুগন্ধ ছড়ায়। এপ্রিল থেকে জুন মাসে গাছে আর একবার ফুল আসে। স্কটিশ চার্চ কলেজের কাছে আজাদ হিন্দ বাগের (পূর্বতন হেদুয়া পার্ক) এক কোণে পথ চলতি একটি গাছ লক্ষ্য করা যায়।

আকাশমণি বা সোনাঝুরি : অস্ট্রেলিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চলের এই গাছ কলকাতা সহ ভারতের অন্যান্য শহরেও দেখা যায়, বিশেষ করে বিহারে ও উত্তর প্রদেশে। এই গাছ শুষ্ক এবং পাথুরে অঞ্চলের খরা সহ্য করতে পারে। সুদৃশ্য চিরহরিৎ এই গাছের চ্যাপটা, বাঁকানো পাতার বোঁটা বা পর্ণবৃন্তগুলি পাতার মত দেখতে হলেও এগুলি আসল পাতা নয়। এর আসল পাতা দ্বিপক্ষল। এগুলি গাছের কচি অবস্থায় কিছুদিন থাকে, তারপর ঝরে যায়। তখন সেই স্থান নেয় 'পর্ণবৃন্ত'। এগুলিই পাতার কাজ করে। উজ্জ্বল পীত বর্ণের ফুল প্রচুর পরিমাণে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ক্যাটকিন পুষ্পবিন্যাসে ঝুলন্ত অবস্থায় ফুটে থাকে। এছাড়া মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে এই গাছে ফুল ফুটতে দেখা যায়। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতার রবীন্দ্রসরোবর সমেত অনেক জায়গায় এই গাছ বেশ কয়েকটি নজরে আসবে।

আমহার্স্টিয়া : এটি বার্মা দেশের গাছ। এই গাছ 'রয়াল বোটানিক গার্ডেন'-এর সুপারিনটেনডেন্ট নাথানিয়েল ওয়ালিচ প্রথম ওই বাগানে রোপন করেন। এখন শিবপুরের ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে গেলে সারি সারি বেশ কয়েকটি গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া কলকাতায় কিছু ব্যক্তিগত বাগানে, বিধানসভা ভবনে, আলিপুরে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি জায়গায় কয়েকটি গাছ নজরে পড়ে। কলকাতায় অন্যান্য গাছের মত এর প্রাচুর্য নেই বটে, তবে সৌন্দর্যের দিক থেকে এর ফুলের তুলনা হয় না। মাঝারি আকারের গাছ, চিরহরিৎ, যৌগপত্র অচূড়পক্ষল ও অবনতমুখী। এর পাতার পত্রফলক আলাদা আলাদা এবং অনেক ছোট ছোট ফলকের মত অঙ্গ বা পত্রক গঠন করে। তাছাড়া একাধিক পত্রকযুক্ত পত্রকেও যৌগপত্র বলা হয়। যখন পাখির পালকের মত মধ্যশির যুক্ত এক-পক্ষল যৌগপত্রের শীর্ষে জোড় সংখ্যক পত্রক থাকে, তখন সেই পক্ষল যৌগপত্রকে অচূড় যৌগপত্র বলে। তেঁতুল পাতা এর দৃষ্টান্ত : ঘোর লাল ও ধূম্র বর্ণের কচি পাতাগুলি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়, পরে এগুলি ধীরে ধীরে সবুজ রঙ ধরে। ফুলগুলি গোলাপি, পাপড়িতে সোনালি পীতের ছিট দেওয়া। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে পাতার কক্ষে ঝাড় লণ্ঠনের মত রেসিম সজ্জায় ফুলগুলি ঝুলতে থাকে। ফুল ফোটার পরে এগুলি গাছে মাত্র দু-তিন দিন থাকে। প্রায় সারা বছর ধরে গাছে কচি নতুন পাতা গজায়।

অ্যাডানসোনিয়া বা বাওবাব : ক্রান্তীয় আফ্রিকার দেশজ এই গাছ আরবরা প্রথম ভারতে এবং শ্রীলংকায় নিয়ে আসে। স্বভাবে একটি বিরাট পর্ণমোচী বহু বর্ষজীবী গাছ, শুষ্ক অঞ্চলে ভাল জন্মায়। গাছের কাণ্ড তলার দিকে প্রকাণ্ড মোটা বোতলের মত, মসৃণ এবং মোটা ডালপালা বিশিষ্ট। পাতাগুলি অঙ্গুলাকার পাঁচটি লোমশ পত্রকযুক্ত। শীতকালে গাছে পাতা

থাকে না। বড় বড় প্রতিটি ফুল একটি দীর্ঘ মোটা পুষ্পদণ্ডে ঝুলতে থাকে। ফুলের পাপড়ি সাদা, ঘি রঙের। সাধারণত জুন-জুলাই মাসে গাছে ফুল আসে। ফলগুলি বেশ বড়, সবুজ, লম্বাটে ক্যাপসুল-জাতীয়, বাইরে মখমলের মত লোমশ, ফল ওষুধ হিসাবে নানা রোগে ব্যবহার করা হয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা এই ফল দিয়ে কমণ্ডলু করে। কলকাতার চিড়িয়াখানায়, রবীন্দ্র সরোবর, সুভাষ সরোবরে ও অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় এই গাছ দেখা যায়।

ইয়েলো এলভার বা চাঁদপ্রভা : দক্ষিণ আমেরিকার এই গাছ কলকাতার পার্কে, বাগানে, মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে অনেক দেখা যায়। ছোট আকারের চিরহরিৎ, পক্ষল, অভিমুখ পত্রযুক্ত গাছ। থোকায় থোকায় বড় উজ্জ্বল হলুদ ফুলে যখন গাছ ভরে যায়, সেদিক থেকে চোখ ফেরানো কঠিন। গ্রীষ্মে এবং বর্ষাকালে প্রায় সব সময়ে গাছে ফুল থাকে। এর ফল লম্বা এবং সরু ক্যাপসুল গাছ থেকে গোছায় গোছায় ঝুলতে দেখা যায়।

এইলানথাস বা মহানিম : অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডের এই গাছ কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত এভিনিউ এবং খোলামেলা জায়গায় লাগানো আছে। প্রজাতি নামের (Excelsa) ভিতরেই গাছটির বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। Excelsa-র অর্থ খুব উঁচু, অর্থাৎ এই গাছ উচ্চতায় আকাশচুম্বী চেহারা ধারণ করে। গাছের কাণ্ড বা গুঁড়ি রীতিমতো দীর্ঘ, ঋজুভাবে বেড়ে ওঠার পরে ডালপালা ছড়ায়। ইংরাজিতে একে ট্রি অব হেভেন বলা হয়। পাতাগুলি পক্ষল, পত্রক-প্রান্ত দণ্ডাকারে খণ্ডিত এবং তলভাগ অসমান। বড় পাতাগুলি শাখা-প্রশাখার শেষভাগে ঠাসাঠাসি করে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফুলগুলি ছোট, সাদা বা হাল্কা হলুদ রঙের। শীতকালে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। আবার মার্চ-এপ্রিলে নতুন পাতা গজায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের উদ্ভিদ উদ্যানে এ-রকম একটি বিশাল গাছ আছে।

এডিনানথেরা, রঞ্জনা বা রক্তকমল : চিন ও মালয় দেশজাত এই গাছ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় লাগানো আছে। এটি পক্ষল পাতাযুক্ত, বড় গাছ। এর ছোট ছোট হলুদ ফুলগুলি স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে সজ্জিত। এই ধরনের পুষ্পবিন্যাস অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস। এই বিন্যাসে দীর্ঘ মঞ্জরীদণ্ডের উপর অবৃন্তক পুষ্প অগ্রোন্মুখ অনুক্রমে সাজানো। বাসক এর দৃষ্টান্ত। ফলগুলি লম্বা, সরু এবং বেশ বাঁকানো। পাকলে ফলগুলি ফেটে যায় এবং ভিতরের ঘোর লাল বর্ণের চকচকে বীজগুলি গাছের তলায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মার্চ-এপ্রিল মাসে গাছে ফুল আসে, কখনো বা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। শীতকালে গাছের পাতা ঝরে পড়ে আর ফেব্রুয়ারি-মার্চে নতুন পাতা গজায়। বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের বাগানে এই গাছ দেখা যায়।

ওবরাজাইলাম, সোনা বা সোনাপট্টি : এটি মালয়, চিন, শ্রীলংকা ও ভারতের দেশজ গাছ। কলকাতার অনেক পার্কে লাগানো আছে। মাঝারি আকারের এই গাছের পাতা পক্ষল, গাঢ় সবুজ। ফুলগুলি বেশ বড়, শাঁসালো, শাখার শেষভাগে গুচ্ছাকারে জন্মায় ; রং গাঢ় রক্তবর্ণ এবং দেখতে ঘণ্টার মত। তবে এর ফুল আকর্ষণীয় হলেও এর থেকে একটা দুর্গন্ধ বেরোয়। ফলগুলি চ্যাপটা, কালো, বল্লমের মত বড়, গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। মে থেকে অগাস্ট মাস পর্যন্ত ফুল জন্মায়। আবার ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত গাছের সব পাতা ঝরে পড়ে। বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের পিছনে পুকুর পাড়ে এই গাছ নজরে আসে।

কদম : ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের গাছ। চিনে এবং মালয় দেশেও জন্মায়। কলকাতার রাস্তায় পার্কে এবং বাগানে যত রকমের গাছ লাগানো হয়, কদম এদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য। কলকাতার মাটিতে এই গাছ এত ভাল জন্মায় যে, এই ব্যাপারে আর কোনো গাছের সঙ্গে তুলনা চলে না। এটি সুশ্রী, পর্ণমোচী বড় গাছ, পাতাগুলি ডিম্বাকার, উজ্জ্বল, মসৃণ এবং গাঢ় সবুজ রঙের। সাদা ছোট ছোট অসংখ্য ফুল একটি সোনালি রঙের গোলকের উপর সাজানো থাকে। সেইজন্য বোঁটা সহ একটি কদম ফুল বলতে গাঁদার মত অনেক ফুলের সমাবেশকে বোঝায়। বর্ষাকালে, জুন থেকে অগাস্ট মাস পর্যন্ত, ফুল ফোটে আর মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়। রবীন্দ্র সরোবরে, বেথুন কলেজের কাছে বিডন স্ট্রিটে এবং বিধান সরণির সংযোগস্থলে বেশ কয়েকটি এই গাছ চোখে পড়বে।

করঞ্জ : এই গাছ চিন, মালয়, ক্রান্তীয় অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলংকা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া যায়। বালুকাময় সমুদ্রতীর ও জলের ধার এই গাছ বেঁচে ওঠার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ। কিন্তু শুকনো মাটিতেও ভাল বাঁচে। তাই কলকাতায় রাস্তার দু' ধারে এই গাছ খুব চোখে পড়ে। গাছের গুঁড়ি কালচে রঙের, এতে ছোট ছোট গাঁট বা স্ফীত অংশ বেরিয়ে থাকে। পাতা পক্ষল, উজ্জ্বল, চকচকে সবুজ পত্রকযুক্ত। মে, জুন মাসে লাইলাক বা হাল্কা ও ফিকে লাল রঙের ফুল পত্র-কক্ষ থেকে গোছায় গোছায় ঝুলতে দেখা যায়। ফলগুলি কাষ্ঠল, চ্যাপ্টা শিমের মত। এর বীজ থেকে এক ধরনের তেল পাওয়া যায়। পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোর কাছাকাছি গড়িয়াহাট রোডের উপর বেশ কয়েকটি করঞ্জ গাছ নজরে পড়বে।

কলভিলিয়া বা কিলবিলি : পূর্ব আফ্রিকা এবং ম্যাডাগাস্কারের এই গাছ কলকাতায় মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও দেখা যায়। পক্ষল পাতার মাঝারি আকারের গাছ। গ্রীষ্মের শুরুতে পাতা ঝরে যায়, আবার মে মাসের দিকে নতুন পাতা গজায়। শাখার প্রান্তে বড় বড় আনত রেসিম গুচ্ছের নারেঙ্গী-লাল রঙের ফুল ফোটে অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে। ফুলবিহীন অবস্থায় এই গাছ অনেকটা গুলমোহর বা রাধাচূড়া গাছের মতন। জাতীয় গ্রন্থাগারে ও চিড়িয়াখানায় এই গাছ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কাঞ্চন (রক্ত বা দেবকাঞ্চন) : রক্তকাঞ্চন বা দেবকাঞ্চন আমাদের দেশের গাছ, হিমালয়ের পাদদেশের সমতলে এবং তরাই অঞ্চলের জঙ্গলে দেখা যায়। কলকাতায় রাস্তার ধারে, পার্কে, বাগানে এই গাছও অনেক চোখে পড়ে। পাতার অগ্রভাগ দ্বিখণ্ডিত। শাখা-প্রশাখার শেষভাগে গোলাপি ও সাদাটে রঙের বড় বড় ফুলগুলি দেখার মতন। ফুলে মিষ্টি গন্ধ আছে। ফল চ্যাপ্টা এবং লম্বা শিম্ব-জাতীয়। সাধারণত শীতের গোড়ায় অক্টোবর থেকে গাছে ফুল আসতে শুরু করে। জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ফল পাকতে থাকে। বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে বেশ কয়েকটি এই গাছ লক্ষ্য করা যায়।

কাঠচাঁপা (গরুড় চাঁপা) : মেক্সিকো এবং গুয়াতেমালার এই গাছ আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। ডাল থেকে খুব সহজেই নূতন গাছ করা সম্ভব। এই গাছ বক্র কাণ্ডবিশিষ্ট, ছোট পর্ণমোচী। কচি শাখা-প্রশাখা শাঁসালো ধরনের। এগুলির ক্ষতস্থান থেকে দুধের মত সাদা রস বেরিয়ে আসে। বড় চওড়া ভল্লাকার পাতা শাখা-প্রশাখার শেষাংশে সর্পিল ঘন-গুচ্ছে জন্মে। নতুন গাছে প্রায় বারো মাস পাতা থাকে কিন্তু পুরনো গাছে শীতের শুরুতে পাতা ঝরে পড়ে। এর ফুল সুগন্ধযুক্ত উজ্জ্বল সাদা রঙের, বড় পুষ্পদণ্ডের উপর গুচ্ছাকারে ফোটে। প্রায় বারো মাস এ গাছে ফুল ফুটলেও ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর মাসে বেশি ফুল দেখা যায়। কলকাতার পার্কে, ছোটখাটো রাস্তার ধারে বা মোড়ে, বিভিন্ন মন্দির প্রাঙ্গণে, বাগানে এই গাছ অনেক নজরে আসে। নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ভি আই পি রোডের মাঝে বেশ কয়েকটি এই গাছ নজরে পড়ে।

কুর্চি : এটি আমাদের দেশজ গাছ, স্বভাবে পর্ণমোচী, অভিমুখ পত্রযুক্ত। শীতের শেষে

গাছের সব পাতা ঝরে যায়, আবার মার্চ-এপ্রিলে সারা গাছ সাদা, সুগন্ধি ফুলে ভরে ওঠে। এ-রকম অবস্থায় শেষের দিকে গাছে নতুন পাতা গজায়। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসে গাছে আর একবার ফুল আসে। লম্বা ফল এক সঙ্গে দু' তিনটে করে ঝোলে। কলকাতার বাগানে, রাস্তার ধারে কুর্চির যেসব গাছ দেখা যায় তাদের বেশির ভাগেই সাধারণত ফল হয় না। এই গাছের ছাল, বীজ আর পাতার ভেষজগুণ আছে। সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রালের ভিতরে এই গাছ কয়েকটি দেখতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণচূড়া : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গাছ—কলকাতার পার্কে, বাগানে প্রায়ই লাগানো হয়। গুল্ম জাতীয় ছোট এই গাছের পাতা দ্বিপক্ষল, ছোট ছোট পত্রকযুক্ত। প্যানিকেল বা রেসিম পুষ্পবিন্যাসে লাল বা হলদে-লাল রঙের ফুলগুলি সজ্জিত থাকে। এই ধরনের পুষ্পবিন্যাসে মঞ্জরীদণ্ডটি শাখান্বিত হয়। অবৃন্তক পুষ্প শাখা-মঞ্জরীদণ্ডের উপরে অগ্রোন্মুখ অনুক্রমে সাজানো থাকে। আম, লিচু এর দৃষ্টান্ত। সাধারণত বছরের বিভিন্ন সময়ে এই গাছে ফুল ফোটে, তবে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরে গাছে ফুলের প্রাচুর্য থাকে। কৃষ্ণচূড়ার ফল কিছুটা ডিম্বাকৃতি বা বল্লমাকৃতি শিম্ব ধরনের। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের উপরে এই গাছ কয়েকটি লক্ষ্য করা যায়।

ক্যাসিয়া নোডোসা : যাভা ক্যাসিযার মত দেখতে আর একটি গাছ মাঝে মাঝে কলকাতার পার্কে, ময়দানে দেখা যায়। পত্রকগুলির অগ্রভাগ সুচলো, পাতা ঝরে যাওয়ার পরে গাছে ফুল আসে। তখন দেখতে অপূর্ব লাগে। রাস্তা বা পার্কের বিভিন্ন গাছের মধ্যে সৌন্দর্যের দিক থেকে এটি সেরা।

গ্লিরিসিডিয়া বা সারাঙ্গা : ক্রান্তীয় আমেরিকার ছোট বা মাঝারি আকারের এই গাছ কলকাতার প্রায় বেশির ভাগ রাস্তার ধারে লাগানো, নজরে আসে। এই গাছটি দ্রুত বেড়ে ওঠে। পক্ষল পাতার লম্বা শাখাগুলি চারদিকে ছড়িয়ে যায়। ফেব্রুয়ারি, মার্চ মাসে ঝরা পাতা অবস্থায় সাদাটে পাটল রঙের ফুলে সারা গাছ ভরে যায়। ফল দীর্ঘ, চ্যাপ্টা শুঁটির মত। কলকাতার রাস্তা ছাড়াও এই গাছ বিভিন্ন শষ্যক্ষেত্রে ছায়া দেওয়ার জন্যও লাগানো হয়ে থাকে। তাছাড়া এই গাছের পাতা ও অন্যান্য অংশে প্রচুর নাইট্রোজেন থাকায়, সবুজ সার হিসাবেও এর ব্যবহার আছে। বিধান সরণি, রামমোহন সরণি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ রাস্তায় এই গাছ লক্ষ্য করা যায়।

গুলমোহর বা রাধাচূড়া : সম্ভবত এই গাছ ম্যাডাগাস্কার এবং মরিশাসের বাসিন্দা। এখন বিভিন্ন ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত। কলকাতার বাগানে, পার্কে, রাস্তার ধারে এই সুদৃশ্য বৃক্ষ অনেক দেখা যায়। বিভিন্ন বাহারি ফুলের গাছের মধ্যে এটি অন্যতম। শুধু ফুল নয়, ছোট ছোট অনেক পত্রক অভিমুখ সন্নিবেশে পাতার এক অভিনব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। এই সন্নিবেশে প্রতি পর্বে দুটি করে পত্রক বেরিয়ে পরস্পর বিপরীতে অবস্থান করে। গ্রীষ্মের শুরুতে সব পাতা ঝরে পড়ে। মার্চ, এপ্রিল থেকে গাছে ফুল আসে এবং তা বর্ষার শুরু পর্যন্ত চলতে থাকে। ওই সময়ে কিছু কিছু পাতা দেখা যায়। ফুলগুলি বড় বড়, উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, ফিকে কমলা বা টকটকে লাল রঙের। এর ফলও প্রায় এক থেকে দেড় ফুট (প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার থেকে ৪৫ সেন্টিমিটার) লম্বা। চ্যাপ্টা শিম্ব, প্রথমে সবুজ, পরে কালো আর শক্ত হয়ে গাছে ঝুলতে দেখা যায়। বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ চত্বরে এই গাছ আছে।

ছাতিম : চিন, মালয়, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ বিস্তৃত। স্বভাবে পর্ণমোচী, ছোট ছোট শাখার শেষভাগে আবর্ত পত্রবিন্যাসে সাত বা আটটি পাতা একসঙ্গে থাকে। এই বিন্যাসে শাখার প্রতি পর্ব থেকে দু'য়ের বেশি পাতা একসঙ্গে বের

হয়। পাতার নীচের দিক ফ্যাকাশে সাদা। শাখার শীর্ষাগ্রে ছোট ছোট সাদাটে সবুজ ফুল গুচ্ছাকারে দেখা যায়। ফল সরু সরু আর ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। রাত্রিবেলায় ফুল ফোটে এবং একটা তীব্র সুগন্ধ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত গাছে ফুল হয়। বছরের গোড়ার দিকে গাছ ভর্তি ফল নজরে আসে। ছোট গাছের সুদৃশ্য পাতা ও শাখা-প্রশাখাগুলির বিন্যাস গম্বুজের মত দেখায়। কলকাতার বড রাস্তার ধারে ধারে এই গাছ চোখে পড়ে।

জারুল : এই গাছ চিন, মালয় এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তৃত। নদীর কাছাকাছি আর্দ্র জায়গায় এ-গাছ বুনো অবস্থায় জন্মায়। এছাড়া শুকনো জায়গাতেও ভাল বেড়ে ওঠে। কলকাতার অনেক রাস্তার দু'পাশে প্রচুর পরিমাণে লাগানো রয়েছে। এগুলি পর্ণমোচী স্বভাবের ও মাঝারি উচ্চতার হয়ে থাকে। পাতার উপর দিকটা ঘন সবুজ, নীচেব দিকে ফিকে, গভীর শিরাযুক্ত। এই গাছের পাতা একান্তর বিন্যাসে সজ্জিত। এই পত্রবিন্যাসে শাখার প্রতি পর্ব থেকে একটি করে পাতা বেরোয় এবং পাতাগুলি দুটি উল্লম্ব রেখায় সাজানো থাকে। ধান, ঘাস এর উদাহরণ। ফেব্রুয়ারি, মার্চে পাতা ঝবে পড়ার আগে লাল হয়ে যায় ; আবাব এপ্রিল, মে-তে নতুন পাতা গজায়। সেই সময় থেকে শুরু করে জুলাই, অগাস্ট মাস পর্যন্ত গাছে ফুল হয়। খুব বাহারে ফুল, প্রথমে উজ্জ্বল 'মোভ' বা পাটল বর্ণের, পরে ঝবে পড়ার আগে প্রায় সাদা হয়ে যায়। ফুলের পাপড়িগুলি কোঁচকানো ও কোঁকড়ানো হওয়ার জন্য একে 'ক্রেপ ফ্লাওয়াব'-ও বলা হয়। ফলগুলি শক্ত ক্যাপসুল, পাকলে ঝিনুকের মত ফেটে পড়ে, সঙ্গে স্থায়ী বৃতিটি লেগে থাকে।

টিউলিপ ট্রি : পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার গাছ, এ-দেশে হায়দ্রাবাদ ও অন্ধ্রপ্রদেশে ব্যাপকভাবে লাগানো হয়। এছাড়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও দেখা যায়। কলকাতার বড বড় পার্কে এই গাছ মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। এর পাতা পক্ষল, গাঢ সবুজ, ডিম্বাকার ফলকযুক্ত, শাখার প্রান্তে ভীড করে থাকে। ফুলগুলি আকাবে বড, উজ্জ্বল কমলা-লাল বা সিঁদুরের মত শাখার শেষাগ্রে গুচ্ছে গুচ্ছে ফোটে জানুযারি থেকে মার্চ পর্যন্ত। বিড়লা মিউজিয়ামের সামনে গুরু সদয় রোডের দিকে একটি গাছ নজরে আসে। তাছাড়া চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও জাতীয় গ্রন্থাগাবে এই গাছ আছে।

দেশি বাদাম বা বাংলা বাদাম : মালয় দেশের পর্ণমোচী এই গাছটি কলকাতাব বিভিন্ন রাস্তায় চোখে পড়বে। শাখাগুলি কাণ্ডের পর্ব থেকে সোজাভাবে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায়। এর ফলে গাছটিকে সুন্দর দেখায়। শাখার শেষভাগে বড চকচকে ভোঁতা পাতা ভিড করে থাকে। এই পাতার অগ্রভাগ সবচেয়ে বেশি চওড়া। শীতকালে পাতা ঝবে যাওযার আগে তামাটে লাল রঙ ধরে। ছোট সাদাটে ফুলগুলি সরু স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। মার্চ-এপ্রিল আর জুন-জুলাই মাসে গাছে ফুল ফোটে। এর ফল মসৃণ, ডিম্বাকৃতি ; সে আর অক্টোবর মাসে পাকে।

নাগলিঙ্গম বা ক্যাননবল ট্রি : এটি ক্রান্তীয় আমেরিকাব গাছ। আমাদের দেশে ক্রান্তীয় আর্দ্র অঞ্চলে পাওয়া যায়। চিরহরিৎ এই গাছটির কাণ্ড ঋজু এবং বেশ মোটা। ছালেব রঙ অমসৃণ, ধূসর-বাদামি শাখাগুলি অবিন্যস্ত। ছোট শাখাব শেষ ভাগে কিছুটা বল্লমাকৃতি পাতার ভিড়। ফুলগুলি বড়, গোলাপি ও সাদা, বাইবের দিকে পীত রঙের। এই ফুলে মিষ্টি গন্ধ আছে এবং এক অদ্ভুত কায়দায় ভাঁজ করা। গাছের কাণ্ডের উপরেই ফুল ধরে। বছরেব বেশির ভাগ সময়েই গাছে ফুল থাকে। এই গাছের ফল বড়, গোলাকার ও বাদামি রঙের ; দেখতে ঠিক কামানেব গোলার মত। গায়ানাবাসীরা খামারের পশুদের এই ফল খাওয়ায়।

প্রায় বারো মাস এই ফুল হয়। কলকাতার কিছু কিছু বাগানে এবং রাস্তার ধারে এই গাছ দেখা যায়। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে ঢোকার পথে এই গাছ একটি নজরে পড়বে।

পলতে মাদার : এটি আমাদের দেশের গাছ। এছাড়া মালয়, ব্রহ্মদেশ, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, যাভা ও পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর হয়। এই গাছ দ্রুত বেড়ে ওঠে। মসৃণ ছালযুক্ত ছোট এই গাছের গুঁড়ির অগ্রভাগে কালো রঙের কাঁটা আছে। পক্ষল সজ্জায় তিনটি করে পত্রক থাকে পাতায। শীতকালে পাতা ঝরে যায়। ফেব্রুয়ারি, মার্চে প্রশাখার অগ্রভাগে থোকায় থোকায় টকটকে লাল রঙের মটরফুলের মত ফুলগুলি রেসিম সজ্জায় ফুটে থাকে। ফল আকারে দীর্ঘ, বক্র, শুঁটি সুচলো। পাকলে কালো হয়ে যায়। কলকাতায রাস্তার ধারে, পার্কে এই গাছ বেশ নজরে পড়ে।

পরাশ : ব্রহ্মদেশ, মালয়, আফ্রিকা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আমাদের দেশে মহীশূর, তামিলনাড়ু, কেরালা ও অন্যান্য অংশে অনেক দেখা যায়। কলকাতায রাস্তার দু'ধারে, পার্কে প্রায়ই চোখে পড়ে। মাঝারি আকারের চিরহরিৎ বৃক্ষ, কাণ্ড কালচে রঙের, আঁকাবাঁকা ধরনের। পাতা মসৃণ, ঘন সবুজ এবং কিছুটা পান পাতার মত দেখতে। ফুল বড় পীত-লাল রঙের, ঘণ্টাকৃতি, ঢ্যাঁড়স বা কাপাস ফুলের মত। শীতকালে বেশি ফুটলেও প্রায সারা বছর গাছে ফুল আসে। এর ফল গোলাকৃতি, উপরটা একটু চাপা, শক্ত ধরনের ক্যাপসুল।

পুত্রঞ্জীব · আমাদের দেশের এই গাছ পাতাব সৌন্দর্যের জন্য রাস্তার ধারে লাগানো হয়। চিরহরিৎ, সরু, চকচকে গাঢ় সবুজ সরল পাতা ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। পুরুষ এবং স্ত্রী-ফুল আলাদা গাছে হয়। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত গাছে ফুল আসে। এই গাছের নামকরণের ক্ষেত্রে একটি লৌকিক ধারণা প্রচলিত। ফলের শক্ত বীজ ধাবণ করলে ভৌতিক বা অশরীরী অশুভ দৃষ্টির হাত থেকে ছোট ছেলেমেয়েরা রক্ষা পায এমন একটা সংস্কার চালু আছে। রাসবিহারী এভিনিউয়ের দু'দিকে এই গাছ অনেক আছে।

পেলটোফোরাম বা অর্জুন জ্যোতি : উত্তর অস্ট্রেলিয়া, মালয, শ্রীলংকা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এই গাছ পাওয়া যায়। কলকাতায় রাস্তার উপযোগী গাছ হিসাবে খুব লাগানো হয়ে থাকে। এরা আংশিক পর্ণমোচী, পাতা বড় বড পালকের মত দ্বিপক্ষল। জানুয়ারি মাসে গাছে পাতা থাকে না, ফেব্রুয়ারিতে নতুন পাতা গজায় আর প্রচুর পরিমাণে উজ্জ্বল সোনালি-পীত বঙের ফুলে গাছ ভরে যায়। মার্চ থেকে মে এবং সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর—বছরেব দু'বার ফুল ধরে। ফোটার পর অবশ্য বেশি সময গাছে থাকে না, ঝরে পড়ে যায়। ফুলে সামান্য সুগন্ধ আছে এবং প্যানিকেল সজ্জায় ফোটে। ফল চ্যাপ্টা, তামাটে, শিম্বাকার। পাতা ঝরা গাছে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বকুল : ব্রহ্মদেশ, ভারতেব পশ্চিমঘাট অঞ্চল এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের এই গাছ মাঝারি আকারের বহু ডালপালা ছড়িয়ে গম্বুজেব আকার নেয। শাখায় ঘন হয়ে থাকা পাতা চকচকে এবং অগ্রভাগ সূচলো। হাল্কা সাদা বঙের সুগন্ধি ফুল পাতার মাঝে ছোট ছোট গুচ্ছে হয়ে থাকে। সাধারণত মার্চ থেকে জুলাই মাসে ফুল ফোটে। গ্রীষ্মকালে এবং বর্ষায় গাছে ফল আসে। এব ফল ডিম্বাকৃতি, মসৃণ আর চকচকে। পাকলে কমলা রঙ ধরে। কলকাতার ছোট-বড় সব রাস্তাতেই এই গাছ চোখে পড়বে।

বাঁদর লাঠি বা সোঁদাল : ব্রহ্মদেশ, যাভা, ইন্দোচিন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ দেখা যায়। কলকাতার রাস্তার ধারে, পার্কে এই গাছ খুব নজরে আসে। মাঝারি আকারের, ডালপালা ছড়ানো, স্বভাবে পর্ণমোচী, পক্ষল পাতার এই

গাছের নূতন পাতার রঙ তামাটে। মার্চ থেকে মে মাসের মাঝামাঝি গাছের পাতা ঝরে যায়।

ওই সময়ে দীর্ঘ ঝুলন্ত রেসিমে সোনালি পীত রঙের ফুলের রাশি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিম্ব জাতীয় ফল গোলাকার দীর্ঘ, লম্বায় প্রায় ১ থেকে ২ ফুট (৩০ সেণ্টিমিটার থেকে ৬০ সেণ্টিমিটার)-এর মত। পাকলে এর রঙ কালো দেখায়।

বিলাতি শিরীষ বা রেন ট্রি : ব্রাজিল দেশের এই গাছ মধ্য এশিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ভারতের ক্রান্তীয় অঞ্চলে নজরে আসে। কলকাতায় রাস্তার ধারে পার্কে এই গাছ অনেক দেখা যায়। চিরহরিৎ, পক্ষল, দীর্ঘ পাতার সুন্দর এই গাছ ডালপালা ছড়িয়ে সামিয়ানার মত দাঁড়িয়ে থাকে। পাতার ভোঁতা ও অসমান তলবিশিষ্ট পত্রকগুলি রোদের সময় খোলা, কিন্তু মেঘলা দিনে, বৃষ্টির সময়, বিকেল থেকে রাতে পাতা ঝুঁকে গিয়ে কাৎ হয়ে যায় এবং পত্রকগুলি বন্ধ অবস্থায় থাকে। এই গাছের তলা ভিজে বা স্যাঁতস্যাঁতে থাকে। সেই সঙ্গে গাছে থাকা এক জাতের পতঙ্গ অসংখ্য জলীয় কণা পথচারীদের গায়ে ছিটোয়। এইসব কারণে এই গাছকে ইংরাজিতে 'রেন ট্রি'-ও বলা হয়। এর ফুলগুলি ফিকে গোলাপি রঙের, শাখার শেষভাগে বড় বড় গুচ্ছাকার প্যানিকেল সজ্জায় মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ফুটে থাকতে দেখা যায়। এক একটি পুষ্পবিন্যাসকে রেশমের পাউডার পাফের মত দেখায়। ফলগুলি লম্বাটে, কিছুটা চ্যাপ্টা, মাংসল, একটা মিষ্টি স্বাদ আছে ; কাঠবেড়ালিরা এ-ফল খেতে ভালবাসে।

বোতল বুরুশ (লাল) : অস্ট্রেলিযার এই গাছ সুদৃশ্য এবং চিরহরিৎ। ঝুলন্ত এক একটি শাখা ছোট ছোট বল্লমের মত পাতার গুচ্ছে ভরা। মার্চ এবং অক্টোবব মাসে লাল রঙের ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ধরে এবং বোতল বুরুশেব মত আকৃতি নেয়। এছাড়া বছরের অন্যান্য সময়েও গাছে ফুল দেখা যায়। ফুলের এ-রকম সৌন্দর্যেব জন্যে ইংরাজিতে একে 'বটল ব্রাশ' বলা হয়। ফুলের রক্তবর্ণ পুংকেশরের দণ্ডগুলি চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাই দেখতে ব্রাশের মত লাগে। কলকাতার বিভিন্ন পার্কে, বাগানে, ট্রাফিক আইল্যাণ্ডে এই গাছ চোখে পড়ে।

বোলা : ক্রান্তীয় আফ্রিকা, মালয এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রায় চিরহরিৎ এই গাছ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওযা যায়। এগুলি মাঝারি থেকে বড় আকারেব। কলকাতার পার্কে, রাস্তার ধারে এই গাছ প্রায়ই চোখে পড়ে। এর পাতা বড বড এবং দেখতে কিছুটা পানপাতার মত। ফুলেব চেয়ে পাতা-ভর্তি গাছের সৌন্দর্য বেশি মনে হয়। হাল্কা পাটল রঙের ফুলগুলি শাখার শেষভাগে থোকায় থোকায় আনতভাবে ঝুলতে থাকে। প্রধানত অগাস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসে গাছে বেশি ফুল আসে। এছাড়া মে থেকে নভেম্বর পর্যন্তও গাছে ফুল দেখা যায়। ফলগুলি পাঁচটি অংশবিশিষ্ট, ফাঁপা এবং দেখতে কাগজেব ছোট বেলুনের মত।

মহুয়া : এটি আমাদেব দেশের গাছ, বিভিন্ন শুষ্ক অঞ্চলে দেখা যায়, বিশেষত উত্তব প্রদেশ এবং বিহারেব গ্রামে গ্রামে। বড় পর্ণমোচী এই গাছের ছাল কোঁচকানো, ধূসর বা বাদামি রঙের পাতা চামড়ার মত, শাখার প্রান্তে গুচ্ছভাবে ধরে। নূতন পাতা তামাটে লাল। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলে পাতা ঝরা অবস্থায় সাদাটে রঙেব শাঁসালো ফুল রাত্রে ফোটে আর ভোরবেলায় ঝরে পড়ে। এর ফল সবুজ, রসালো, ডিম্বাকৃতি, বেরি শ্রেণীভুক্ত। এর ফুল উত্তর প্রদেশ, মধ্যভারত ও বিহারের অরণ্যবাসীদের একটি প্রধান খাদ্য। স্বাদে বেশ মিষ্টি। কলকাতার রাস্তায় এবং কিছু কিছু পার্কে এই গাছ দেখা যায়।

মিনজিরি : ব্রহ্মদেশ, মালয়, থাইল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ ভারতে এই গাছ নজরে পড়ে।

এগুলি মাঝারি আকারের, স্বভাবে চিরহরিৎ। পাতা গাঢ় সবুজ, চকচকে পত্রকযুক্ত পক্ষল ধরনের। শাখার শেষভাগে উজ্জ্বল পীত রঙের ফুল গুচ্ছাকারে থাকে। অক্টোবর মাসে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ফুল ফুটলেও জুন থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত গাছে ফুল ধরে। ফল লম্বা, চ্যাপ্টা শিম্ব ধরনের, পাকলে হাল্কা গোলাপি বা বাদামি রঙের হয়। রাস্তার ধার ছাড়া পার্কের ভিতরও কিছু কিছু এই গাছ লাগানো দেখা যায়।

মুচকন্দ বা কনকচাঁপা : এটি ব্রহ্মদেশ, চট্টগ্রাম, আসাম এবং হিমালয়ের পাদদেশ সংলগ্ন সমতল ভূমির গাছ। কলকাতার মধ্যে কিছু কিছু রাস্তার ধারে, পার্কে এই গাছ নজরে আসবে। মাঝারি থেকে বড় আকারের এই গাছের পাতাগুলিও বড় এবং প্রায় গোলাকৃতি। উপরিভাগ গাঢ় সবুজ এবং নীচের দিকে ফ্যাকাসে সাদা। গাছের নীচের দিকের পাতাগুলি দেখতে একটু ভিন্ন ধরনের, ধারটা একটু বেশি খণ্ডিত হয়। ফুল লম্বা, পাতলা সাদা পাপড়িগুলি শাঁসালো বৃতির ভিতর ঢাকা, বৃতির বাইরের অংশে মরচে রঙের পাউডারের প্রলেপ থাকে। ফুলের লম্বা কুঁড়িগুলি ফুটলে উপর দিক থেকে বিভিন্ন অংশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু বোঁটার দিকে আটকানো থাকে। গাছের পাতা বেশ বড় হওয়ায় ফুল সহজে চোখে পড়ে না। ফুলের মিষ্টি গন্ধ সবাইকে খুব আকর্ষণ করে। ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ফুল ফোটে। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের কাছে বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, হেদুয়া পার্ক (আজাদ হিন্দ বাগ) ও বিভিন্ন জায়গায় এ-গাছ দেখা যায়।

যাভা ক্যাসিয়া : এটি সুমাত্রা, মালয় ও যবদ্বীপের গাছ। আমাদের দেশে সর্বত্র দেখা যায়। কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার ধারে গোলাপি রঙের এই ক্যাসিয়া গাছ চোখে পড়বে। সোজা গুঁড়ির উপর বিস্তৃত মণ্ডপের মত শাখাগুলি চারদিকে সোজাভাবে ছড়িয়ে পড়ে। শাখা থেকে ভোঁতা পত্রক সমেত পক্ষল পাতা প্রশাখার সঙ্গে ঝুলতে থাকে। মে মাসে গোলাপি রঙের প্রচুর নূতন পাতা গজায়। এপ্রিল থেকে গাছে ফুল আসতে শুরু করে। কিন্তু শাখায় ফোটার পর মাত্র অল্প কয়েকদিন থাকে, তারপর ঝরে যায়। ফুলের রঙ উজ্জ্বল পাটল। পার্ক সার্কাস ময়দানে রাস্তার ধারে বেশ কয়েকটি এই গাছ আছে।

শিমুল : মালয় দেশজ এই গাছ ভারতের বিভিন্ন উষ্ণ অঞ্চলে পাওয়া যায়। কলকাতার রাস্তার ধারে পার্কে এই গাছ প্রায়ই চোখে পড়ে। পর্ণমোচী এ-গাছের পাতা অঙ্গুলাকার, কাণ্ডের গায়ে ছোট ছোট শক্ত কাঁটা থাকে। মাটির ঠিক উপরে পুরনো কাণ্ডের গা থেকে শিকড় বরাবর কিছু প্রসারিত ঠেস থাকে। এইজন্যে এ-গাছ প্রচণ্ড ঝড়েও উপড়ে পড়ে না। শাখাগুলি মাটির সঙ্গে আনুভূমিকভাবে কাণ্ডের পর্ব থেকে আবর্ত বিন্যাসে প্রসারিত হয়ে ছড়ানো। এই বিন্যাসে কাণ্ডের প্রতি পর্ব থেকে দু'য়ের বেশি শাখা একসঙ্গে বের হয়। বছরের শেষে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। ফেব্রুয়ারি, মার্চ মাসে পাতাহীন শাখা-প্রশাখায় লাল রক্তবর্ণের বড় বড় ফুলে গাছ ভরে যায়। অবশ্য ফোটার কয়েকদিন পরেই গাছের তলায় ঝরে পড়ে। রক্তবর্ণের পুংকেশরগুলি গুচ্ছাকারে পাপড়ির বাইরে বেরিয়ে ফুলের সৌন্দর্য বাড়ায়। এর ফল লম্বাটে, ডিম্বাকৃতি, পাকলে কাষ্ঠল হয়। এর মধ্যে সাদা তুলোর সঙ্গে লেগে থাকে গোল গোল কালো বা বাদামি রংয়ের অসংখ্য বীজ।

সিলভার ওক : অস্ট্রেলিয়া দেশের এই গাছ সুদৃশ্য। কলকাতার বিভিন্ন পার্কে, মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে দেখা যায়। গভীরভাবে খণ্ডিত পাতা ফার্নের পাতার মত দেখায়। পাতার উপরটা গাঢ় সবুজ আর নীচের দিক কিছুটা রুপোলি। ফুলের রঙ লালচে-কমলা কিন্তু কলকাতার মাটিতে এই গাছে সাধারণত ফুল হয় না। লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের ভিতরে এই গাছ আছে।

সুবাবুল : ক্রান্তীয় আমেরিকা জাত এই গাছ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মায়। এগুলি দ্রুত বেড়ে ওঠে। কলকাতার রাস্তায় মাঝে মাঝে লাগানো হয়। ফুলের জন্য খুব একটা জনপ্রিয় নয়। গাছের পাতা দ্বিপক্ষল, ফুলের পুংকেশরগুলি একসঙ্গে মিলে এক-একটি বলয়ের আকার নেয়, রঙ সাদাটে বা পীতাভ। ফল চ্যাপ্টা এবং লম্বা শিম্ব জাতীয়, গোছায় গোছায় হয়ে থাকে। পাকলে কালো বা তামাটে রঙের।

সেগুন : ব্রহ্মদেশ, মালয় এবং আমাদের দেশেব এই গাছ কাঠের জন্য বিখ্যাত হলেও কলকাতায় রাস্তার ধারে প্রায়ই লাগানো হয়ে থাকে। এই গাছ পর্ণমোচী, মাঝারি থেকে বড় আকারের। এর বড় বড় পাতা অভিমুখ বিন্যাসে সাজানো থাকে। এই বিন্যাসে শাখার প্রতি পর্ব থেকে দুটি করে পাতা বের হয় এবং পাতা দুটি পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান করে, যেমন, পেয়ারা বা মাধবীলতা। পাতার উপরের দিকটা খসখসে। শাখার শেষভাগে ছোট ছোট অসংখ্য ফুল প্যানিকেল সজ্জায় সাজানো, দেখতে সুন্দর লাগে। জুন থেকে অগাস্ট পর্যন্ত ফুল হয় এবং নভেম্বর থেকে জানুয়ারিতে ফল পাকে। এই গাছ ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য বনজ সম্পদ। এব কাঠ উন্নত মানের ফার্নিচার ও বিভিন্ন বকম কাঠেব কাজে ব্যবহার করা হয়। তবে কলকাতার সেগুনের কাঠ উন্নত মানের নয়। এখানকার সেগুন গাছের বর্তমান অস্তিত্ব এক সময়ে ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিব প্রথম এই গাছ লাগানোর কথা মনে কবিয়ে দেয়।

স্বর্ণচাঁপা : মালয় দেশের এবং ভাবতের ক্রান্তীয় অঞ্চলে এই গাছ জন্মায়। সুগন্ধি সোনালি রঙের ফুলের জন্য এই গাছ কলকাতার পার্কে এবং বাগানে লাগানো হযেছে। গাছটি চিরহরিৎ, উজ্জ্বল সবুজ, চকচকে পাতা। সাধারণত এপ্রিল মাসে ফুল ফোটা শুরু হয এবং বর্ষা পর্যন্ত চলে। ফুলগুলি পবিত্রতার প্রতীক মনে কবে মন্দির প্রাঙ্গণে এই গাছ লাগানো হয়। থোকা থোকা ফল গাছে ঝুলতে থাকে। চাঁপা গাছের কাঠ দামী কাঠ। ফার্নিচার বা ঘরবাড়ি তৈরির কাজে লাগে।

হলদে শিমূল : ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ ও পূর্বদেশীয় দ্বীপপুঞ্জের কযেকটি দ্বীপের গাছ। কলকাতা মহানগবীতে খুব বেশি দেখা না গেলেও বিধাননগর বা সল্ট লেক অঞ্চলে এই গাছ প্রায়ই চোখে পড়ে। ছোট আকারের পর্ণমোচী গাছ। কিছুটা আঙ্গুলের আকারের পাঁচটি খণ্ডযুক্ত পাতা শাখাব প্রান্তের দিকে হয়। পাতার উপরটা ঘন সবুজ, নীচের দিক কিছুটা ধূসর, লোমশ। ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চে যখন গাছে পাতা থাকে না, তখন শাখার প্রান্তে বড় বড় সোনালী-হলদে ফুল ফুটে গাছের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। এর ফল বড় বড় ক্যাপসুল, বৃক্কাকার বীজগুলি রেশমি তুলোর মধ্যে ঢাকা থাকে।

হিমচাঁপা বা ম্যাগনোলিয়া : উত্তর আমেরিকার এই গাছ আমাদের দেশে হিমালয অঞ্চলে প্রায় ৭০০০ থেকে ৮০০০ ফুট (প্রায় ২১৩৪ থেকে ২৪৩৮ মিটার) উচ্চতায জন্মায়। কলকাতার কিছু কিছু ব্যক্তিগত বাগানে, জাতীয় গ্রন্থাগারে, বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এই গাছ আছে। অনুকূল পরিবেশে চিরহরিৎ স্বভাবের এই গাছটি উচ্চতায় প্রায় ৮০ ফুট (প্রায় ২৪·৫ মিটার) পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। কলকাতার মাটিতে এই বৃদ্ধি খুবই নগণ্য। বড় ডিম্বাকৃতি পাতার উপরটা গাঢ় চকচকে সবুজ আর নীচের অংশ গাঢ় বাদামি রঙের। শাখার শেষাগ্রে একটি করে বড় সাদা ফুল ফোটে। এক নজরে পদ্মফুলের মত দেখায়। ফুলে অনেক ছোটবড় বৃত্যংশ আর পাপড়ি থাকে। অবশ্য কলকাতায় যেসব গাছ দেখা যায়, তাতে সাধারণত ফুল হয় না।

এসব গাছ এবং গুল্ম ছাড়াও কিছু লতানে গাছ কলকাতার পার্কে, বাগানে, বাড়ির দেওয়ালে, পাঁচিলের উপরে, বেড়ার ধারে দেখা যায়। সৌন্দর্যের দিক থেকে এগুলির মূল্যও কম নয়। এ-রকম কয়েকটি সাধারণ লতানে গাছের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল :

অ্যান্টিগোনন : দক্ষিণ আমেবিকার গাছ। পাতা কিছুটা তিন কোণা ধরনেব। পাতার ধারটা ঢেউ-খেলানো এবং নীচের দিকটায় শিরা স্পষ্ট। গ্রীষ্মকালে সারা মাস জুড়ে এবং বর্ষার শুরু পর্যন্ত শাখার আগায় থোকায় থোকায় হাল্কা গোলাপি রঙের ফুল ফোটে। শীতকালে আর একবার ফুল হয়। পুষ্পবিন্যাসের দণ্ডটির শেষভাগ আকর্ষে পরিণত হয়ে গাছকে উপরে উঠতে বা বাড়তে সাহায্য করে। লতাটি স্বভাবে পর্ণমোচী।

এগানোসমা (মালতী) : ক্রান্তীয় আমেরিকার এ-গাছটি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও সেই সঙ্গে কলকাতায় প্রচুর দেখা যায়। পাতা হাল্কা সবুজ এবং কিছুটা চকচকে। বর্ষার শুরুতে সাদা, সুগন্ধি ফুলে ফুলে গাছ ঢেকে যায়। গাছের পাতা বা ডাল ভাঙ্গলে দুধের মত এক ধরনের সাদা রস বেরোয়।

এডিনোক্যালিম্মা ("রসুনলতা") :ব্রাজিল দেশের এই লতা কলকাতার মাটিতে ভালই হতে দেখা যায়। ঘন সবুজ, চকচকে পাতাযুক্ত চিরহরিৎ স্বভাবের এই গাছে 'পিঙ্কমভ' রঙের ফুল থোকায় থোকায় ফোটে। পাতা ভাঙ্গলে বা মচকালে রসুনের গন্ধ বেরোয়।

কুইসকুয়লিস ইণ্ডিকা : মালয়, আফ্রিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য ক্রান্তীয় অঞ্চলে এই গাছ ছড়িয়ে আছে। বাড়ির গেটে, দেওয়ালে, পাঁচিলের উপরে এই গাছ দেখা যায়। পাতা উজ্জ্বল সবুজ এবং অভিমুখ পত্রবিন্যাসে সজ্জিত। ফুল গাঢ় লালচে, পাটল বঙের, তাতে গন্ধ আছে। অনেক সময়ে সাদাও হয়। বছরের প্রায় সব সময়ে গাছে ফুল থাকে।

থানবারজিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা : এটি পূর্ব ভারতের গাছ বলে ধরে নেওয়া হয়। এ-গাছের পাতাগুলি অগ্রভাগে ক্রমশ সরু কিন্তু তলার দিকে চওড়া, খসখসে, শিরা স্পষ্ট ও গাঢ় সবুজ। উজ্জ্বল সাদাটে নীল রঙের ফুল থোকায় থোকায় শাখা-প্রশাখাব শেষভাগে ফুটে থাকে। বর্ষা থেকে শুরু করে বছরে বেশ কয়েকবার ফুল দেয় এই গাছ। কলকাতায় বাড়ির দেওয়ালের ধারে, বেড়ায় কিংবা পাঁচিলের উপরে এই লতানে গাছটিকে প্রচুর পত্রসম্ভার নিয়ে দেখা যায়।

পিট্রিয়া ভলিউবিলিস বা পার্পল রিথ : ক্রান্তীয় আমেরিকার গাছ, কলকাতায বাড়ির প্রবেশদ্বারে, পাঁচিলের উপরে, বেড়ার ধারে কিছু কিছু চোখে পড়ে। পাতা খসখসে এবং অভিমুখ বিন্যাসে সজ্জিত। সাধারণত বসন্তকালে ফুল ফোটে। ফুলের রঙ হাল্কা 'মভ'। ফুলের পাপড়ির চেয়ে বৃত্যংশগুলির সৌন্দর্য অনেক বেশি।

বিগনোনিয়া ভেনাসটা : ব্রাজিলের এই লতা পৃথিবীর বিভিন্ন ক্রান্তীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং কলকাতায় বাড়ির প্রবেশ দ্বারে দেওয়ালের গায়ে, ছাদে, পাঁচিলের উপরে, বেড়ার ধারে এই লতানে গাছ মাঝে মাঝে নজরে আসে। পাতা যৌগিক ধরনের এবং অগ্রভাগের শেষ পত্রকটি আকর্ষে পরিণত হয়ে যায়।

শীতকালে উজ্জ্বল কমলা-হলুদ রঙের অসংখ্য ফুলে সারা গাছ ঢাকা থাকে ; তখন পাতা পর্যন্ত নজরে আসে না। ফুল ফোটার পরে গাছ জুড়ে যেন রঙের ঢেউ লেগে যায়। চোখ-জুড়োনো ফুলের বিভিন্ন লতানে গাছের মধ্যে এটি অন্যতম।

উপরে এ পর্যন্ত যেসব গাছের পরিচয় দেওয়া হল, সেগুলি সবই কলকাতায় আমাদের হাঁটা-চলা পথে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এছাড়াও আরো বেশ কিছু শৌখিন এবং উল্লেখযোগ্য গাছ আছে, যা সবার নজরে আসে না। এগুলি ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। এদের

পাতা ও ফুলের বৈচিত্র্য অতুলনীয়। বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, দেশ-বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ, গাছপালার প্রতি ব্যক্তিগত রুচি ও অনুরাগের মত নানা কারণে কলকাতা শহরের অনেক অভিজাত পরিবারের বাড়িতে, ঘরের কোণে, ড্রইংরুমে, বারান্দায় এমন বহু গাছের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর বিশেষ-কিছু গাছের গণের নাম করা যেতে পারে, যেমন, এডিয়ানটাম, এসপ্লিনিয়াম, নেফ্রোলেপিস, প্লাটিসেরিয়াম ইত্যাদি ফার্ন ; অ্যানথুরিয়াম, অ্যালোকাসিয়া, এগ্লোনিমা, ক্যালাডিয়াম, পোথসফিলোডেনড্রন, মন্‌সটেবা-এর মত কচু জাতীয় গাছ ; অ্যালো, অ্যাসপারাগাস, ক্লোরোফাইটাম, ড্রাসিনা, স্যান্‌সিভিয়েরিয়া-এর মত লিলি-জাতীয় গাছ ; এছাড়া এচমিয়া, ক্যালাথিয়া, ক্রিপটানথাস, কোডিযাম, কোলিয়াস, ক্রোটন, জেব্রিনা, ট্রাডেসক্যানসিয়া প্রভৃতি। এদের মধ্যে অ্যানথুবিয়াম ছাড়া বাকি সবগুলিই পাতার সৌন্দর্যের জন্য বিশেষ সমাদৃত। ক্লোরোফাইটাম, ট্রাডেসক্যানসিয়া, মন্‌সটেরা এবং ফার্নের মত গাছ সাধারণত কোনো ঝুলন্ত পাত্রে লাগানো হয়ে থাকে। কোনো কোনো বাড়িতে ক্যাকটাস বা ক্যাকটাস জাতীয় গাছ লাগানো দেখা যায। এদের মধ্যে অ্যাসট্রোফাইটাম, কিছু ইউফরবিয়া, ইয়োনিয়াম, একিনোক্যাকটাস, এচিভেবিয়া, সিডাম, সেফালোসিরিয়াস প্রভৃতির নাম অগ্রগণ্য।

ঘরের মধ্যে যেসব গাছ রাখা হয়, তার মধ্যে 'বনসাই'-কে বাদ দিলে চলে না। আজকাল এই ধরনের গাছ এক বিশেষ কলা এবং রুচির পবিচয় বহন কবে। 'বনসাই' একটি জাপানি শব্দ। এর প্রকৃত অর্থ হল পাত্রের মধ্যে লাগানো গাছ। কিন্তু আধুনিক অর্থে 'বনসাই' বলতে বোঝায়—বড় বড় গাছকে বিশেষ পদ্ধতিতে চারা অবস্থা থেকে পরিচর্যা করে একটি উদ্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত উচ্চতায় খর্বাকারে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে বজায় রাখা। এই ধরনের গাছ ছোট ছোট পাত্রে লাগাতে হয়। গাছগুলি যত্নের মাধ্যমে বেশ দৃঢ় প্রকৃতির থাকে। পাশ্চাত্য দেশে বনসাই এক বিশেষ কলা-কৌশল যা ব্যয়-বহুলও বটে। চিন এবং জাপান এই কলা-কৌশলের পথিকৃৎ। এই পদ্ধতিতে যে-গাছ ডালপালা মেলে আকাশচুম্বী চেহারা ধারণ করে, তাকে সহজেই বশ মানিয়ে ঘরের কোণে টেবিলেব উপরে একটি ছোট পাত্রে বসিয়ে রাখা যায়। বছরের পর বছর বেঁচে থাকে এই গাছ। জাপানের এই ধবনের কিছু গাছ কয়েক শো বছর বেঁচে আছে। কলকাতায় যেসব গাছ বনসাই হিসাবে দেখা যায়, তার মধ্যে বট, অশ্বত্থ, সাইকাস, পাইন, ডালিম, লেবু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কলকাতাব গাছ হিসাবে এ-পর্যন্ত যেসব গাছের পবিচয় দেওয়া হল, নাম জানা না থাকলেও দৈনন্দিন জীবনে এগুলি প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু এছাড়া এমন কিছু গাছ আছে, যারা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি এবং বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। 'কলকাতার গাছ'—এই শিরোনামে এই সমস্ত গাছের উল্লেখের তাৎপর্য আছে। গোড়ার দিকে বিশাল উদ্ভিদ রাজ্যের যে-শ্রেণী বিভাগেব কথা বলা হয়েছে, সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে উপরে আলোচিত কলকাতার গাছেব সংখ্যা এবং প্রকারভেদ অতি নগণ্য। কিছু ফার্ন ছাড়া ওইগুলি সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদ। এছাড়া শ্রেণীগতভাবে সংখ্যায় বিরাট বৈচিত্র্যপূর্ণ যে উদ্ভিদ কলকাতা মহানগরীর মধ্যে পাওয়া যায়, আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকার জন্যে, আমরা তাদের বড় একটা পরিচয় জানি না। অতীত এবং বর্তমান মিলিয়ে বলা চলে, কলকাতা মহানগরীর বুকে উদ্ভিদ-রাজ্যের সব শ্রেণীর গাছ পাওয়া যায়। শ্রেণীগতভাবে নাম কবলে এগুলি হল শেওলা, ছত্রাক, মস ও ফার্ন জাতীয় গাছ ; ব্যক্তবীজী এবং গুপ্তবীজী উদ্ভিদ। এর মধ্যে প্রথম চারটি অপুষ্পক এবং শেষের দুটি সপুষ্পক শ্রেণীর। উপরে বর্ণিত সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদ সবই পারিপার্শ্বিক শোভা বাড়ানোর জন্য, বাগান-বিলাসী এবং রোপণ করা ; কিন্তু এই জাতেরই বিশাল

সংখ্যক গাছ-গাছালি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে কলকাতার মাটিতে আনাচে-কানাচে, মাঠে-ময়দানে, পার্কে, বাগানে, দেওয়ালে, খোলা জায়গায় জন্মায়, বেড়ে ওঠে এবং পরিশেষে ফুল-ফল দিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরের বছর বীজ থেকে আবার নূতন গাছ জন্মায়। এই ধরনের গাছ বেশির ভাগ একবর্ষজীবী বীরুৎ (Herb)। যেসব গাছ কলকাতায় বর্তমানে নজরে আসে, বিভিন্ন ঋতু ও সময়ের ধারাবাহিক পরিবর্তনের সঙ্গে সেগুলিও ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই পরিবর্তন সংখ্যায় এবং বৈচিত্র্যে উভয় দিক দিয়েই নজরে আসে। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি প্রকাশিত তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এক গণনায় দেখা যায়, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের সংখ্যা ছিল ১৮০। এগুলির বেশির ভাগ মৃতজীবী এবং পচনশীল জৈব পদার্থ ও কাঠ, মরা গাছের গুঁড়ি, কাঠ, পচা পাতা বা মাটির উপরে জন্মায়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ সংলগ্ন এলাকাসহ দক্ষিণ কলকাতার গাছপালার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে সংখ্যার হিসাবে জানা যায়, শেওলা-৩৪, ছত্রাক-১২, মস-জাতীয়-৫, ফার্ন-জাতীয়-৮, সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদ-২৭০। ১৯৬৬-এর এক সমীক্ষায় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের সংখ্যা ছিল ৮৭২ এবং ১৯৭০-এ কলকাতা ও ২৪ পরগণায় শুধু মসের সংখ্যা পাওয়া যায় ২৭। বর্তমানে কলকাতার এই চিত্র ভিন্ন। আগের বহু গাছ নানা কারণে লুপ্ত, সেই জায়গায় নতুন অনেক গাছের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ সংলগ্ন এলাকায় সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদের এক পর্যবেক্ষণমূলক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ওই সময়ে ক্যাম্পাসে ওই জাতীয় উদ্ভিদের সংখ্যা ছিল ২৮৫। এর মধ্যে ১৫৫টি আঠাশ বছরে নূতন সংযোজন, অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে বেশ কিছু গাছ এই এলাকা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আজ কলকাতার তিনশো বছর পূর্তির সন্ধিক্ষণে যদি আবার নতুন করে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তবে দেখা যাবে, পূর্ব পরিসংখ্যানের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এইভাবে সারা কলকাতা এবং বৃহত্তর কলকাতার বুকে নানা কারণে বিভিন্নভাবে নূতন নূতন গাছের আবির্ভাব ঘটছে; আবার প্রকৃতির নিয়মে অথবা মানুষের জন্যে অনেক গাছ শহর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য গাছের বিলুপ্তি বা ধ্বংসের ব্যাপারে মানুষ আজ সজাগ। শহরের বুক থেকে সবুজ গাছপালার বিদায়ের সুদূরপ্রসারী ফল আজ কারো অজানা নেই। এই জ্ঞান এবং ধারণা শহর ছাড়িয়ে গ্রামেও পৌঁচোচ্ছে। সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে যথেষ্ট বৃক্ষরোপণ এবং তার সংরক্ষণে সবাই সচেষ্ট। পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচতে গেলে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে চাই গাছ। দিনের পর দিন নানাভাবে, বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণে কলকাতা মহানগরীর বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় বাতাসকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারে গাছ। শুধু তাই নয়, গাছ আমাদের ছায়া দেয়; ফুল, ফল ও সবুজ পাতায় আমাদের ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট ও তার আশেপাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তাই মহানগরী কলকাতার বুকে চাই আরো গাছ, আরো সবুজের সমারোহ। এই প্রয়োজনে শুধু গাছ লাগালেই কর্তব্য শেষ হবে না, গাছ লাগিয়ে সেগুলির সংরক্ষণও প্রয়োজন। এই ধরনের কাজে কলকাতার কিছু সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কিন্তু কলকাতা মহানগরীর মত বড় শহরে বৃক্ষ রোপণ ও সেগুলির সংরক্ষণে কলকাতার প্রতিটি নাগরিককে সচেষ্ট হতে হবে, আর সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় এই মহান কর্মযজ্ঞ সফল হতে পারে। সেদিন কলকাতা মহানগরী যথার্থ 'সবুজ নগরী কলকাতা' বিশেষণে ভূষিত হবে।

'কলকাতার গাছ'—এই শিরোনামে যেসব গাছের পরিচয় এখানে দেওয়া হয়েছে, এগুলি ছাড়া আরো অনেক ওই ধরনের গাছ মহানগরীর বুকে দেখা যায়। আলোচিত গাছসহ এগুলির একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা তৈরি করা হল। এই তালিকায় বিভিন্ন গাছের ল্যাটিন নামের সঙ্গে সেগুলির বাংলা, ইংরাজি, হিন্দী বা অন্য নাম পাশাপাশি দেওয়া আছে। কলকাতায় সচরাচর যেসব গাছ চোখে পড়ে এই তালিকা থেকে তার একটি আভাস পাওয়া যাবে। গাছগুলি প্রায় সবই বৃক্ষ এবং গুল্ম জাতীয়।

তালিকায় ব্যবহৃত নির্দেশিকা :

ইংরাজি—ইং	মারাঠি—মা
তেলেগু—তে	ল্যাটিন—ল্যা
বম্বে—ব	সংস্কৃত—সং
	হিন্দী—হি

কলকাতার গাছপালা

ল্যাটিন নাম		বাংলা নাম/অন্য নাম
Abroma augusta	...	উলট কম্বল
Acacia arabica	...	বাবলা
A. auriculiformis	...	আকাশমণি, সোনাঝুরি
Achras zapota	...	সপেদা
Adansonia digitata	...	বাওবাব, মাঙ্কি ব্রেড ট্রি (ইং)
Adenanthera avonina	...	রক্তকমল
Adenocalymma alliaceum	...	রসুনলতা
Aegle marmelos	...	আঠা বেল
Aganosma caryophyllata	...	মালতী
Ailanthus excelsa	...	মহানিম, ট্রি অফ হেভেন (ইং)
Albizzia lebbek	...	শিরীষ
Alangium salvifolium	...	আকর কাঁটা
Allamanda cathartica	..	জোহাবিসনটক্কা (ব)
Alstonia scholaris	...	ছাতিম
Althaea rosea	...	হলি-হক (ইং)
Amherstia nobilis	...	আমহার্স্টিয়া (ল্যা)
Anacardium occidentale	...	কাজু
Annona reticulata	..	নোনা
A. squamosa	...	আতা
Anthocephalus chinensis	...	কদম
Antigonon leptopus	...	স্যাণ্ডউইচ আইল্যাণ্ড ক্লাইম্বার (ইং) অ্যান্টিগোনন (ল্যা)
Araucaria cookii		অরোকোরয়া (ল্যা)

Ardisia solanacea ... বনজাম
Areca catechu ... সুপারি
Artocarpus heterophyllus ... কাঁঠাল
A. lakoocha ... ডাহুয়া, লাকুচা (সং)
Averrhoa carambola ... কামরাঙ্গা
Azadirachta indica ... নিম
Bambusa arundinacea ... বাঁশ
Barringtonia acutangula ... হিজল
Bauhinia acuminata ... কাঞ্চন
B. Purpurea ... রক্তকাঞ্চন, দেবকাঞ্চন
Beaumontia grandiflora ... নেপাল ট্রামপেট ক্লাইম্বার (ইং)
Bignonia venusta ... বিগনোনিয়া (ল্যা)
Bombax ceiba ... শিমুল
Borassus flabellifer ... তাল
Bougainvillea spectabilis ... বাগানবিলাস
Brownea coccinea ... ব্রাউনিয়া (ইং)
Brya ebenus ... ব্রায়া (ল্যা)
Bursera serrata ... বারসেরা (ল্যা)
Butea monosperma ... পলাশ
Caesalpinia bonducella ... নাটাফল
C. Pulcherrima ... কৃষ্ণচূড়া
Calliandra haemotocephala ... পাউডার পাফ (ইং), মণিকুন্তলা
Callistemon lanceolatus ... লাল বোতল বুরুশ
Calophyllum inophyllum ... সুলতান চাঁপা
Calotropis gigantea ... আকন্দ
Campsis grandiflora . টেকোমা
Canna orientalis ... সর্বজয়া
Carissa carandas ... করমচা
Caryota urens ... মারি (হি), ইণ্ডিয়ান সাগো পাম (ইং)
Cassia alata ... দাদমারি
C. fistula ... বাঁদর লাঠি, সোঁদাল
C. javanica ... যাভা ক্যাসিয়া (ল্যা)
C. nodosa ... ক্যাসিয়া নোডোসা (ল্যা)
C. renigera ... ক্যাসিয়া রেনিজেরা (ল্যা)
C. siamea ... মিনজিরি
C. sophera ... কালকাসুন্দ
C. tora ... চাকুন্দা
Casuarina equisetifolia ... ক্যাজুয়ারিনা (ল্যা), বিলাতি ঝাউ
Catesbaea spinosa ... কণ্টক লিলি

Cedrella toona ... তুন
Cestrum nocturnum ... হাসনুহানা
Chrysalidocar puslutescens ... ক্রাইস্যালিডোকারপাস (ল্যা)
Citrus aurantifolia ... কাগজি লেবু
Clerodendrum infortunatum ... ঘেঁটু, ভাঁট
Clitoria ternatea ... অপরাজিতা
Cocos nucifera ... নারকেল
Cochlospermum gossypium ... হলদে শিমূল
Codiaeum variegatum ... পাতাবাহার
Colvillea racemosa ... কিলবিলি
Cordia dichotoma ... বুহুল
C. sebestena ... লাল লসোড়া (হি)
Couroupita guianensis ... নাগলিঙ্গম, ক্যানন বল ট্রি (ইং)
Crataeva nurvala ... বরুণ
Cycas circinalis ... সাইকাস
C. rumphii ... সাইকাস
Dalbergia sissoo ... শিশু
Datura metel ... ধুতুরো
Delonix regia ... গুলমোহর, রাধাচূড়া
Dillenia indica ... চালতা
Diospyros discolor ... বিলাতি গাব
D. kaki ... গাব
D. montana ... বনগাব
Dombeya mastersii ... ডম্বিয়া (ল্যা)
Duranta plumieri ... বিলাতি মেহেদি, দুরন্ত
Elaeis guineensis ... অয়েল-পাম (ইং)
Emblica officinalis ... আমলকি
Enterolobium saman ... বিলাতি শিরিষ, রেন ট্রি (ইং)
Ervatamia divaricata ... টগর
Erythrina variegata ... পলতে মাদার
Eucalyptus citriodora ... ইউক্যালিপটাস, তালানপ্পি (তে)
E. globulus ... ইউক্যালিপটাস, করপুরা মরম (মা)
Euphorbia antiquorum ... তেশিরা মনসা
E. nerifolia ... মনসাসিজ
E. nivulia ... সিজ
E. pulcherrima ... পত্রমঞ্জরী, কেরুই
E. tirucalli ... লঙ্কাসিজ
Euphoria longana ... আঁশফল
Excoecaria agallocha ... গেঁওয়া

Feronia limonia	...	কয়েদবেল, কাঠ বেল
Ficus bengalensis	...	বট
F. elastica	...	রাবার গাছ
F. glomerata	...	যজ্ঞ ডুমুর
F. hispida	...	কাকডুমুর
F. infectoria	...	পাকুড়
F. religiosa	...	অশ্বত্থ
Gardenia jasminoides	...	গন্ধরাজ
Garuga pinnata	...	জুম
Gelonium multiflorum	...	নারেঙ্গী
Gliricidia sepium	...	গ্লিরিসিডিয়া, সারাঙ্গা
Gloriosa superba	...	উলট চণ্ডাল
Glycosmis arborea	...	আশ শেওড়া
Gmelina hystrix	...	বধরা
Grevillea robusta	...	রূপসী, সিলভার ওক
Grewia subinaequalis	...	ফলসা
Guazuma tomentosa	...	নিপলতুঁত
Gustavia augusta	...	আভা, শ্বেতাভা
Haematoxylon campechianum	...	বোক্কন
Hamelia patens	...	মুনা
Hibiscus mutabilis	...	স্থলপদ্ম
H. rosa-simensis	...	জবা
Hiptage benghalensis	...	মাধবীলতা
Holarrhena antidysenterica	...	কুর্চি
Ixora coccinea	...	রঙ্গন
I. parviflora	...	সাদা রঙ্গন
I. undulata	...	সাদা রঙ্গন
Jacaranda ovalifolia	...	জাকারাণ্ডা, নীল গুলমোহর
Jacquinea ruscifolia	...	জাকুইনিয়া (ল্যা)
Jasminum pubescens	...	কুন্দ
J. sambac	...	বেলফুল, বেলাফুল
Jatropha curcas	...	সাদা ভেরেণ্ডা, বাগভেরেণ্ডা
J. glandulifera	...	লাল ভেরেণ্ডা
Kigelia pinnata	...	ঝাড় ফানুস
Kleinhovia hospita	...	বোলা
Kopsia fruticosa	...	ডাকুর
Lagerstroemia indica	...	ফুরুশ
L. speciosa	...	জারুল
Lantana camara	...	ল্যানটানা (ল্যা)

Lawsonia inermis ... মেহেদি
Leucaena leucocephala ... সুবাবুল
Litchi chinensis ... লিচু
Litsaea chinensis ... কুকুরচিতা
Livistona chinensis ... চিনা পাম (ইউরোপ)
Livistona rotundifolia ... চিনা পাম (ভারত)
Madhuka latifolia ... মহুয়া
Magnolia grandiflora ... ম্যাগনোলিয়া, হিম চাঁপা, বিলিতি চাঁপা
Mallotus philippinensis ... কমলা, কামিলা
Mangifera indica ... আম
Melia azedarach ... ঘোড়া নিম
Mesua ferrea ... নাগকেশর
Michelia champaca ... স্বর্ণচাঁপা
Millingtonia hortensis ... আকাশ নিম
Millettia ovalifolia ... মৌলমীন রোজউড
Mimosa pudica ... লজ্জাবতী
M. rubicaulis ... শিয়াকাঁটা
Mimusops elengi ... বকুল
Morinda citrifolia ... আচফুল
Moringa oleifera ... সজনে
Morus alba ... তুঁত
Muntingia calabura ... চিনা চেরী, জাপানি চেরী
Murraya paniculata ... কামিনী
Nerium odorum ... করবী
Nipa fruticans ... গোলপাতা, গুলগা
Nyctanthes arbor-tristis ... শিউলি, শেফালি
Oroxylon indicum ... সোনাপট্টি
Pandanus foetidus ... কেয়া
Passiflora suberosa ... ঝুমকোলতা
Peltophorum inerme ... পেলটোফোরাম (ল্যা), অর্জুনজ্যোতি
Petrea volubilis ... পার্পল রিথ (ইং)
Phoenix sylvestris ... খেজুর
Pinus longifolia ... পাইন
Pithecellobium dulce ... মনিলা ট্যামারিণ্ড (ইং)
Plumeria alba ... সাদা কাঠচাঁপা
P. rubra ... কাঠচাঁপা, গরুড় চাঁপা
Polyalthea longifolia ... দেবদারু,
Pongamia pinnata ... করঞ্জ
Psidium guajava ... পিয়ারা

Pterospermum acerifolium ... মুচকুন্দ, কনক চাঁপা
Ptychosperma macarthuri ... টাইকোস্‌পারমা (ল্যা)
Punica granatum .. ডালিম
Putranjiva roxburghii ... পুত্রঞ্জীব (ল্যা)
Quisqualis indica ... রেঙ্গুন ক্রিপার
Ravenala madagascariensis ... পান্থপাদপ
Ravenia spectabilis ... লাবণি
Ricinus communis ... রেড়ি, গাব
Roystonea regia ... রয়্যাল পাম, বোতল পাম
Sapindus mukorossi ... রিঠে
Saraca indica ... অশোক
Sesbania grandiflora ... বকফুল, অগস্ত্য
S. sesban ... জয়ন্তী
Spathodea campanulata ... টিউলিপ ট্রি (ইং)
Spondias dulcis ... বিলাতি আমড়া
S. mangifera ... আমড়া
Streblus asper ... শেওড়া
Strelitzia reginae ... স্বর্গের পাখি, বার্ড অব প্যারাডাইস (ইং)
Strychnos nux-vomica ... কুচিলা
Swietenia macrophylla ... মেহগিনি
S. mahagoni ... মেহগিনি
Syzygium cumini ... কালো জাম
S. jambos ... গোলাপ জাম
Tabebuia chrysantha ... বাসন্তী, ট্যাবেবুইয়া (ল্যা)
Tamarindus indica ... তেঁতুল
T. stans ... চাঁদপ্রভা, ইয়েলো এলডার (ইং)
Terminalia arjuna ... অর্জুন
T. catappa ... বাংলা বাদাম, দেশি বাদাম
Tectona grandis ... সেগুন
Thespesia populnea ... পরাশ, পলাশপিপল
Thevetia peruviana ... কল্কে
Thrinax barbadensis ... থ্রিনাক্স (ল্যা)
Thuja orientalis .. থুজা (ল্যা)
Thunbergia grandiflora ... থানবারজিয়া (ল্যা)
Trema orientalis ... ট্রিমা (ল্যা)
Trewia nudiflora ... পিটুলি
Vinca rosea ... নয়নতারা
Vitex negundo ... নিশিন্দে
Zizyphus mauritiana ... কুল

Z. oenoplia ... বনকুল

যেসব গাছ বর্তমানে কলকাতায় পাওয়া যায় না, অধুনালুপ্ত সেই সব গাছের একটি তালিকা :

Heritiera fomes ... সুঁদরী
Ceriops decandra ... গরাণ
Excoecaria agallocha ... গেঁও
Rhizophora mucronata ... খামো বা গর্জন
Kandelia candel ... গরিয়া
Bruguiera gymnorrhiza ... কাঁকরা
Avicennia alba ... বাইন
Sonneratia apetala ... কেওড়া
Aegiceras majus ... খলসি
Acanthus ilicifolius ... হাড়গোজা
Phoenix Paludosa ... হেঁতাল
Nipa fruticans ... গোলপাতা

কলকাতার পাখি

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

সময়ের সঙ্গে তাল রেখে কলকাতাব রূপবদল ঘটেছে। সেই সঙ্গে বদলেছে তার আকাশরেখা। সারি সারি গগনচুম্বী অট্টালিকার জ্যামিতিক চালচিত্রে ছোট হয়ে গেছে দিগন্তের আকাশ। এই পটভূমিতে চেনা-অচেনা পাখিবা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

সত্যি কথা বলতে কি, গত দেড়শো বছরে কলকাতার বিবর্তন লক্ষ্য করার মত। যে-মুক্ত, নির্মল এবং নিবাপদ পরিবেশ পাখিদের স্বচ্ছন্দ আবাসভূমি হতে পারে বা তাদের আকর্ষণ করতে পারে. তা আজ কলকাতার বুক থেকে ক্রমশ অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। অথচ দেড়শো বছর আগেব কলকাতার চেহারা ছিল অন্যরকম। আজকের অভিজাত এলাকা নিউ আলিপুরও ছিল সুন্দরবনের আওতায়। তখন এ-শহরের গা-চিরে বইত বহু নোনা জলের নালা, বিদ্যাধবী নদীর জোয়ার-ভাটা খেলত আজকের পূর্ব কলকাতায়, এখন যেখানে আবদ্ধ জলের ভেড়ি। আর লবণাম্বু অরণ্য (Mangrove forest) আজকের শহরেব অনেকটাই ঢেকে রেখেছিল।

জলা-জঙ্গল বেষ্টিত সেই সবুজ প্রান্তব সময়ের সঙ্গে তাল বেখে পাল্টাতে লাগল। পুরনো কলকাতার প্রাকৃতিক উদ্ভিদ-সম্পদ নিশ্চিহ্ন হল। এখনকার কলকাতার বুকে যে গাছপালা দেখা যায় তার প্রায় সবটাই মানুষের লাগানো।

কলকাতার পাখি বলতে মূল শহর ও সি এম ডি এ কলকাতা, দুটোকেই ধরা সঙ্গত। একদিকে কল্যাণী থেকে বজবজ, অন্যদিকে বারুইপুর থেকে হাওড়া। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি জেলা ও নদীয়ার কিছু অংশ নিয়ে সি এম ডি এ কলকাতা।

শহর কলকাতার পাখি বলতে পাতিকাক, চড়ুই, শালিক, বুলবুলি আর পায়রার কথাই মনে পড়ে। মূলত এদের সঙ্গেই আমাদেব নিত্যদিনের সাক্ষাৎ। অবশ্য বাতাসি, হাঁড়িচাচা, টিয়া, কোকিল, কুবো কিংবা ঘুঘুর দেখাও পাওয়া যায়। তবে একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, এ শহর থেকে নিয়মিত হারিয়ে যাচ্ছে নানা পরিচিত পাখি।

কলকাতার পাখির উপর তেমন বিস্তারিত গবেষণা হয়নি। শুধু কলকাতা কেন, ভারতের পাখি নিয়ে কাজ করেছেন খুব কম সংখ্যক উৎসাহী পক্ষিবিদ্। যাঁরা প্রথম দিকে উৎসাহ দেখান তাঁরা প্রত্যেকেই বিদেশি। বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় পাখিদের নিয়ে লেখা প্রথম ভারতীয় বই। রচয়িতা এদেশের অন্যতম বিশিষ্ট পক্ষিবিদ্ সালিম আলি। সারা পৃথিবীতে বর্তমানে টিকে থাকা ৮৬০০টি প্রজাতির পাখির মধ্যে ভারতে পাওয়া যায় ৭০টি বংশের ১২০০ প্রজাতির পাখি। এর মধ্যে ৯০০-এর কিছু বেশি এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা।

উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে এডওয়ার্ড ব্লাইথ কলকাতা ও তার চারপাশে ২৭৪টি প্রজাতির পাখি লক্ষ্য করেন। প্রখ্যাত পক্ষিবিদ্ ডঃ বিশ্বময় বিশ্বাসের নেতৃত্বে জ্যুলজিক্যাল

সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার একদল বিজ্ঞানী ১৯৬১ থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সি এম ডি এ কলকাতায় ২৩০টি প্রজাতির পাখির সন্ধান পান। এই পরিসংখ্যানের ২২০টি প্রজাতি অধ্যাপক ব্লাইথের একশো বছরেরও বেশি পূর্বের তালিকাভুক্ত। কিন্তু হলে কি হবে, প্রায় ৫৪টি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায়নি। অবশ্য নূতন ১০টি প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছিল।

কলকাতার পাখির উপর গবেষণা সংক্রান্ত কৃতিত্বের সিংহভাগ এই দুই বিশিষ্ট পক্ষিবিদের হলেও কয়েকজন বিদেশির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত। এঁদের মধ্যে অন্যতম অধ্যাপক ব্লাইথের বন্ধু এইচ স্ট্রিকল্যাণ্ড, ব্যারাকপুরের জুটমিলের বড়সাহেব ফিলিপ মন, আর স্যুইডিশ সাহেব কার্ল সুনডেভাল বিক্ষিপ্তভাবে কলকাতার পাখি নিয়ে কাজ করেন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে সুনডেভাল সাহেব ১০৭টি ও ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে মন সাহেব ১৫২টি প্রজাতির পাখির তালিকা তৈরি করেন। এছাড়া ফ্র্যাঙ্ক ফিন-এর কথাও বলতে হয়। ফিন সাহেবের 'বার্ড্স অব ক্যালকাটা' বইটি উল্লেখযোগ্য।

ডঃ বিশ্বাস ঊনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত সামগ্রিক একটি পাখির তালিকা তৈরি করেন। তাতে অবশ্য সি এম ডি এ কলকাতায় ৩৮২টি প্রজাতির পাখির নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১১টি 'সম্ভাব্য' পাখি। পক্ষিবিদদের মতে, 'সম্ভাব্য' পাখিদের বেশির ভাগই অন্য কোথাও থেকে আনা খাঁচার পাখি, যারা কোনোরকমে মুক্ত হয়ে পরে কলকাতা ও তার আশেপাশে দেখা গেছে বা ধরা পড়েছে।

এ ছাড়া প্রকৃতি-প্রেমীদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রকৃতি-সংসদ ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩-এর মধ্যে কলকাতা ও তার আশেপাশে ২০৮টি প্রজাতির পাখি খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে শহর কলকাতায় কত প্রজাতির পাখি দেখা যায়? এই শহরে আমাদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে বাস করে প্রায় ১০০টি প্রজাতির বিচিত্র বর্ণালী পাখি। এদের মধ্যে অনেকেই এই শহরের মায়া ত্যাগ না করতে পেরে নিজেদের প্রকৃত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বদলে কলকাতার রূপবদলের সঙ্গে সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এখানে পাতিকাক, চিল, শালিক, চড়াই, পায়রা, ছাড়াও একটু নজর করলেই বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায় ছোট পানকৌড়ি, কোঁচবক, গোবক, সাদাবুক ও ছোট মাছরাঙা, ছোট সোনালি কাঠঠোকরা, টিয়া, ঘুঘু, কোকিল, বাতাসি, ছোট বসন্তবৌরি, শালিক, গোশালিক, ঝুঁট শালিক, কুবো, বেনেবউ, কাজল পাখি, গাঁডিচাচা, কালো ও চিনে বুলবুল, টুনটুনি, চুটকি, দোয়েল, খঞ্জন, মৌটুসি ও অন্যান্য অনেক পাখি। অবশ্য সব পাখি প্রত্যেক ঋতুতে দেখতে পাওয়ার কথা নয়। শীতকালে পাখির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বহু গুণ বেড়ে যায়। এছাড়াও কলকাতার আশপাশের পাখিও কখনো কখনো শহর কলকাতায় চলে আসে।

কলকাতায় যত পাখির বাস তার মধ্যে বাড়ির কাছাকাছি কয়েক ধরনের জলচর পাখি নজরে আসার কথা। বাড়ির কাছের জলাভূমিতে দেখতে পাওয়া যেতে পারে ছোট পানকৌড়ি, কোঁচবক ও মাছরাঙা। এর মধ্যে কুচকুচে কালো রঙ, আকারে দাঁড়কাকের চেয়ে অল্প বড়, লম্বাটে লেজ ও তীক্ষ্ণ সরু চ্যাপটা ঠোঁট, হাঁসের মত যে-জলচর পাখিটি অনেক সময়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি ছোট পানকৌড়ি। এর গলায় থাকে সাদা রঙের ছোঁয়া। মাথার পিছনে অল্প ঝুঁটির আভাস। পানকৌড়িদের প্রধান খাদ্য মাছ। এদের জলের তলায় ডুব দিয়ে মাছ ধরা লক্ষ্য করার মত। মাছ ধরার পর সেটিকে খাওয়ার পদ্ধতিও অদ্ভুত। ঠোঁটে চেপে জলের উপর ভেসে উঠে মাছটিকে প্রথম উপর দিকে ছুঁড়ে

দেয়। যখন সেই মাছটি মাথা নীচু করে পড়তে থাকে তখন টপ করে তাকে গিলে ফেলে। শিকার ধরার মাঝে মাঝে জলের ধারের গাছপালায় কিংবা বড় বড় পাথরে ডানা মেলে ছোট পানকৌড়িরা রোদ পোহায়।

ডোবা বা পুকুরের আনাচে-কানাচে ছোট দেশি মুরগির আয়তনের আর একটি পাখির দেখা পাওয়া যায় আমাদের শহরে। এটি কোঁচবক। যখন চুপচাপ সে বসে থাকে তখন দেখায় ফিকে হলুদ। কিন্তু উড়বার সময়ে ডানা আর লেজের ধবধবে সাদা রঙ চোখে পড়ে। প্রজনন ঋতুতে কোঁচবকেদেব সারা পিঠ ভরে যায় তামাটে পালকে। দেখা দেয় লম্বা সাদা ঝুঁটি। এদের বর্শার মত তীক্ষ্ণ ঠোঁটের প্রধান শিকার ছোট মাছ, কাঁকড়া আর ব্যাঙ। জলের ধারে পা টিপে টিপে যখন শিকার করে তখন সত্যিই এদের একাগ্রতা দেখার মত। কোনো কোনো অঞ্চলে এরা ধানপাখি নামেও পরিচিত।

চড়াইয়ের চেয়ে খানিক বড়, ভারি সুন্দর দেখতে আমাদেব অতি পরিচিত পাখি ছোট মাছরাঙাকেও কলকাতার জলা-অঞ্চলে দেখা যায়। নীল-সবুজে মেশানো পিঠ, শরীবের অন্যান্য অংশ বাদামি, অনেকটা মরচে ধরা লোহাব মত রঙ। ছোট লেজ আর লম্বা তীক্ষ্ণ লাল ঠোঁট। জলের ধাবে কোনো গাছেব নুয়ে পড়া ডালেব উপর বসে এরা নজর রাখে জলের দিকে। ছোট মাছ, ব্যাঙাচি আর জলের কীট-পতঙ্গ এদের প্রধান খাদ্য। শিকার ধরার সময় এরা চিঁ-চিঁ করে শব্দ করে।

সাদাবুক মাছরাঙাও কলকাতায় নজরে আসার মত একটি পাখি। তবে অন্য মাছরাঙাদের মত এরা একমাত্র জলের উপর নির্ভরশীল নয়। এদের ডোবা, পুকুর, জলে-ডোবা ক্ষেত বা বর্ষায় জমা জলের কাছে দেখতে পাওয়া যাবে। আবার জলের থেকে বেশ দূরেও এদের বিচরণ। অনেক সময় বাড়িব পাশের টেলিফোনের তারের উপবেও বসে থাকতে দেখা যায়। আয়তনে ময়নার মত। পিঠের রঙ উজ্জ্বল নীল। গলা, মাথা আর শরীর গাঢ় চকোলেট রঙের। বুকের কাছে সাদা ছোপ। লম্বা তীক্ষ্ণ লাল ঠোঁট। মাছ ও পোকামাকড়ই এদের প্রধান খাদ্য। তবে ব্যাঙাচি, টিকটিকি, ছোট ছোট পাখি কিংবা ইঁদুরছানাও খায়। শিকার ধরার পরে এরা প্রথমে সেটাকে থেঁতলে মারে, তারপর গিলে ফেলে।

আর একটা পাখি গো-বক বা গাইবকও দেখতে পাওয়া যায় কলকাতা শহরে। প্রধানত ক্ষেত-খামার ও মাঠেই নজরে আসে। গরু-মোষ জাতীয় গবাদি পশুর পায়ের ফাঁক দিয়ে দিব্যি পোকামাকড় ধরে খাচ্ছে। কখনো বা চারদিক ভাল করে দেখে নেওয়াব জন্য চড়ে বসছে গরু বা মোষের পিঠে। আবার কখনো গরু-মোষের গা বা কানের পাশ থেকে পোকা খুঁটে খায়। গায়ের রঙ সাদা, লম্বা গলা আর পা। হলুদ ঠোঁট। প্রজনন ঋতুতে গো-বকের মাথা, গলা আর পিঠের উপর গজিয়ে ওঠে কমলা আর সোনালি রঙেব পালক। তখন আর এদের কোরচে বকেদের থেকে আলাদা করে চিনতে অসুবিধা হয় না।

শহর কলকাতায় বাড়ির পাশে বড় বাগানে বা অগভীর জঙ্গলে এক রকমের পাখি নজরে আসবে। এর পিঠের রঙ সোনালি আর কালো মেশানো, কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশ হলদেটে সাদা, তাতে কালো দাগ। এটি হল সোনালি পিঠ কাঠঠোকরা। আকারে ময়নার চেয়ে বড়। এদের শক্ত, লম্বা ঠোঁট দিয়ে গাছের গায়ে টোকা মেরে পোকার সন্ধান করে। গুঁড়ি ধরে একবার নীচের দিকে নেমে আসে আবার সোজা উপর দিকে উঠে যায়। কখনো ওঠে সোজাসুজি, কখনো বা গুঁড়িটাকে ঘুরে ঘুরে। দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে শক্ত লেজটি চেপে ধরে গাছের গায়ে। এক অদ্ভুত কর্কশ আওয়াজ করে এরা।

উজ্জ্বল সোনালি গায়ের রঙ, মাথা, গলা ও বুকের অংশ কুচকুচে কালো। ডানা আর লেজে কালো ছাপ, গোলাপি ঠোঁট। এমন পাখিও অনেকের নজরে এসে থাকবে শহর কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যে। অদ্ভুত সুন্দর এই পাখিটি বেনেবউ। সাহিত্যিক বনফুল নাম দিয়েছেন কনকপাখি। বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বেনেবউ হলদেগুড়ি বা হলুদ পাখি নামে পরিচিত। লাজুক পাখি। দিব্যি থাকে ঘন গাছপালার আড়ালে। সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে ঘন পাতার আড়াল থেকে হঠাৎ উড়লে চোখ ঝলসে যায় হলুদ অঙ্গের ঝলমলানিতে। মিষ্টি সুরে পিলো, পিলোলো গেয়ে বেড়ায়। এদের প্রধান খাদ্য নানা ছোট ফল-পাকুড়।

দেহের রঙ কালচে বাদামি, মাথা, গলা আব লম্বা লেজে ভুষোকালির রঙ এমন একটি পাখিও কলকাতায় অনেকেরই নজরে আসার কথা। এটির নাম হাঁড়িচাচা। অন্য পাখির বাসায় গোপনে ঢুকে ডিম খেয়ে ফেলে বলে হাঁড়িচাচাদের চোর-পাখি আব টাকা চোর বলে ডাকে অনেকে। কোনো কোনো জায়গায় হাঁড়িচাচা কুটুম পাখি হিসাবেও পরিচিত। কর্কশ স্বরে আওয়াজ তুলে সপবিবারে এ-গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে বেড়ায়। কাকেদের মত হাঁড়িচাচাবাও সর্বভুক।

আকারে চড়াইয়ের মতন। লম্বা লেজ। শরীরের উপর ভাগ ধূসর, নীচের অংশ সাদা। কলকাতার আকাশে সদা চঞ্চল এই পাখিটি নজর এড়ানোর কথা নয়। এটি খঞ্জন। শীতে গলার কালো রঙ অনেকটা ফিকে হয়ে সাদাটে দেখায়। সব সময়ে লেজ নাচিয়ে পোকামাকড়েব খোঁজে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। শীতকালে শহরের যে-কোনো খেলার মাঠে খঞ্জনের দেখা পাওয়া যাবে। এই পাখিরা রাতে দল বেঁধে আশ্রয় নেয় বড় গাছে বা আখের ক্ষেতে।

শহর কলকাতার সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে দোয়েলের সঙ্গে। সাদা-কালো পালকে আবৃত শরীব। বাহারি লেজটি সর্বদা উপরের দিকে তোলা। সব সময়ে ফিটফাট চেহারা—এমন পাখি। এমনিতে লাজুক পাখি, নিরিবিলিতে থাকতে ভালবাসে। তবে প্রজনন ঋতুতে দোয়েল সাজে নতুন সাজে। তখন তার চবিত্রেব আমূল পরিবর্তন হয়। পুরুষ দোয়েল তখন গাছের ডালে বা টেলিগ্রাফের তারে দোল খায আর মিষ্টি গান গায়। কখনো আবার অন্য পাখিব কণ্ঠস্বরের নকলও করে দোয়েল। কীট-পতঙ্গ ছাড়াও এরা ছোট ফল-পাকুড ও ফুলের মধু খায়।

সবুজ পাখির বুক আর কপালে লালের ছোঁয়া। হলুদ গলা আর শরীরের নীচের ভাগে হলুদের উপর সবুজের ছোপ। ছোট বাহারি এক পাখি। এই পাখিটিও অপরিচিত নয় কলকাতার মানুষের কাছে। নাম বসন্তবৌরি। মোটা ভারি ঠোঁট আর ছোট লেজ। গাছের ডালে ডালেই কাটায় সারাক্ষণ, মাটিতে নামে না। থেকে থেকে বসন্তবৌবির টুক-টুক ডাক দূর থেকে শোনা যায়। ঠিক মনে হয় যেন কোনো কামাব লোহা পেটাচ্ছে। ইংরাজিতে তাই বসন্তবৌরিকে 'কপারস্মিথ' বলে। যেখানে বট কিংবা অশ্বত্থ গাছ রয়েছে সেখানেই দেখা পাওয়া যাবে বসন্তবৌরির।

ছোট পাখি হলেও রঙেব বাহার দেখার মত। ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায়, পিঠ জলপাই আর বাদামি, পেট সাদাটে হলুদ। এমন একটা পাখিও নিশ্চয়ই কলকাতায় অনেকেরই নজরে এসেছে। এটি দুগাটুনটুনি। পুরুষ পাখির ডানা কালো এবং বুকে কালো রেখা। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ দুগাটুনটুনির রূপবদল হয়। চকচকে কালো পালকে দেখা দেয় সবুজ-বেগুনি আভা। ডানার তলায় গজায় কমলা পালক। চিউইট-চিউইট করে এরা

ডেকে চলে দিনমান, যদিও এদের ডাক সুরেলা নয়।

বাতাসি বা তালচোঁচ চড়াইয়ের থেকে ছোট। ভুষোকালি পাখিটির সাদা, ছোট চৌকো লেজ আর লম্বা ডানা। এ-পাখিটিও কলকাতায় পরিচিত। নাম বাতাসি বা তালচোঁচ। ভীষণ জোরে উড়তে পারে। পোড়ো বাড়ির আনাচে কানাচে বাতাসিদের নজরে আসে, যদিও ব্যস্ত লোকালয়েও এদের দেখা মেলে। বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায় এদের কিচমিচ ডাকে আকাশ মুখরিত হয়ে ওঠে। পোকা-মাকড় ধরে খায় আর অনেকে একসঙ্গে মিলেমিশে দিব্যি থাকে।

আজ সারা পৃথিবীর বড় বড় শহরের বুক থেকে পাখিরা হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত নগরায়ণের ফলে। কলকাতার আকাশ থেকে পাখিদের হারিয়ে যাওয়া কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কোনো অঞ্চলে পাখির থাকা না থাকা নির্ভর করে সাধারণত চারটি কারণের উপরে : ১· পর্যাপ্ত খাবার ২· রাতের আশ্রয়ের সন্ধান ৩· বাসা বাঁধা থেকে সন্তান পালনের উপযুক্ত স্থান এবং ৪· শত্রুর সংখ্যা ও উপদ্রব।

কোনো সন্দেহ নেই, বর্তমানে যথেচ্ছ গাছ কাটা ও জলাজমি বুজিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পাখিদের বাসস্থান, খাবার, ডিমপাড়া ও সন্তান প্রতিপালনে জায়গার অভাব দেখা দিয়েছে। এছাড়া পুরনো বাড়িঘর ভেঙে ফেলার ফলে চড়াই, শালিক বা পেঁচার মত পাখির নির্বিঘ্নে বাসা বাঁধার মত জায়গা আর পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে সারি সারি আকাশচুম্বী অট্টালিকা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে—বিশেষত পরিযায়ী পাখিদের যাতায়াতের পথে। তাছাড়া আছে শত্রুর উৎপাত।

পাখিদের প্রকৃত শত্রু কারা ? ছোট পাখিদের ক্ষেত্রে শত্রু বড় পাখি, আর বেড়াল, সাপ ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণী। কিন্তু সম্প্রতি মানুষ নামক শত্রুই পাখিদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ। গুলতির আঘাতে বা ফাঁদ পেতে বা ঘুড়ির মাঞ্জা প্রয়োগে উড়ে যাওয়া পাখির ডানা কেটে মানুষের শিকার আজ হাজার হাজার পাখি। বিশেষ করে শীতকালে উড়ে আসা পরিযায়ী পাখিরা।

বর্তমানে কীটনাশকের ব্যবহারও একটি সমস্যা। পাখির খাদ্য পোকা-মাকড় ধ্বংস হচ্ছে। শুধু তাই নয়, দেহে কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় বহু পাখির ডিমের খোলা এত পাতলা হয়ে পড়ছে যে, তার উপর তা দিতে গেলেই ভেঙে যাচ্ছে। ফলে বংশবিস্তার অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হচ্ছে।

অন্যদিকে গৃহস্থের অতি পরিচিত পাতিকাকও কলকাতার বুক থেকে অন্যান্য ছোট পাখিদের হটিয়ে দিচ্ছে শত্রুর মত। যেসব পাখি জনবসতির কাছে বাড়িঘরের আনাচে-কানাচে বা গাছপালায় বাসা বাঁধে, তাদের ডিম এবং বাচ্চা কাকের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার হাত থেকে খুব কমই রক্ষা পায়। এছাড়া কাক, চড়াই, শালিক, পায়রার মত মানুষের বসতির কাছেপিঠে যারা দিব্যি থাকে, সংখ্যায় তারা উল্লেখযোগ্য হওয়ার ফলে অন্যান্য পাখিদের খাদ্যেও টান পড়ে।

একসময়ে কলকাতা এবং তার আশেপাশের বহু জলাজমি শীতকালীন উড়ে আসা বন্য হাঁসের মত পরিযায়ী পাখিদের আদর্শ বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠত। উত্তর ও দক্ষিণ সল্ট লেক ও ছোট বড় অন্যান্য জলাজমি, চিড়িয়াখানার লেক ইত্যাদি ছিল জলচর পাখিদের বিচরণক্ষেত্র। তাছাড়া ছিল বহু ছোট বড় জঙ্গল, যেখানে স্বচ্ছন্দে বাস করত শাখাচর পাখিরা।

একসময়ে সল্ট লেকেই প্রায় ৮০টি পরিযায়ী প্রজাতি সমেত ২৪৮টি প্রজাতির লক্ষাধিক

রঙ-বেরঙের পাখির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। কলকাতার পূর্ব দিকে বিস্তৃত নোনাজলের হ্রদ ঘিরে সল্ট লেক ছিল এক বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ। বিভিন্ন গাছপালা, গুল্মরাজি নিয়ে সল্ট লেক ছিল পরিযায়ী এবং স্থায়ী পাখিদের স্বর্গোদ্যান। এব অবস্থান ছিল পরিযায়ী পাখিদের স্বাভাবিক উড়ান পথেব মাঝে। ফলে এখানে পৌঁছতে পাখিদেব দিক পবিবর্তন করার দরকার হত না।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তরের শতবার্ষিকী উৎসব চলাকালীন সল্ট লেকে একটি পক্ষী-আলয় গড়ে তোলার প্রস্তাব কবা হয়। বহু আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী ও সংস্থা এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। স্বাগত জানান তদানীন্তন পশ্চিমবাংলাব রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু। কিন্তু এই প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। পক্ষী-আলয় গড়ে উঠলে স্থায়ী পাখিরা নিঃসন্দেহে এখানে অবাধে বসবাস করতে পারত এবং পরিযায়ী পাখিবা ফি-বছর উড়ে আসত।

আর শুধু পাখিই নয়, পাখিদের অভয়ারণ্য গড়ে উঠলে এখানে অন্তত পঁচিশটি প্রজাতির স্তন্যপায়ী ও বহু অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সাক্ষাৎ মিলত।

আজও যে-কয়েকটি হাতে গোনা জলাজমি কলকাতা ও তাব আশেপাশে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, তার অন্যতম চিড়িয়াখানার লেক এবং সাঁতরাগাছি ও ব্রেসব্রিজেব ঝিল। ছোট বড় কয়েকটি জলাভূমি এখনও বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে সল্ট লেক অঞ্চলে। এছাড়া বালি থেকে ডানকুনি যাবার পথে আছে রেললাইনের দু' পাশের জলাভূমি। জলাভূমি ছাড়া শাখাচর পাখির আজও দেখা পাওয়া যায়, বিশেষ কবে নরেন্দ্রপুর ও বারুইপুর অঞ্চলে।

পাখির দেখা পাওয়া যায় আমাদের অতি পবিচিত চিড়িয়াখানার লেকে। প্রায় একশো বছর কি তারও বেশি সময় ধরে হাজারে হাজারে হাঁস অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দিনগুলি এখানে কাটাতো। দিনের বেলা এই লেকে কাটিয়ে খাবার সংগ্রহের জন্য বন্য হাঁসেরা সাঁঝের বেলা উড়ে যেত আশেপাশের জলাভূমিতে ও ক্ষেতে। কিন্তু গত দশ বছর ধরে এই পাখিদের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। একটা জিনিস লক্ষণীয় যে, হালে নভেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ লেকে এসে এই হাঁসেবা হঠাৎ ডিসেম্বরের শেষ দিকে উধাও হয়ে যায়। ফিরে আসে জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারিতে। এর সঠিক কারণ এখনও অজ্ঞাত, তবে মনে হয়, চিড়িয়াখানার দর্শনার্থীর সংখ্যা যখন তুঙ্গে থাকে সেই সময়টুকু এই পাখিরা চিড়িয়াখানার লেককে এড়িয়ে যায়। অবশ্য এছাড়া অন্যান্য অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে, তার মধ্যে দুটি প্রধান কারণ হল চারপাশের ক্রম হ্রাসমান গাছপালা এবং বেড়ে ওঠা সুউচ্চ অট্টালিকার সারি।

চিড়িয়াখানার ঝিলে যেসব পাখিরা ফি-বছর উড়ে আসে তার প্রায় ৯৫ শতাংশ শরাল। এ ছাড়া কম সংখ্যায় আসে গিরিয়া হাঁস। দেখা মেলে পাতারি হাঁসেরও। আসে কিছু দিগহাঁস ও নাকটা। এই লেক আজ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন এলাকা ও সংলগ্ন রাজ্যগুলি থেকে উড়ে আসা শরালের এক আদর্শ শীতকালীন মিলনক্ষেত্র। শরাল ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা বলে গণ্য, কেননা এরা ভারতেরই বিভিন্ন প্রান্তে বংশবিস্তার করে। নাকটাও ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা। বিদেশি অতিথি গিরিয়া হাঁস ও দিগহাঁস হিমালয় পেরিয়ে উড়ে আসে সাইবেরিয়া ও কাস্পিয়ান উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে। পরিযায়ী হয়ে উড়ে আসে বালিহাঁসও। গত দশ বছরে খুবই কম সংখ্যক বড় শরাল দেখতে পাওয়া গেছে এই লেকে।

০·৪৮৪ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত ছোট্ট সাঁতরাগাছির জলাভূমি আজ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের শতবর্ষ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত পরিযায়ী পাখিদের পাখিরালয় নামে পরিচিত। আজও এই

জলাভূমি সাতবঙ্গা পাখিদের এক আদর্শ বিচরণক্ষেত্র। চিড়িয়াখানার লেকের মতই এখানকার পাখিরা হাঁস জাতীয় এবং বেশির ভাগই শরাল। আর দেখা যায় বালিহাঁস, কিছু নাকটা এবং কম হলেও বড় শরাল। সুদূর বিদেশ থেকে উড়ে আসা এখানকার পরিযায়ী পাখিরা বৈচিত্র্যময়। এই ঝিলকে শীতকালে কাকলিমুখর করে রাখে গিরিয়া হাঁস, দিগহাঁস, পীংহাঁস, বালিহাঁস ও খুন্তেহাঁসের দল। এখানে পাখি আসছে গত বছর দশেক ধরে। চিড়িয়াখানাব লেকে বিভিন্ন রকমের উৎপাৎ পাখিদের এই বিলে নিয়ে এসেছে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অবশ্য এক দল বিজ্ঞানীদের অনুমান, এটা একটা বড় কারণ হওয়া সম্ভব।

সল্ট লেকে আজও যে-কয়েকটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জলাভূমি রয়েছে, সেখানে প্রতি শীতে বিশেষ করে দেখতে পাওয়া যায় বালিহাঁস, পীংহাঁস, ছোট লালশির ভূতিহাঁস, বামুনিয়া হাঁস ও পাতারি হাঁস।

ব্রেসব্রিজ ঝিলের অবস্থান বজবজ লাইনের, ব্রেসব্রিজ স্টেশনের পশ্চিমে। স্টেশন থেকে ঝিল মিনিট পাঁচেক। জায়গাটি কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের। এখানে সাবা বছরই নানা জলচর পাখির সন্ধান পাওয়া যেত। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত গৃহীত এক সমীক্ষা অনুসারে, এই জলাভূমিতে স্থায়ী ও পরিযায়ী সমেত ৮০টি প্রজাতিরও বেশি পাখির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। দুঃখের বিষয়, এই সুন্দর জলাভূমিটি ক্রমশই বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে।

এছাড়া বালি থেকে ডানকুনি যাওয়ার পথে বেললাইনের দু'ধারের জলাভূমি শীতকালে পাখিদের বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। এখানেও প্রায় ৮০টি প্রজাতির বিভিন্ন রঙ-বেরঙের পাখির হদিশ পেয়েছেন পক্ষিবিদেরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শিয়ালদা-রানাঘাট লাইনে কাঁচরাপাড়ার মথুরা বিল। এখানেও শীতকালে বহু সংখ্যক হাঁস জাতীয় পাখি প্রতি বছর উড়ে আসে।

শাখাচর পাখি প্রসঙ্গে প্রথমেই রাজপুরের সুরেন কয়ালদের বাগানের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। প্রায় ৯ হেক্টর বিস্তৃত এই জায়গা মূলত মানুষের তৈরি ফলের বাগান। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ডোবা, পুকুর, খানিকটা চাষের জমি। সব মিলিয়ে এলাকাটি আদর্শ পক্ষি-আবাস, যেখানে বহুকাল ধরে অবাধে বাস করত একশোরও বেশি প্রজাতির বর্ণময় পাখি। সত্তরের দশকে গাছপালা কাটা শুরু হলে বিভিন্ন মহল থেকে জায়গাটি অভয়ারণ্য ঘোষণা করার জন্যে চেষ্টা হয়। জ্যুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ড (ইণ্ডিয়া) ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এ-বিষয়ে উদ্যোগী হন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে অঞ্চলটি নরেন্দ্রপুর অভয়ারণ্য হিসাবে পরিচিত হয়। নরেন্দ্রপুর অভয়ারণ্য নামে চিহ্নিত হলেও শহর কলকাতার নিকটে এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ অবহেলিত।

বারুইপুরের কাছে শাসন রোড অঞ্চলের চৌধুরিদের ফলের বাগানও ছিল পাখিদের এক আদর্শ বিচরণক্ষেত্র। কিন্তু আজ সেখানে চলছে প্রকৃতির নিধনযজ্ঞ। পক্ষিবিদেরা এই অঞ্চলে ৬০টিরও বেশি প্রজাতির পাখির সন্ধান পেয়েছিলেন।

আর যে-কটি উল্লেখযোগ্য জায়গায় পাখি দেখা যায় তা হল শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন, মানকুণ্ড স্টেশনের কাছে ফলের বাগান, ব্যারাকপুর-বারাসাত রোডে অবস্থিত নীলগঞ্জের কাছে বরতুর বিল, রাজারহাটের ফলের বাগান ও ভেড়ি, কাঁচরাপাড়ার ফুলিয়া বিল, বোড়ালের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন পুকুর ও তার চারপাশের গাছপালা, শিয়ালদা-লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে ধবধবির ফলের বাগান, সোনারপুর ও সুভাষগ্রামের ফলের

বাগান ও সাঁকরাইলের চর।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সি এম ডি এ কলকাতা এলাকায় মাত্র দুটি জলাভূমিতে কয়েক হাজার পাখি এখনও আসছে প্রতি শীতে। বাকি ছোটখাটো জলাভূমিতে আসা হাঁসেব সংখ্যা তেমন বেশি নয়। চিড়িয়াখানার লেক ও সাঁতরাগাছির ঝিলে আবার যেসব পাখি ফি-বছর আসে তার সিংহভাগই শরাল, যা ভাবতের স্থায়ী বাসিন্দা। কলকাতা ও তার আশপাশে এমন কোনো জলাশয় আজ আর নেই যেখানে সুদূর বিদেশ থেকে হিমালয় পার হয়ে আসা পরিযায়ী পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসে। বিষয়টি নিশ্চয়ই আশঙ্কাজনক।

আজকেব সব থেকে বড প্রয়োজন, কম সংখ্যায় হলেও এখনও যে-কটি জলাভূমিতে পাখি আসে, সেগুলির সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত রক্ষণাবেক্ষণ করা ও জলাভূমিগুলির আশপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ অপরিবর্তিত রাখা। এতে আগামী দিনে পাখির সংখ্যা বাড়বে বলে মনে করেন পক্ষিবিদেরা।

এই মর্মে শান্তিনিকেতনের বল্লভপুর মৃগদাবরের ভিতরে অবস্থিত ঝিলটির উদাহরণ দেওয়া অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সঠিক সংবক্ষণের ফলে আজ সেখানে প্রতি শীতে ২০ হাজারেরও বেশি পরিযায়ী পাখি আসে। ঝিলে আসা পাখিদের বেশির ভাগই দিগ্‌হাঁস হলেও কয়েক বছর ধবে সেখানে বিদেশি অতিথি রাজহাঁস দেখা যাচ্ছে। এই অতিথি পাখি এক সময়ে সল্ট লেকের জলাভূমি কাকলিমুখর করে রাখত।

পক্ষিবিদেরা মনে করেন চিড়িয়াখানার লেকের চারপাশে অবিলম্বে এমন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যাতে শীতকালে উপচে-পড়া উৎসুক মানুষের ভিড় পাখিদের বিরক্ত করতে না পারে।

কলকাতার পাখি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পাখি দেখা এবং চেনার গোড়ার কথাগুলিও মনে রাখা প্রাসঙ্গিক।

পাখি দেখার দুটি স্তর আছে: পাখি চেনা এবং পাখিদের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানা।

প্রাথমিকভাবে পাখি দেখার তেমন কোনো আডম্বর বা খরচ নেই। প্রয়োজন 'খোলা চোখ, কান, মাথা—হাতে পেনসিল আর খাতা', তবে যথাযথ এগোনোর জন্যে একটি ফিল্ড গাইডের সাহায্যে 'হোম ওয়ার্ক' করে নেওয়া আবশ্যক। এতে বিভিন্ন অঞ্চলের পাখি এবং তাদের আচার আচবণ সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। তবে দেখামাত্রই যে কোনো পাখি চিনতে বহুদিনের একনিষ্ঠ অধ্যবসায় প্রয়োজন। পরের দিকে যখন পাখি দেখা নেশায় পেয়ে বসবে তখন একটি দূরবিন ও কিছু পাখির বই কেনা অত্যন্ত জরুরি।

একটি অপরিচিত পাখি দেখলে প্রথমেই লক্ষ্য করতে হবে তার ঠোঁট, পা, ডাক, শারীরিক বিবরণ ও ওড়ার ধরন। পাখিটি কী কবছে হেঁটে বেড়াচ্ছে না লাফিয়ে চলছে, কেমন করে খাবার খুঁজছে এবং তা খাচ্ছে, ল্যাজ নাচাচ্ছে কিনা এ সবও দেখা দরকার। এগুলি লক্ষ্য করার সঙ্গে পাখিটির বিভিন্ন পরিবেশে ও সময়ে বসে থাকা ও উড়ন্ত অবস্থায় শরীরের প্রধান বঙগুলিব সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। কারণ একটি পাখিকে রোদের আলোয় খোলামেলা পরিবেশে যেমন লাগবে, সন্ধ্যাবেলায় পড়ন্ত কিংবা আবছা আলোয় বা ঘন পাতার ফাঁকে অনাবকম লাগাও অসম্ভব নয়। ফলে চেনা পাখিকেও অচেনা মনে হওয়া স্বাভাবিক। এছাড়া পাখিটির ওড়ার ধরনের সঙ্গেও পরিচয় দরকার, কারণ প্রত্যেক পাখিরই একটি বিশেষ ওড়ার ধরন আছে। মনে রাখতে হবে, পাখিরা এক একটি বিশেষ পরিবেশ পছন্দ করে। পাখিটির সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবেশও চিনে নেওয়া প্রয়োজন।

আর একটি কথা, নতুন পাখিটির শারীরিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সময়ে চেনা কোনো

পাখির সঙ্গে তুলনা করলে ভাল হয়। যেমন, পাখিটি শালিকের চেয়ে বড় বা কাকের থেকে ছোট। সম্ভব হলে নতুন পাখিটির একটি স্কেচ এঁকে রাখা উচিত। এছাড়াও নজর রাখতে হবে, পাখিটি কোনো বিশেষ ঋতুতে আসে না সারা বছরই তাকে দেখা যায়। এই বিষয়ে সঠিক তথ্য জানতে পারলেই বোঝা যাবে, পাখিটি এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা না পরিযায়ী। পাখি দেখার সব থেকে ভাল সময় খুব সকালে আর শেষ বিকেলে। বলা বাহুল্য, শীতকালে পাখির বৈচিত্র্য এবং সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

এককালে কলকাতা ছিল বিভিন্ন প্রজাতির পাখির আবাসস্থল। কিন্তু আজ অনেক পাখিই হারিয়ে যাচ্ছে। বিশিষ্ট পক্ষিবিদ্‌দের মতে কলকাতা ও তার আশপাশের আকাশ থেকে ৬০টিরও বেশি প্রজাতির পাখি বর্তমানে নিশ্চিহ্ন। এদের মধ্যে অন্যতম রাক্ষুসে কাঁক, বড় হাড়গিলে, রেড ব্রেস্টেড ম্যাবগানসাব, রাজহাঁস, কালো ঈগল, কিয়াঃ, সাকনাল, বাদিহাঁস। এই হারিয়ে যাওয়া পাখিগুলি উল্লেখযোগ্য হলেও, তালিকায় আরও বহু পাখি আছে।

হারিয়ে যাওয়া পাখিদের মধ্যে সাকনাল ও হার্ডাগিলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু কলকাতার আকাশ থেকেই নয়, প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার লম্বা গোলাপি মাথা-গলা আর বাদামি শরীরের সুন্দর সাকনাল সারা পৃথিবী থেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সালিম আলির মতে, এদের শেষ দেখা গিয়েছিল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে বিহারের দারভাঙ্গা জেলায়।

এক সময়ে কলকাতাব 'ঝাড়ুদার' নামে পরিচিত এবং কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম প্রতীক বড় হাড়গিলে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে কলকাতায় শেষ দেখা গিয়েছিল। বিশাল চেহারার কিম্ভূত এই পাখি কোনো কোনো অঞ্চলে গড়ুর বা ঢেঙ্ক নামে পরিচিত। মাথায় প্রায় দেড় মিটার, এই পাখির নেড়া বাদামি-হলদে মাথা ও গলা। মস্ত চৌকো ঠোঁট। গলার গোলাপি ঝোলা প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা। পুরনো কলকাতার গঙ্গার ঘাট ও অন্যান্য জায়গা ছাড়াও বড় বড় বাড়িব ছাদে দলে দলে বসে থাকতো হাড়গিলে। নোংরা আবর্জনা খেয়ে শহর পরিষ্কার রাখাই ছিল এদের কাজ।

বাদিহাঁস পরিযায়ী হয়ে প্রতি বছর এ-শহব ও তাব আশপাশেব ঝিলে উড়ে আসত। দেহের রঙ ধূসর, বাদামি আর সাদায় মেশানো। সাদা মাথা আর গলা। হলুদ ঠোঁট ও মাথার পিছনে দুটি গাঢ় কালো রেখা। এই অতিথি হাঁসের ঝাঁক তাদের প্যাঁক প্যাঁক ডাকে ঝিল ছাড়া আশপাশেব ক্ষেত-খামারও মুখরিত করে রাখত। এদেব আহারের সময় সন্ধেবেলা আর রাত। জলাজমি বুজিয়ে ফেলা আব ক্রমাগত শিকাবের ফলে এই হাঁসেদেব আব এই শহরে ও তার আশপাশে দেখা যায় না।

দেখা যায় না রাজহাঁসও। দেখতে দেশি রাজহাঁসদের মত হলেও ঠোঁটের বঙ গোলাপি আর দেহের পিছনটা ধূসর। শীতের অতিথি এই হাঁসও একসময়ে মুখর করে রাখত এই শহর ও তার চারপাশের জলাভূমি। অতিমাত্রায় শিকার ও জলাজমির বিনাশ এই হাঁসদেরও আমাদের এই শহর থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

আজ কলকাতায় আসা পাখিব সংখ্যা অনেক কমে গেছে। বিজ্ঞান-উন্নত সভ্যতার সম্ভবত এ এক অভিশাপ। তবু কলকাতার পরিবেশে বিচিত্র প্রজাতির পাখি এখনও আমাদের আকর্ষণ করে।

কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের পাখির তালিকা

উনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত যেসব পাখি কলকাতা ও তার আশেপাশের আকাশে দেখা গেছে, তাদের একটি তালিকা সংকলন করেছেন ডঃ বিশ্বময় বিশ্বাস। এই তালিকার পাখিদের একটা বড় অংশ আজ আর দেখা যায় না। সংকলিত তালিকাটি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

তালিকায় ব্যবহৃত সংকেত চিহ্ন :

★ স্থায়ী বাসিন্দা

?★ স্থায়ী বাসিন্দা কিনা সঠিক জানা যায়নি

★★ ভবঘুরে বা হঠাৎ এসে-পড়া পাখি

তালিকার শেষে ১১টি সম্ভাব্য পাখির নাম দেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য পাখিদের কলকাতার পাখির তালিকায় রাখা যায় কিনা তা নিয়ে সংশয় এখনও আছে। পক্ষিবিদ্‌দের অনুমান, এই তালিকার বেশির ভাগ পাখি অন্য কোথাও থেকে আনা খাঁচার পাখি, যারা কোনোভাবে মুক্ত হয়ে পরে কলকাতা ও তার আশেপাশে দেখা গেছে বা ধরা পড়েছে।

তালিকার পাখিদের বৈজ্ঞানিক, ইংরাজি ও আঞ্চলিক নাম দেওয়া হল। কয়েকটি পাখির আঞ্চলিক নাম না থাকায় দেওয়া যায়নি। যেসব পাখির একাধিক আঞ্চলিক নাম রয়েছে তার সবকটিই এখানে উল্লেখ করা হল।

বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরাজি নাম	আঞ্চলিক নাম
Grebes:		
★ *Podiceps ruficollis*	Little grebe	পানডুবি/ ডুবুরি/ ডুবডুবি
Pelicans:		
Pelecanus philippensis	Grey/ spottedbilled pelican	গগনবেড়
Cormorants & Darter:		
?★ *Phalacrocorax carbo*	Large cormorant	বড় পানকৌড়ি
★ *Phalacrocorax niger*	Little cormorant	ছোট পানকৌড়ি
★ *Phalacrocorax fuscicollis*	Indian shag	পানকৌড়ি/ মাঝারি পানকৌড়ি
★ *Anhinga rufa*	Darter/ snakebird	গয়াব
Herons, Egrets, Bitterns:		
★ ★ *Ardea goliath*	Giant heron	রাক্ষুসে কাঁক
★ *Ardea cinerea*	Grey heron	সাদাকাঁক/ কাঁক/ অঞ্জন
★ *Ardea purpurea*	Purple heron	লালকাঁক
★ *Ardea alba*	Large egret	ঢলবক/ বড়বক/ ধারবক

★ *Ardeola striatus*	Little green heron	কানাবক/ কুঁড়োবক
★ *Ardeola grayii*	Pond heron	কোঁচবক
★ *Bubulcus ibis*	Cattle egret	গোবক/ গাইবক
★ *Egretta intermedia*	Smaller egret	কোরচে বক
★ *Egretta garzetta*	Little egret	ছোট কোরচে বক
★ *Nycticorax nycticorax*	Night heron	ওয়াক/ ওয়াক বক/ বাচকা
★ *Ixobrychus cinnamomeus*	Chestnut bittern	খয়েরী বক
★ *Ixobrychus sinensis*	Yellow bittern	কাঠবক
★ *Ixobrychus flavicollis*	Black bittern	কালোবক
Botaurus stellaris	Bittern	—
Storks:		
?★ *Mycteria leucocephala*	Painted stork	সোনাজঙ্ঘা/ ডাঙিঘল/ রাম ঝঙ্কার/ রামঙ্ঘা
★ *Anastomus oscitans*	Openbill stork	শামুকখোল/ শামুকভাঙ্গা
?★ *Ciconia episcopus*	Whitenecked stork	মানিকজোড়
Ciconia ciconia	White stork	--
Ephippiorhynchus asiaticus	Blacknecked stork	লোহাজঙ্ঘা/ লোহারজঙ্গ
★ *Leptoptilos dubius*	Adjutant stork	হাড়গিলে
★ Leptoptilos javanicus	Lesser adjutant	মদনটাক/ মদনচূড়
Ibis, Spoonbill:		
? ★ *Threskiornis aethiopica*	White ibis	কাস্তেচরা/ সাদা দোচরা
? ★ *Plegadis falcinellus*	Glossy ibis	কাচিয়া তোরা
Platalea leucorodia	Spoonbill	খুন্তেবক/ চিন্তা
Ducks, Geese, Swans:		
Anser anser	Greylag goose	রাজহাঁস
Anser indicus	Barheaded goose	বাদিহাঁস
★ *Dendrocygna javanica*	Lesser whistling teal	শরাল/ ছোট শরাল

★ *Dendrocygna bicolor*	Large whistling teal	বড় শরাল
Tadorna ferruginea	Brahminy duck	চকা-চকি
Tadorna tadorna	Sheld duck	শা-চকা
Anas acuta	Pintail	দিগ্‌হাঁস/ বড় দিগর/ শালঞ্চ
Anas crecca	Common teal	পাতারি হাঁস/ বিগড়ি হাঁস/ তুলসী বিগড়ি
★ *Anas poecilorhyncha*	Spotbill duck	মুঘিহাঁস
Anas platyrhynchos	Mallard	নীলশির
Anas strepera	Gadwall	পীংহাঁস
Anas penelope	Wigeon	ছোট লালশির
Anas querquedula	Garganey	গিরিয়া হাঁস
Anas clypeata	Shoveller	খুন্তেহাঁস/ পাণ্ডা
Rhodonessa caryophyllacea	Pinkheaded duck	সাকনাল
Netta rufina	Redcrested pochard	বড় রাঙামুড়ী/ হেড়ো হাঁস/ ছোবড়া হাঁস
Aythya ferina	Common pochard	লালমুড়ি
Aythya nyroca	White-eyed pochard	ভূতিহাঁস/ লাল বিগড়ি
Aythya baeri	Baer's pochard	বড় ভূতি হাঁস
Aythya fuligula	Tufted duck/ Pochard	বামুনিয়া হাঁস
★ *Nettapus coromandelianus*	Cotton teal	বালিহাঁস
★ *Sarkidiornis melanotos*	Nukta/Comb duck	নাকটা/নাকিহাঁস
Mergus serrator	Redbreasted merganser	—
Hawks, Vultures e.t.c:		
★ *Elanus caeruleus*	Blackwinged kite	কাপাসি
? ★ *Aviceda leuphotes*	Blackcrested baza	—
★ *Pernis ptilorhynchus*	Honey buzzard	মধুচিল
★ *Milvus migrans*	Pariah kite	চিল
★ *Haliastur indus*	Brahminy kite	শঙ্খচিল
★ *Accipiter badius*	Shikra	শিকরে
Accipiter nisus	Asiatic	বাজপাখি

	sparrow-hawk	
★ *Spizaetus cirrhatus*	Crested hawk-eagle	শা-বাজ/ সদল
Hieraaetus pennatus	Booted hawk-eagle	—
★ *Aquila clanga*	Greater spotted eagle	বড় তিলে/ঈগল
? ★ *Aquila pomarina*	Lesser spotted eagle	গুটিমার
? ★ *Ictinaetus malayensis*	Black eagle	কালো ঈগল
Haliaeetus leucogaster	Whitebellied sea-eagle	সাপমার
★ *Haliaeetus leucoryphus*	Pallas's fishing-eagle	কোড়াল/ মাচাল
★ *Icthyophaga ichthyaetus*	Greyheaded fishing-eagle	মাছমারোল
Targos calvus	Black/Pondicherry vulture	রাজ শকুন/ কাল শকুন
Gyps fulvus	Griffon vulture	—
★ *Gyps indicus*	Longbilled vulture	শকুন
★ *Gyps benghalensis*	Indian whitebacked vulture	শকুন
? ★ *Neophron percnopterus*	Indian scavenger vulture	শ্বেত শকুন
Circus cyaneus	Hen harrier	মাঠচিল
Circus macrourus	Pale harrier	মাঠচিল/ ধূসর চিল
Circus pygargus	Montagu's harrier	—
Circus melanoleucos	Pied harrier	গিরগিটি-মার/ গিরগিটমার
Circus aeruginoeus	Marsh harrier	ছোঁয়াচিল/ পানচিল
★ *Circaetus gallicus*	Short-toed eagle	সাপমারিল
★ *Spilornis cheela*	Crested serpent eagle	তিলেবাজ/ সাপমার চিল
Pandion haliaetus	Osprey	উৎক্রোশ
Falcons:		
★ *Falco jugger*	Lagger falcon	বাহারী
Falco peregrinus	Peregrine falcon	—
Falco subbuteo	Central asian hobby	—
Falco severus	Oriental hobby	—
Falco chiquera	Redheaded merlin	তুরমতি
Falco vespertinus	Redlegged falcon	—

Falco naumanni	Lesser kestrel	—
Falco tinnunculus	Kestrel	পোকামার
Pheasants, Partridges, Quails etc.		
★ *Francolinus gularis*	Swamp partridge	কিয়াঃ
Coturnix coturnix	Common quail	বটের
? ★ *Coturnix coromandelica*	Rain quail	চিনা বটের
★ *Coturnix chinensis*	Bluebreasted quail	গুররু
Bustard-quails:		
? ★ *Turnix sylvatica*	Little bustard-quail	ছোট বটের
★ *Turnix suscitator*	Common bustard-quail	গুলু
★ *Turnix tanki*	Button quail	লাওয়া/বটের
Cranes:		
Grus grus	Common crane	কুরুঞ্চ
Rails, Coots:		
Rallus aquaticus	Water rail	অম্বুকুক্কুট
★ *Rallus striatus*	Banded rail	—
★ *Rallina eurizonoides*	Banded crake	—
Porzana pusilla	Baillon's crake	খৈবী/ঝিল্লি
Porzana porzana	Spotted crake	গুড়গুড়ি/খৈরী
★ *Porzana fuscus*	Ruddy crake	লালখৈরী
★ *Amaurornis akool*	Brown crake	—
★ *Amaurornis phoenicurus*	Whitebreasted waterhen	ডাহুক/ডাক/ পানপায়রা
★ *Gallicrex cinerea*	Water cock/ Kora	কোরা
★ *Gallinula chloropus*	Moorhen	জলমুরগি
★ *Porphyrio porphyrio*	Purple moorhen	কায়েম/ কামপাখি
★ *Fulica atra*	Coot	ডউখোল/ জলকুক্কুট/ কারগুাব
Jacanas:		
★ *Hydrophasianus chirurgus*	Pheasant-tailed jacana	জলময়ূর/ হোঙ্গা

★ *Metopidius indicus*	Brown winged jacana	জলপিপি
Painted snipe:		
★ *Rostratula benghalensis*	Painted snipe	রাজচাহা/ বাগ্গাজী
Stilts, Avocets:		
★ *Himantopus himantopus*	Blackwinged stilt	লালঠ্যাঙ্গী/ সাহেব বাটান
Recurvirostra avosetta	Avocet	—
Stone curlews, Thick-knees:		
? ★ *Esacus magnirostris*	Great stone plover	বড় শিলবাটান
Coursers, Pratincoles:		
★ *Glareola pratincola*	Collared/ Large indian pratincole	বড় বাবুই-বাটান
Plovers, Sandpipers. Snipe:		
Vanellus cinereus	Greyheaded lapwing	—
★ *Vanellus indicus*	Redwattled lapwing	হটটিট/ টিট্টিভ/ টিটিপাখি
★ *Vanellus spinosus*	Spurwinged lapwing/ plover	হট্টিটি
★ *Vanellus malabaricus*	Yellow-wattled lapwing	—
Pluvialis squatarola	Grey plover	বড় বাটান
Pluvialis dominica	Eastern golden plover	সোনা বাটান/ মিটুয়া
Charadrius leschenaulti	Large sand plover	—
★ Charadrius dubius	Little ringed plover	জিরিয়া
Charadrius alexandrinus	Kentish plover	—
Charadrius mongolus	Lesser sand plover	—
Numenius arquata orientalis	Eastern curlew	কাষ্টচূড়া/ বড় গুলিন্দা
Limosa limosa	Blacktailed godwit	জৌরালি
Tringa erythropus	Spotted or Dusky redshank	—
Tringa stagnatilis	Marsh sandpiper	বিলের বালুবাটান/ছোট গোত্রা

Tringa nebularia	Greenshank	গোত্রা
Tringa ochropus	Green sandpiper	সবুজ বালুবাটান
Tringa glareola	Spotted or Wood sandpiper	তিলে বালুবাটান/ বালুবাটান
Tringa terek	Terek sandpiper	—
Tringa hypoleucos	Common sandpiper	ছোট/সাধারণ বালুবাটান
Arenaria interpres	Turnstone	—
Limnodromus semipalmatus	Snipebilled godwit	—
Gallinago nemoricola	Woodsnipe	বনচাহা
Gallinago stenura	Pintail snipe	সূচপুচ্ছ কাদাখোঁচা
Gallinago megala	Swinhoe's snipe	চ্যাগা
Gallinago gallinago	Fantail snipe	কাদাখোঁচা
Gallinago minima	Jack snipe	ছোট চাহা
Scolopax rusticola	Woodcock	বনচাহা
Calidris tenuirostris	Eastern knot	—
Calidris ruficollis	Eastern little stint	—
Calidris minuta	Little stint	—
Calidris temminckii	Temminck's stint	—
Calidris subminuta	Longtoed stint	—
Calidris alpina	Dunlin	—
Calidris testacea	Curlew-sandpiper	—
Limicola falcinellus	Broadbilled sandpiper	—
Philomachus pugnax	Ruff and reeve	গেওয়ালা
Gulls, Terns:		
Larus ichthyactus	Great blackheaded gull	—
Larus brunnicephalus	Brownheaded gull	ধূসরমাথা গাংচিল
Larus ridibundus	Blackheaded gull	কালোমাথা গাংচিল
Chlidonias hybrida	Whiskered tern	টেকচিল
Chlidonias leucopterus	Whitewinged black tern	কালো টেকচিল
★ *Gelochelidon nilotica*	Gullbilled tern	—
Hydroprogne caspia	Caspian tern	—
★ *Sterna aurantia*	Indian river tern	গাংচিল/পানপায়রা

★ *Sterna acuticauda*	Blackbellied tern	—
Anous tenuirostris	Whitecapped noddy	—
Rynchops albicollis	Skimmer	গাংচষা
Pigeons, Doves:		
★ *Treron pompadora*	Ashyheaded green pigeon	ছোট হরিয়াল
★ *Treron bicincta*	Orangebreasted green pigeon	—
★ *Treron phoenicopterus*	Bengal green pigeon	হরিয়াল
★ *Ducula aenea*	Green imperial pigeon	ধূলকল
★ *Columba livia*	Blue rock pigeon	গোলাপায়রা
Streptopelia orientalis	Rufous turtle dove	রামঘুঘু
Streptopelia decaocto	Ring dove	কণ্ঠীঘুঘু/ পাঁড়ঘুঘু
Streptopelia tranquebarica	Turtle dove	লালঘুঘু/ গোলাপী ঘুঘু
★ *Streptopelia chinensis*	Spotted dove	তিলেঘুঘু
★ *Streptopelia senegalensis*	Little brown dove	ছোটঘুঘু
Chalcophaps Indica	Emerald dove	রাজঘুঘু
Parrots:		
★ *Psittacula eupatria*	Large indian parakeet	চন্দনা
★ *Psitlacula krameri*	Roseringed parakeet	টিয়া/ তোতা
★ *Psittacula cyanocephala*	Blossomheaded parakeet	টুই/ফুলটুসি
Cuckoos:		
Clamator coromandus	Redwinged crested cuckoo	—
★ *Clamator jacobinus*	Pied crested cuckoo	চাতক/ শা-বুলবুল
★ *Cuculus varius*	Common hawk-cuckoo	পাপিয়া/ চোখগেলো/ পিউকাঁহা
★ *Cuculus micropterus*	Indian cuckoo	বউ-কথা-কও

Cuculus canorus	Cuckoo	—
Cuculus sonneratii	Indian banded bay cuckoo	—
★ *Cuculus passerinus*	Indian plaintive cuckoo	—
Cuculus merulinus	Rufousbellied plaintive cuckoo	বিলাপী পিক
★ *Eudynamys scolopacea*	Indian koel	কোকিল
Rhopodytes tristis	Large greenbilled malkoha	—
★ *Centropus sinensis*	Crow pheasant/ Coucal	কুবো/ কুকো
★ *Centropus toulou*	*Lesser coucal*	ছোট কুবো
Owls:		
★ *Tyto alba*	Barn owl	লক্ষ্মীপেঁচা
★ *Otus scops*	Scops owl	—
★ *Otus bakkamoena*	Collared scops owl	ক্ষুদেপেঁচা
★ *Bubo bubo*	Great horned owl/ Eagle owl	হুতোম পেঁচা
? ★ *Bubo coromandus*	Dusky horned owl	—
★ *Bubo zeylonensis*	Brown fish owl	ভুতুম পেঁচা
★ *Glancidium radiatum*	Jungle owlet	—
★ *Ninox scutulata*	Indian brown hawk-owl	কালপেঁচা
★ *Athene brama*	Spotted owlet	কুটুরে পেঁচা
★ *Strix ocellata*	Mottled wood owl	—
★ *Asio flammeus*	Shorteared owl	—
Nightjars, Goatsuckers:		
★ *Caprimulgus indicus*	Indian jungle nightjar	—
★ *Caprimulgus macrurus*	Indian longtailed nightjar	বড় ঠুকঠুকিয়া
★ *Caprimulgus asiaticus*	Indian nightjar	সাধারণ ঠুকঠুকিয়া
? ★ *Caprimulgus affinis*	Franklin's nightjar	—

Swifts:		
Chaetura sylvatica	Whiterumped spinetail swift	—
Apus pacificus	Large whiterumped swift	—
★ *Apus affinis*	House swift	বাতাসী
★ *Cypsiurus parvus*	Palm swift	তালচৌচ/ তালচড়াই
Kingfishers:		
★ *Ceryle rudis*	Lesser pied kingfisher	ফটকা মাছরাঙ্গা/ করিকাটা
★ *Alcedo atthis*	Common kingfisher	ছোট মাছরাঙ্গা
★ *Pelargopsis amauroptera*	Brownwinged kingfisher	ঢোঁসা
★ *Pelargopsis capensis*	Storkbilled kingfisher	গুড়িয়াল
★ *Halcyon smyrnensis*	Whitebreasted kingfisher	সাদাবুক মাছরাঙ্গা
★ *Halcyon pileata*	Blackcapped kingfisher	কালোমাথা মাছরাঙ্গা
★ *Halcyon chloris*	Whitecollared kingfisher	কণ্ঠী মাছরাঙ্গা
Bee-eaters:		
? ★ *Merops philippinus*	Bluetailed bee-eater	বড় বাঁশপাতি
★ *Merops orientalis*	Common/Green bee-eater	বাঁশপাতি
Rollers:		
★ *Coracias benghalensis*	Indian roller/ Blue jay	নীলকণ্ঠ
Hoopoes:		
Upupa epops	Hoopoe	মোহনচূড়া/ হুদহুদ
Barbets:		
★ *Megalaima zeylanica*	Green barbet	বড় বসন্ত
★ *Megalaima asiatica*	Bluethroated barbet	নীলগলা বসন্তবৌরি
★ *Megalaima haemacephala*	Coppersmith	ভগীরথ/ ছোট বসন্তবৌরি

Woodpeckers:		
Jynx torquilla	Wryneck	বঙ্কিমগ্রীব
★ *Micropternus brachyurus*	Rufous woodpecker	বাদামী কাঠঠোকরা
★ *Picus myrmecophoneus*	Little scalybellied green woodpecker	ছোট সবুজ কাঠঠোকরা
★ *Picus chlorolophus*	Small yellownaped woodpecker	—
★ *Dinopium benghalense*	Lesser goldenbacked woodpecker	ছোট সোনালী কাঠঠোকরা
★ *Picoides macei*	Fulvousbreasted pied woodpecker	—
★ *Picoides mahrattensis*	Yellowfronted pied woodpecker	—
★ *Picoides nanus*	Browncrowned pygmy woodpecker	ক্ষুদে কাঠঠোকরা
★ *Chrysocolaptes lucidus*	Large goldenbacked woodpecker	বড় সোনালী কাঠঠোকরা
Larks:		
★ *Mirafra javanica*	Singing bush lark	—
★ *Mirafra assamica*	Bengal bush lark	ভিরিরি/ মাঠচড়াই
Mirafra erythroptera	Redwinged busk lark	আগ্‌গিন
★ *Eremopteryx grisea*	Ashycrowned finch lark	ধুলোচড়াই
?★ *Ammomanes phoenicurus*	Rufoustailed finch-lark	লালভরত
★ *Alauda gulgula*	Eastern skylark	ভরত/ ঝুঁটি ভরত
Swallows:		
Riparia riparia	Collared sand martin	—
★ *Riparia paludicola*	Plain sand martin	নাকুটি
Hirundo rustica rustica	Common swallow	আবাবিল
Hirundo rustica gutturalis	Eastern swallow	—
Hirundo rustica tytleri	Tytler's swallow	—
? ★ *Hirundo smithii*	Wiretailed swallow	—
Hirundo daurica	Striated swallow	—

Shrikes:		
★ *Lanius vittatus*	Indian baybacked shrike	পচানাক/ খয়েরী ক্যারকাটা/ ছোট কিলেতোরা
Lanius tephronotus	Greybacked shrike	—
? ★ *Lanius schach tricolor*	Blackheaded shrike	মেটে লটোরা/ কাজলা লটোরা
Lanius cristatus	Brown shrike	কাজল পাখি/ ক্যারকাটা
Orioles:		
? ★ *Oriolus oriolus*	Golden oriole	সোনা বউ
★ ★ *Oriolus chinensis tenuirostris*	Slenderbilled blacknaped oriole	—
★ *Oriolus xanthornus*	Blackheaded oriole	বেনেবউ/ খোকা হোক
Drongos:		
★ *Dicrurus adsimilis*	Black drongo	ফিঙ্গে
Dicrurus leucophaeus	Indian grey drongo	নীল ফিঙ্গে
Dicrurus caerulescens	Whitebellied drongo	ধৌলি
★ *Dicrurus aeneus*	Bronzed drongo	ছোট ভুজঙ্গ
★ *Dicrurus hottentottus*	Haircrested drongo	কেশরাজ
? ★ *Dicrurus paradiseus*	Largo racket-tailed drongo	ভীমরাজ/ ভৃঙ্গরাজ
Swallow-shrikes or Wood-swallows:		
★ *Artamus fuscus*	Ashy swallow-shrike	তালচড়াই/ তালচটক
Starlings, Mynas:		
Sturnus malabaricus	Greyheaded myna	দেশি পাওয়ে
★ *Sturnus pagodarum*	Blackheaded or Brahminy myna	হরবোলা/ বামুনী শালিক
Sturnus roseus	Rosy pastor	লাল ময়না
Sturnus vulgaris	Starling	তিলে ময়না
★ *Sturnus contra*	Pied myna	গোশালিক/ গুয়ে শালিক
★ *Acridotheres tristis*	Common myna	শালিক
★ *Acridotheres ginginianus*	Bank myna	গাংশালিক

★ *Acridotheres fuscus*	Jungle myna	ঝুঁটশালিক
Crows, Magpies, Jays e.t.c:		
★ *Dendrocitta vagabunda*	Tree pie	হাঁড়িচাঁচা/ লেজঝোলা/ টাকাচোর/ কোটরি
★ *Corvus splendens*	House crow	পাতিকাক
★ *Corvus macrorhychos*	Jungle grow	দাঁড়কাক
Cuckoo-shrikes, Minivets:		
★ *Hemipus picatus*	Pied flycatcher-shrike	—
★ *Tephrodornis pondicerianus*	Indian wood shrike	দূককা
★ *Coracina novaehollandiae*	Large cuckoo-shrike	ধূসর কাবাসী
Coracina melaschistos	Dark grey cuckoo-shrike	কাবাসী
★ *Coracina melonoptera*	Blackheaded cuckoo-shrike	ছোট কাবাসী/ কালোমাথা কাবাসী
Pericrocotus flammeus	Scarlet minivet	সাতসয়ালী/ সয়ালী
Pericrocotus roseus	Rosy minivet	—
★ *Pericrocotus cinnamomeus*	Small minivet	ছোট সাতসয়ালী
Fairy blue bird, Ioras, Leaf birds:		
★ *Aegithina tiphia*	Iora	ফটিক-জল
★ *Chloropsis aurifrons*	Goldfronted chloropsis	হারেওয়া
Bulbuls:		
★ *Pycnonotus jocosus*	Redwhiskered bulbul	চিনে বুলবুল/ সিপাহী বুলবু
★ *Pycnonotus cafer*	Redvented bulbul	বুলবুলি/ কালো বুলবুল
Bablers, Flycatchers, Warblers, Thrushes, Chats:		
★ *Timalia pileata*	Redcapped babbler	
★ *Turdoides earlei*	Striated babbler	ডোরা ছাতারে
★ *Turdoides striatus*	Jungle babbler	ছাতারে/ সাতভাই
Muscicapa parva	Redbreasted flycatcher	চুটকি

Muscicapa rubeculoides	Bluethroated flycatcher	
★ *Muscicapa tickelliae*	Tickell's blue flycatcher	—
Muscicapa thalassina	Verditer flycatcher	নীল কটকটিয়া
Culicicapa ceylonensis	Greyheaded flycatcher	জর্দ-ফুটকি
★ *Rhipidura albicollis*	Whitethroated fantail flycatcher	চাক দোয়েল/ চাকদিল
★ *Terpsiphone paradisi*	Paradise flycatcher	ফিতে বুলবুল
? ★ *Hypothymis azurea*	Blacknaped flycatcher	কালোমাথা কটকটিয়া
★ *Pachycephala grisola*	Grey thickhead/ Mangrove whistler	—
Bradypterus thoracicus	Spotted bush warbler	—
★ *Prinia hodgooni*	Franklin's ashy grey wren-warbler	ফুটকি
★ *Cisticola juncidis*	Streaked fantail warbler	—
★ *Prinia subflava*	Plain longtail warbler	—
★ *Prinia socialis*	Ashy wren-warbler	—
★ *Prinia flaviventris*	Yellowbellied longtail warbler	হলদে ফুটকি
★ *Orthotomus sutorius*	Tailor bird	টুনটুনি
Locustella certhiola	Palas's grasshopper-warbler	ঘাসফড়িং ফুটকি
★ *Chaetornis striatus*	Bristled grass warbler	—
★ *Megalurus palustris*	Striated marsh warbler	জলা ফুটকি
Acrocephalus aedon	Thickbilled warbler	—
★ *Acrocephalus stentoreus*	Indian great reed warbler	—

Acrocephalus arundinaceus	Eurasian great reed warbler	—
Acrocephalus bistrigiceps	Blackbrowed reed warbler	—
Acrocephalus dumetorum	Blyth's reed warbler	টিকরা/ ঝোপ টিকরা
Acrocephalus agricola	Paddyfield warbler	ক্ষেত টিকরা
Hippolais caligata	Booted tree warbler	—
Sylvia hortensis	Orphean warbler	—
Sylvia curruca	Lesser whitethroat	—
Phylloscopus collybita	Brown chiffchaff	বাদামী শাখা ফুটকি
Phylloscopus affinis	Tickell's leaf warbler	—
Phylloscopus griseolus	Olivaceus leaf warbler	—
Phylloscopus fuligiventer	Smoky willow warbler	—
Phylloscopus fuscatus	Dusky leaf warbler	গোধূলি শাখা ফুটকি
Phylloscopus inornatus	Yellowbrowed leaf warbler	হলদে ভুরু শাখা ফুটকি
Phylloscopus magnirostris	Largebilled leaf warbler	—
Phylloscopus trochiloides viridanus	Dull green leaf warbler	সবজে শাখা ফুটকি
Phylloscopus trochiloides nitidus	Bright green leaf warbler	—
Phylloscopus reguloides	Blyth's leaf warbler	—
Seicercus burkii burkii	Eastern blackbrowed flycatcher-warbler	—
Seicercus burkii tephrocephalus	Burmese blackbrowed flycatcher-warbler	—
Erithacus calliope	Rubythroat	গুপীগলা
Erithacus svecicus	Bluethroat	গুপীকণ্ঠ

★ *Copsychus saularis*	Magpie robin	দোয়েল
★ *Copsychus malabaricus*	Shama	শ্যামা
Phoenicurus ochruros	Black redstart	লাল-গিরদি
Saxicola torquata	Stone chat	লাল ফিন্দা
Saxicola leucura	Whitetailed stone chat	—
★ *Saxicoloides fulicata*	Indian robin	কালচুরি/ কালি শামা
Monticola cinclorhynchus	Blueheaded rock thrush	—
Monticola solitarius	Blue rock thrush	—
Zoothera dauma	Smallbilled mountain thrush	সোনালী গিরিদামা
★ *Zoothera citrina*	Orangeheaded ground thrush	দামা/কস্তুরা
Turdus unicolor	Tickell's thrush	মাচাশা
Tits or Titmice:		
★ *Parus major*	Grey tit	রামগঙ্গা/ রামগাঙ্গরা
Nuthatches, Creepers:		
★ *Sitta castanea*	Chestnutbellied nuthatch	চোরপাখি
Pipits, Wagtails:		
Anthus hodgsoni	Indian tree pipit	গেছো তুলিকা
Anthus trivialis	Tree pipit	—
★ *Anthus novaeseelandiae*	Paddyfield pipit	মাঠ চড়াই
Anthus roseatus	Vinaceousbreasted pipit	—
Motacilla indica	Forest wagtail	জঙ্গলী খঞ্জন
Motacilla flava	Yellow wagtail	হলদে খঞ্জন
Motacilla citreola	Yellowheaded wagtail	হলদে মাথা খঞ্জন
Motacilla cinerea	Grey wagtail	ধূসর খঞ্জন
Motacilla alba dukhunensis	White wagtail	সাদা খঞ্জন

Motcilla alba personata	Masked wagtail	সাদা খঞ্জন
Motacilla alba alboides	Hodgsen's pied wagtail	সাদা খঞ্জন
Motacilla alba leucopsis	Whitefaced wagtail	সাদা খঞ্জন
Flowerpeckers:		
? ★ *Dicaeum agile*	Thickbilled flowerpecker	মোটাচঞ্চু পরাগ-পাখি
★ *Dicaeum erythrorhynchos*	Tickell's flowerpecker	পরাগ-পাখি
★ *Dicaeum cruentatum*	Scarletbacked flowerpecker	ফুলচুকি/ লালপিঠ পরাগ-পাখি
Sunbirds, Spiderhunters:		
★ *Nectarinia zeylonica*	Purplerumped sunbird	মৌচুকি/ মৌটুসী
★ *Nectarinia asiatica*	Purple sunbird	দুর্গা-টুনটুনি
White-eyes:		
★ *Zosterops palpebrosa*	White-eye	চশমা পাখি
Weaver birds:		
Petronia xanthocollis	Yellowthroated sparrow	বনচড়াই
★ *Passer domesticus*	House sparrow	চড়াই
★ *Ploceus philippinus*	Common baya	বাবুই
★ *Ploceus megarhynchus*	Finn's baya	—
★ *Ploceus benghalensis*	Blackthroated weaver bird	কাটাওয়া/ শোর বায়া
★ *Ploceus manyar*	Streaked weaver bird	তিলে বাবুই
★ *Estrilda amandava*	Red munia	লালমুনিয়া
★ *Lonchura malabarica*	Whitethroated munia	সরমুনিয়া
★ *Lonchura punctulata*	Spotted munia	তিলেমুনিয়া
★ *Lonchura malacca*	Blackheaded munia	শ্যামসুন্দর

Finches:		
Carpodacus erythrinus	**Indian rosefinch**	লালতুতি/ গোলাপী তুতি
Buntings:		
Emberiza aureola	**Yellowbreasted bunting**	
Emberiza fucata	**Greyheaded bunting**	
Emberiza schoeniclus	**Reed bunting**	
Probable:		
Pelecanus onocrotalus	**White/Rosy pelican**	গগনবেড়
Falco severus	**Indian hobby**	—
Francolinus francolinus	**Black partridge**	কালো তিতির
Francolinus pondicerianus	**Grey partridge**	রাম তিতির
★ *Burhinus oedicnemus*	Stone curlew	ছোট শিলবাটান
Glareola lactea	Small Indian pratincole	ছোট বাবুই-বাটান
Cuculus saturatus	Himalayan cuckoo	—
Pitta brachyura	Indian pitta	—
Calandrella cinerea	Short-toed lark	—
Saroglossa spiloptera	Spottedwinged stare	—
★ *Lonchura striata*	Whitebacked munia	শাঁখারী মুনিয়া

সূত্রঃ ডঃ বিশ্বময় বিশ্বাস ও কুশল মুখোপাধ্যায়।

কলকাতার প্রাণিজগৎ

স্বপনকুমার দাশ

একাকালে বিচিত্র সব জীবজন্তু বিচরণ করত কলকাতার বুকে। এই নগরীর বির্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ চলে গেছে সুদূর নির্জন অরণ্যে আর কেউ-বা ভারত থেকেই হারিয়ে গেছে চিরদিনের মত।

জলাজঙ্গলে আচ্ছন্ন কলকাতার শৈশবাবস্থার সর্বপ্রথম প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বেঙ্গল কন্সালটেশান্স-এর বিবরণীতে। হিসাব মত সেই সময়ে গোবিন্দপুরের অর্ধেক অংশ প্রায় ৬৮ হেক্টর ছিল জঙ্গল এবং সুতানুটির একের তিন অংশ অর্থাৎ প্রায় ৬৫ হেক্টর জলাভূমি, জঙ্গল আর বাঁশবন। এমন কি তখনকার সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু অঞ্চল টাউন কলকাতার এক পঞ্চমাংশ প্রায় ৩৫ হেক্টর বাঁশবন, কলাবাগান আর পাঁচমিশেলি জঙ্গল।

তখনকার কলকাতার দক্ষিণ সীমানা ছিল গোবিন্দপুর। চৌরঙ্গি, ভবানীপুর এবং আলিপুর জুড়ে গহন উষ্ণমণ্ডলের বনভূমি। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১২৯৬) প্রকাশিত শ্রীঅঘোরনাথ দত্তের 'কলকাতার বাল্যদৃশ্য' প্রবন্ধে আছে, ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে হ্যামিলটন এবং ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড জেমস লঙ কলকাতাকে জঙ্গল আব খানা-ডোবায় ভর্তি শহর বলেছেন। তাঁদের লেখা থেকে জানা যায়, বেলেঘাটা আর কলকাতার (বৌবাজার) মধ্যে প্রায় এক ক্রোশ অর্থাৎ দু'মাইল (৩·২১৮ কিলোমিটার) জায়গায় ছিল বাঘ এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে ভর্তি ঘন অরণ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে তদানীন্তন শহর কলকাতার কাছাকাছি জঙ্গলে ইংরাজ রাজপুরুষরা বন্যজন্তু শিকার করতেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'কলিকাতা . সেকালের ও একালের' বইটিতে শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'এরূপ শোনা গিয়েছে, ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব বর্তমান হরিণবাড়ি জেলের নিকটস্থ বনে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বন্যবরাহ ইত্যাদি শিকার করিতেন।'

কলকাতার জলাতে ছিল কুমিরের প্রাচুর্য। এখনকার রেসকোর্স-ময়দান অঞ্চলে ছিল এক বিস্তীর্ণ জলা। নানা জাতের জলচর পাখি আর হিংস্র কুমিরের বাস ছিল সেখানে। রেভারেন্ড লঙ-এর কথায় কলকাতা ছিল, 'Land of mist, alligators and wild boars'.

গোড়াব দিকে শহর কলকাতাব পূর্বদিকের সীমানা ছিল চিৎপুর রোড। বর্তমানের এসপ্লানেড অঞ্চলের আলাদা কোনো অস্তিত্ব ছিল না, আর চৌরঙ্গি এবং গোবিন্দপুরের মধ্যবর্তী জঙ্গলে ঘোরাফেরা করত বাঘ। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Calcutta : Old and New' বইটিতে H.E A. Cotton লিখেছেন, 'Chowringhee, in 1717 was surrounded by water-logged paddy-fields and bamboo groves and

separated from Govindpore by a tiger-haunted jungle. ...The Esplanade was a jungle not yet cleared, interspersed with a few huts and small plots of grazing and arable lands'.

কলকাতার জঙ্গলে ভাবটি বজায় ছিল অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত। পরে শহরের জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে বন-জঙ্গল অদৃশ্য হয়, গড়ে উঠতে থাকে নতুন বাজার-হাট, রাস্তা-ঘাট। বর্তমান শতাব্দীতে স্বাধীনতার পরবর্তিকালে পূর্ববঙ্গ থেকে জলস্রোতের মত উদ্বাস্তু আসতে থাকে। শহরতলী অঞ্চলে যেটুকু পতিত জমি, স্বাভাবিক বন-জঙ্গল বা জলাভূমি পড়ে ছিল, সেইসব জায়গায় নতুন করে উপনগরী গড়ে ওঠে।

ভাবলে অবাক লাগে, পুরনো কলকাতার জলা-জঙ্গলে একসময়ে বসবাস করত ৩৪টি প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ২৭টি প্রজাতির সরীসৃপ, যার মধ্যে নির্বিষ এবং বিষধর প্রজাতির সাপই ছিল ১৫ জাতের। এইসব বন্যপ্রাণীর মধ্যে কয়েকটিকে এখন আর দেখাই যায় না। অন্য অল্প কটি প্রাণীর চিহ্ন কালেভদ্রে চোখে পড়ে।

এটুকুই শুধু নয়, অন্তুতপক্ষে ৪০টি প্রজাতির প্রজাপতি সমেত শতাধিক কীট-পতঙ্গের বাসস্থান ছিল এই শহরে। বিচিত্র সব মাছের দেখা মিলত এখানকার পুকুর আর খালবিলে। আবহাওয়ার পরিবর্তন, সেই সঙ্গে উদ্ভিদ সংস্থানের পরিবর্তনই কলকাতা থেকে বন্য জীব-জন্তুর নিশ্চিহ্নকরণে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, বিজ্ঞানীদের ধারণা এইরকম। এই ধারণার সপক্ষে তাঁরা কিছু যুক্তিও উত্থাপন করেছেন। কয়েক জাতের প্রজাপতির লার্ভা বা শুঁয়োপোকা কেবলমাত্র একটি বা দুটি বিশেষ গাছের পাতা খেয়ে বাঁচে। সুতরাং ওই বিশেষ প্রজাতির গাছ কোনো অঞ্চল থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রজাপতিগুলিকে আর সেখানে দেখা যাবে না।

এর সঙ্গে বাসস্থান-সংকোচনের সমস্যাও এসে পড়ছে। খাদ্য ছাড়াও সব বন্য জীবজন্তুর আশ্রয়স্থানের প্রয়োজন হয়। যথেষ্ট পরিমাণে চরে বেড়ানোর জায়গা না থাকলে তৃণভোজীরা কোনো অঞ্চল ত্যাগ করে চলে যায়। সেই সঙ্গে তৃণভোজী এবং পত্রভোজী শাকাশী প্রাণীদের খেয়ে যে-সব শিকারী মাংসাশী জন্তুরা বেঁচে থাকে, তারাও সেই অঞ্চল থেকে অন্য জায়গায় চলে যাবে, এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

শিকারের সন্ধানে চৌরঙ্গির জঙ্গলে বাঘ (প্যান্থেরা টাইগ্রিস) ঘুরে বেড়াত। দমদমে বাঘে মানুষ মেরেছে, এমন খবর ছাপা হয়েছে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ। সেকালের ভাষায় খবরটি এইভাবে ছাপা হয়েছে, 'দমদমার নিকট গৌরীপুর গ্রামে এই প্রকারে এক ব্যাঘ্র মারা গিয়াছে। সে ব্যাঘ্র সুন্দরবন ছাড়িয়া শুড়িটোলা ও বাগমারী ও বেলগাছী এই তিনগ্রাম বেড়িয়া গৌরীপুর গ্রামে একজন স্ত্রীলোককে ধরিয়া খাইল। পরে একজন দুঃখী লোকের ঘরে প্রবেশ করিল। সে ব্যক্তি ভয় পাইয়া ঘরের বাহির হইয়া ঘরের দ্বার রোধ করিয়া দমদমাতে সমাচার দিল। সেখানকার সাহেব লোকেরা আপন চাকর ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গৌরীপুরে গিয়া গুলি করিয়া তাহাকে হত করিল।'

এর তিন বছর পরে, অর্থাৎ ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ সমাচার দর্পণ পত্রিকায় আবার বাঘ দেখা এবং এক সাহসিনী গ্রাম্য গৃহবধূর হাতে বাঘের জীবন নাশের খবর ছাপা হয়। ততদিনে অবশ্য কলকাতার শহর এলাকা ছেড়ে বাঘ ক্রমশ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আরো নিভৃত বাদাবনে সরে যেতে শুরু করেছে। খবরটিতে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীর চেহারা

ফুটেছে : 'কলিকাতার পূর্ব-দক্ষিণ বাদাবনের অন্তঃপাতী জয়নগরের নিকটে চৌরমহল নামে একস্থান আছে। সেখানে অধিক লোকের বসতি নাই কেবল অতিশয় বন এবং ব্যাঘ্রভীতিও অতিশয়।'

সেই সময়কার আঙ্গিকে এবং ভাষায় ছাপা দীর্ঘ প্রতিবেদনেব সাবাংশে বয়েছে মাটির ঘরের খোড়ো চালায় আটকে পড়া একটি বাঘকে পুড়িয়া মারাব ঘটনা। ঘটনার দিন স্বামী কাজে গেলে সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে গৃহবধূটি বাড়িতে ছিল। তখনও চৌরমহল গ্রামটিতে লোকজন বিশেষ না থাকায় এবং সেই সঙ্গে বাঘের উপদ্রব থাকায় বৌটি বাড়ির দরজা বন্ধ করে রাখে। দুপুববেলা বাঘটি আসে। দরজা খোলা না পেয়ে ধূর্ত মানুষখেকোটি ওঠে ঘবেব চালে। তারপর খড়ের চালা সরিয়ে বাঘ ঘবেব ভিতর উঁকি মাবে কিন্তু ঝাঁপিয়ে না পড়ে পিছন দিকটা বাঁশ-বাঁখারির ফাঁক দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। এব ফলে দেহের ওজনেব ভারে বাঘটি ফাঁদে আটকে পড়ে। বৌটি প্রচণ্ড ভয় পেযে গিয়েছিল ঠিকই. তবুও উপস্থিতবুদ্ধি না হারিয়ে বাঘের লেজের দিকটাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই অবস্থাতেও আগুন যাতে না ঘরের চালে ধরে যায়, সেদিকেও মেয়েটির নজব ছিল।

বাঘের তুলনায় চিতাবাঘ বা লেপার্ডের (প্যান্থেরা পার্ড়স) খবব পাওয়া গেছে কম। বস্তুত, দক্ষিণবঙ্গের ব-দ্বীপ অঞ্চলে এই প্রাণীটি কোনো সময়ে তেমন জাঁকিয়ে বসতে পারেনি। সমুদ্রোপকূলের নোনা জলেব খাঁড়ি আর বাদাবনের ম্যানগ্রোভ ছাওয়া পরিবেশে এশিয়ার উত্তর অঞ্চল থেকে আসা বাঘ খুব তাড়াতাড়িই নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে। অন্য দিকে চিতাবাঘেব আদর্শ বাসস্থান বড গাছওয়ালা ঘন জঙ্গল। স্যাঁতসেঁতে আর্দ্র পরিবেশ এদেব বিশেষ পছন্দ নয়। এই জন্যই হিমালযের তরাই অঞ্চলের বনভূমি আর পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তের জেলাগুলিতে, অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চলে (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বীবভূমে) এদের বিস্তার ঘটেছে বেশি।

খোদ কলকাতার জঙ্গলে চিতাবাঘ দর্শনের ঘটনা পাওয়া গেছে একটিই। সিপাহী বিদ্রোহের কুড়ি বছর আগে, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর শ্যামপুকুর অঞ্চলে বাঘ শিকারে বেরিয়েছিলেন নেটিভ বাবু দীননাথ দত্ত এবং গোবাসাহেব মিস্টার মকান। বিস্তব খোঁজাখুঁজি করেও বাঘের দেখা তাঁর পাননি, তবে দেখা পেয়েছিলেন এক দশাসই চিতাবাঘের। শিকারীদের কপাল মন্দ, জঙ্গল তাড়ুয়াদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে চিতাবাঘটি পালিয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কলকাতা সমেত সমগ্র পাশ্চমবঙ্গের বনভূমিতে শিকারী চিতা (অ্যাসিনোনিক্স জুবেটাস) কোনোকালেই বসতি স্থাপন করেনি। এখন এই প্রাণীটি অবশ্য ভারত থেকেই অবলুপ্ত হয়ে গেছে। আজ থেকে কিছু কম চল্লিশ বছর আগে শিকারী চিতা শেষ দেখা গেছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে জেম্স মিলনে উড়িষ্যা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একটি এবং ওই একই বছরে কার্ক প্যাট্রিক দক্ষিণ ভারতের চন্দ্রগিবি অঞ্চলে একজোড়া শিকারী চিতার সাক্ষাৎ পান।

চিতাবাঘ এবং শিকারী চিতা আদতে আলাদা জাতের মাংসাশী প্রাণী। প্রাণিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে চিতাবাঘ বাঘ-সিংহের নিকট আত্মীয়, কিন্তু শিকারী চিতা তা নয়। শিকারী চিতা চিতাবাঘের মত গাছে চড়ায় তত পটু নয়, চিতাবাঘের মত গর্জনও কবতে পারে না। একটু লক্ষ্য করলেই এদের অনেকটা গোল মুখ, চোখের নীচে কাজল টানার মত দুটি গাঢ় কালো রেখা দেখে প্রাণীটিকে চিনে নেওয়া যায়। চোখের নীচে গাঢ় কালো রেখা চিতাবাঘের নেই। উপরন্তু দুটি প্রাণীর গায়ে ছোপছোপ দাগের মধ্যেও পার্থক্য আছে।

চিতাবাঘের গায়ের দাগ চক্রাকারে সজ্জিত কিন্তু শিকারী চিতার গায়ের দাগ অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ঘন বুটির মত।

১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর একটি বিজ্ঞাপনে বেরোয়, ২৩০ নং লালবাজারে মিঃ স্মিথের দোকানে একটি রয়াল বেঙ্গল টাইগার বা সুন্দরবনেব বৃহৎ বাঘ বিক্রয়ের জন্য আনা হয়। তাছাড়া চার মাস বয়সের দুটি বাঘের ছানা ও একটি চিতাবাঘও বিক্রয় করা হবে জানানো হল। গ্রাহকগণ স্বচক্ষে দেখে বাঘের মূল্য স্থির করবেন। অবশ্য বাঘ দেখাবাব জন্য এটির রক্ষককে আট আনা বখশিশ দিতে হবে।

দেড়শো থেকে দুশো বছর আগে কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যে তিন জাতেব বুনো বেড়াল—বন বেডাল (ফেলিস চাওস), মেছো বেড়াল বা বাঘবোল, (ফেলিস ভাইভেরিনা) এবং চিতা বেড়াল (ফেলিস বেঙ্গলেনসিস) প্রায়ই দেখা যেত। কোনো কোনো অঞ্চলে মেছো বেডালকে বলে বাঘডাঁশা। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'এ হ্যাণ্ডবুক অব দ্য ম্যানেজমেন্ট অব অ্যানিম্যালস ইন ক্যাপটিভিটি ইন লোয়াব বেঙ্গল'-এ চিডিযাখানার প্রথম সুপারিন্টেন্ডেন্ট রামব্রহ্ম সান্যাল কলকাতার জঙ্গল থেকে পাওয়া মেছো বেড়ালের উল্লেখ করেছেন। আর চিতা বেডালেব প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে বলেছেন, 'সমস্ত দক্ষিণবঙ্গেই এটি পাওয়া যায়।' অবশ্য মেছো বেডালের মত চিতা বেড়াল ঠিক কলকাতার জঙ্গল থেকে ধরা পড়েনি। শ্রীসান্যালের আমলে আলিপুর চিডিয়াখানায় যে-চিতা বেড়াল এসেছে, সেগুলো দার্জিলিং এবং সুন্দরবনের বাসিন্দা।

পাঁচ-দশ বছর আগেও কসবা-বালিগঞ্জ আর টালিগঞ্জ-বাঁশদ্রোণী অঞ্চল থেকে ধরা পড়েছে মেছো বেডাল। আর জংলি বা বন বেড়ালের দেখা মিলেছে আলিপুর-নিউ আলিপুর অঞ্চলে। চিতা বেডালের দেখা অবশ্য এখন আব অত সহজে পাওয়া যায় না। একেবারে হাল আমলের সমীক্ষা অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে এরা অল্প সংখ্যায় টিকে আছে সুন্দরবনে।

তিন জাতের বুনো বেড়ালই কম-বেশি হিংস্র হলেও মেছো বেড়ালই এ-ব্যাপারে অন্য দু'জাতের থেকে এগিয়ে। আকারেও এরা চিতা আর জংলি বেড়ালেব থেকে বড়, মোটাসোটা গৃহপালিত বেড়ালের অন্তত দু'গুণ। অপর দুটি জাত দেড় গুণের কাছাকাছি। জংলি বেড়ালের গায়ের রঙ পিঙ্গল, লেজ কালো, চোখে সবুজ আভা, কান বড় আর লম্বাটে। কানের ডগায় উঁচিয়ে থাকা কালো লোমের গুচ্ছ দেখে প্রাণীটিকে চিনে নেওয়া যায়।

চিতা বেড়ালের নাম সার্থক। অনেকটা জংলি বেড়ালের মত আকৃতিবিশিষ্ট চিতাবেড়ালের ধূসর গায়ের রঙ আর তার উপরে গাঢ় রঙেব চক্রাকার দাগ বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে।

মেছো বেড়ালের গায়ের রঙ পাঁশুটে-হলুদ। এদের দেহের দু'পাশে থাকে গাঢ় রঙের লম্বালম্বি ডোরা। দেহের তুলনায় পা এবং লেজ একটু ছোট মাপের।

মেছো বেডালের প্রধান খাদ্য মাছ। অন্য দু' জাতের বনবেড়ালই ছোটখাটো পশু-পাখি আর পাখির ডিম খেয়ে থাকে। সুবিধা পেলে গৃহস্থের বাড়ির আনাচে কানাচে থেকে হাঁস-মুরগি আর ছাগলছানা চুরি করে। মেছো বেড়াল কুকুরকে আক্রমণ করতেও ছাড়ে না, এমন কি, ছোট শিশুকেও ঘর থেকে টেনে নিয়ে যায়। এর শক্তি এবং হিংস্রতার বর্ণনা করেছেন এস এইচ প্রেটার তাঁর লেখা 'দ্য বুক অব ইন্ডিয়ান অ্যানিম্যাল্স' বইটিতে। নিজের দ্বিগুণ আয়তনবিশিষ্ট এক চিতাবাঘিনীকে একটি মেছো বেড়াল মেরে ফেলে। বেড়ালটি

তার নিজের এবং বাঘিনীর খাঁচার মধ্যেকার জালের দেওয়াল ভেঙে বাঘিনীটিকে ঘায়েল করে। অন্য দু' জাতের বেড়াল অতটা আক্রমণাত্মক না হলেও উত্যক্ত হলে সাঙ্ঘাতিকভাবে মানুষকে আহত করার ক্ষমতা রাখে।

কলকাতা থেকে বন বেড়াল নিশ্চিহ্ন হবার পিছনে খাদ্যের অকুলান এবং বাসস্থানের অভাবই দায়ী। মেছো বেড়ালের পছন্দসই থাকার জায়গা হল নদী বা খাঁড়ির কাছাকাছি ঝোপঝাড়। জংলি বেড়ালের পছন্দ অল্প ঝোপ-জঙ্গল মেশানো খোলামেলা জায়গা আর চিতা বেড়াল বড় গাছের কোটরে থাকতে ভালবাসে।

পুরনো আমলে কলকাতায় শিয়ালেব (ক্যানিস অরিযাস) উপদ্রব ছিল খুব। স্বামী বিবেকানন্দেব ভাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'আমাদের শৈশবে দেখিয়াছি বড় শিয়ালের উৎপাত ছিল। সর্বত্র এঁদোপুকুর ও বাঁশঝাড় থাকায় শিযালের উৎপাত ছিল।'[১] তারিখ মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, শ্রীদত্ত বলেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা।

শিয়ালের উপদ্রব নিয়ে একটি খবর ছাপা হয় সমাচাব দর্পণ পত্রিকায় ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ জানুয়ারি। 'কলিকাতার মধ্যে এক স্ত্রীলোক আপন দুই শিশু কোলে শুইয়াছিল। রাত্রিকালে এক শৃগাল আসিয়া তাহার দশ মাসের এক বালককে লইযা গেল।...প্রাতঃকালে এক নবদামাতে সে বালককে মৃত পাইল।'

ছোট মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে ঝাড়ুদার স্বভাবের শিয়াল কলকাতা শহর এবং শহরতলী অঞ্চলে টিঁকে ছিল বহু দিন। ছোট পশু-পাখি এদের স্বাভাবিক খাদ্য হলেও অভাবে আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা, জীব-জন্তুর পচাগলা মৃতদেহ সব কিছুই শিয়ালের খাদ্য। সুতরাং বন-জঙ্গল পরিষ্কার, সেই সঙ্গে শিয়ালের খাদ্য-প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস চট করে একে কাহিল করতে পারেনি।

ঠিক এই ধরনের অবস্থাব খবর পাওয়া গেছে ইউবোপের কিছু আধুনিক শহর থেকে। শিযাল বর্তমানে এইসব শহরাঞ্চলে পুরোপুরি উচ্ছিষ্ট-ভোজী হয়ে পড়েছে। দিনের বেলায় এরা আশ্রয় নিচ্ছে ভূগর্ভস্থ নর্দমা অথবা মাটির নিচের অন্ধকারাচ্ছন্ন কুঠরিতে। আর রাত্রে চরছে শহরের পথঘাটে (Peter D. Moore : The Collins Encyclopedia of Animal Ecology)

শিয়ালকে তবু শেষ পর্যন্ত কলকাতার দখল ও স্বত্ব ছাড়তেই হল। প্রতিযোগিতায় নেড়ি কুকুরের সঙ্গে পেরে উঠল না শিয়াল, পিছু হঠতে হল।

সত্যিই কুকুরের উৎপাতে কলকাতা বিব্রত হয়ে আসছে একেবারে তার বাল্যাবস্থা থেকে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে কলকাতা পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই মর্মে একটি নোটিশ জারি করে, 'পুলিশ কমিশনারগণ সাধারণকে জানাইতেছেন, কলিকাতা শহরের রাজপথে কুকুরের উৎপাত বড় বেশী হইয়াছে। এজন্য স্ক্যাভেঞ্জার-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আগামী ২১ শে মে হইতে জুন মাসের ১লা তারিখ পর্যন্ত, শহরের পথে যে সমস্ত কুকুর দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাদিগকে হত্যা করা যাইবে। প্রত্যেক কুকুরের জন্য দুই আনা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।'

শিয়ালের থেকে আকারে বেশ কিছুটা ছোট, সরু সুচলো মুখ আর ঝাঁটার মত লেজবিশিষ্ট খেঁকশিয়াল (ভাল্‌পেস বেঙ্গলেনসিস) অবশ্য বিদায় নিয়েছে আরো অনেক আগেই। স্বভাবে খেঁকশিয়ালের থেকে অনেকটাই আলাদা। শিয়ালের মত এরা গৃহস্থের

১. কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা. মহেন্দ্রনাথ দত্ত। দা মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৩।

ঘরদোর বা হাঁস-মুরগির ঘরে হামলা করে না, বরং লোকজনের সংস্রব এড়িয়ে নির্জন ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে থাকতেই পছন্দ করে। ছোট পশুপাখি, গিরগিটি, ব্যাঙ, পোকা-মাকড় আর ফুটি-শশা, জাম-কুল, খেজুরের মত ফল-পাকুড়ই এদের খাদ্য। কলকাতা থেকে ঝোপ-ঝাড় সমন্বিত লুকোবার জায়গা কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এরাও উধাও হয়েছে।

শিয়াল যে একেবারে এই শহর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তা বলা যাবে না। আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেও কসবা-তিলজলা, টলিগঞ্জ-গল্ফ ক্লাব বা গড়িয়ায় কিম্বা দমদম-ভি আই পি সল্ট লেক অঞ্চলে মাঝে মাঝে এদের নজরে এসেছে বা ডাক শোনা গেছে। ইদানীংকালে অবশ্য শিয়াল বিরল দর্শন।

এককালে যাঁরা পাখি পুষতেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভামের (প্যারাডক্সুরাস হার্মাফ্রোডাইটাস) কথা ভুলে যাননি। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বাঙলার শিকার-প্রাণী' বইটিতে জীববিষয়ক প্রকৃতিবিদ্ শচীন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন, 'কলিকাতায় ভামেব উপদ্রব ছিল কিছু দিন পূর্বে, এখন এই মহানগরীতে ভাম বিরল।' [১]

ভামের স্বাভাবিক খাদ্য পাখি। গাঢ় রঙের ফুটকিতে চিত্রিত ছিমছাম পাঁশুটে দেহের নিশাচর প্রাণীটি অত্যন্ত ধূর্ত শিকারি। পাঁচিল আর ছাদের আলসে ধরে চলাফেরা করতে পারে অনায়াস দক্ষতায়। ছোট আকারের পাখি শিকার করে খায় ভাম।

এমনিতে ভাম থাকে বাগানের বড় গাছে। পতিত জমিতে বেড়ে ওঠা ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালেও দিব্যি থাকে। সে-রকম সুবিধাজনক জায়গা না পেলে পুরনো বাড়ির ছাদের আলসে অথবা ঘুলঘুলিতেও ভাম ঘর-সংসার পাততে পারে। তাল-খেজুরের রস এদের খুবই প্রিয়। প্রায়ই এরা গাছ বেয়ে উঠে হাঁড়িতে জমা রস চুরি করে। এ জন্যই ভামের ইংরাজি নাম রাখা হয়েছে পাম ক্যাট (অথবা পাম সিভেট)। কেউ বা বলেন টডি ক্যাট।

ভামের জ্ঞাতিভাই গন্ধগোকুল (ভাইভেরিনা ইন্ডিকা) স্বভাবে বন্য। মানুষের সংস্রব এড়িয়ে চলতেই এরা ভালবাসে। পতিত জমির স্বাভাবিক খোঁদল আর ছোট নিচু ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে থাকতে চায় এরা। ভামের মত এরাও গাছে চড়তে খুবই পটু। খাবার ব্যাপারে নিশাচর গন্ধগোকুল বাছবিচার করে না। ইঁদুর-কাঠবেড়ালি, গিরগিটি, পাখি বা পাখির ডিম, পোকা-মাকড় কিছুতেই এদের আপত্তি নেই।

এদেরই সগোত্র আর একটি প্রাণী হল বাঘডাঁশ, যার পোষাকি নাম লার্জ ইন্ডিয়ান সিভেট (ভাইভেরা জিবেথা)। এদেব গায়ের রঙ ভামের চেয়ে বেশি গাঢ়। বাঘডাঁশের গায়ে লম্বা ডোরা আছে। দেহটি কিছুটা চ্যাপ্টা ধরনের ; লেজও দেহের সঙ্গে মানানসই মাপের। ভাম আর গন্ধগোকুলের থেকে বড় আয়তনের বাঘডাঁশকে চিনতে পারা যায় পিঠের কর্কশ লোম দেখে। কুচকুচে কালো লোমের সারি পিঠের মধ্যরেখা বরাবর উঁচিয়ে থাকে। নিশাচর বাঘডাঁশ দিনের বেলায় ঝোপ-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকে। ছোট পশু-পাখির সঙ্গে চুরি করা হাঁস-মুরগি খেয়ে এরা বাঁচে।

রামব্রহ্ম সান্যালের কথায়, ভাম এবং বাঘডাঁশ একশো-দেড়শো বছর আগেও কলকাতায় ছিল যথেষ্ট সংখ্যায়। এখন বাঘডাঁশ একান্তই বিরল পর্যায়ভুক্ত।

বাঘডাঁশ, ভাম আর গন্ধগোকুলের আত্মরক্ষার কায়দাটি চিত্তাকর্ষক। তেমন বিপদ হলে বিশেষ গন্ধযুক্ত (সাধারণত মিষ্টি, কখনও বা ঝাঁঝালো) তরল পরিত্যাগ করে। শত্রু এর

১· বাঙলার শিকার-প্রাণী : শচীন্দ্রনাথ মিত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৫৭।

ফলে অন্যমনস্ক হলে এরা চম্পট দেয়। শহরতলী অঞ্চলে ভাম আর গন্ধগোকুল ইতস্তত দু'একটা চোখে পড়ে।

ছোট কলেবরের আর এক অতি পরিচিত প্রাণী হল বেজি (হার্পেস্টিস এডওয়ার্ডসি)। গাছের চেয়ে জমিতেই এদের চলাফেরা বেশি স্বচ্ছন্দ। পিঙ্গল কর্কশ লোমে প্রাণীটির দেহ ঢাকা। মুখ সুচলো, কান গোল আর ছোট। লেজ কিছুটা রোমশ। প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন বেজি আগাছার ঝোপে ছাওয়া পতিত জমিতে ডেরা বাঁধে। সকালবেলায় আর শেষ বিকালে, সন্ধ্যার মুখে বেজি খাবারের সন্ধানে বেরোয়। মাছ, শামুক, গুগলি থেকে আরম্ভ করে পোকা-মাকড়, গিরগিটি, পাখির ডিম বা ছানা, ইঁদুর, পচাগলা মৃতদেহ, সব কিছুই বেজির খাদ্য-তালিকায়। সাপের শত্রু বলে বেজির (বা নেউল) সুখ্যাতি আছে। এ জন্যই বাড়ির আশপাশ থেকে এই প্রাণীটিকে তাড়াতে চান না অনেকেই। সাপ মেরে বেজি গৃহস্থের কিছু উপকার করে বটে, অপকারও কিন্তু কম করে না। রাতের বেলায় হাঁস-মুরগির খাঁচায় ঢুকে চালিয়ে যায় নির্মম হত্যাকাণ্ড। ঠিক শহরের মধ্যে না হলেও কলকাতার শহরতলী অঞ্চলে বেজি এখনও বেশ চোখে পড়ে।

জোর দিয়েই বলা যায়, কলকাতা এবং তার আশপাশে এখন আর ভোঁদড় দেখা যাবে না। অথচ শচীন্দ্রনাথ মিত্র লিখছেন, 'দক্ষিণবঙ্গে বিশেষত কলিকাতার সন্নিকটস্থ স্থানসমূহে ইহাকে (ভোঁদড়কে) বেশি দেখা যায়।' কলকাতায় নখরহীন ভোঁদড়ের (অ্যানোনিক্স সিনেরিয়া) সংখ্যাই ছিল সাধারণ ভোঁদড়ের (লুট্রা লুট্রা) চেয়ে বেশি।

খালবিল আর নদীর পাড়ের নরম পলিমাটিতে বড় গাছের শেকড়-বাকড়ের ফাঁকে ভোঁদড় বাসা বাঁধে। মাছ ছাড়াও এরা কাঁকড়া-চিংড়ি, ব্যাঙ, ইঁদুর আর জলচর পাখি শিকার করে। ডাঙ্গার প্রাণীদের মধ্যে এরাই ডুব সাঁতারে সবচেয়ে ওস্তাদ। এদের লম্বা ছিমছাম দেহ আর অনেকটা হাঁসের মত চামড়া-ছাওয়া পায়ের চেটো দ্রুতগতিতে জল কেটে সাঁতরাবার জন্য তৈরি। বড় কর্কশ লোমের তলায় আটকে থাকে বাতাসের বুদবুদ। এজন্য বহুক্ষণ জলে থাকলেও ভোঁদড়ের চামড়া শুকনোই থেকে যায়। থ্যাবড়া-মত গোল মুখ বড় বড় চোখ আর লম্বা লেজ নিয়ে ভোঁদড়কে মাছ শিকার করতে অনেকেই দেখেছেন চিড়িয়াখানায়। মাছচাষীদের চক্ষুশূল ভোঁদড। খালবিলের সংস্কার, বন-জঙ্গলের অবলুপ্তি, স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব, জলদূষণ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণেই এদের সংখ্যা কমেছে।

মাংসাশী প্রাণীর সঙ্গে একাধিক শাকাশী-প্রাণী এককালে কলকাতার বন-জঙ্গলে আর উন্মুক্ত প্রান্তরে চরে বেড়াত। এর মধ্যে বুনো শুয়োরের (সুস ক্রোফা) কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। চেহারায় অনেকটা গৃহপালিত সাধারণ শুয়োরের মত হলেও এদের রঙ আরো কালো। এদের ঘাড়ে একসারি কালো কর্কশ লোম উঁচিয়ে থাকে কেশরের মত। আর একটি বৈশিষ্ট্য বুনো শুয়োরকে চিনিয়ে দেয়, সেটি এদের বাঁকা ভাবে বেরিয়ে থাকা শ্বদন্ত। উপর নীচ দু' পাটির শ্বদন্তই থাকে মুখ থেকে বেরিয়ে। এই দাঁতের সাহায্যে এরা মাটি খুঁড়ে বার করে গাছের শিকড় আর কচু-কলা ইত্যাদি গাছের কন্দ।

প্রধানত শাকাশী হলেও বুনো শুয়োর প্রকৃতপক্ষে সর্বভুক। জীবজন্তুর মৃতদেহ এমন কি মলও এরা বেমালুম খেয়ে থাকে। রাতের দিকে বুনো শুয়োরের পাল জঙ্গল ছেড়ে কাছাকাছি ক্ষেত-খামারে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। কাজেই বুনো শুয়োর নিধন সব চাষীরই কাম্য। ক্ষেত-খামার রক্ষার জন্য সেই আমলেও কলকাতার বাসিন্দারা নিশ্চয়ই শুয়োর মারায় উৎসাহী ছিল। আর ইংরাজদের কাছে শুয়োর শিকার ছিল অবসর বিনোদনের প্রকৃষ্ট পন্থা। শুয়োরের মাংসও ছিল তাদের প্রিয় খাদ্য।

আর ছিল হরিণ। চিতল হরিণ (অ্যাক্সিস অ্যাক্সিস) তো ছিলই। বুনো শুয়োর আর হরিণ—এই দুই শাকাশী প্রাণীর মাংসই ছিল বাঘ আর চিতাবাঘের প্রধান খাদ্য। সুন্দরবন অঞ্চলে এখনও চিতল হরিণই সংখ্যা-গরিষ্ঠ শাকাশী প্রাণী।

অন্য কোনো জাতের হরিণ কি কলকাতায় ছিল কোনোকালে ? ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে দমদম আর ১৯৮০-এ যাদবপুরে পাওয়া গেছে অর্ধেক ফসিলে পরিণত হওয়া দুটি শাকাশী স্তন্যপায়ীর মাথার খুলি। জিওলজিকাল সার্ভের সংগ্রহশালায় এই দুটি নিদর্শন এখন রয়েছে। খুলি দুটি আনুমানিক দশ থেকে পনেরো হাজার বছরেব পুরনো। বিজ্ঞানীরা কিন্তু এখনও সঠিক ভাবে বলতে পারেন নি, খুলি দুটি কোন প্রাণীর—কৃষ্ণসার হরিণ (অ্যান্টিলোপ সার্ভিকাপ্রা) নাকি ঘোড়ার (ইকোয়াস ক্যাবেলাস) ? তবে এটি যে-প্রাণীরই হোক না কেন, ব্যাপারটা কিছুটা অদ্ভুত। প্রাণিবিজ্ঞানীদের ধারণা, কৃষ্ণসার হরিণ সাম্প্রতিক কালে কলকাতা কেন, সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই ছিল না। এখন এই জাতেব হরিণের অর্থাৎ অ্যান্টিলোপের বাসস্থান পশ্চিম এবং মধ্য ভাবতের শুকনো খোলামেলা বনভূমিতে। এমন বনভূমি দক্ষিণবঙ্গে যদি থেকেও থাকে, তবে তা বেশ কিছু হাজাব বছর আগেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আর খুলিটি যদি সত্যি ঘোড়ার হয়, তাহলে তো আরও আশ্চর্যের ব্যাপাব ' দশ পনেরো হাজার বছর আগে কলকাতায় ঘোড়া ? প্রাণীটিকে মানুষ বশ মানিয়েছে তো বড় জোর হাজার-খানেক বছর আগে। আব বন্যঘোড়া ? সে তো আরো অসম্ভব ব্যাপার। ভারতে যে বন্যঘোড়া ছিল, এমন প্রমাণও মেলেনি।

কৃষ্ণসারের ব্যাপারে যতই বিতর্ক থাক না কেন, গণ্ডার যে কলকাতার কর্দমাক্ত বনভূমিতে বিহার করেছে সে-সম্বন্ধে কারো সন্দেহ নেই। তবে বর্তমান ভারতে যে-প্রজাতিটি এখনও টিকে আছে অর্থাৎ এক শিংয়ের বড এশীয় গণ্ডার (রাইনোসেরস ইউনিকর্নিস), পুরনো কলকাতায় তার কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। কলকাতার কাছেই গোবরার মিনাখাঁ অঞ্চলে মাত্র এক হাজার বছরের প্রাচীন এক গণ্ডারের কয়েক টুকরোয় খণ্ডিত কঙ্কাল পাওয়া গেছে। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে এগুলি আবিষ্কাব কবেছেন জিওলজিকাল সার্ভের বিজ্ঞানীরা। নিদর্শনগুলির বর্তমান ঠিকানা হল জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার প্যালিওন্টোলজি ও স্ট্র্যাটিগ্রাফিক বিভাগ। বিজ্ঞানীরা ফসিল পরীক্ষা কবে জানিয়েছেন, গণ্ডারটি দুই শিং-বিশিষ্ট এশীয বা সুমাত্রা প্রজাতির (ডাইডার্মাসেরাস সুমাত্রেনসিস)। আশ্চর্যের ব্যাপার, এখন এই প্রজাতির গণ্ডার ভারত থেকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন। এই জাতের গণ্ডারের শেষ পদচিহ্ন পড়েছে কলকাতা থেকে বহু দূরে উত্তরবঙ্গে, তিস্তা নদীর ধারে, এই শতকের তৃতীয় দশকে। বিগত শতকে বিভিন্ন সময়ের সংগৃহীত তথ্য নির্দেশ করছে, এই দুই শিং বিশিষ্ট এশীয় গণ্ডারের বসবাস ছিল বাংলার ডুয়ার্স অঞ্চলে, আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায এবং বর্মা, ইন্দোচিন ও ইন্দোনেশিয়ার বনাঞ্চলে। বর্তমানে এরা আছে সুমাত্রা (লিউসার রিজার্ভ), মালয় (তামান নেগেরা) এবং থাইল্যান্ডের (খাও সালোর, খাও লুয়াং ইত্যাদি) কিছু অভয়ারণ্যে। সুদূর অতীতে এই প্রজাতির গণ্ডার যে কলকাতার বনভূমিতেও চরে বেড়াত, দমদম থেকে পাওয়া এক ফসিলই তার প্রমাণ।

আর এক জাতের বেঁটে একশিং গণ্ডার (রাইনোসেরস সোন্ডাইকাস) সুন্দরবনে চরেছে বিগত শতকেও। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দেও সুন্দরবন অঞ্চলে এদের পায়ের ছাপ দেখা গেছে এবং অবশিষ্টাংশ সংগৃহীত হয়েছে। ভারতীয় যাদুঘরে এই জাতের গণ্ডারের একটি নিদর্শন সযত্নে সাজানো আছে। একেবারে শৈশবাবস্থায় কলকাতা যখন সুন্দরবনের মত প্যাচপেচে কর্দমাক্ত জলাভূমি আর ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছপালায় ঢাকা ছিল, তখন এই জাতের

গণ্ডারও সেখানে বাস করত বলে অনেকেরই ধারণা। এখন এরা ভারতে নিশ্চিহ্ন।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর ভারতে প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁটে একশিং-এর গণ্ডার আর দেখা যায়নি, কিন্তু এই জাতের একটি স্ত্রী-গণ্ডার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত আলিপুর চিড়িয়াখানায় বেঁচে ছিল। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যায় নবাবের সংগ্রহশালা থেকে প্রাণীটি চিড়িয়াখানায় আসে। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে চিড়িয়াখানার তৎকালীন সুপারিন্টেন্ডেন্ট রামব্রহ্ম সান্যাল লিখেছেন, সুন্দরবন ছাড়াও এদের দেখা মেলে আসাম, বর্মা, মালয়েশিয়া, সুমাত্রা, বোর্নিও আর জাভার বনাঞ্চলে। বর্তমানে এদের ঠিকানা পশ্চিম জাভার উদ্‌জাং কুলন এবং উত্তর সুমাত্রার লিউসার অভয়ারণ্য। প্রায়-বিলুপ্ত এই গণ্ডারের বর্তমান সংখ্যা আনুমানিক ৫০টি।

কলকাতার মাটির তলায় পাওয়া গেছে প্রাচীন মূর্তি আর মুদ্রার সঙ্গে হাজার বছরের পুরনো একটি হাতির (এলিফাস ম্যাক্সিমাস) দাঁত এবং কঙ্কালের টুকরো। ক্লাইভ বিল্ডিংয়ের নীচের ভিত থেকে পাওয়া এই দাঁত আর হাড় কোথা থেকে এল, কেমন করেই বা এল এই নিয়ে শেষ কথা এখনও বিজ্ঞনীরা বলতে পারেন নি। তবে বহুকাল আগেই যে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে হাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এই বিষয়ে প্রাণিবিজ্ঞানীরা একমত।

পুরনো দিনের কাগজপত্রে এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে, আঠারো শতকের শেষ দিকে বাগবাজার অঞ্চলে বুনো মোষের (বুবেলাস বুবেলিস) তাড়া খেয়েছেন লর্ড ক্লাইভের সৈন্য। দক্ষিণবঙ্গ থেকে বুনো মোষের অবলুপ্তি একেবারে সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। সেই ভিত্তিতে কলকাতার বনভূমিতে দুশো বছর আগে বুনো মোষের থাকার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে শ্রীলংকা, উত্তর অস্ট্রেলিয়া এমন অনেক দেশেই বুনো মোষের যে দলগুলিকে চরতে দেখা যায়, তারা আসলে গৃহপালিত মোষেরই বংশোদ্ভূত। প্রাণিবিজ্ঞানীরা এদের ঠিক ওয়াইল্ড না বলে বলছেন ফেরাল (Feral)। সোজা কথায়, গৃহপালিত জীবজন্তুরা যদি আবার কোনো কারণবশত বন্যাবস্থায় ফিরে যায়, তাদেরই এই গোষ্ঠীতে ফেলা হয়। ক্লাইভের সৈন্যের দিকে ধেয়ে যাওয়া বুনো মোষের দল সত্যিকারের বন্য না ফেরাল—এই উত্তর জানা যায়নি।

কলকাতার জঙ্গলে শুধু অতিকায় বলশালী শাকাশী প্রাণীই ছিল না, সেখানে ডেরা বেঁধেছিল মেঠো খরগোশ (লেপাস নিগ্রিকোলিস) আর শজারুর (হিস্ট্রিক্স ইন্ডিকা) মত ছোট নিরীহ প্রাণী। মেঠো খরগোশ প্রকৃতপক্ষে 'হেয়ার' আমাদের পরিচিত প্রাণী সাধারণ খরগোশের মত 'র‍্যাবিট' জাতের নয়। এরা মাটিতে সুড়ঙ্গ ধরনের বাসা তৈরি করে না। পতিত জমির খোঁদল আর ঝোপঝাড়ের মধ্যেই এরা থাকে। সকাল আর সন্ধেবেলা মেঠো খরগোশ খাবারের সন্ধানে বেরোয়। এরা তখন ঘাসপাতা আর সময়বিশেষে আবর্জনা খেয়ে থাকে। কলকাতার গণ্ডীর মধ্যে এখন আর এদের দেখা যায় না বটে, শহরতলী অঞ্চলে, বিশেষত দক্ষিণ শহরতলীতে এখনও মাঝে মধ্যে দু-একটি দেখতে পাওয়া যায়।

পিঠ বরাবর ১৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা, কাঁটার বর্মে ঢাকা শজারুকে এখন প্রায় দেখাই যায় না, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে। নিশাচর শজারু ক্ষেত-খামারের ক্ষতি করে প্রচুর। দিনের বেলাটা এরা নদী বা খাঁড়ির ধারে নরম মাটির গর্তে লুকিয়ে কাটায়। গাছের মূল আর কন্দই এদের প্রধান খাদ্য।

শজারু এবং মেঠো খরগোশের মাংস অনেকে খেয়ে থাকেন। সেইজন্যও বটে, আর বাসযোগ্য খোলা বাগান আর প্রান্তর কমে যাওয়ায় এরাও এখন ক্রমশই কমে আসছে।

এবার বৃক্ষবাসী প্রাণীদের কথায় আসা যাক। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন, "খালধার আর

মানিকতলায় তখন সব বাগান ছিল। বড় বড় গাছ থাকায় অনেক বাঁদর থাকিত এবং হনুমানও কিছু কিছু থাকিত।' কলকাতার বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'শোভাবাজারের দক্ষিণ এবং দর্জিপাড়া ও বালাখানার উত্তর স্থানকে এখন রাজারপাড়া বলে, কিন্তু পূর্বে এই স্থানকে হনুমান-বাগান বলিত। সেকালে নাকি এই অঞ্চলে বানরের বিশেষ উপদ্রব ছিল। এখনও দমদমার নিকট এক স্থানে যথেষ্ট বানর আছে দেখা যায়।'[১]

অবশ্য মাত্র তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেও রেসকোর্স-ময়দান অঞ্চলে বেশ কিছু হনুমান (প্রেসবাইটিস এন্টেলাস) ছিল বহাল তবিয়তে। কাছে-পিঠের বাড়িতে হামলা করতও হরদম। বরং বাঁদর, সঠিকভাবে বললে রেসাস বাঁদর (ম্যাকাকা মুলাটা) বেশ কিছু দিন আগে থেকেই শহরাঞ্চল থেকে বিদায় নিয়েছে। এদের খাদ্য আর বাসস্থান এখন দুটোরই অভাব এই জনবহুল শহরে।

বৃক্ষবাসী একটি নিরীহ সুন্দর প্রাণী এখনও এই শহরের পার্ক-ময়দানে কোনোক্রমে টিকে আছে, তা হল কাঠ বেড়ালি (ফুনাম্বুলাস পেনান্টি)। সদাচঞ্চল ইঁদুর জাতীয় এই প্রাণীর স্বাভাবিক খাদ্য হল গাছের ফল, বীজ আর কচি মুকুল। গাছের কোটরে থাকতেই এরা ভালবাসে। তবে মানুষের সঙ্গ এরা বেশ পছন্দ করে। এজন্য বাড়ির ঘুলঘুলিতে দিব্যি সংসার পাততে পারে আর খাবারের টুকরো-টাকরা দিলে বেশ পোষ মানে।

আর এক নিশাচর বৃক্ষচারী-প্রাণীর কথাও এই প্রসঙ্গে চলে আসছে। প্রাণীটি আমাদের বেশ পরিচিত, সাধারণভাবে আমরা একে বাদুড় বলে চিনি। পুরনো কলকাতায় ফুল-ফলের বাগান ছিল। ফলভুক বাদুড়কেও সন্ধের মুখে উড়তে দেখা যেত। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় আছে, 'আমাদের ঠাকুরদালানে অনেক বাদুড় ঝুলিত এবং কিচমিচ করিয়া সবসময়ে আওয়াজ করিত। যে সকল বরগাতে বাদুড় থাকিত, তাহার নিচে মেঝেয় নানারকম ফলের বিচি ছড়াইত ও নানারকম ময়লা করিত।'

দুজাতের বাদুড়—ফ্লাইং ফক্স (টেরোপাস জাইগান্টিয়াস) এবং কলাবাদুড় (সাইনোপ্টেরাস স্ফিংস) দেখা যেত এই শহরে। এছাড়াও পতঙ্গভুক বাদুড়, এর চলতি-বাংলা নাম চামচিকে, পড়ছে এই দলে। কলকাতায় দু' জাতের চামচিকে—সাধারণ পিপিস্ট্রেল (পিপিস্ট্রেলাস করোম্যান্ড্রা) আর হলুদ জাতের চামচিকের (স্কোটোফিলাস হিদি) দেখা মেলে বেশি। পাকা ফল খেয়ে আর ছড়িয়ে বাদুড় যথেষ্ট উপদ্রব করে। কিছুদিন আগেও ঘুড়ির সঙ্গে বঁড়শি আটকে বা ফাঁদ পেতে বাদুড় ধরার প্রথা চালু ছিল। একদল লোকের পেশাই ছিল বাদুড় আর পাখি ধরে বিক্রি করা। কিছু লোক আবার বাদুড়ের মাংসের ভক্ত। একেবারে সাম্প্রতিক কালে হগ মার্কেটে বাদুড়ের মাংস বিক্রি হতে দেখেছেন অনেকে।

চামচিকে অবশ্য পোকা-মাকড় খেয়ে আমাদের উপকারই করে থাকে। ইদানিং শহরের মধ্যে বাদুড় বিরল দর্শন হলেও চামচিকে আছে যথেষ্টই।

একেবারে শৈশবাবস্থা থেকেই কলকাতা ইঁদুরের উপদ্রব সহ্য করে আসছে। প্রথমদিকে ক্ষেত-খামারের কাছেপিঠে, খোলা এবং মাটির নীচের ঢাকা নর্দমায় আর বর্তমানে ঘর-গৃহস্থালি, গুদামঘর, নর্দমা—সব জায়গাতেই ইঁদুরের উপদ্রবে এ-শহর ব্যতিব্যস্ত। ইঁদুরের সংখ্যাবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, শিয়াল, সাপ আর চিল পেঁচার মত শিকারী

১· (পুরনো কলকাতার কথা · নিশীথরঞ্জন রায় ও সুনীল দাস)। প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯।

পশুপাখির বিলুপ্তি। গবেষণায় প্রমাণিত তথ্য নির্দেশ করছে, একটি স্প্যারোহকের খাদ্য তালিকার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে ইঁদুর। শতকরা হিসাবে শিকারী পাখিটি ৮০ ভাগের মত বিভিন্ন জাতের ইঁদুর, প্রায় ১৫ ভাগ ছোট আকারের পাখি আর বাকি ৫ ভাগ পোকা-মাকড় খেয়ে থাকে। হিসাবমত একটি স্প্যারোহক এক বছরে খেয়ে থাকে ৩০০ ইঁদুর। ইঁদুর নিধনে পেঁচার পারদর্শিতা আরো বেশি। এরা প্রতি রাতে গড়পড়তা ১২টি ইঁদুর শিকার করে। তাহলে অঙ্কের হিসাবে একটি পেঁচা এক বছরে ধ্বংস করে ৪৩৮০টি ইঁদুর। এদিকে ইঁদুরের প্রজনন-হারও মাত্রাতিরিক্ত। সমীক্ষায় দেখা গেছে, একজোড়া ইঁদুর সারা জীবনে গড়পড়তা ৮৮৮টি সন্তানের জন্ম দিতে পারে।

এখন কলকাতায় নর্দমাবাসী ধেড়ে ইঁদুর (ব্যান্ডিকোটা ইন্ডিকা), সাধারণ ধেড়ে ইঁদুর (র‍্যাটাস র‍্যাটাস) আর ঘরদোরের নেংটি ইঁদুর (মাস মাস্কুলাস) বেশি দেখা যায়। তবে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে জে জে স্পিলেট কলকাতার ইঁদুরের উপর গবেষণা করে দেখেছেন, নর্দমাবাসী ধেড়ে ইঁদুর কলকাতার পরিবেশে বেশি খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাধারণ বা 'র‍্যাটাস' জাতের ধেড়ে ইঁদুর পেরে উঠছে না।

এই শহরে ইঁদুরের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হলেও ছুঁচোর (সাঙ্কাস মুরিনা) সংখ্যা ইদানীং কমের দিকে। পতঙ্গভুক, নিশাচর এই প্রাণীটিকে চেনেন সবাই। এরাও 'ব্যান্ডিকুট' ইঁদুরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে ওঠে না।

জলচর স্তন্যপায়ীদের মধ্যে গঙ্গার শুশুক (প্ল্যাটানিস্ট গ্যাঞ্জেটিকা) প্রাণিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তিমির নিকট আত্মীয়। এদিক থেকে এটি অনন্য। সাধারণত আমরা যেসব প্রজাতির শুশুক বা ডলফিনের কথা বেশি শুনি, সেগুলি সামুদ্রিক। নদীর শুশুক বলতে এই শুশুকটি বাদে আর একটি মাত্র প্রজাতি রয়েছে, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজনের বাসিন্দা লা-প্লাটা ডলফিন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্র্যাঙ্ক ফিন গাঙ্গেয় শুশুকের বিস্তার সম্পর্কে লিখেছেন, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদ এবং এইসব নদ-নদীর বড় বড় শাখাসমূহে প্রাণীটিকে দেখা যায়। তবে মোহনার জলে নোনা ভাব থাকায় সেখানে এরা থাকে না। একই তথ্যের অবতারণা করেছেন প্রেটার ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। এখন কলকাতার পশ্চিম প্রান্তে হুগলি নদীতে কিন্তু এদের বড় একটা চোখে পড়ে না।

শুশুকের দেহের রঙটি কুচকুচে কালো। দুই থেকে আড়াই মিটার লম্বা প্রাণীটির গড়ন ডলফিনের মতই,খানিকটা টর্পেডোর অনুরূপ। তবে গাঙ্গেয় শুশুকের মাথার সামনের তুণ্ডটি অনেক বেশি লম্বা। এদের সামনের পা পরিবর্তিত হয়ে প্যাডেল তৈরি করেছে, পিছনের পা অবলুপ্ত। লেজ চ্যাপ্টা 'ফ্লুক'-এ পরিণত হয়েছে।

শুশুক পুরোপুরি জলচর প্রাণী হলেও বাতাস থেকে শ্বাসকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন নেয়। তুণ্ডের উপরে লম্বাটে ফাটলের আকারে এক নাকের ছিদ্র বা ব্লো হোল অবস্থিত। এদের চোখ খুবই ছোট, আয়তনে মটর দানার বেশি হবে না, দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ।

মাছই শুশুকের প্রধান খাদ্য। দল বেঁধে মাছের ঝাঁকের পিছনে ছোটে এরা। এজন্য এরা প্রায়ই মাছ ধরার জালে ধরা পড়ে। অল্প গভীর খাঁড়িতে ঢুকেও আটকে পড়ে। বছর দশেকের আগে চেতলা ব্রিজের নীচে আদিগঙ্গায় ঠিক এভাবেই একটি শুশুক আটকে পড়ে। কিছু উৎসাহী লোক মাংসের লোভে প্রাণীটিকে মেরে ফেলে।

জলদূষণ, পলি জমে হুগলি নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া, খাদ্যের অভাবের মত একাধিক কারণেই শুশুক সংখ্যায় কমছে। এর সঙ্গে মাংস আর চর্বির জন্য শুশুক নিধন পর্ব তো সমানেই চলছে।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চে জুলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার বিজ্ঞানীবা গাঙ্গেয় শুশুকের বর্তমান সংখ্যা এবং বিস্তার সম্পর্কে সমীক্ষা চালান। এই প্রসঙ্গে পি ডি গুপ্তা (১৯৮৬) জানিয়েছেন, বিহারের মুঙ্গের থেকে সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত যথেষ্ট সংখ্যায় শুশুক নজরে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে ফারাক্কার কাছাকাছিও প্রায়ই এদের দেখা পাওয়া যায় কিন্তু আরো দক্ষিণে ক্রমশই এদের সংখ্যা কমতে থাকে। সমীক্ষা-বর্ষের ৪ ফেব্রুয়ারি, কলকাতার জগন্নাথ ঘাট এবং মেটিয়াবুরুজে বিজ্ঞানীরা মাত্র একটি করে শুশুক দেখেছেন। কলকাতার কাছে পলি জমে হুগলি নদী ক্রমশ অগভীর হয়ে পড়ছে, এ-কথা বহুদিন ধরেই পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা বলে আসছেন। সেইসঙ্গে দু' পাশেব কল-কাবখানা থেকে হুগলি নদীতে ক্রমাগত এসে পড়ছে অ্যাসিড, ক্ষার, বিভিন্ন ধাতব পদার্থ আর আবর্জনা। সব মিলিয়ে কলকাতার কাছে হুগলি নদীর জল এখন দূষণে জর্জবিত। গাঙ্গেয় শুশুক এখন আর অগভীর দূষিত জলে আসছে না। শুশুকের প্রধান খাদ্য মাছ-চিংড়িও আগের তুলনায় এসব অঞ্চলে পাওয়া যায় কম।

নামখানা, কাকদ্বীপ এবং ডায়মন্ডহারবার অঞ্চলে হুগলি নদীর নাব্যতা আর গভীরতা অনেক বেশি। তবুও সেখানে শুশুক দেখা যায়নি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলে লবণাক্তভাব বেড়ে যাবার জন্যই শুশুক মোহনা অঞ্চল পরিত্যাগ করে। গঙ্গাব শুশুক নোনা জলে বাঁচে না।

আঠারো শতক পর্যন্ত কলকাতার অনেক জায়গায় ছিল বড় বড় জলা। এই সব জলায় বাস করত হিংস্র কুমির। রেভারেন্ড লঙ এবং ক্যাথলিন ব্লেকিনডেন[১]-ও কুমিরের বর্ণনা দিয়েছেন। 'কলিকাতার ইতিহাস' বইটিতে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর লিখছেন, 'যে-সকল স্থান বর্তমান সময়ে শিয়ালদহ ও বউবাজাব বলিয়া প্রসিদ্ধ, ঐ সমস্ত স্থান পর্যন্ত লবণ-জলের হ্রদটি বিস্তৃত ছিল। এই সকল ভৌতিক পদার্থ অপেক্ষা নানাপ্রকার জীবজন্তুও অল্প ভীতির কারণ ছিল না। বন্য শূকর, কুম্ভীর, হাঙ্গর, নানা জাতীয় সরীসৃপ ও ব্যাঘ্র বিস্তর ছিল।'[২]

কলকাতার মধ্যেকার জলাভূমিতে মগর বা জলার কুমির (ক্রোকোডাইলাস পালুসট্রিস) ছিল বলেই প্রাণিবিজ্ঞানীদের ধারণা। এই প্রজাতিব কুমির বেশি নোনা জলে থাকতে পারে না। অপর এক প্রজাতি মোহনার বা নোনা জলের কুমির (ক্রোকোডাইলাস পোরোসাস) যদি কলকাতায় থেকেও থাকে, তবে অনেক আগেই তারা এই অঞ্চল ছেড়ে গেছে বলেই মনে করা হয়।

মেছো কুমির বা ঘড়িয়াল (গেভিয়েলিস গ্যাঞ্জেটিকাস) কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যে ছিল কিনা, তার সঠিক প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। জীববিষয়ক প্রকৃতিবিদ্ শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র বলেন, গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রেই দেখা যেত এদের। তবে কলকাতার কাছাকাছি হুগলি নদী পর্যন্ত ঘড়িয়াল আসত কিনা, সে সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থেকেই গেছে।

অন্যান্য সরীসৃপের মধ্যে সাধারণ গোসাপ বা ধূসর গোসাপ (ভ্যারানাস বেঙ্গলেনসিস), হলুদ গোসাপ বা সোনাগদী (ভ্যারানাস ফ্ল্যাভেসেন্স) আর জল-গোসাপ বা রামগদী (ভ্যারানাস স্যালভেটর) বাস করত এখনে। এখন এদের আর শহরের মধ্যে দেখা যায় না,

---

১· Calcutta Past & Present. Kathleen Blechynden General Printers, 1978 (New Edition).

২· কলিকাতার ইতিহাস [The Early History of Growth of Calcutta by Benay Krishna Deb Bahadur]: সুবলচন্দ্র মিত্র (অনুঃ)। জে এন চক্রবর্তি, ১৯৮৯।

তবে শহরতলীর বনবাদাড়ে কিছু সংখ্যক রয়ে গেছে। মংসাশী এই সরীসৃপের খাদ্য মাছ, ব্যাঙ এবং অন্যান্য ছোট প্রাণী। চামড়ার লোভে গোসাপ শিকার বহু দিন ধরেই চলে আসছে। মাঝে এরা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, এখন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের আইন বলবৎ হওয়ায় অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

স্বাধীনতার আগে, ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অবিভক্ত বাঙলার বন্দরগুলি থেকে কী পরিমাণে গোসাপের চামড়া বিদেশে রপ্তানী হয়েছিল এবং তখনকার বাজারে তার মূল্যের একটি হিসাব দিয়েছেন শচীন্দ্রনাথ মিত্র। মনে রাখতে হবে, হিসাবটি সরকারি, যার সঙ্গে আসল হিসাবের কিছু তফাৎ থেকেই যায়।

খ্রিস্টাব্দ		যতগুলি চামড়া রপ্তানি হয়		মূল্য (লক্ষ টাকায়)
১৯২৬-২৭	...	১৪,১৫,৯৭৮	...	২৩·৫০
১৯২৭-২৮	...	১৯,৫৩,০৭৫	...	৩৩·৫৪
১৯২৮-২৯	...	১৪,৯০,১১৭	...	২৪·২৮

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ম্যালকম স্মিথ ভারতীয় গোসাপ সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। সেই সময়েই সোনাগদী অত্যন্ত বিরল হয়ে পড়েছে। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তো নয়ই, শুধুমাত্র মেদিনীপুর জেলার বনাঞ্চলে স্মিথ দু' একটি সোনাগদী দেখতে পান।

প্রাণিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে জলগোসাপ বা বামগদীর এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। স্মিথের মতে প্রজাতিটি মূলত বহির্ভারতীয়। বর্মা এবং ইন্দোচীন রামগদীর আসল দেশ। সেখান থেকে এটি ভারতের পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পশ্চিমে এরা একান্তই বিরল আর ভারতের অন্য অঞ্চলে রামগদী কখনোই বসতি স্থাপন করেনি। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বলবৎ 'বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণ' আইনানুসারে গোসাপ-শিকার নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ।

গিরগিটি জাতীয় প্রাণীর মধ্যে পুরনো দিনে কলকাতার বাসিন্দা ছিল এবং এখনও অল্পবিস্তর টিকে আছে, এমন কয়েকটি প্রাণী কাঁকলাশ (মাবুইয়া ম্যাকুলেরিয়া), ছোট কাঁকলাশ (রিয়োপা পাংটেটা), আরজিনা (মাবুইয়া ক্যারিনেটা), তক্ষক (গেকো গেকো) এবং রক্ত-চোষা বা সাধারণ গিরগিটি (ক্যালোটিস ভারসিকলর)।

যেসব প্রজাতির সাপের দেখা কলকাতার বন-জঙ্গলে মিলত, তার তালিকাটি দীর্ঘ বলা যায়। নির্বিষ, অল্প বিষ এবং উগ্র বিষ তিন ধরনের সাপই এখানে রাজত্ব করে গেছে। এখনও বিক্ষিপ্তভাবে এরা এখানে-ওখানে উঁকি দিয়ে থাকে।

অতিকায় নির্বিষ ময়াল সাপ বা অজগর (পাইথন মলুরাস) পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর আগেও শহর কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে এক-আধবার দর্শন দিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের চব্বিশ পরগনা এবং মেদিনীপুর জেলায় বিগত শতকেও ময়ালের সংখ্যা ছিল অনেক। এরা সাধারণত নদী এবং বড় জলাশয়ের কাছে বড গাছের উপর শিকারের অপেক্ষায় থাকে। ময়াল জল ভালোবাসে। গরমের দিনে প্রায়ই এদের জলের মধ্যে শুধু মাথাটি বের করে থাকতে দেখা যায়।

ময়ালের শিকার উষ্ণশোনিত প্রাণী, বুনো পশু-পাখি। বাসস্থানের সংকোচন এবং

খাদ্যের অকুলান—এই দুটি প্রধান কারণের সঙ্গে চামড়ার জন্য ময়াল শিকার প্রাণীটিকে বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছে। সরকারি হিসাবে কেবলমাত্র সুন্দরবন থেকে ৮৪০টি ময়ালের চামড়া ১৯২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দে চালান গিয়েছিল (বাঙলার শিকার-প্রাণী : শচীন্দ্রনাথ মিত্র)।

অন্যান্য নির্বিষ সাপের মধ্যে পুরনো বাড়ির আনাচ-কানাচে আর ছাইগাদা বা আবর্জনার স্তূপ থেকে বেরোত ঘরচিতি (লাইকোডন অলিকাস), দাঁড়াশ বা ঢ্যামনা সাপ (টায়াস মিউকোসাস) আর ছোট কেঁচোর মত পুঁয়েসাপ (টিফ্‌লিনা ব্রামিনা)। এছাড়া খালবিলে আড্ডা ছিল জলঢোঁড়ার (জেনোক্রোফিস পিস্‌কেটর)।

ঝোপ-ঝাড়ে বসবাসকারী নির্বিষ এবং অল্পবিষ সাপের মধ্যে ছিল লাউডগা (আহিতুল্লা ন্যাসুটাস), বেতআঁচড়া (ডেনড্রেলাপিস ট্রিসটিস), কালনাগিনী (ক্রাইসোপেলিয়া অবনাটা), উদয়কাল (অলিগোডন আর্নেনসিস), মেটেলি (অ্যাট্রেটিয়ম সিস্টোসাম), আর বঙ্করাজ (বয়গা ট্রাইগোনাটা)।

উগ্র বিষ সাপের মধ্যে কেউটে (ন্যাজা ন্যাজা), কালাচ (বুঙ্গেবাস সিরুলিয়াস), শঙ্খিনী বা শাঁখামুটি (বুঙ্গেরাস ফেসিয়েটাস) আব চন্দ্রবোড়াই (ভাইপেরা রাসেলি) ছিল প্রধান। তবে, কলকাতা এবং তাব উপকণ্ঠে সাপে কাটার হার কেমন ছিল, সে-সম্পর্কে তেমন নির্ভরযোগ্য তথ্য মেলেনি।

সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে আর একটি প্রাণীরই নাম করা দরকার। এটি কচ্ছপ। আগে পাওয়া যেত বা এখনও অল্প সংখ্যায় পাওয়া যায়, এমন দুটি কচ্ছপ প্রজাতি হল—পুকুরের কচ্ছপ বা কাঠা (লিসেমিস পাংটেটা) আর গঙ্গার কাছিম (ট্রাইয়নিক্স গ্যাঞ্জেটিকাস)। কিছু দিন আগে পর্যন্ত কচ্ছপেব মাংস বিক্রি হয়েছে কলকাতাব প্রায় সব বাজারে। এর মধ্যে বেশ কিছু কচ্ছপ চালান আসত বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে। এখন অবশ্য আইন করে কচ্ছপ হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পুবনো কলকাতায় খাল-বিল, মজা পুকুব, আগাছাব ঝোপ-জঙ্গলে অসংখ্য প্রজাতিব কীট-পতঙ্গের দেখা পাওয়া যেত। গুপ্তকবি বলেছেন, 'রেতে মশা দিনে মাছি। এই নিয়ে কলকেতায় আছি।' ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী ফ্যানি পার্কসেব লেখা চিঠিতেও কলকাতার মশা এবং মশার কামড়ের অস্বস্তিকর অনুভূতিব বিবরণ পাওয়া যায়। তা ছাড়া ম্যালেবিয়া, ডেঙ্গু, কালাজ্বর, টাইফয়েড, কলেরার মত কীট-পতঙ্গ বাহিত রোগ এবং মহামারীব উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে পুরনো কাগজপত্র, মিউনিসিপাল গেজেট প্রভৃতিতে।

কলকাতার প্রাণী প্রসঙ্গে মাছের কথা উল্লেখ করা দরকার। একশো বছর আগে কলকাতার বাজার-হাটে যেসব মাছ পাওয়া যেত, তার সঙ্গে বর্তমানে বিভিন্ন ঋতুতে বাজারে যেসব মাছ ওঠে তার খুব একটা পার্থক্য চোখে পড়ে না। তবে কলকাতার মধ্যে সল্ট লেক ভরাট করে উপনগরী তৈরি হবার পরে আর বিদ্যাধরীর মত খাল মজে আসার ফলে অনেক মাছই আর আগের মত সুলভ নয়। এই সঙ্গে হুগলি নদীর দূষণজর্জর অবস্থাও মাছের আকালের জন্যে দায়ী।

আর একটি কথা এখানে বলে নেওয়া ভাল, কলকাতার বাজারে মাছ চালান আসছে বহুকাল ধরে এবং বহুদূর দেশ থেকে। তাছাড়া স্যামন, টুনা, পমফ্রেটের মত সামুদ্রিক মাছও সাম্প্রতিক কালে চালান আসে প্রচুর। এইসব মাছের মধ্যে কলকাতা কেন, দক্ষিণবঙ্গের প্রজাতিগুলিকে আলাদা করে নেওয়া দুঃসাধ্য। একেবারে সাম্প্রতিক কালে (১৯৮৯) রাধাপ্রসাদ গুপ্ত বাংলাদেশে পাওয়া যেত এ-রকম মাছের একটি তালিকা

দিয়েছেন।[১] সর্বমোট ৮৮টি মাছের নাম আছে এতে।

অন্য একটি অসুবিধাও আছে। আমাদের খাবার উপযোগী বহু মাছই চাষযোগ্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এইসব মাছকে পুরনো কলকাতার প্রাকৃতিক পরিবেশে বিচরণশীল প্রাণিগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সেজন্য চাষযোগ্য নয়, এমন কি খাবার উপযোগীও নয়, এ-রকম কয়েকটি মাছের কথাই এখানে আলোচ্য। অবশ্য হুগলি নদীর বাসিন্দা কিছু খাদ্যোপযোগী মাছও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত।

হুগলি নদীতে হাঙর (স্কোলিয়োডন সোরাকোয়া) ছিল, এমন খবর মিলেছে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বর্ণনায় হাঙরের উল্লেখ দেখা যায়। অবশ্য এখনও মাংসাশী তরুণাস্থি বিশিষ্ট মাছ—হাঙর দু' একটা ছিটকে আসে। অন্য এক প্রজাতির হাঙরের (কার্চেরিনাস গ্যাঞ্জেটিকাস) ডেরাই ছিল হুগলি নদী আর তার শাখা-উপশাখায়।

আব এক স্বাদু মাছ তপস্বী বা তপসে মাছ (পলিনেমাস প্যারাডিসেনস) প্রচুর পবিমাণে ধরা পড়ত হুগলি নদীতে। এখন প্রায় দেখাই যায় না।

একটু নোনা এবং মিষ্টিজলের ভেড়ি আব পুকুরে আগে যথেষ্ট পাওয়া যেত, এখন বিরল, এমন কিছু মাছের মধ্যে গুবজালি (এলিউথেবোনিমা টেট্রাডাকটাইলাম), ফলুই (নোটোপটেরাস নোটোপটেবাস), চ্যাঙ (চানা গাচুয়া), ন্যাদস (ন্যানডাস ন্যানডাস), খরসুলা (লিজা কবসুলা), কুঁচে (অ্যামফিপনাস কুচিয়া), খলসে (কলিসা লেলিয়াস), পুঁটি (পুন্টিয়াস পুন্টিয়ো ও পুন্টিয়াস টিকটো), স্বর্ণপুঁটি (পুন্টিয়াস স্যাবানা) আর চাঁদা (অ্যাম্বাসিস নামা ও অ্যাম্বাসিস রঙ্গা) উল্লেখযোগ্য।

অভক্ষ্য শ্রেণীর অনেকটা বেলেমাছের মত দেখতে মাঠ-কৈ মাছকে হুগলি নদী এবং আদিগঙ্গার পাড়ে নরম কাদার মধ্যে লাফিয়ে চলতে দেখেছে অনেকেই। মাঠ-কৈ মাছের (পেরিঅফথ্যালমাস কীলরিউটারি এবং পেবিঅফথ্যালমাস পিয়ার্সি) একটি অদ্ভুত অভিযোজন লক্ষ্য করা গেছে। এই মাছের লেজের রক্তজালিকা শ্বাসকার্য চালাতে সক্ষম। মাঠ-কৈ জলের বাইরে অনেকক্ষণ কাটাতে পারে। মাঝে মাঝে জলের মধ্যে শুধু লেজটি ডুবিয়ে দেয়। এর ফলে প্রয়োজনমাফিক অক্সিজেনটুকু লেজের রক্তজালিকা নিয়ে দেহকে আবার কর্মক্ষম করে তোলে। মাঠ-কৈ মাছের সংখ্যাও এখন কমতির দিকে।

১৬৯০ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনশো বছরে কলকাতার প্রাণিগোষ্ঠী প্রচুর পরিমাণে পাল্টে গেছে। এখন শহরের চৌহদ্দির মধ্যে গৃহপালিত নয়, এমন প্রাণী বলতে নেড়ি কুকুর, বেড়াল (ফেলিস ক্যাটাস) আর কিছু ষাঁড় (বস ইন্ডিকাস) আছে। এছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর দেখা পেতে হলে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করা দরকার।

বিদেশ থেকে কলকাতায় আনা প্রাণীদের মধ্যে ঘোড়া বেশ কিছুকাল জাঁকিয়ে বসেছিল। এক সময়ে ঘোড়ায় টানা গাড়ি চলত কলকাতার রাস্তায়। তারপর ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি ঘোড়ায় টানা ট্রাম প্রথম চলে। কিন্তু শীতের দেশ থেকে আনা ঘোড়া সমস্যা তৈরি করল। অনেক তোয়াজে রাখা সত্ত্বেও গরম আবহাওয়া সহ্য করতে পারল না এইসব জন্তু। ঠিক কোন জাতের ঘোড়া ইংরাজরা এ-দেশে আমদানী করেছিল, তার সঠিক হদিশ পাওয়া যায়নি। তবে ঘোড়ার বংশপঞ্জী ঘেঁটে যতটুকু জানা যাচ্ছে, তাতে পিঠে চড়ার জন্য এবং গাড়ি টানার জন্য আলাদা জাতের ঘোড়ার দরকার। প্রথম জাতের ঘোড়া বেশ উঁচু, ছিমছাম গড়নের এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন। দ্বিতীয় জাতের ঘোড়া মজবুত, মোটাসোটা, বেঁটে

১ মাছ আর বাঙালি রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। আনন্দ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯

ধরনের কিন্তু ভারি বোঝা টানতে বেশি পটু। আরব, হ্যাকনি, এবং আমেরিকান স্ট্যাণ্ডার্ড প্রথম দলের ঘোড়া আর সায়ার, সাফোক এবং ক্লাইডেসডেল দ্বিতীয় দলের। ইংরাজরা তাদের দেশ থেকে এদের মধ্যেই কয়েকটিকে এনে থাকবে।

কলকাতার জীবজন্তু সম্পর্কে আলোচনায় চিড়িয়াখানার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। অবশ্য চিড়িয়াখানায় দেশজ পশুপাখির সঙ্গে বহু বিদেশি প্রাণী রাখাই প্রচলিত রীতি। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আলিপুরে যখন চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, কলকাতার বন-জঙ্গল তখনও সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়নি। বস্তুত ১৮৭৫ থেকে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অন্তত ১২ জাতের জীবজন্তু কলকাতা এবং শহরতলী অঞ্চল থেকে চিড়িয়াখানায় জমা পড়ে। চিড়িয়াখানার প্রথম সুপারিন্টেন্ডেন্ট রামব্রহ্ম সান্যালের লেখা থেকে জানা যায়, জংলি বেড়াল, মেছো বেড়াল, চিতা বেড়াল, ভাম, বাঘডাঁশ, গন্ধগোকুল, শিয়াল, খেঁকশিয়াল, বেজি, হনুমান, রেসাস বাঁদর, ভোঁদড়, শজারু বাদুড় ইত্যাদি প্রাণী কলকাতা জঙ্গলেই ধরা পড়েছে। কিন্তু শিয়াল, ভাম আর শজারুর মত জীব-জন্তু বন্য অবস্থায় চিড়িয়াখানার গণ্ডীর মধ্যেই ঘোরাফেরা করত। এক থেকে দুই কিলোমিটারের মধ্যেই ছিল জংলি বেড়াল, খেঁকশিয়াল এবং ভোঁদড়ের আস্তানা।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট সিবিলিয়ান ডঃ জে ফেয়ার কলকাতায় চিড়িয়াখানা স্থাপনে প্রথম উদ্যোগ নেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে সোসাইটির আর এক উৎসাহী সদস্য লুই শোয়েণ্ডলার চিড়িয়াখানাব প্রাথমিক খসড়াটি তৈরি করেন। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রিন্স অব ওয়েলস সপ্তম এডওয়ার্ড ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। কাজ শেষ হতে বছর গড়িয়ে যায়। শেষে ১৮৭৬-এর পয়লা মে চিড়িয়াখানার দরজা খুলে দেওয়া হয় সর্বসাধারণের জন্য।

চিড়িয়াখানার প্রথম ম্যানেজিং কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডঃ জি কিং। রামব্রহ্ম ছিলেন এই কিং সাহেবের সহকারি বা 'বাবু'। চিড়িয়াখানার প্রথম আবাসিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট রামব্রহ্ম একেবারে শুরু থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত (জন্ম : ফেব্রুয়ারি, ১৮৫১) কাজ করে গেছেন।

চিড়িয়াখানা গড়ে তোলার পিছনে প্রধান উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম ছিল সর্বসাধারণের মধ্যে জীব-জন্তু সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টি আর বিদেশি পশু-পাখির আচার-আচরণ সম্পর্কে প্রাণিবিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ করে দেওয়া। একই সঙ্গে শহরবাসীদের কিছু নির্দোষ অথচ শিক্ষামূলক প্রমোদ বিতরণের উদ্দেশ্য তো ছিলই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চিড়িয়াখানায় এক রোমহর্ষক, বিয়োগান্ত এবং নাটকীয় ঘটনা ঘটে। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ এক জোড়া বাঘ খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে বাইরে চলে আসে। বহু চেষ্টা করেও তাদের আর খাঁচায় ফেরানো যায়নি। অগত্যা পর দিন ভোরে একরকম নিরুপায় হয়েই বাঘ দুটিকে গুলি করে মারা হয়। বলতে কি, কলকাতার মধ্যে বাঘ মারার নথিবদ্ধ ঘটনা এই একটাই।

কলকাতার বনাঞ্চল থেকে বেশ কয়েক হাজার বছর আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এমন একটি প্রাণী হল সুমাত্রার গণ্ডাব। এটি চিড়িয়াখানার মধ্যে শুধু বহাল তবিয়তেই ছিল না, বাচ্চার জন্মও দিয়েছে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে আনা গণ্ডারদম্পতির বাচ্চা পৃথিবীর আলোর মুখ দেখে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি।

কলকাতার জীবজন্তুর ক্ষেত্রে তিনশো বছরেরও অনেক আগের কিছু প্রাণীর ফসিলাকৃতি নিদর্শন পাওয়া গেছে কলকাতার মাটির তলা থেকে। কলকাতার তলা থেকে বেরিয়েছে

অস্ট্রিয়া জাতীয় কিছু সামুদ্রিক ঝিনুকের ফসিল। এই জাতের ঝিনুকের—অস্ট্রিয়া গ্রাইফয়েড্স-এর বড়সড় আকারের একটি ফসিল প্রথম পাওয়া যায় নেতাজি সুভাষ রোডের গিলাণ্ডার হাউসের ভিত থেকে। ফসিলটি আনুমানিক ৬০ থেকে ২৬০ লক্ষ বছরের পুরনো। সম্প্রতি পাতাল রেলের কাজের সময়ে পরবর্তিকালের আরো কিছু 'অস্ট্রিয়া' ঝিনুকের ফসিল পাওয়া গেছে এসপ্লানেড অঞ্চলে। এগুলির যথাযথ সনাক্তকরণ এখনও হয়ে ওঠেনি। এর সঙ্গে আরো আছে সামুদ্রিক কচ্ছপের খোলক। তাহলে ধরে নিতে হয় সুদূর অতীতে কলকাতা সমুদ্রের অংশবিশেষ ছিল। কিন্তু কোনো কোনো পুরাজীবতাত্ত্বিক বলছেন, ঝিনুকগুলি সেই প্রাগৈতিহাসিক কালের, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জলোচ্ছ্বাসের জন্য কলকাতার নরম পলিস্তরে এসে এরা গেঁথে যায়।

তিন শতকের ইতিহাসে কলকাতার জীবজন্তুর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে সুন্দরবনের জীবজন্তুর উল্লেখযোগ্য মিল নজরে আসে। কিন্তু এখনকার সুন্দরবনে পাওয়া যায় না, এমন কিছু কিছু প্রাণীও বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্য করা গেছে তিন শতকের কলকাতায়। প্রাণিজগতের পরিচয়ে সেখানেই কলকাতার বিশেষত্ব।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রাণীদের তালিকা (প্রাণীগুলিকে স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ইত্যাদি আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে)।

★ ভারত থেকে অবলুপ্ত.

★★ বিলুপ্তির পথে, বর্তমানে সংরক্ষিত।

স্তন্যপায়ী

ল্যাটিন নাম	**ইংরাজি নাম**	**বাংলা নাম**
★ *Acinonyx jubatus*	Cheetah	শিকারী চিতা
Anonyx cinerea	Clawless otter	নখরহীন ভোঁদড়
★★*Antilope cervicapra*	Black buck	কৃষ্ণসার মৃগ
Axis axis	Spotted deer	চিতল হরিণ
Bandicota indica	Sewage rat	ধেড়ে ইঁদুর
Bos indica	Zebu	গরু
★★ *Bubalus bubalis*	Indian water buffalo	বুনো মোষ
Canis aureus	Jackal	শিয়াল
Canis familiaris	Pariah dog	নেড়ি কুকুর
Cynopterus sphinx	Fruit bat	কলা বাদুড়
★ *Didermocerus sumatrensis*	Sumatran rhino	দুই শিং এশিয়ার গণ্ডার
Elephas maximus	Indian elephant	ভারতীয় হাতি
Equus caballus	Horse	ঘোড়া
★★ *Felis bengalensis*	Leopard cat	চিতা বেড়াল
Felis cattus	Domestic cat	বেড়াল

★★*Felis chaus*	Wild cat	বন বেড়াল
★★*Felis viverrina*	Fishing cat	মেছো বেড়াল
Funumbulus pennanti	Three striped squirrel	কাঠ বেড়ালি
Herpestes edwardsi	Common mongoose	বেজি
Hystrix indica	Porcupine	শজারু
★★ *Lepus nigricolis*	Hare	মেঠো খরগোশ
Lutra lutra	Otter	ভোঁদড়
Macaca mulatta	Rhesus monkey	রেসাস বাঁদর
Mus musculus	House mouse	নেংটি ইঁদুর
★★*Panthera pardus*	Panther	চিতাবাঘ
★★*Panthera tigris*	Tiger	বাঘ
Paradoxurus hermaphroditus	Palm civet or toddy cat	ভাম
Pipistrellus coromandra	Indian pipistrelle	চামচিকে
Platanista gangetica	Gangetic dolphin	শুশুক
Presbytis entellus	Langur monkey	হনুমান
Rattus rattus	House rat	ইঁদুর
Rhinoceros unicornis	Indian rhino	ভারতীয় গণ্ডার
★ *Rhinoceros sondaicus*	Javan rhino	জাভার গণ্ডার
Scotophilus heathi	Lesser bat	হলুদ চামচিকে
Suncus murina	Common shrew	ছুঁচো
Sus scrofa	Wild boar	বুনো শুয়োর
★★*Viverra zibetha*	Large Indian Civet	বাঘডাঁশ
★★*Viverricula indica*	Small Indian Civet	গন্ধগোকুল
★★ *Vulpes bengalensis*	Indian fox	খেঁকশিয়াল

সরীসৃপ

Ahaetulla nasutus	Common green whip snake	লাউডগা
Atretium schistosum	Olivaceous keelback	মেটেলি
Boiga trigonata	Cat snake	বঙ্করাজ
Bungarus caeruleus	Common Indian krait	কালাচ
Bungarus fasciatus	Banded krait	শাঁখামুটি বা শঙ্খিনী
Calotes versicolor	Garden lizard or Blood sucker	গিরগিটি বা রক্তচোষা

Chrysopelea ornata	Ornamental or Flying snake	কালনাগিনী
★★*Crocodylus palustris*	Marsh crocodile	জলার কুমির বা মগর
★★*Crocodylus porosus*	Estuarine crocodile	মোহনার কুমির
Dendrelaphis tristis	Whip snake	বেতআঁচড়া
★★*Gavialis gangeticus*	Gharial	ঘড়িয়াল
Gecko gecko	Tucktoo	তক্ষক
Hemidactylus flaviviridis	House gecko	টিকটিকি
Lissemys punctata	Mud turtle	পুকুরের কচ্ছপ বা কাঠা
Lycodon aulicus	Wolf snake	ঘরচিতি
Mabuya carinata	Common skink	আরজিনা
Mabuya macularia	Little skink	কাঁকলাশ
Naja naja	Cobra	কেউটে
Oligodon arnensis	Common kukri snake	উদয়কাল
Ptyas mucosus	Rat snake	দাঁড়াশ
★★*Python molurus*	Python	ময়াল বা অজগর
Riopa punctata	Snake skink	ছোট কাঁকলাশ
Trionyx gangeticus	Gangetic turtle	গঙ্গার কাছিম
Typhlina bramina	Blind worm	পুঁয়ে সাপ
★★*Varanus bengalensis*	Monitor lizard	ধূসর গোসাপ
★★*Varanus flavescens*	Yellow monitor	সোনাগদী
★★*Varanus salvator*	Water monitor	রামগদী
Vipera russelli	Russel's viper	চন্দ্রবোড়া
Xenochrophis piscator	Checkered keelback	জলঢোঁড়া

মাছ

Ambassis nama	Glass fish	চাঁদা
Ambassis ranga		
Amphipnous cuchia	Kuchia	কুঁচে মাছ
Carcharhinus gangeticus	Gangetic shark	গঙ্গার হাঙর
Channa gachua	chang	চ্যাঙ মাছ
Colisa lalius	Indian goramy	খলসে
Eleutheronema tetradactylum		গুরজালি
Liza corsula		খরসুলা

Nandus nandus		ন্যাদস
Notopterus notopterus		ফলুই
Periophthalmus koelreuteri	Mud skipper	মাঠ-কৈ
Periophthalmus pearsei		
Polynemus paradisens	Mango fish	তপসে
Puntius puntio	Punti	পুঁটিমাছ
Puntius ticto		
Puntius sarana	Sarpunti	স্বর্ণপুঁটি বা সরপুঁটি
Scolioden sorrakowah	Shark	হাঙর

কলকাতার মানুষ ও সমাজ

অশোককুমার ঘোষ

তিনশো বছর আগে জন্মকালে কলকাতার অবস্থা কেমন ছিল ? মনে হওয়া স্বাভাবিক, জন্মের আগে কলকাতা ছিল হুগলি নদীর তীরবর্তী জনমানবশূন্য জলাজঙ্গলে আচ্ছন্ন এক গণ্ডগ্রাম।

কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা সে-রকম ছিল না।

ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজদের এখানে আগমন, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং পরবর্তিকালে দেশ-শাসন সম্বন্ধে কিংবদন্তী ইতিহাসকে ছাপিয়ে যায়। সম্ভবত তার ফলে এক শ্রেণীর মানুষের বদ্ধমূল ধারণা জন্মায় ইংরাজরাই প্রথম ইউরোপীয় বিদেশী যারা ভারতবর্ষে ও এই অঞ্চলে সর্বাগ্রে আসে। পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে, ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দেব ২০ মে, পর্তুগিজ নাবিকরা মালাবার উপকূলে পৌঁছোয়। বছর পাঁচেকের মধ্যে, ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে, কোচিনে পর্তুগিজ দুর্গ স্থাপিত হয়। এরপরে মাত্র দু' বছরেই তাদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। ভারতবর্ষে ক্ষমতা আসীনের জন্য তাদের ২০টি রণতবী ও ২০০০ সৈন্য-সামন্ত ছিল। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দিউ দ্বীপ ও গোয়া পর্তুগিজদের করতলগত হয়। সেই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবসা-বাণিজ্য পর্তুগিজদের একচেটিয়া ছিল। ভারতবর্ষে সুদূর দক্ষিণে তাদের রাজকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য থাকলেও বাংলার রেশমের কথা তাদের অজানা ছিল না। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সঙ্গে পর্তুগিজদের ব্যবসা শুরু হয়। সেই সঙ্গে হুগলি অঞ্চলে পর্তুগিজেরা বসবাস আরম্ভ করে।

লোভ ও নৃশংসতার জন্য পর্তুগিজদেব রাজ্য অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার, কোনোটাই সম্ভব হয়নি। উপবন্তু সেই সময়ে ওলন্দাজেরা এই অঞ্চলে ও সুদূর প্রাচ্যের সঙ্গে পর্তুগিজদের ব্যবসায় বাদ সাধে। ফলে মধ্য-ইউরোপ, জার্মানি ও ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় পণ্যের পসরা হাজির হল। ইংরাজদের কাছে ভারতীয় পণ্যের জনপ্রিয়তাও উত্তরোত্তর বেড়ে চলল।

জোব চার্নকের আগেও কিছু কিছু ইংরাজ ভারতে এসেছিলেন। জন মেডেনহল নামের এক ইংরাজ বণিককে আকবরের রাজসভায় পাঠানো হয়েছিল। এ-ছাড়াও আরো দু'চারজন ইংরাজ ভারতে আসেন। তাঁদের ভারতে আগমন, উপস্থিতি ও অভিজ্ঞতা—সব নিয়ে অনেক ইংরাজই এ-দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা চিন্তা-ভাবনা করেন। অন্যদিকে ওলন্দাজদের আনা ভারতীয় পসরার বাজারও ইংল্যাণ্ডে সমাদর পেতে শুরু করে।

ইতিমধ্যে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হল। কয়েক বছর পরে ১৬০৮-এ ক্যাপ্টেন হকিন্স, এক ইংরাজ নাবিক, সুরাটে উপস্থিত হলেন। তুর্কি ভাষায় পোক্ত হকিন্স তাঁর আর্মেনীয় স্ত্রীকে নিয়ে হাজির হলেন জাহাঙ্গীরের দরবারে ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে। সেই বছরেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যাণ্ডের রাণীর কাছ থেকে দ্বিতীয় সনদ

অধিকার করে। সব রকমের অনুকূল অবস্থায় হকিন্স মুঘলদের কাছ থেকে ভারতবর্ষে ব্যবসার অনুমতি পেলেন। ক্রমান্বয়ে ইংরাজদের ব্যবসা এ-দেশে প্রসার লাভ করতে থাকে। ১৬৩৩-এ র‍্যাল্‌ফ কার্টরাইট বাংলায় হরিহবপুরে একটা কারখানাও খুললেন।

ভারতবর্ষে যেসব ইংরাজ ব্যবসায় নামেন, তাঁবা সবাই একই সঙ্গে ছোটখাটো খণ্ডরাজ্যগুলি ও ধনী স্বদেশী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে হাত মেলান। অন্যান্য যেসব ইউরোপীয় ব্যবসায়ী এ-দেশে ছিলেন, ইতিমধ্যে ইংরাজরা তাঁদের প্রায় সবাইকেই দেশ ছাড়া করলেন। ১৬৫১-এর মধ্যে ইংরাজরা বাংলায়, বিশেষভাবে হুগলি অঞ্চলে, নিজেদের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করেন।

১৬৪৪ থেকে ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একজন জার্মান নাগরিক বাংলায় ছিলেন। এই অঞ্চলটি দেখে তাঁর শুধু ভাল লাগেনি, এখানে জার্মান উপনিবেশ স্থাপনের কথাও তিনি ভাবেন। কিন্তু তাঁর ভাবনায় অন্য জার্মানেরা কোনো আগ্রহ দেখাননি। ফলে অঙ্কুরিত বাসনা ফলপ্রসূ হল না। অবশ্য অনেক পরে, সে সময়ের প্রায় এক শতাব্দী পরে, তিনটি জার্মান জাহাজ হুগলির মোহনায় নোঙ্গর ফেলে। ওই জাহাজ তিনটিকে ডুবিয়ে দেবার জন্য হুকুমনামা বেরোয়—যদিও নানা কারণে তা বলবৎ করা সম্ভব হয়নি।

এইসব ইতিহাসের পশ্চাৎপটে কলকাতার জন্মবৃত্তান্ত একেবারেই সাদামাঠা ছিল না।

কলকাতাকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাংলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বেছে নেওয়ার ব্যাপারে জোব চার্নকের দূরদৃষ্টি ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, পঁয়ত্রিশ বছর আগেও জোব চার্নক বাংলায় আসেন। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর চাকরিতে পদোন্নতি হয় ও তিনি হুগলি অঞ্চলের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কারখানাগুলির প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

এর কিছু পরের ঘটনা। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্ট্যাফোর্ড-এর অধীনে একটি ইংরাজ জাহাজ হুগলি নদীতে নোঙর ফেলে—ওই জায়গাটি বর্তমান গার্ডেনরিচ অঞ্চল। ক্যাপ্টেন সাহেবের ইচ্ছা, আঞ্চলিক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। ওই সময়ে ইংরাজি ভাষা এ-অঞ্চলে নতুন। ফলে সেই ভাষায় পারদর্শী লোকজনের যথেষ্ট অভাব ছিল। সুতরাং কথোপকথনে ইংরাজি ভাষা বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ইংরাজদেব আসা-যাওয়া যে একদম ছিল না, তা নয়। তার ফলে কিছু শব্দ, আকার-ইঙ্গিত ইত্যাদির মাধ্যমে গণসংযোগ অসম্ভব ছিল না। ইংরাজ সাহেবদের সঙ্গে কথাবার্তায় সামান্য অভিজ্ঞতা ছিল এক বাঙালির। নাম রতন সরকার, পেশায় রজক। অগত্যা রতনই সেই জাহাজে উঠল। দোভাষীর কাজের জন্য তার অভ্যর্থনার অভাব হল না। সেই সঙ্গে জুটল প্রচুর উপহারসামগ্রী। ক্রমে ক্রমে এই অঞ্চলের ব্যবসায়ী ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে ইংরাজিতে খবরাখবর আদান-প্রদানের জন্য রতন যোগাযোগকারীর কাজ করতে লাগল। ইতিমধ্যে ১৬৮০-তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দপ্তর বা কুঠি স্থাপিত হল গড় গোবিন্দপুরে, বর্তমান কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে। কিছুকালের মধ্যে এই কুঠি থেকে অনতিদূরে আর একটি কুঠিও গড়ে উঠল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরাজ বণিকেরা মাদ্রাজে তাদের প্রধান দপ্তর স্থাপন করে। সোরা ছিল বাণিজ্যের অন্যতম পণ্য এবং সেইজন্যে তাদের হুগলি নদী দিয়ে প্রায়শই যাতায়াত করতে হত। পথে পড়ত পাটনা ও ঢাকা। তদানীন্তন মুঘল বাদশার কাছে এটা ভাল ঠেকেনি। ইংরাজরা এটা অনুমান করে ১৬৭৭-১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে একটা সরকারি অনুমোদন পত্র বের করে। ফলে বাংলা অঞ্চলে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা পায়।

ইংরাজদের এ-অঞ্চলে আসার অনেক আগে, গোবিন্দপুরে শেঠ ও বসাক পরিবারেরা

বসবাস শুরু করে। এদেরই সম্ভবত কলকাতার প্রথম বাসিন্দা বললে অত্যুক্তি হবে না। শেঠ ও বসাকদের বসবাস থেকে বোঝা যায় তখনকার কলকাতা উপেক্ষণীয় ছিল না। সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারবার চলত। তাছাড়া প্রথম যুগের কলকাতায় কিছু সংখ্যক ধনী ব্যবসায়ীও ছিল।

১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুলাই ইংরাজ তরী হুগলি নদীতে প্রত্যাবর্তন করে। সেই দিনটি তারা উদযাপন করল ৩০টি তোপধ্বনি দিয়ে। এই ঘটনার আরো ছয় বছর পরে ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ সুতানুটিতে বৃটিশ পতাকা উত্তোলিত হয়।

মোটামুটি সেই সময় থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি শুরু হল। ব্যবসায়ীরা হল ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা—পর্তুগিজ, ফরাসি এবং ওলন্দাজ। এরা সবাই আগে থেকে এ-অঞ্চলে এসে ব্যবসা শুরু করে। এদের সঙ্গে ছিল এখানকার ব্যবসায়ীরা। এর অনেক আগে, ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে যে-আর্মেনীয়রা এখানে ব্যবসা করতে এসেছিল, পরবর্তিকালে তারা ইংরাজ ব্যবসায়ীদের দালালের কাজ করত।

জোব চার্নক কলকাতায় পৌঁছোলেন ১৬৯০-এর ২৪ অগাস্ট রবিবার দুপুর বেলায়। সঙ্গে এল তার উপদেষ্টামণ্ডলী ও ৩০ জন সৈন্য। হুগলির রাজ্যপাল, মীর আলি আকবর তাঁকে সৌহার্দ্যপূর্ণ স্বাগত জানালেন। কারণ আগে থেকেই নবাব রাজ্যপালকে এই মর্মে আদেশ দিয়েছিলেন যে, বন্ধুত্বপূর্ণ সৌহার্দ্যের ব্যাপারে জোব চার্নকের যেন বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ না থাকে। পরে ১৬৯১-এর ১০ ফেব্রুয়ারি একটি ফরমান জারি হয়। এই ফরমানে পরিষ্কার করে বলা হয় যে, বৃটিশেরা বাংলায় স্বচ্ছন্দে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে, তবে তার জন্য তাদের বছরে ৩০০০ টাকা করে দিতে হবে।

জোব চার্নক কলকাতায় আসার পরের দিন, অর্থাৎ ১৬৯০-এর ২৫ অগাস্ট, কয়েকজন পূর্ব-পরিচিত বাঙালির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরা তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

কলকাতার পুরনো শেঠেরা ও বসাকেরা জঙ্গল ও অনাবাদী জমি পরিষ্কার করে দখল নেবার জন্য ইংরাজদের পরামর্শ দেন। তাঁরাও একইভাবে কোনো অনুমতি ছাড়াই জমি দখল করে নেন। সেই সময়ে কলকাতা পরগণার উত্তরে ছিল সুতানুটি হাট। এসবের পত্তন করেন কলকাতার আদি বাসিন্দা শেঠ ও বসাকেরা।

উত্তর কলকাতার হাটখোলা অঞ্চলে জোব চার্নক বসতি স্থাপন করলেন, আর সেই থেকেই এই অঞ্চল ঘিরে কলকাতা বেড়ে উঠতে লাগল। সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর কাছাকাছি গ্রাম। বাকি অঞ্চল ঘন জঙ্গল—সেখানে হিংস্র বন্য পশুর আনাগোনা, সেই সঙ্গে সাপের প্রাদুর্ভাব। এর উপর এই অঞ্চলে ঘাতক ডাকাতও কমতি ছিল না।

প্রায় তিনশো বছর আগের পুরনো কলকাতার একটা রূপ পাওয়া যেতে পারে সুন্দরবন অঞ্চলের ছোটখাটো গ্রামগুলোর মধ্যে। চারদিকে জঙ্গল, পশুপাখিতে জমজমাট, বুনো গাছের গন্ধ, গাছের ডালে মৌচাক, সামান্য ধানের জমি—এ-সবই পুরনো কলকাতায় ছিল। নানা বন্য পশু তখনকার কলকাতায় বিচরণ করত। জোব চার্নকের সময়ে এখনকার ময়দান অঞ্চলে লোকেরা বুনো শুয়োর শিকার করত। কলকাতা থেকে অনেক দূরের গ্রামে কাঁচা ঘরই ছিল প্রধান, বেশ কয়েকটা ঘর নিয়ে এক-একটা পাড়া। যে-জাতের মানুষ সেখানে বাস করে তাদের নিয়েই পাড়ার নাম। জাত-পাত, বর্ণজাতি নিয়ে ছোটখাটো ভেদ ও বিভেদ পূর্বতন কলকাতায় যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল।

১৬৯৮-এ রায়চৌধুরিদের কাছ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর কিনে নেয়। মালিক বিদ্যাসাগর রায় এর জন্য দাম পেয়েছিলেন ১১৯৪ টাকা ১১ আনা ১১ পাই। এই তিনটি গ্রামের বিস্তার নীচের তালিকায় দেখানো হল :

গ্রাম	বিস্তার
সুতানুটি	১৬৯২ বিঘা ১২ কাঠা (২২৮ হেক্টর)
কলিকাতা	২২০৬ বিঘা (২৯৭ হেক্টর)
গোবিন্দপুর	১১৭৮ বিঘা ৭ কাঠা (১৫৯ হেক্টর)

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জমি-জায়গা কেনার পর তা ব্যবসায়ী ও সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বণ্টন শুরু করেন। জমির গড় দাম ছিল ৯ টাকা একর অর্থাৎ হেক্টরে ২২ টাকার মত। টাকা-পয়সা আদায়ের জন্য কোম্পানি একজন কালেকটর নিয়োগ করেন। সেই সঙ্গে এই অঞ্চলের নকশা তৈরি হয়।

এরপর ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অতি দ্রুত কলকাতার ক্রমবিবর্তন হয়। গ্রাম সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর শহর কলকাতায় পর্যবসিত হল। ইতিমধ্যে তিরাশি একরের (৩৩·৬ হেক্টর) কলিকাতা ও উনিশ একরের (৭·৬ হেক্টর) বাজার (বর্তমান বড়বাজার) নিয়ে শহর শুরু হল। এখানেই বেশির ভাগ লোকজনের বাস, সেই সঙ্গে বাসস্থানও গড়ে উঠতে লাগল। বাকি জায়গা বসতের নয়—চাষবাসের। ধান ক্ষেত, সব্জি, তামাক ও পানচাষের জায়গা। একই সঙ্গে চলতে লাগল কোম্পানির ব্যবসা ও রাজস্ব আদায়। মুকুন্দরাম শেঠ কলকাতার আদি বাসিন্দা—তাঁর নবম পুরুষ জনার্দন শেঠ কোম্পানির দালাল হিসাবে নিযুক্ত হলেন ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে। এ-থেকে এ-কথা পরিষ্কার যে, অন্যূন ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কলকাতায় মোটামুটি বসবাস শুরু হয়েছিল।

কলকাতার রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত ছিল কোম্পানির কালেকটর বা আদায়কারী—তার সঙ্গে সাহায্যকারীও থাকত। ১৭০৫-এ এই পদে নিযুক্ত ছিল জনৈক নন্দরাম। ১৭২০-এ গোবিন্দরাম মিত্র সেই পদ অধিকার করে ও দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর চাকরি করে। এদের মাইনে ছিল যৎসামান্য কিন্তু ক্ষমতা ছিল প্রচুর। এই ক্ষমতাই বাড়তি টাকা জোগাত, অবশ্যই অন্যায়ের পথে। শহর উন্নয়নের জন্য বিশেষ কিছু তহবিল ছিল না। কিন্তু শহরের আইন-অমান্যকারীদের কাছ থেকে যে জরিমানা পাওয়া যেত তা ছোটখাটো উন্নয়নের কাজে খরচের কথা ছিল। ১৭০৬-এ প্রথম পুলিশি ব্যবস্থার শুরু। একজন প্রধান—তার অধীনে ৪৫ জন কনেস্টবল, ২০ জন চৌকিদার ও ২ জন কেরানি। পরে ৩১ জন পাইক নিয়োগের ব্যবস্থা হয়।

কলকাতায় পৌর প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত ১৭২৭-এ। এর সভাধিপতিকে বলা হল মেয়র। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য থাকবেন ন'জন অল্ডারম্যান। হলওয়েল কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রথম মেয়র। সেই সময়ে বৌবাজার স্ট্রিট ছিল দুই কলকাতার সীমানা, উত্তর ও দক্ষিণ। উত্তর কলকাতায় স্থানীয় অধিবাসীদের বাস আর দক্ষিণ কলকাতা ইংরাজদের।

পুরনো কলকাতার আয়তন ছিল ২২০৬ বিঘা বা ২৯৭ হেক্টরের মত। তখনকার কলকাতা ছিল ডিহি কলিকাতা। অবশ্য একে ঘিরে কাজকর্ম ছিল আরও পঞ্চান্নখানা

গ্রামের—তাই পরগণা কলিকাতাও বলা হত। সে-সময়ে কলকাতা ছিল জলা-জঙ্গল। বিস্তীর্ণ অঞ্চল অনেকাংশে নীচু বলে জলার সংখ্যাও কম ছিল না। এর মাঝে চাষের জমি। তাই এখানকার লোকের প্রধান জীবিকা ছিল চাষবাস ও মাছ ধরা। অধিবাসীরাও প্রধানত ছিল কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী—জাতে ছিল বাগ্‌দী, পোদ ও তিওর। আর ছিল মুসলমান। এদের মধ্যে সম্ভবত মণ্ডলরা ছিল উপরের দিকে। ধর্মে হিন্দু অথবা মুসলমান হলেও নামের শেষে পদবী থাকত মণ্ডল। এরাই ছিল জমির মালিক বা অঞ্চলের প্রধান লোক। ঠিক এই রকমের অবস্থা, জীবিকা, ধর্ম ও নাম নিয়ে এখনও উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় অনেক পুরনো গ্রাম আছে। শুধু আগের কালে নয় এখনও অনেক গ্রামে রোজ বাজার বসে না। বেশ কয়েকখানা গ্রাম নিয়ে হাট বসে। সপ্তাহে সাধারণত একবার, কোথাও বা দু'বার। কলকতার কাছাকাছি সে-রকম হাট ছিল সুতানুটিতে। হুগলির পূর্ব তীরে সুতানুটি থাকার জন্য, পূর্ব দিকের গ্রাম থেকে লোকেরা হাঁটাপথেই আসত। অবশ্য দূরের বা পশ্চিম তীরের গ্রাম থেকে আসা-যাওয়া চলত নদী পথে—নৌকা, ডিঙ্গি বা শালতি করে। মোটামুটি ভাবে কেনা-বেচা হত বদলা-বদলি করে—তা না হলে কড়ি দিয়ে। অবশ্য ভারতবর্ষে অনেক আগে থেকেই ধাতব মুদ্রার প্রচলন ছিল।

গ্রামের স্বনির্ভরতার জন্য প্রতি গ্রামেই বিভিন্ন জীবিকার লোক বাস করত। কৃষিজীবী এবং মৎস্যজীবীরা সংখ্যায় অধিক এবং তাদের জীবিকার জন্য তারা অর্থনীতিতে একটু উপরে। এছাড়া গ্রামে থাকত রজক, নাপিত, কুমোর, কামার, তেলি—এ ধরনের নানা জীবিকার লোক। সাবেক কলকাতাতে জাতপাতের দিক দিয়ে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ছিল। যেমন, পাল্কী বেহারাদের আয় বেশ ভাল হওয়া সত্ত্বেও বাগ্‌দী বলে তাদের স্থান সামাজিক কাঠামোয় ছিল নীচের দিকে।

কলকাতায় যে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জীবিকার মানুষ ছিল—তার পরিচয় পাওয়া যায় জায়গার নামে। চুনাপুকুর বা চুনাগলি নির্দেশ করে যে, সেই অঞ্চলে চুন তৈরির লোকেরা বা চুনের ব্যবসায়ীরা থাকত। একই ভাবে যারা নুন তৈরি করে তাদের বলা হয় মলঙ্গী—তাদের বসবাসের জায়গার নামও হয়েছিল মলঙ্গী। এইরকম যেমন নানা জীবিকার মানুষ ছিল, বর্ণের ব্যাপারেও ঠিক তেমনি দেখা যায়। সে সময় ব্রাহ্মণেরা ছিল নরশ্রেষ্ঠ। কলকাতার আদি বাসিন্দাদের অন্যতম সাবর্ণ চৌধুরি, বর্ণে ব্রাহ্মণ। এদের পূর্বপুরুষদের একজন রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজস্ব আদায়ের অধিকর্তা ছিলেন। পরবর্তিকালে তিনি তাঁর সমর্থন বদলে মুঘলদের কাছাকাছি আসেন। ফলস্বরূপ কলকাতার এক বিরাট অঞ্চল দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়। ইনি কালী মন্দিরের পুরোহিত এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট আনুকূল্য প্রদান করেন। কলকাতায় সাবর্ণ চৌধুরিদের বিরাট জমিদারি ছিল। অনুমান করা যায় যে, একাধারে ব্রাহ্মণ ও জমিদার হওয়ার জন্য তৎকালীন সমাজে তাঁর একটা বিশেষ স্থান ছিল।

সাবর্ণ চৌধুরির মত আরো একজন জমিদার ছিলেন কলকাতায়—তিনি নদীয়ার রাজা। অবশ্য এটা ঠিক যে অন্য গ্রাম বা অঞ্চলের থেকে কলকাতার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। কলকাতা প্রথম থেকেই ব্যবসাকেন্দ্রিক—তাই সমাজে জমিদার, ব্যবসায়ী এইসব শ্রেণীর ধনী লোকদের মান মর্যাদা বেশি ছিল। এইজন্যই বেনে বা বেনিয়াদের, সুবর্ণ বণিক ও গন্ধ বণিক উভয় সম্প্রদায়েরই, কলকাতায় অনেকদিন পর্যন্ত একটা বিশেষ স্থান ছিল—এখনও যে সেই স্থান তার বিশেষত্ব পুরোপুরি হারিয়েছে তা বলা যায় না।

সাধারণভাবে জাতের কাঠামোয় বেনেদের স্থান খুবই নীচে। তাদের প্রধান জীবিকা

ব্যবসা-বাণিজ্য, সেই সঙ্গে সুদে টাকা ধার, দালালি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজকর্ম। প্রথম থেকেই বিদেশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাদের একটা ভাল সম্বন্ধ ছিল। সেই সুবাদে তাদের অনেকেই বেশ মোটা রকমের অর্থ রোজগার করে। টাকা পয়সার সঙ্গে এদের বিলাস-ব্যসনেরও বহর ছিল প্রচুর। বাড়ি-ঘর, আসবাবপত্র সবই খুব উঁচু দরের। তাছাড়া এঁদের দান ধ্যানের সুখ্যাতি ছিল। অন্যদিকে সাবেক কলকাতা অঞ্চলেও ইংরাজদের প্রভাবমুক্ত মানুষদের বড় একটা কদর ছিল না।

চাষ-বাস, মাছধরা ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া কলকাতাতে একটা নতুন জীবিকার প্রচলন হয়েছিল। বহু আগে থেকেই ব্যবসার কাজে বিদেশি জাহাজ এ অঞ্চলে আসত বলে লোকে ক্যাপ্টেন ধরা'র কাজ করত। এই কাজে কলকাতার আদি ধনী বাসিন্দা শেঠ এবং বসাকরাও যুক্ত ছিল। অবশ্য সেই সঙ্গে তাদের-সুতো ও কাপড়ের ব্যবসা ছিল একচেটিয়া। 'ক্যাপ্টেন ধরা' কাজে মূলধনের বড় একটা প্রয়োজন ছিল না—তাই বেশ কিছু বেনিয়া এই কাজ করে শুধু যে স্বনির্ভর হয়েছিল তাই নয়, কালে কালে কলকাতার সমাজে তাদের স্থান ও প্রতিপত্তি অনেক উপরে পৌঁছেছিল। একই সঙ্গে সমসাময়িক ইংরাজদের সঙ্গে তাদের ওঠা-বসা বেড়ে যায়, ক্ষমতাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। অবশ্য পরবর্তিকালে এই ব্যবসা অনেকাংশেই লোপ পায়। তখন ইংরাজরা তাদের অধিকৃত এলাকা ও শক্তি অসম্ভব বাড়িয়ে ফেলেছে।

তৎকালীন সমাজে আর একটি শ্রেণী ছিল। তাদের বলা হত দেওয়ান। তাদের কাজও মধ্যস্থতা বা দালালির সামিল, তবে তা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে নয়—তা নিবদ্ধ ছিল আইনকানুন ও রাজস্ব করের ক্ষেত্রে। বেনিয়াদের তুলনায় সংখ্যায় তারা ছিল কম। কিছু কিছু লোকের মধ্যে দেওয়ান ও বেনিয়ার কাজ—দুটিই একই সঙ্গে চলত। কোম্পানির প্রশাসন, আইন-কানুন ও রাজস্ব আদায়ের কাজেও স্থানীয় লোকদের তরফ থেকে দেওয়ান নিয়োগ করা হত। দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিং তাঁদেরই একজন।

গঙ্গা গোবিন্দ সিং প্রথম জীবনে রাজস্ব আদায়ের কাগজপত্রের সংরক্ষণের কাজ করতেন এবং কালক্রমে দেওয়ান নিযুক্ত হন। সেই সময়ে তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের খুব কাছের লোক হয়ে ওঠেন। হেস্টিংসের সঙ্গে কাউন্সিলের যে-বিবাদ বাধে তাতে গঙ্গা গোবিন্দ হেস্টিংসের পক্ষে কাজ করেন এবং সেইজন্য তাঁর চাকরি যায়। পরে অবশ্য হেস্টিংসের সমর্থনে তিনি আবার দেওয়ান হন। গঙ্গা গোবিন্দ রাজস্ব সংক্রান্ত কাজকর্ম অসম্ভব ভাল বুঝতেন। তাঁর সম্পর্কে দুর্নীতি সংক্রান্ত অনেক অভিযোগ আছে। কিন্তু তার প্রমাণ মেলা ভার। গঙ্গা গোবিন্দের সুনজর পাওয়ার জন্য বড় বড় জমিদারেরা তাঁর পিছনে পিছনে ঘুরতেন। এই সুযোগে গঙ্গা গোবিন্দ প্রভূত অর্থ উপায় করেন। তাঁর ধনসম্পত্তি সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত ছিল। কোর্টের কাগজপত্র অনুসারে প্রকাশ যে, গঙ্গা গোবিন্দ তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে (অষ্টাদশ শতাব্দীর আশির দশকে) ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা খরচ করেন। অমন শ্রাদ্ধ বাংলাদেশে একমাত্র টাকার শ্রাদ্ধ। সেই শ্রাদ্ধের খরচের হিসাবে দেখানো ছিল দুটি পুকুর। একটি ভোজ্য তেলের, অপরটি ঘিয়ের। অবশ্য এই রকম অপচয় করেই গঙ্গা গোবিন্দের টাকা শেষ হয়।

পুরনো কলকাতার লোকদের কথায় অনেক বিদেশি লোকজনের কথা এসে পড়ে। এদের মধ্যে যারা প্রথমে পৌঁছয় তারা হল আর্মেনীয় ও পর্তুগিজ। এই দুই জাতিরই কলকাতায় আসার কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য। এ-অঞ্চলে আর্মেনীয়দের আগমনের ব্যাপারে যে সব নথীপত্র পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পারস্যের ইস্পাহানের নিকটবর্তী নব জুলফা থেকে

কলকাতায় এদের আগমন শুরু হয়। পরবর্তিকালে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। কলকাতার বসবাস পাকা করবার জন্য আর্মেনীয় ও পর্তুগিজেরা উত্তর অঞ্চলে গির্জাও স্থাপন করে। ইংরাজরা আসার পরে তাদের বড় রকমের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হলেও ওই দুই জাতি একেবারে কলকাতা ছেড়ে যায়নি।

কলকাতায় নগর পত্তনের প্রারম্ভ থেকেই একটা সমন্বয়ের ভাব লক্ষ্য করা যায়। এর আগে থেকেই কলকাতায় লোক সমাগম শুরু হয়েছে। গ্রাম কলকাতার রূপেও পালাবদল নজরে আসে। কোম্পানির ১৭০৭-এর এক সমীক্ষা ও জরিপ অনুযায়ী দেখা যায় যে, বাজার অঞ্চলটা ছিল পুরাতন দুর্গ থেকে প্রায় এক কিলোমিটার উত্তরে। সেখানেই পুরনো কাল থেকে বাড়ি-ঘর তোলা শুরু হয়েছে। এই অঞ্চলের লোকসংখ্যাও ছিল অনেক। ফলে মোট ৪৮৮ বিঘার (৬৫ হেক্টর) মধ্যে ৪৮০ বিঘাতে (৬৪ হেক্টর) বসতি স্থাপন হল। শহর কলকাতায় আনুপাতিকভাবে বসতি কম, মোট ১৭১৭ বিঘার (২৩১ হেক্টর) মধ্যে ২৪৮ বিঘায় (৩৩ হেক্টর) বাড়িঘর। সুতানুটি ও গোবিন্দপুরে মোট জমি ও বসবাসের জমির অনুপাত আরো কম। তা হল যথাক্রমে : ১৬৯২ : ১৩৪ এবং ১১৭৮ : ৫১। এইসব জায়গার তৎকালীন অরণ্য অঞ্চলের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল :

স্থান	অরণ্য অঞ্চল (হেক্টর)
কলিকাতা	৩৫
সুতানুটি	৬৫
গোবিন্দপুর	৬৮

কলকাতাকে গড়ে তোলার কাজে প্রায় ১৩০০ বিঘা (১৭ হেক্টর) অরণ্যকে ধ্বংস করা হয়েছে, অধিগ্রহণ হয়েছে নগরের। সেই সময়ে বাজার অঞ্চলে অনেক বাগান ছিল—ওখানে অনেক কর মকুব করা জমি ব্রাহ্মণদের দেওয়া হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলকাতার প্রধান অঞ্চলগুলি হল সাহেবদের কলকাতা বা শহর কলকাতা। স্থানীয় মানুষদের বসতিপূর্ণ গোবিন্দপুর, বাজার অঞ্চল (এখনকার বড়বাজার) ও সুতানুটিতে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হল—বিশেষ করে কাপড়ের ব্যবসা। এই অঞ্চল ঘিরে অনেক গ্রাম বা ডিহি ছিল যেখানে দেখা যায় চাষী ও জেলেদের বাস।

পর্তুগিজ ও আর্মেনীয় ছাড়া এখানে গ্রিকদেরও বাস ছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রিকদের সম্বন্ধ অনেক পুরনো। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্যে গ্রিক মুদ্রা ও মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। তবে কলকাতায় গ্রিকদের আনাগোনা আরো পরে। এরা ব্যবসায়ী হয়ে এসেছিল ; পরে ব্যবসা ছাড়া টাকা ধার দেওয়ার কাজকর্মও শুরু করে।

ঔপনিবেশিক শহরে বাসস্থানের ব্যাপারে যে-বিশেষ ধাঁচ দেখা যায়—কলকাতা সেদিক থেকে কোনো ব্যতিক্রম নয়। শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত কলকাতা উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘতর, সেই অনুপাতে পূর্ব-পশ্চিমে নয়। সাবেকী ইংরাজদের কলকাতায় ছিল তিনটি অংশ : দক্ষিণে ইংরাজদের কলকাতা, উত্তরে বাঙালিদের কলকাতা, আর এই দুইয়ের মাঝামাঝি একটা মধ্যবর্তী অঞ্চল—সেখানে বসবাস ছিল ইংরাজ ছাড়া অন্যান্য বিদেশিদের। তখন কলকাতা ছিল ইউরোপীয়দের কলকাতা, ভারতীয়দের কলকাতা ও ইঙ্গ-ভারতীয়দের কলকাতা। আসলে অন্যান্য বিদেশিদের ইংরাজরা খুব একটা সুনজরে দেখতেন না।

ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরাজদের সম্বন্ধ ছিল দ্বৈত। একদিকে 'কালা আদমি', 'নেটিভ'—সম্পর্ক দূরের। আবার দৈনন্দিন প্রয়োজনে ধোপা, নাপিত, দুধওয়ালা, বাড়ির ভৃত্যেরা নিকটে না থাকলে বিশেষ অসুবিধা। এ-মত অবস্থায় তাদের বসবাস একেবারে কাছের না হলেও খুব একটা দূরে রাখা যায় না। সেকালের মধ্যবর্তী কলকাতায় যারা জায়গা-জমি কিনেছিলেন তাদের নাম থেকেই তাদের সম্বন্ধে, বিশেষ করে তাদের জীবিকা ও সামাজিক প্রতিপত্তির, একটা পরিচয় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে আছে জুঙ্গু খালাসি, রমজান পিওন, জ্ঞানদা ছোবদার, নকু খিদমতগার, সহীর সারেঙ—এমন সব লোকজন।

বস্তি সম্বন্ধে লোকের ধারণা তখনও ছিল। সেই পুরনো কলকাতায় নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর বস্তিও ছিল—কিন্তু কখনোই ইংরাজ কলকাতা অঞ্চলে নয়, তা ছিল বরাবর বাইরে। নগরপত্তনের শুরুতেই কাছাকাছি অঞ্চলের জঙ্গল কাটা পড়ল, বস্তি উচ্ছেদ হল উপরের তলার লোকদের বসবাসের জন্য। এই সময়ে বর্তমানের কলেজ স্ট্রিট ও কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (আধুনিক বিধান সরণি) অঞ্চল নগর উন্নয়নে সামিল হয়। গোবিন্দপুরে একদিকে হুগলির ভাঙনে অন্যদিকে ইংরাজদের প্রয়োজনে বাসিন্দাদের জায়গা বদলাতে হল। সেই সঙ্গে বাজার অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাওয়ায় সবদিকেই এর প্রসার ঘটে। পরবর্তী কালে এই বাজার অঞ্চলে নগর সভ্যতা বিশেষ কার্যকরী হয়। তবে বাজার অঞ্চলে সঠিক ঐতিহ্য ফুটে ওঠে না, কারণ সেখানে পাঁচমিশেলি একটা ব্যাপার থাকে। কিন্তু কলকাতার মত বাণিজ্যকেন্দ্রিক নগরে ওই বাজারই শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। উত্তরের কলকাতা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে, বিভিন্ন রুজি-রোজগারের মানুষ নিয়ে টোলা, টুলি বা পাড়া গড়ে ওঠে। এইসব পাড়ার সঙ্গে বড়বাজারের যোগাযোগ যেমন ছিল, তেমনি এই অঞ্চলে ছোট ছোট বাজারেরও পত্তন হয়। এইজন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন চোখে পড়তে শুরু করে। ধনীরা বিশেষ করে বেনে ও দেওয়ানরা সম্পত্তি বাড়ানোর দিকে ঝোঁকে। জমি কেনাবেচা জোর কদমে চলতে থাকে দীর্ঘকাল ধরে। ওই জমিতে হয় বাজার বসে বা বস্তি বানানো হয়—যা থেকে নিয়মিত ভাড়া আসতে থাকে।

রাজা-রাজড়া ও বড় জমিদারদের জায়গায় ছোট জমিদার তৈরি হতে শুরু করে—তারা হল ওই বেনে ও দেওয়ানের দল। ফলে এক নতুন নাগরিক সভ্যতার জন্ম হল যেখানে ব্যবসা, রাজনীতি ও সামরিক পরিবেশ ছিল না। এছাড়া জাতিগত কাঠামোও বিশেষভাবে নাড়া খেল। আগে এই ব্যবস্থাটা অনড় ছিল। ভেদাভেদ, ছোঁয়াছুঁয়ি, খাবার বা জলের কল—সবই চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। নতুন ছোট জমিদাররা যখন বাড়ি তৈরি শুরু করলেন—তখন তা শুরু হল বিশেষ করে ভাড়া দেবার জন্য। ভাড়াটের ব্যাপারে জাতপাত, শ্রেণী, বর্ণ সবই বাহ্য—শুধু ভাড়ার টাকাটাই মুখ্য। বাড়ি বা জমি থাকার জন্য সমাজে তাদের স্থানও উন্নত হল, অবশ্য এ-বিষয়ে তাদের চেষ্টারও ত্রুটি ছিল না।

এই ব্যাপারে তাদের তৈরি বাড়িঘরের স্থাপত্য-নিদর্শন মেলে। স্থাপত্যে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ ভঙ্গীর সংমিশ্রণ বিদ্যমান। ভিতরের উঠান একটা বড় দিক যা সেকালের কলকাতায় বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সেখানে পূজা-পার্বণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। কলকাতার নামী বাসিন্দারা সবাই কলকাতাকে তাঁদের পূর্বতন আবাস বলতেন—জঙ্গল কেটে যে-কলকাতা তাঁদের তৈরি। কলকাতার বাঙালি বাসিন্দাদের মধ্যে সামান্যতম রেষারেষি থাকলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে মিলের বহর ছিল অনেক বেশি। অথচ একই সময়ে কলকাতার বাইরে গ্রাম-গঞ্জের চেহারা ছিল অন্যরকম।

নগর সভ্যতার গতিতে সমাজের কোনো শ্রেণীর লোকেরাই পিছিয়ে থাকে না—এক শ্রেণীর অগ্রগতিতে অন্য শ্রেণীও এক সঙ্গে এগিয়ে চলে।

বলা প্রয়োজন যে, সে-সময়ে পরিবার বলতে যৌথ পরিবারই ছিল। এ-জন্য পরিবারের লোকসংখ্যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেছে। সেই অনুপাতে সম্পত্তি বা টাকা পয়সা না বাড়ায় এক কালের অনেক ধনী ব্যক্তির ভিটে পরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। সাতপুরুষের জন্য যে অট্টালিকা অনেক ব্যয়ে তৈরি হয়েছিল, দুই পুরুষ পরে তার চরম অবক্ষয় ঘটেছে।

এককালে কলকাতায় পাড়া-বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণভাবে পাড়া অর্থ এক জীবিকার মানুষ। একদিকে যেমন কোঠাবাড়ি তেমনই কাছাকাছি কাঁচা ঘর। এই দুই সম্প্রদায় অবশ্যই প্রধানত দুটি অর্থনৈতিক শ্রেণীর। অবশ্য এই বিভেদ থাকলেও দুই শ্রেণীই একে অপরের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল—এটিও নাগবিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য।

উপরের তলার পরিবারদের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল। এইজন্য দলও তৈরি হল। দলের সঙ্গে সঙ্গে দলীয় জমির পরিমাণ বিশেষভাবে যুক্ত। একটা জমি, সে বড় ধরনের বাড়ি হোক বা বস্তি হোক, শুরু হয় কিছু ভাড়াটে নিয়ে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় মানুষের প্রয়োজন বেড়ে চলে। আবার অন্য জায়গার মানুষ কলকাতায় আসে ভাগ্যের খোঁজে বা বাঁচার তাড়নায়। এইসব মানুষ আসা শুরু করে বিভিন্ন জায়গা, অঞ্চল এমনকি প্রদেশ থেকে। বসতি বেড়ে চলে—আয়ের টাকাও সীমা ছাড়িয়ে যায়। প্রামাণ্য দলিলের ভিত্তিতে প্রকাশ যে, কৃতী ব্যবসায়ী শোভারাম বসাকের বড়বাজার অঞ্চলেই ৩৭টি বাড়ি ছিল। এছাড়া মধ্য ও উত্তর কলকাতাতেও ছিল তার জমি, বাগান আর পুকুর। ১৮২৫-এ রামদুলাল দে-র মৃত্যুর পরে তার সম্পত্তির মূল্য ছিল ৫ লাখ টাকা—যার থেকে বাৎসরিক আয় হত ২৫ হাজার টাকা। জোড়াসাঁকোর সিংহীদের সম্পত্তি ছিল ৮ লাখ টাকার উপরে। ঠাকুর পরিবারের দ্বারকানাথও কৃতিপুরুষ। তিনি কলকাতার উপকণ্ঠে বাড়ি ও জমিতে অনেক টাকা ঢেলেছিলেন। কলকাতার কাছাকাছি বড় জমিতে ধনী-মানী লোকদের বাড়ি, বাগান, পুকুর এইসব ছিল। এইভাবে সম্পত্তিতে মূলধন লাগানোর সম্ভবত বিশেষ কারণ থাকতে পারে। প্রথমত অন্য ব্যবসায়ের মত সম্পত্তিতে ক্ষয়-ক্ষতি প্রায় নেই বললেই চলে। আর সম্পত্তির সঙ্গে মান ও মর্যাদারও যোগাযোগ আছে। অন্যদিকে এইভাবে জমি কেনা ও তার উন্নয়নের ফলে কলকাতার উন্নয়ন তাড়াতাড়ি হয়েছে। ঠিক একই ভাবে ভাড়া দেবার জন্য বড় বাড়ি ও বস্তি তৈরি হয়ে লোক সমাগমের পথকে সহজতর করেছে। কারণ নগরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জনসংখ্যা অন্যতম। জনসংখ্যা কম হলে সবরকম উন্নয়ন সত্ত্বেও কোনো অঞ্চলকে নগর হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায় না।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই কলকাতায় জোর কদমে বাড়িঘর তৈরি শুরু হলেও সেই সময় পর্যন্ত কুঁড়েঘরের প্রাধান্য ছিল বেশি—অবশ্য খড়ের বদলে টালি ছাওয়া ব্যবস্থার আইন প্রণয়ন হয়। কুঁড়েঘর ও বাড়ি পাশাপাশি তৈরি হলেও বড়লোক ও মধ্যবিত্তদের সঙ্গে সমাজের নীচের তলার মানুষের একটা দূরত্ব থেকেই গিয়েছিল। এই সমস্যাটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় প্রকটভাবে প্রতিভাত হয়। ফলস্বরূপ সমাজের বিভিন্ন বিত্ত ও বৃত্তির শ্রেণীদের আলাদা আলাদা অঞ্চল গড়ে ওঠে।

ওই একই সময়ে হুগলির ধার থেকে কলেজ ও কর্নওয়ালিস স্ট্রিট পর্যন্ত এলাকায় জায়গা-জমি সম্পত্তির স্তূপে পরিণত হওয়ায় রাস্তাঘাট ক্রমশ সরু হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রায় লীন হয়ে গেল। অন্যদিকে কলকাতার পূর্বাঞ্চলে জঞ্জালের পাহাড় জমা হতে থাকে। একই

সঙ্গে বস্তি আবাসন শুরু হয়। কোনো কোনো বস্তিতে বস্তির মালিক বস্তিবাসীদের সঙ্গে ঘর বাঁধল, অন্যথায় মালিকের সঙ্গে বস্তির সম্বন্ধ থাকে শুধুই ভাড়ার টাকার। এইসব বস্তি ভরে উঠতে লাগল ভিনদেশী মানুষে—সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা, আচার, ব্যবহারে যাদের মধ্যে বাঙালিয়ানা ছিল না। কালক্রমে ওই বস্তিতেই এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম হল, সেখানে ভাষা, আচার-ব্যবহার সব কিছুই মিলেমিশে একাকার। এই সব অঞ্চলে বাঙালি ছাড়া, বিশেষ করে হিন্দুস্থানি (ভাষাগত অর্থে) ও ওড়িয়ারা জমা হতে লাগল। তাদেব পদবীতে স্থান পেল ঘরামি, ঝাড়ুদাব, পরামানিক, দরজি। একই সঙ্গে নানা জাতির বাস, তবে কোথাও এদেব সংখ্যার সমতা দেখা যায় না।

বাজারে যেমন নানা ধরনের লোকজন—জাত, বর্ণ, বিত্ত, শ্রেণী, ভাষা, দেশ ভিন্ন, বস্তিতেও সেই একই রকম। বাজারে লোকজন আসে কেনা-বেচার জন্য, কিন্তু বস্তিতে সবাই বাসিন্দা। তাদের নিয়ে সেখানে গড়ে উঠল আব এক জগৎ। তখনকার বৌবাজাব ও ধর্মতলায় এই বস্তির জগৎ ছিল। অথচ আগে এই একই জায়গায় সনাতনী হিন্দুদের আবাস ছিল—অন্তত নামে সেই বকম নির্দেশ দেখা যায়। পববর্তিকালে ওই একই জায়গায় এল নিম্নবিত্তেব ইউরোপীযরা। অথচ একই সঙ্গে ওই জায়গায় ছোটখাটো অনেক কুঁড়েঘব ছিল—ছিল এক গ্রামীণ লোকালয়। উত্তর কলকাতার চেহারাটা অন্য ধরনেব। সেখানে বিভাজন ও সমন্বয় দুটি একসঙ্গে চলছিল। এরই ফলে বাঙালিবা যেমন জায়গা পাল্টাল, তেমনি বাজারের পরিবেশে জুটল কুমোর, মুসলমান, দরজি, মুদি, মসলা ও গন্ধওযালা, তেলি ইত্যাদি। এদেব বাসস্থানের পবিবেশে ছিল জঙ্গল, মন্দির ও পোড়ো বাড়িঘর।

বাগ্দী, পোদ, তিওর ও মুসলমানদের পুরনো কলকাতায় মণ্ডলদের যে-প্রতিপত্তি ছিল তার পালাবদল শুরু হল। একদিকে বাঙালি ব্যবসায়ী, ধনী জমিদারেরা যেমন কলকাতাকে নিজের করে নিতে লাগল, তেমনি বিদেশিবাও আসা শুরু কবল সুদূর ইউবোপ ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে। সাহেবদের সঙ্গে দালালের পেশা ছিল হিন্দু বাঙালিদের একচেটিয়া, ব্যতিক্রম শুধু উত্তর ভারতেব ক্ষেত্রি পরিবার। এদের বসবাস উত্তর কলকাতায়। মধ্য কলকাতায় সাহেবি পাড়ার বাইরে মুসলমানেরা এল, বিভিন্ন পেশার মানুষ এরা—যেমন, খানসামা, ওস্তাগার, উকিল, মুন্সি। আরও দক্ষিণ-পূর্বে সাহেবদেব প্রয়োজনে মাল্লা, দপ্তরি, কসাইয়েব মত আবো মানুষ এল---এছাড়া ভৃত্যকুল তো ছিলই। অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে রইস মুসলমানদের বাসস্থান গড়ে উঠল। এই অঞ্চলে নানা দেশের ব্যবসায়ীদের আস্তানা স্থাপিত হল—পার্সি বা ইরানি, আবব, আর্মেনীয়, ইহুদি ও গ্রিক। সবাই ভারতবর্ষের আশেপাশের দেশের লোক।

ইহুদিরা কলকাতায় এসেছিল আর্মেনীয়দের বেশ কিছু পরে। এদেবই একজন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কলকাতায় প্রথম মুদ্রণের কাজ শুরু করে। কলকাতায় ইহুদিদের বাগদাদের বলে ধারণা করা হয়। বাগদাদে পর পর বিপ্লব ঘটায় এরা দেশ ছেড়ে এদিকে আসে। এদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার ছিল। আর এদের রূপ সত্যিই অতুলনীয়। বিবাহের ব্যাপারে এরা নিজেদের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ থাকে—অন্য জাতির লোকজনদের সঙ্গে বিয়ের চল ছিল না।

যে-ভারতীয়েরা এইসব বিদেশিদের সঙ্গে সহাবস্থান শুরু করল—তাবা পশ্চিমের গুজরাতি। ওই সব লোকদের বসবাসের জন্য পর্তুগিজ, আর্মেনীয়, ইহুদি, গ্রিক ও পার্সিদের ধর্মগৃহও তৈরি হল। এদের মধ্যে বেশ কিছু লোক ছিলেন মনে-প্রাণে বাঙালি। দৃষ্টান্তস্বরূপ কবিয়াল এন্টনি ফিরিঙ্গির কথা বলা যেতে পারে। তিনি ছিলেন জাতে পর্তুগিজ, পুরনো

কলকাতায় জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেই এই অঞ্চলে নাখোদা মসজিদের পত্তন হয়। এই মসজিদ তৈরির খরচের অনেক টাকাই পশ্চিম ভারতের মুসলমান ও আরব ক্যাপ্টেনদের দেওয়া।

নগর সভ্যতায় জাতি, ভাষা, ধর্ম, পেশা সব যে একই হতে হবে তা নয়—সাবেকী কলকাতাতেও তা হয়নি। আসলে নগর সভ্যতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পুরনো কলকাতায় বেশ জোরদার ভাবেই ছিল। ফলে নানা ভাষা নানা জাতির সহাবস্থানে কোনো অসুবিধা হয়নি। এরা সবাই ব্যবসায়ী—ছোট থেকে বড় সব রকমের পণ্য নিয়েই এদের কারবার। ঘোড়া, পশম, আফিম, গোলাপজল, কাপড়-চোপড় আরো কত কি। এদের বিস্তার ছিল কলকাতা, বাংলা, ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে একদিকে সাংহাই অন্যদিকে লণ্ডন পর্যন্ত।

বাইরের বিদেশিদের চেহারা, চলন, বলন, আদব-কায়দা বাঙালিদের মত নয়। এদের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল যা না-সাহেব—না-বাঙালি। এই মাঝের লোকগুলোর নাম দাঁড়াল 'কালো ফিরিঙ্গি' পরে 'ইউরেশিয়ান'। আরো পরে তা পর্যবসিত হল 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান'-এ।

ইংরাজরা আসার অনেক আগে থেকেই এ-অঞ্চলে খ্রিস্টান ধর্ম চালু হয়েছিল। এ-অঞ্চলের লোকেরাও খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। তাদের একদল শিক্ষিত, ধনী ও সামাজিক স্বীকৃতি যুক্ত, তবে এদের সংখ্যা অবশ্যই খুব বেশি ছিল না। আর একদল ছিল অশিক্ষিত, দরিদ্র ও অনেক নীচু তলার মানুষ। প্রথম দলে ধর্মের প্রতি প্রকৃত টানের একটা ব্যাপার ছিল। কিন্তু পরের দলে যা ছিল অনুপস্থিত। একটু ভাল করে খাওয়া-থাকার সংস্থানের জন্যই তাদের ধর্মান্তর। কলকাতায় এই খ্রিস্টানদের উপস্থিতি ছিল—বিশেষ করে আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে। কলকাতায় যেমন গির্জা তেমনি গাঁয়েতেও; সেখানে এই নূতন কালো খ্রিস্টানরা যিশুর প্রার্থনা করত, সেই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ভাল করে বাঁচবার সুযোগ পেত।

ইউরোপীয়রা সবাই খ্রিস্টান। তাদের মধ্যে অনেকেই গৃহ-পরিবার ছাড়া। অনেকদিন ধরে তাদের কলকাতায় বাস। যৌবনের সঙ্গী হিসাবে তারা দেশি মেয়েদের রাখত প্রায় ঘরণী করে—পুরোপুরি আইনসঙ্গত স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে নয় অবশ্যই। ইউরোপীয় পিতা ও দেশি মাতার যে-সন্তান তারাই 'কালো ফিরিঙ্গি' বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। একটু একটু করে এদের সংখ্যা অনেক হয়ে দাঁড়াল। এরাও খ্রিস্টান—হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। এছাড়াও যে-সব হিন্দু বা মুসলমান সাহেবদের দাসত্ব করত তারা ধর্ম না বদলালেও বিভিন্ন মাংসভুক হওয়ায় সবরকম কাজ করার জন্যে তাদেরও 'খ্রিস্টান' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

এইসব ইউরোপীয়রা পেশায় প্রধানত ছিল করণিক। করণিক পিতার ছেলেও করণিক—একেবারে বংশ পরম্পরায় চলল। পরবর্তিকালে কেরানির চাকরিতে বাঙালিরা এলেও তাদের মাইনে অনেক কম ছিল। আরো পরে যখন বাঙালি ছেলেরা স্কুল-কলেজ থেকে লেখাপড়া শিখে চাকুরিতে এল তখন অবশ্য বৈষম্য অনেকটা কাটল। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়দের মধ্যেও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় জন্ম নিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরো লোকজন এল কলকাতায়। এদের মধ্যে উত্তর ভারতীয়, বিশেষ করে মাড়োয়াড়িরা প্রধান। তাদের ব্যবসা শুরু বন্ধকী, লেন-দেন আর সুদের মত কারবার নিয়ে। ব্যবসার দিকে বাঙালিরাও বাজার অঞ্চলে এগিয়ে এল। প্রধানত সোনার দোকান, ঘড়ির দোকান, তা ছাড়া ছোটখাটো অন্য ব্যবসাও ছিল। মহারাষ্ট্র থেকে লোকদের আগমন আরো পরে।

উনিশ শতকে জাতের ব্যাপারটা একটা নতুন মোড় নিল। একই জাতের লোক একত্রিত হবার দিকে একটা ঝোঁক দেখা গেল, গড়ে উঠল দরজিপাড়া, জেলেপাড়া, শাঁখারিপাড়া, সেকরাপাড়া ইত্যাদি।

বিদেশিদের মধ্যে আরো যারা বেশ বড় সংখ্যায় কলকাতায় বসতি স্থাপন করল তাদের মধ্যে চিনারা (ক্যান্টনি) অন্যতম। কলকাতা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আগে-পরে আরো ভিনদেশি ও ভারতের অন্যান্য প্রান্ত থেকে নানা মানুষজন সেখানে আসে। কালক্রমে এরা বেশির ভাগই এক একটা এলাকা জুড়ে বসবাস শুরু করে। এ-ব্যাপারে শিখ, পাঞ্জাবি ও দক্ষিণীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন সময়ে কলকাতার লোকসংখ্যার কিছু কিছু খতিয়ান আছে। সেই সংখ্যাগুলি পর পর সাজালে লোকসংখ্যা কিভাবে বেড়েছে, তাব যেমন একটা সাদামাঠা হিসাব পাওয়া যাবে, তেমনি কলকাতার ক্রমবিবর্তন ও বৃহদায়তনের একটা পরিচয় জানা সম্ভব হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে বিস্তার—কলকাতার আশপাশের জমি-জায়গা, জঙ্গল পুকুরকে গ্রাস করে চলেছে। এই বৃদ্ধির বিবর্তন থেমে নেই। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার জনসংখ্যার হিসাব মোটামুটি এই ধবনেব .

খ্রিস্টাব্দ	জনসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধি
১৭৫২	৪,০০,০০০	—
১৮৫০	৪,১৩,১৮২	৩ ৩
১৯০১	১,৪৮৮,৩২৩	২৬০·২১
১৯১১	১,৭১৮,৪২৬	১৫·৪৬
১৯২১	১,৮৫০,৬৫০	৭ ৬৯
১৯৩১	২,১০৫,৭০৮	১৩·৭৮
১৯৪১	৩,৫৭৭,৭৮৯	৬৯·৯১
১৯৫১	৪,৫৮৮,৯১০	২৮ ২৬
১৯৬১	৫,৭৩৬,৬৯৭	২৫·০১
১৯৭১	৭,০৩১,৩৮২	২২·৫৭
১৯৮১	৯,৫০০,০০০	৩৫·১১

১৮৭২ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত জনসমীক্ষায় দেখা গেছে কলকাতাবাসীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা নাবীব সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। এই ধবনের অসাম্য প্রভাব ফেলেছিল কলকাতাব জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারেব উপবে। পরের পৃষ্ঠায় কলকাতা কর্পোরেশনের রেজিস্ট্রিকৃত নারী-পুরুষের সংখ্যার হিসাব দেখানো হল।

সন্দেহ নেই, অ-রেজিস্ট্রিকৃত নাগরিকদের সংখ্যা ধবলে কলকাতার প্রকৃত জনসংখ্যা ছিল আবো অনেক বেশি। তবে তাতে নারী-পুরুষেব আনুপাতিক গড় হিসাবে তেমন হেরফের হওয়ার কথা নয়।

S W Goode, 1916 Municipal Calcutta pp 363, Edinburg

খ্রিস্টাব্দ	পুরুষ	নারী
১৮৭২	৪,০৭,৭৪২	২,২৫,২৬৭
১৮৭৬	৩,৮৮,৭৬৬	২,২৩,০১৮
১৮৮১	৩,৯৩,৪৫৩	২,১৮,৮৫৪
১৮৯১	৪,৪৭,১৬২	২,৩৫,১৪৩
১৯০১	৫,৬২,৫৯৬	২,৮৫,২০০
১৯১১	৬,০৭,৬৭৪	২,৮৮,৩৯৩

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে কলকাতার বিস্তার ও বসবাসের ঘনত্ব। পুরনো কলকাতায় অনেক জাতের, দেশের, ধর্মের ও নানা ভাষাভাষী লোকজন ছিল। এত ধরনের লোকজনের মধ্যে বিভেদ-অভেদ দুই-ই থাকা স্বাভাবিক এবং তা ছিলও। তবে সাহেবদের সংখ্যা কম হলেও তাদের ক্ষমতা হল রাজক্ষমতা। ওদের কাছের লোকদের ঐশ্বর্য, মান-মর্যাদা এমন কি ক্ষমতাও খুব একটা কম ছিল না। বিভিন্ন সংস্থায় অনেক লোক কাজ করত। তেমনি একটা সংস্থা ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা পুলিশ—এখানেও অনেক ধরনের লোকের কাজের সংস্থান হয়। এ-সম্পর্কে যে-হিসাব পাওয়া যায় তাতে পুলিশ মহলে কী ধরনের লোক কী অনুপাতে কাজ করত তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

জাতি	সংখ্যা	শতকরা হিসাব
ইংরাজ	৩,১৩৮	১·২৬
পূর্ব ভারতীয় (ইউরোপীয়)	৪,৭৪৬	১ ৯০
পর্তুগিজ	৩,১৮১	১·২৭
ফরাসি	১৬০	০·০৬
চিনা (ক্যান্টনি)	৩৬২	০·১৫
আর্মেনীয়	৬৩৬	০·২৬
ইহুদি	৩০৭	০ ১২
পশ্চিমী মুসলমান বাঙালি মুসলমান	৫৯,৬২২	২৩·৮৮
পশ্চিমী হিন্দু বাঙালি হিন্দু	১৫৬,৭৩৫	৬২·৭৬
মুঘল	৫২৭	০·২১
পার্সী	৪০	০·০২
আরবীয়	৩৫১	০·১৪
মঘ	৬৮৩	০·২৭
মাদ্রাজি (দক্ষিণী)	৫৫	০·০২
ভারতীয় খ্রিস্টান	১০৪	০·০৪
নীচু সম্প্রদায়	১৯.০৮৪	৭ ৬৪
মোট সংখ্যা	২৪৯,৭৩১	

শতকরা হিসাবে দেখা যায়, শুধু পশ্চিমী ও বাঙালি হিন্দুরাই সংখ্যায় অধিক ছিল (৬২·৭৬%)। তার সঙ্গে পশ্চিমী ও বাঙালি মুসলমান (২৩·৮৮%) যোগ হলে শতকরা সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬·৬৪। অন্যদিকে ইংরাজরা নিজেরা মাত্র ১·২৬%। এমন অবস্থাতেও ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান নিয়ে যে-পুলিশ বাহিনী তা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করত ইংরাজ সাহেবরা। বাঙালি তথা ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের নিজেদের কবলে রাখার জন্য ইংরাজদের বড় একটা বেগ পেতে হয়নি। ফলে ভারতীয় ও বাঙালিরা তাদের যথোপযুক্ত সেবা করত।

জনসংখ্যা পাঁচ লাখ বা তার বেশি এমন নগরের সংখ্যা সারা পৃথিবীতে দু' দশক আগে ছিল প্রায় আড়াই শো। এখন এই সংখ্যা অবশ্যই বেড়েছে। এই সব নগরের অর্ধেক উন্নয়নশীল দেশে। এই নগরের তালিকায় কলকাতা অন্যতম এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য নগরের তুলনায় কলকাতা সর্ববৃহৎ নগর। গার্ডেনরিচ, যাদবপুর ও দক্ষিণ শহরতলী নিয়ে কলকাতার বর্তমান ক্ষেত্রফল ১৮৭·৩৩ বর্গ কিলোমিটার, আর জনসংখ্যা ৪১,২৫,০০৬।[১] অবশ্য এখনকার বৃহৎ কলকাতায় কলকাতা নগর ছাড়া তার উপকণ্ঠে আছে ১০৭টি শহর। সব মিলিয়ে লোকসংখ্যা ৯১,৯৪,০১৮।

কলকাতা শুধু বিশাল নগর বা বন্দরকেন্দ্রিক স্থান নয়, এই নগর এখন বিবিধ শিল্পের কেন্দ্র। সর্বোপরি কলকাতা পূর্ব ভারতের বাংলা ভাষাভাষী জনগণের সাংস্কৃতিক রাজধানী। এই নগর শুধু বাঙালিদের নয়, অন্যদেরও বাসভূমি। প্রাণচঞ্চল কলকাতায় বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা প্রকৃতপক্ষে কলকাতাকে চলমান রেখেছে। কারিগরি ক্ষেত্রে আছে চিনা, শিখ, পাঞ্জাবি, ওড়িয়া। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রধানত রাজস্থানি, গুজরাতি, সিন্ধি। দাক্ষিণাত্যের প্রধানত তামিলনাড়ু, অন্ধ্র ও কেরালাবাসীরা বাণিজ্য ও প্রশাসনিক দপ্তরে চাকরির ব্যাপারে অনেককাল কলকাতার বাসিন্দা। বিহার ও উত্তর প্রদেশের লোকের সংখ্যাও এখানে কম নয়। তাঁরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। এঁরা সবাই নিজ নিজ মাতৃভাষা অবশ্যই ভোলেননি, রেওয়াজ রেখেছেন। কিন্তু কাজকর্মে কলকাতার বাসিন্দাদের সঙ্গে ওঠা-বসার ফলে বাংলা ভাষায় একেবারে পোক্ত। এঁদের ছেলেমেয়েরা শুধু ভাষায় নয়, সব কাজেকর্মে অনেকটাই বাঙালি। যাঁরা উপরের তলার চাকুরে বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত, বিভিন্ন প্রদেশের এমন লোকেরা তাঁদের পরিবারবর্গকে নিয়ে কলকাতাতেই বাস করেন। আর একটু নীচের তলার খেটে খাওয়া মানুষদের অনেকেরই পরিবারের বাড়ি অথবা বাস নিজ দেশে। সংখ্যায় কম হলেও অন্য প্রদেশের লোকেরা বাঙালি মেয়েদের বিয়ে করে সুখে ঘরকন্না করছেন, বাংলা বলছেন, বাঙালি খাবার খাচ্ছেনও এই কলকাতাতেই। তবে অন্য প্রদেশের মেয়েদের সঙ্গে বাঙালি ছেলেদের বিবাহ বন্ধন খুবই কম।

মানুষের সঙ্গে ধর্ম প্রায় অবিচ্ছেদ্য—বিশেষ করে আগের কালে। কলকাতার কালীঘাটের কালীমন্দির অনেক পুরনো। আগের কাল থেকে এখন পর্যন্ত কলকাতায় জনসংখ্যার আধিক্যের প্রধান কারণ বাঙালি ও হিন্দু। তাই সময়ের সঙ্গে বড় থেকে ছোট প্রায় অসংখ্য মন্দিরের সন্নিবেশ এই কলকাতায়। সেই মত দেব-দেবীর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে এরপর যে-ধর্মের কথা আসে তা হল খ্রিস্টান ধর্ম। এদের মধ্যে বেশ কিছু শ্রেণীবিভাগ আছে। কিন্তু উপাসনা স্থল সব সময়ই গির্জা। কলকাতার পত্তনের আগে থেকেই গির্জা স্থাপন শুরু হয় পরদেশি খ্রিস্টান ব্যবসায়ীদের দৌলতে। পরবর্তিকালে

১· India 1988-89, Ministry of Information and Broadcasting, Govt of India, 1988

ইংরাজদের যখন রমরমা অবস্থা তখন গির্জার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ইসলাম ধর্মের বড় ও ছোট আকারেব মসজিদও এই নগরের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায়, কেন্দ্রীভূত। পরবর্তিকালে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকেবা তাঁদের দেবগৃহ ও উপাসনাস্থল এখানে তৈরি কবেছেন। অবশ্য এগুলিব সংখ্যা সীমিত। এর মধ্যে যে-সব ধর্মাবলম্বীরা আছেন, তাঁরা হলেন বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ।

সাংস্কৃতিক মাপকাঠিতে ধর্ম অবশ্যই একটি বিশেষ প্রতীক। পূজা-পাঠ, যাগ-যজ্ঞ, নামাজ প্রার্থনা এ-সবই ধর্মীয় প্রকাশ। এছাড়া জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু— জীবনের এই চক্রে ধর্মের প্রভাব প্রায়ই প্রতীয়মান। জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে প্রতি ধর্মেই বিভিন্ন প্রথা-প্রণালী আছে। জন্ম ও বিবাহের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্থান বলে কিছু নেই। কিন্তু মৃতদেহের সৎকারে সর্বধর্মেই নির্দিষ্ট স্থান আছে। হিন্দুদেব শ্মশান---কলকাতাব নিমতলা ও কেওড়াতলার শ্মশান অতি প্রাচীন। বিদেশি খ্রিস্টানদেব আবির্ভাবেব পব তাদেব অন্তিম শয়ানেব জন্য কলকাতার কয়েকটি জায়গায় সমাধি স্থানের ব্যবস্থা হয়। একইভাবে মুসলমানদের কবরস্থানও আছে।

১৯৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে বঙ্গবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) দুটি রাজ্যের রূপ নেয়। ১৯৪৭ থেকে ক্রমাগত উদ্বাস্তু হিন্দু বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আসতে শুরু করে। এদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। পুরোপুরি হিসাবের মধ্যে না গিয়েও ওই জনসংখ্যা কোনোভাবেই ১০ লাখের কম হবে না। এদের মূল গন্তব্যস্থল কলকাতা। ফলে কলকাতাতে ১৯৪৭-এর পর থেকে মানুষেব চাপ ক্রমাগত বেড়ে চলে। ১৯৪৭-এব আগে যে কলকাতা ছিল, তা বর্তমান কলকাতার থেকে স্বভাবতই অনেক ছোট। কিন্তু সেই সময় থেকেই কলকাতার মাপ উত্তরোত্তব বাড়তে থাকে। বঙ্গ বিভাগোত্তর কলকাতায় যখন নতুন বসতি শুরু হয়, তখন সেকালের কলকাতার আশপাশের ধানক্ষেত, অনাবাদী জমি, হোগলাবনে ভরা এঁদো জলাশয় সব কিছুই বসতি স্থাপনে লেগে যায়—একেবারে পরিকল্পনাবিহীন, কোনোক্রমে একটা ঠাঁই পাবার জন্য। ওই সময়ে উদ্বাস্তুদের বসতি অঞ্চলগুলি কলোনি নামে খ্যাত ছিল।

সব হারিয়ে খুইয়ে শুধুমাত্র প্রাণ নিয়ে চলে আসা মানুষের দল—পুরুষ-স্ত্রী, কাচ্চা-বাচ্চা, বৃদ্ধ, যুবা। ওইসব পড়ে থাকা জমি তারা প্রায় দখলই করে নিল। পূর্বতন কলকাতাবাসীরা স্বভাবত এমন অবস্থার জন্য এতটুকু প্রস্তুত ছিল না। তাই প্রথম প্রথম তারা সদা-সর্বদা উদ্বাস্তুদের ঠিক নিজের করে নিতে পারেনি। চলতি ভাষায় উদ্বাস্তুদের নাম হল বাঙাল, আর এখানকার মানুষকে বলা হত ঘটি। পূর্ব পাকিস্তানের একেবারে পূর্ব অঞ্চল থেকে যারা এসেছে ভাষা বাঙলা হলেও কথার মধ্যে হেরফের ও একটা টান ছিল। অন্যদিকে এদিকের কথায় 'স'-এর প্রাধান্য, বাক্যের শেষে 'কো' 'গো' 'উম' প্রভৃতি ধ্বনির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

শুধু ভাষা নয়—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধরনেও বাঙাল ও ঘটির প্রণালীতেও অনেক তফাৎ ছিল। রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলন, সবেতেই সে-পার্থক্য নজরে আসে। এবং সেইজন্যে এদের মধ্যে বিবাহ-বন্ধনও সহজ ছিল না। এসব চল্লিশের দশকের থেকে বড়জোর পঞ্চাশের দশকের সময়কালের অবস্থা।

তারপর সাধারণ ভাবে ষাটের দশক থেকে উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। দেশ-ঘর ছেড়ে আসা নিঃসম্বল উদ্বাস্তুদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়তে লাগল, চাকুরির সুযোগ এল। ছোটখাটো ব্যবসা দিয়ে অনেকে নতুনভাবে জীবন শুরু করে। পরে তা বৃহদাকার ধারণ করে। আঞ্চলিকতার দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমে ক্রমে ঘুচে যায়।

বর্তমান কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চল বিশেষ করে বালিগঞ্জের দক্ষিণে পুরনো উদ্বাস্তুদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়। তাই এখানকাব আদি বাসিন্দাদেব মধ্যে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ বেশি। অন্যদিকে উত্তব কলকাতাব শ্যামবাজার, শোভাবাজার, আহিরিটোলা প্রভৃতি জায়গায় পুরনো কলকাতার বাসিন্দাদের সংখ্যা উদ্বাস্তুদেব থেকে বেশি হওয়ায় আদি কলকাতার সংস্কৃতিকে নূতন-আসা মানুষেবা নিজেব করে নিয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দুই সম্প্রদায়েব সংস্কৃতিব তারতম্য এখনও দেখা যাবে শ্যামবাজাবের আদি কলকাতাবাসী ও যাদবপুববাসী (পূর্ব পাকিস্থান থেকে আসা) বাড়িগুলির মধ্যে। কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে ওই পার্থক্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

কলকাতা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বেড়ে ওঠার পিছনে বঙ্গবিভাগ অবশ্যই একটা বড কারণ। আসলে কলকাতাকে ছেড়ে বেশির ভাগ মানুষ অন্য কোথাও যেতে নারাজ। তাই কলকাতার বিস্তার ছাড়াও এই নগরের জনঘনত্ব সীমাহীন ভাবে বাড়তে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুল, কলেজ, দোকান-পাট, বাজার, সিনেমা হল—আনুষঙ্গিক সব কিছুই স্থাপিত হল। ইতিমধ্যে নিঃসম্বল মানুষদের সম্বল একটু একটু করে ফিরে আসে। সেই সঙ্গে নূতন নূতন বাড়ি, ঘর এবং উপনগরীর পত্তন হয়।

কলকাতাকে কিছুতেই ছেড়ে যাওয়া যাবে না—এই মানসিকতা থেকে কলকাতার জমি দুর্লভ এবং দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠার সঙ্গে শুরু হল বহুতল বিশিষ্ট বাড়ি। আশেপাশের বাড়িব লোকজনদের সঙ্গে আগে যে-প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব ছিল আকাশচুম্বী বহুতল বাড়িব পরিবারদের মধ্যে তার অভাব সূচিত হল। মাটি থেকে দূরে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাছ থেকে মানুষ দূরে সরে যেতে থাকে। আত্মীয়-স্বজনও এখন অনেক দূরের লোক। ছোট পরিবারের মধ্যেই লোকেবা সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আব এই সুখ এখন মানসিক নয়, জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যের রূপ নিয়েছে। তাই ঘরে ঘরে এখন টিভি। বাইরের কাজ সেরে এখন মানুষ অন্দরমুখীন। মেলামেশা নেই, আড্ডার অভাব, চড়ুইভাতি স্মৃতিকথা। দোল, বিজয়া, এসবও প্রায় অন্তর্হিত। যাদের মধ্যে এসব মানার সামান্যতম প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তারাও সাহস করে তা মানতে পারে না—সমাজেব চোখে হেয় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়।

এ সব তো উচ্চবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত কলকাতাবাসীদেব কথা। নিম্নবিত্ত কলকাতাবাসীরাও পরিবর্তনের জোয়ারে ভেসে গেছে। এই শ্রেণীর একটা বিরাট অংশের বাস কলকাতার বস্তিতে—যার উপস্থিতি শহরের মধ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রান্তে। সেখানেও অন্য জগৎ। সকাল থেকেই প্রত্যাশিত ঝগড়া নেই। গালি-গালাজও কম। অবশ্য তার বদলে নূতন নূতন শব্দের আবির্ভাব হয়েছে। অর্থগত ভাব এক থাকলেও প্রকাশভঙ্গীতে রকমফের হয়েছে। আগেকার বস্তি মানেই ঘিঞ্জি, নোংরা, আবর্জনা ও পূতিগন্ধময় নরক। সে-বস্তি আর নেই। সেখানে জলের কল, পাকা রাস্তা, ড্রেন, পায়খানা হয়েছে। অনেক ঘরে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলে—লোকেরা টিভি দেখে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। এই শতকের ষাটের দশকের হিসাব অনুসারে আগে যে বস্তিতে এক-একটা কল থেকে ৩০ জন জল নিত, একটা পায়খানা ২৩ জন ব্যবহার করত—সে-হিসাব এখন অনেকটাই পাল্টেছে। প্রতি কল ও পায়খানা ব্যবহারের লোকসংখ্যা অবশ্যই কমেছে। তার থেকেও বড় কথা, লোকে আর উদাসীন নয়—তারা পানীয় জল কল থেকে নেয়। আর যেখানে সেখানে মলত্যাগ না করে পায়খানা ব্যবহার করে।

সংক্রামক রোগ আগে কলকাতায় মহামারী আকারে দেখা দিত, বিশেষ করে বসন্ত ও কলেরা। ওই দুটি রোগ এখন অনেকাংশে বিরল। বসবাসকারীদের আয়ু বেড়েছে। সেই

সঙ্গে শিক্ষিত পরিবারে ছেলেমেয়ের সংখ্যা অনেক কম। একটি বা দুটি সন্তানযুক্ত পরিবার আগে দেখা যেত না। এখন এটি প্রায়ই নজরে আসে। বাচ্চাদের পড়াশুনার প্রতি বাপ-মায়ের যত্ন ও চেষ্টা অনেক বেড়েছে। আর ছোট পরিবার হওয়ার জন্য এসেছে আর্থিক স্বচ্ছলতা।

নগর পত্তনের শুরু থেকেই কলকাতায় জাতপাতের বাছ-বিচার গ্রামাঞ্চলের থেকে কম। তবে একেবারে যে ছিল না, এমন নয়। আগে জাতের সঙ্গে অর্থনীতির যোগাযোগ ছিল—এখন আর তা নজরে আসে না। ব্রাহ্মণ সন্তান যদি জুতোর বা মাংসের দোকান করে তা নিয়ে কোনো সাড়া পড়ে না। আগে অসবর্ণ বিবাহের কোনো চলই ছিল না। কোনো ক্রমে কোথাও প্রেম-ভালবাসায় যদি অসবর্ণ বিবাহ হত, তাহলে সমাজের চোখে সেই দম্পতি প্রায় 'এক ঘরে' হয়ে যেত। এখন এসব নিয়ে বড় কাউকে মাথা ঘামাতে দেখা যায় না। অপর দিকে অসধর্ম বিবাহ আগে ছিলই না বললে চলে। এখন সে-রকম ঘটনা ঘটলেও লোক ও সমাজ তাকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়।

ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে কলকাতার খাবার দোকানের সঙ্গে বাঙালির নাম যুক্ত ছিল। এখন সেগুলির অবস্থা ভাল নয়। খাস্তা কচুরি, ডালপুরির জায়গায় এসেছে চাউ. রোল, এমন সব চট জলদি খাবার-দাবার। আগে বাঙালি হিন্দুদের হেঁসেলে মুরগি ঢোকা বন্ধ ছিল। আর ব্রাহ্মণদের 'মুরগি' শব্দটি উচ্চারণ করাই নিষিদ্ধ ছিল। এখন পাড়ায় পাড়ায় ব্রয়লার মুরগির দোকান। গো-মাংসের চল খুব একটা না হলেও উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের খাবারের তালিকায় হ্যাম ও সসেজের সংযোজন হয়েছে। ম্লেচ্ছ ব্যাপার বলে কিছু নেই। বাঙালি হিন্দুর বাবা কিংবা মা দেহ রাখলে তার ছেলেদের যে মস্তক মুণ্ডন করতেই হবে, এমন কথা এখন আর জোর দিয়ে বলা যাবে না।

কলকাতা কলকাতাতেই আছে। আগের মানুষের বংশধরেরা যেমন বর্তমান, তেমনি অনেক মানুষ কলকাতায় এসেছে সময়ের রথে চেপে। এরা অনেকে বিদেশি, অনেকে অন্য প্রদেশের। তাদের ভাষা, ভাব, ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি অসম্ভব রকম ভিন্নধর্মী। কিন্তু কলকাতায় এসে তাদের অনেকাংশে বিবর্তন ঘটেছে। কলকাতার একটা নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতি আছে। তবে তা স্থাবর নয়, বরং সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনে তাল রেখে ওই সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটছে। আসলে এর অনেকটাই নাগরিক, যান্ত্রিক—যা অন্যান্য নগরে মোটামুটি একই ভাবে বর্তমান। তবুও এসবের মধ্যে কলকাতার একটা বৈশিষ্ট্য আছে—সেটা সব জাত-পাত, ভাষা, সমাজ, সংস্কারের লোকদের এক সঙ্গে এনে নতুন একটা সংস্কৃতির উদ্ভাবন। এর মধ্যে বাঙালিয়ানার একটা স্বকীয়তা থাকা স্বাভাবিক। নিঃসন্দেহে এই স্বকীয়তা বাঙালির সংস্কৃতির।

কলকাতার স্থাপত্য

দুর্গা বসু

নাগরিক বাস্তুশিল্পের অগ্রগতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সেই শহরের আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক ও জন-মানসিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে। ফলে কোনো স্থাপত্যকে অনুধাবন করতে হলে আগে জানা দরকার সেই শহরের ইতিহাস, তার পৌর-বিকাশের কার্যকারণ। কলির কেতন 'কলকেতা হল', অর্থাৎ সর্ব স্টাইলের জন্মস্থান এই শহর। এক কথায় স্টাইল-নগরী। বাস্তুবিদ্যায় অবশ্য কলকাতার নিজস্ব কোনো ফ্যাশান গড়ে ওঠেনি এখনও। মাত্র তিনশো বছরে তা গড়ে ওঠা সম্ভবও নয়। তবে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে বহু স্টাইলের সমন্বয় সাধনের একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন পর্যায়ে।

কলকাতার ইতিহাস অনেকটা সাবেকী একান্নবর্তী পরিবারের মত। সব স্থাপত্য ধারার একত্র বাস এখানে। অগোছালো অন্দরমহল সুতানুটিতে আগে থেকেই ছিল হাটুরে মানুষের আস্তানা। বাহারে বার মহলের পত্তন করলেন কোম্পানি বাহাদুর ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে। সাবর্ণ চৌধুরির কাছ থেকে এগারো শো টাকায় লালদীঘি অঞ্চলটা ইজারা নিলেন। সুতানুটির ব্ল্যাক টাউন বা নেটিভ মহল্লা নিয়ে মাথা ঘামাননি তাঁরা। তাঁদের দৃষ্টি ছিল ইউরোপীয় কোয়ার্টার লালদীঘি থেকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত বিস্তৃত। আড়াই শো বছর ধরে প্রসাধনের ফলে বিলাতি কেতা-সম্বল নির্মাণ-শিল্পের ঢেউ সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। কিছু প্রভাব অবশ্য ফেলেছে সে-আমলে সদ্য গদীচ্যুত ইসলামী তরিকা। অল্প-স্বল্প হিন্দু রীতিও। তবে স্থাপত্যের আলাদা আলাদা পাড়া গড়ে ওঠেনি। সব প্রবাহই জমা হয়েছে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল অবধি। সচেতনভাবে না হলেও সেখানে এসে গেছে স্থাপত্য-সমন্বয়ের এক অদৃশ্য পরম্পরা।

পাশাপাশি ব্লাক টাউনে হয়েছে রাজরীতির অনুকরণ। অন্ধ রাজানুকরণে নেটিভ মহল্লার বাস্তুশিল্পও ছিল অনেকটাই জগাখিচুড়ি অর্থাৎ মিশ্র স্থাপত্য-রীতি। স্থাপত্যের ভাষায় বারোক (Baroque) বা রোকোকো (Rococo) স্টাইল।

সেকালে কলকাতার দু'টি ভাগ। জোব চার্নকের বুনিয়াদ দেওয়া ইউরোপীয় মহল্লা বা টাউন ক্যালকাটা ; এর চৌহদ্দী উত্তরে লালদীঘি, পূর্বে মারাঠা খাল, পশ্চিমে ফোর্ট উইলিয়াম ও দক্ষিণে পার্ক স্ট্রিট। কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেল্লার দক্ষিণে গোবিন্দপুর থেকে মেটিয়াবুরুজ জুড়ে গড়ে উঠেছিল সাহেব পাড়ার নব কলেবর— আলিপুর, হেস্টিংস, গার্ডেনরিচ। ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম হজেস রং-তুলি-ইজেল নিয়ে এসেছিলেন হিন্দুস্থানকে ক্যানভাসে ধরে রাখতে।

এ-সম্পর্কে তাঁর ডায়ারিতে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে। ক্রমসংকীর্ণ হুগলির জলে জাহাজ ঢোকার পরে কলকাতার ছবি দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে। চোখে পড়ে গার্ডেনরিচ। ধনী

মানুষের ভিলা আর বাংলো। নদীর দক্ষিণ পাড় জুড়ে পূর্বদেশে ব্রিটিশ প্রভুত্বের সদম্ভ বিজ্ঞাপন, বিশাল দুর্গনগরী (ফোর্ট উইলিয়াম)। শৌর্য, শক্তি, গরিমার প্রতীক। ভারতের শ্রেষ্ঠ গড়। নদীর বুকে তার বিশাল ওয়াটার গেট, পানিপথ। সব মিলিয়ে কেল্লাটি স্থপতি কর্নেল পলিয়ারের প্রতিভার সফলতম সাক্ষর। দুর্গ প্রাকার ও পরিখার বাইরে শিশির-ধোয়া সবুজ ময়দান—এসপ্লানেড। তার দিগন্ত ঘিরে লাবণ্যময়, নয়নাভিরাম প্রাসাদমালা। খোলামেলা, বাগান দিয়ে সাজানো; ফাঁকা, শান্ত পরিবেশে সযত্ন লালিত। স্থাপত্যে বিশাল, ভাস্কর্যে অপরূপ এই সৌধশ্রেণী প্রশস্ত রাজপথের দু'পাশে সুশৃঙ্খলভাবে দণ্ডায়মান। উদ্যানের মাঝ দিয়ে বাঁধানো প্রবেশপথ শেষ হয়েছে বিপুলাকৃতি শ্বেত বর্ণ গাড়ি-বারান্দার তলায়। চওড়া শ্বেতপাথরের সিঁড়ি পৌঁছয় সুউচ্চ অলিন্দে। অলিন্দের সারিবদ্ধ স্তম্ভ, খিলান, (পোডিয়াম সদৃশ) উঁচু ভিত ও সিঁড়ি এবং সর্বোপরি ত্রিকোণ শীর্ষমণ্ডিত গাড়ি-বারান্দার উঁচু ছাদ—সব মিলিয়ে হর্ম্যবাজিকে দেখায় যেন গ্রিক মন্দির।

হোয়াইট টাউনের এই রূপ ভুলিয়েছিল রাজপুরুষ লর্ড ভ্যালেন্টাইনকেও। তাঁর মতে,

'The town of Collecutta is at present well worthy of being the size of our Indian Government, both from its size and from magnificent buildings which decorate the part of it inhabited by Europeans.'[১]

সাহেবি কলকাতার চেকনাই যখন গগনবিহারী, কালোপাড়ার কৃষ্ণরূপে তখন প্রসাধনের ছাপ কতটা পড়েছিল? শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা থেকে জানা যায়, 'প্রত্যেক ভবনে এক একটি কূপ ও প্রত্যেক পল্লীতে দুই-চারিটি পুষ্করিণী ছিল। এই সকল পচা দুর্গন্ধময় জলপূর্ণ পুষ্করিণীতে কলিকাতা পরিপূর্ণ ছিল। অনুমান করি বর্তমান রাজধানীর আদিম স্থানে দুই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ভিন্ন সমগ্র স্থান ধানের ক্ষেত ছিল। শহর যেমন বাড়িয়াছে লোকে ধানের ক্ষেতে পুষ্করিণী খনন করিয়া করিয়া বাস্তু ভিটা প্রস্তুত করিয়াছে। এইরূপে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী হইয়াছে।'[২]

শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুমান মিথ্যা নয়। পরিকল্পনাহীন শহর সম্প্রসারণের এই ধারাটি আজও অব্যাহত যাদবপুর, গড়িয়া, বাজারহাট, টালি অঞ্চলে আগাছার মত গজিয়ে ওঠা কলোনি ও বস্তিতে। মানুষের বানানো খানা-ডোবার পাড় দিয়ে পায়ে হাঁটা সরু সরু গলির দু'ধারে নোংরা ঘিঞ্জি পরিবেশে বাস করছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই সব খানাখন্দ বুজিয়ে চওড়া গাড়ি-চলা পথ, পার্ক, খেলার মাঠের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে যে-খরচ হবে, তাতে আর একটা কলকাতা তৈরি করা সম্ভব।

'এখনকার ফুটপাতের পরিবর্তে প্রত্যেক রাজপথের পার্শ্বে এক একটি সুবিস্তীর্ণ নর্দামা ছিল। কোনো কোনো নর্দামার পরিসর আট দশ হাতের অধিক ছিল। ওই সকল নর্দামা কর্দম ও পঙ্কে এরূপ পূর্ণ থাকিত যে একবার একটি ক্ষিপ্ত হস্তী ওইরূপ একটি নর্দামাতে পড়িয়া প্রায় অর্ধেক প্রোথিত হইয়া যায়, অতি কষ্টে তাহাকে তুলিতে হইয়াছিল। এই সকল নর্দামা হইতে যে দুর্গন্ধ উঠিত তাহাকে বর্ধিত ও ঘনীভূত করিবার জন্যই যেন প্রতি গৃহেই পথের পার্শ্বে এক একটি শৌচাগার ছিল; তাহাদের অনেকের মুখ দিন-রাত্রি অনাবৃত থাকিত। নাসারন্ধ্র উত্তমরূপে বস্ত্রদ্বারা আবৃত না করিয়া সেই সকল পথ দিয়া চলিতে পারা যাইতো না। মাছি ও মশার উপদ্রবে দিনরাত্রির মধ্যে কখনোই নিরুদ্বেগে বসিয়া কাজ

১ Calcutta's Problem—Calcutta's Future—CMPO

২ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী। এস কে লাহিড়ী। প্রথম প্রকাশ ১৯০৪

করিতে পারা যাইতো না। ...এই সময়েই বালক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কলিকাতাতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, 'রেতে মশা দিনে মাছি, দুই নিয়ে কলকেতায় আছি ॥"[১]

কোম্পানির এলাকায় লালদীঘির মত দু'চারটে পানীয় জলের পুকুর ছিল। কেউ যাতে জল দূষিত করতে না পারে সেইজন্যে সেখানে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা রাখা হয়। এককালে সাবর্ণ চৌধুরিদের দোল উৎসবে লাল হয়ে উঠত দীঘির জল। তা থেকেই নাম লালদীঘি। লালদীঘিকে লাল করার সে-খেলাতেও বাধা দিল পুলিশ।

কিন্তু নেটিভ পাড়ার আম-জনতা খেতেন অ্যাকোয়াডাক্ট মারফৎ বয়ে আনা গঙ্গাজল। অ্যাকোয়াডাক্টে মানুষ-পশু সবাই ইচ্ছেমত স্নান করত, নোংরা করত। হিন্দু ধনীরা অবশ্য অ্যাকোয়াডাক্টের জল খেতেন না। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'তখন জলের কল বসে নি। বেহারা বাঁখে করে কলসী ভরে মাঘ-ফাগুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। ...রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন কপাট টেনে দেওয়া হত ঝরঝর কলকল করে ঝরনার মত জল ফেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো উল্টো দিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত।'[২] কিন্তু হিন্দুরা যে-পবিত্র গঙ্গাজল খেতেন তা নগরবাসীর বিভিন্ন ব্যবহারে মোটেই পানযোগ্য ছিল না। শহরের সব ময়লা জল গিয়ে পড়ত পতিতোদ্ধারিনীর বুকে। এই ছিল নেটিভ এলাকার পরিবেশ যা আয়তনে ছিল ইউরোপীয় কোয়ার্টারের দ্বিগুণ ; জমা ময়লার পরিমাণ বিশ গুণ। চৌহদ্দী ছিল উত্তরে বাগবাজার, চিৎপুর খাল, দক্ষিণে বড়বাজার (সাহেবরা বলতেন বাজার ক্যালকাটা), এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্ট্রিট, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ক্রিক রো ও ক্যানেল রোড বরাবর বহমান ধর্মতলা খাল—যার ঘাট বা চাঁদনীতে গড়ে উঠেছে আজকের চাঁদনীচক বাজার, পশ্চিমে হুগলি নদী এবং পূর্বে মারাঠা ডিচ (বর্তমান আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড), দেশি জমিদার, দেওয়ান, বেনিয়ান, মুন্সি, মুৎসুদ্দীর তালুকদারী মুলুক। এই ব্ল্যাক টাউনের আদিমতম সদর রাস্তা ছিল চিৎপুর রোড বা চিত্তেশ্বরী মন্দিরের পথ—কাঁচা পথ। আজকের মতই সরু, ঘিঞ্জি, নোংরা, জ্যাম-জমাট। কোচোয়ানি হাঁক, জুড়িগাড়ির ঠং ঠং ঘণ্টা ঘোড়ার চিঁহিরব, উড়িয়্যাবাসী পালকি-বেয়ারাদের বিদঘুটে হুঁম-হুম-না আর্তনাদ—সব মিলিয়ে সেদিন চিৎপুর রোড ছিল সরগরম। শোভারাম বসাকের হাভেলি, জগৎ শেঠের প্রাসাদ, দ্বারকানাথের লাল-বাড়ি, রাজেন মল্লিকের মার্বেল প্যালেস আর নবকৃষ্ণের রাজবাটির সঙ্গে কয়েক হাজার খড়ো চালওয়ালার মাটির ঘর সহাবস্থান করত এ রাস্তার দু'ধার জুড়ে।

ওইরকম একটা মাটির বাড়িতেই থাকতেন জোব চার্নক। ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি দেহ রাখলেন চার্নক। পরের বছর গভর্নর গোল্ডসবরো উদ্বোধন করলেন মাটির দেওয়াল ঘেরা ফ্যাক্টরির। তৈরি হল ইংরাজদের প্রথম কেল্লা। তার পরিধি ছিল কয়লাঘাটা স্ট্রিট থেকে ফেয়ারলি প্লেস অবধি। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন সিরাজের কলকাতা আক্রমণের সময়ে সিরাজের ফৌজ এই কেল্লা দখল করে। কেল্লাদার ফ্রান্সিস ড্রেক হুগলি নদী বেয়ে পালালেন ফলতায়। জে জেড হলওয়েলের নেতৃত্বে ব্রিটিশবাহিনী আত্মসমর্পণ

---

১ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ শিবনাথ শাস্ত্রী। এস কে লাহিড়ী, প্রথম প্রকাশ, ১৯০৩।

২ ছেলেবেলা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, (৮ মুদ্রণ) ১৩৫৪।

করল সিরাজের কাছে। এই আত্মসমর্পণকারীদের স্মৃতিতেই কুখ্যাত হলওয়েল মনুমেণ্ট বা ব্ল্যাকহোল মনুমেণ্ট খাড়া করা হয়েছিল রাইটার্স বিল্ডিংসয়ের সামনে।

পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানি পৌনে দু' কোটি আশরফী আদায় করেছিল নবাব মীরজাফরের কাছে। সেই টাকায় লালদীঘির চারপাশ বাঁধানো হল, তৈরি হল চারদিকের সুন্দর বাগান। ক্রমে এল কলকাতার সবচেয়ে পুরনো চালু চার্চ আর্মেনিয়ান গির্জা; সেণ্ট অ্যান্স চার্চের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে উঠল রাইটার্স বিল্ডিংস, স্ট্র্যাণ্ড রোড, পুবনো টাঁকশাল, চার্চ লেনে চার্নকের কবরের সামনা-সামনি সেণ্ট জন চার্চ। খোদ চার্নক কলকাতায় আসার ন'মাস বাদে লণ্ডনে কোম্পানির ডাইরেকটারদের চিঠিতে লিখেছিলেন, 'Traders in collecotta lived in wild and unsettled conditions at Chutanutee. Neither fortified houses, nor godowns. Only tents, huts and boats.'[১]

এই চিঠির ঠিক দু'শো বছর বাদে নগর-বিকাশ কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ব্যারন ডাওলিন চিৎপুর রোড সম্পর্কে যে বিবরণ দেন, তা মোটেই মনোরম নয়। তখন চিৎপুরের অবস্থা কি রকম ছিল? দোকান আর আস্তাবলের ক্লেদাক্ত ওঁচলায় ভাসত নালা-নর্দমা। রাস্তায় পঙ্কিল জঞ্জালেব পাহাড। তা পরিষ্কাব করার সাধ্য সরকাবি সাফাইওয়ালাদের ছিল না। গা ঘিনঘিন করা দুর্গন্ধ আর ম্যালেরিয়ার মহামারী সত্ত্বেও দেখা যেত দোকান আর আস্তাবলের খিদমদগারের দল নর্দামার থিকথিকে পচা পাঁকের উপরেই আড়াআড়ি খাটিয়া পেতে নির্বিকাবে ঘুমোচ্ছে। নর্দমায় যে-পরিমাণ ছাইপাঁশ ফেলা হত তাতে তার পরিবহণ ক্ষমতা কিছু থাকত কিনা সন্দেহ।

যাই হোক, শহর কলকাতা গডে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আইন-বেআইনি ঘরবাড়ি তৈবি শুরু হয়। কিন্তু দু' শো বছরে বাজাব ক্যালকাটা যেখানে ছিল, সেইখানেই থেকে গেছে। কোঠাবাড়ি বলতে চার্নকের আগে ডিহি কলকাতায় নাকি একটাই দোতলা পাকা দালান ছিল। লালদীঘির পাড়ে সাবর্ণ চৌধুরিদের কুঠিবাড়ি। ডিহি কলকাতা বলতে বোঝাত সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা এবং ভবানীপুর সমেত কালীঘাট গ্রাম। পরে মীরজাফরের টাকায় ইংরাজরা তৈরি করল অনেক বড় বড় কোঠা: ফিবার হসপিটাল, আইস হাউস, ইম্পিরিয়াল মিউজিয়াম, টাউন হল, হাইকোর্ট, হগ মার্কেট, মেটকাফ হল, নেটিভ মেয়েদেব জন্যে বেথুন স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হল ইত্যাদি। শেষ তিনটি অট্টালিকার জন্যে মুক্ত হস্তে দান করেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও বাজা প্রতাবচাঁদ সিং। আইস হাউস ছিল কোম্পানির অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু এ-দেশে কোনো ববফ-কল না থাকায় কানাডা থেকে জাহাজে আসত চালানি বরফ। সে মহার্ঘ্য বস্তু যাতে কলকাতার ভ্যাপসা গবমে গলে না যায় তাই আইস হাউসের ডিজাইনে মোটা মোটা মাটির দেওয়াল, পুরু ছাদ, শীতলপাটির ছাউনি, পাখাব মারফত ভিজে খসখসের ছাঁকনিতে ঠাণ্ডা করা বাতাস দিয়ে মাটির তলার বরফঘরকে হিমপুরী তৈরি করার উদ্দেশ্যে নানা রকম কলা-কৌশল আমদানী করা হয়েছিল হিরাট-কাবুল-কান্দাহার থেকে। সবকাব নিয়োজিত লটারি কমিটিব তোলা টাকাতেও বহু ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, পার্ক-লেক গড়ে উঠেছিল। লটারি চলেছিল ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ অবধি। এ-টিকিট কিনতেন সাদা-কালো নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ। অর্থাৎ কলকাতার বড বড় সরকারি স্থাপত্য-নিদর্শন গড়ার পিছনে সাধারণ নাগরিকদের দানও কম নয়। লটাবিব

১ History of Calcutta Edited by S N Sen Indian Science Congress Association, 1952

ঢাকায় গভর্নমেন্ট প্লেস ওয়েস্টের টাউন হল, চার্চ লেনের সেন্ট জন্স চার্চের মত ঘর-বাড়ির সঙ্গে স্ট্র্যাণ্ড রোডের মত রাস্তাঘাটও তৈরি হয়েছিল। সেন্ট জন্স চার্চকে বলা হয় পাথুরিয়া গির্জা। গির্জা তৈরির পাথর সংগ্রহ করা হয়েছিল প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে।

চাঁদপাল ঘাট থেকে কেল্লা অবধি নদীর পাড়ে গাছ পুঁতে তৈরি হয়েছিল সাহেব-বিবিদের বেড়ানোর ঠাণ্ডি সড়ক, এ-ও তৈরি হল লটারির টাকাতেই। পরে অবশ্য লর্ড অকল্যাণ্ডের আমলে ঠাণ্ডি সড়কের জায়গায় চমৎকার বাগিচা তৈরি করলেন গভর্নর জেনারেলের উদ্যানবিদ্ বোন এমিলি ইডেন। নাম হল অকল্যাণ্ড সার্কাস। অধুনা ইডেন গার্ডেন্স। বর্মী দারুশিল্পের এক দারুণ নিদর্শন, সোনালি গিল্টি করা বর্মা-টিকের প্যাগোডা আছে বাগানের পশ্চিম প্রান্তে। ডালহৌসির বর্মা বিজয়ের স্মৃতি হিসাবে এটি প্রোম থেকে আনা। এক সময়ে বন-বিভাগ বিক্রি করতে চেয়েছিলেন জ্বালানি হিসাবে। জনরোষে তা সম্ভব না হলেও এটির ভেঙে পড়া চূড়া, ক্ষয়ে যাওয়া কারুকার্য মেরামতের কোনো চেষ্টাই আজ পর্যন্ত হয়নি। প্রসঙ্গত সেনেট বিল্ডিংয়ের মত নিখুঁত গ্রিক স্থাপত্যও আজ অবলুপ্ত। এমনি আর এক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে টাউন হলকে নিয়ে।

ব্যক্তি-মালিকানার পাকা ভদ্রাসনও বাড়ছিল হু হু করে। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে হলওয়েলের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, কলকাতায় পাকা বাড়ির সংখ্যা প্রায় পাঁচশো। ফোর্ট উইলিয়ামের জায়গায় বিশাল সুঁদরী বনের জঙ্গল। চৌরঙ্গি জুড়ে বাঁশবন, ধানক্ষেত আর জলা। ১৮৫০ ও ১৮৭৬-এর দুটি সমীক্ষা তুলনা করলে নজরে আসবে :

	১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ	১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ	বৃদ্ধির হার (শতকরা হিসাবে)
কাঁচা কুঁড়েঘর	৪৯,৪৪৫		
পাকাবাড়ি-একতলা	৫,৯৫০	৭,০৩৭	১৮
দোতলা	৬,৪৩৮	৮,৬৩৬	৩৪
তিন তলা	৭২১	১,১৮৭	৬৫
চারতলা	১০	৩৪	২৪০
পাঁচতলা	১	২	১০০

বৃদ্ধির শতকরা হারটা উঁচু বাড়ির ক্ষেত্রেই বেশি। বলা চলে উঁচুতে ওঠার ঝোঁকটা সে-যুগেও ছিল।

১৭৭৩-এ কলকাতা হল ভারতের রাজধানী। লর্ড ওয়েলেসলির নেতৃত্বে স্থপতি ক্যাপ্টেন ওয়াটের নকশায় পুরনো গভর্নর প্যালেস বাকিংহাম হাউস ভেঙে ছ' একর জমির উপর ষাট কামরার নতুন প্রাসাদ তৈরি হল গভর্নমেন্ট হাউস বা রাজভবন। এটি তৈরি হল গথিক স্থাপত্য রীতিতে। এই স্থাপত্যের ব্যাপ্তি ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত। সুচলো খিলান ও বহু আর্চ সংযোগে ভল্ট ছাদ তৈরি এর বিশেষত্ব। কলকাতায় এর দৃষ্টান্ত সেন্ট পল্স গির্জা। রাজভবন তৈরি হল লর্ড কার্জনের পৈত্রিক প্রসাদ ডার্বিশায়ারের কেডলেস্টন হলের অনুকরণে, ব্যয় হয়েছিল তেরো লক্ষ টাকা। ছ'টা গেট। সিংহের মূর্তি বসানো, ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতীক। প্রধান গেটটি উত্তরে লাল দীঘির দিকে মুখ করে

রয়েছে। গভর্নমেণ্ট হাউসের চারপাশের পাঁচিল তুলতে গিয়ে লর্ড ওয়েলেসলিকে চারিদিকের রাস্তাঘাট নূতন করে তৈরি করতে হয়েছিল। প্রাসাদের থ্রোনরুম বা সভাঘরে রয়েছে টিপু সুলতানের সিংহাসন। তিন-মানুষ উঁচু ভিতে উঠতে হলে তিন ডজন সিঁড়ি পার হতে হয়। সিঁড়ির প্রান্তে রয়েছে এক জোড়া নারী স্ফিংস। গভর্নর জেনারেলের এক গোঁড়া এ ডি সি-র কাছে এদের পীনোন্নত স্তন অশালীন লাগায় তিনি তা কেটে ফেলবার হুকুম দেন। ব্যাপারটা যখন গভর্নর জেনারেল জানলেন, তখন যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়েই গেছে। প্রাসাদ গড়তে সময় লেগেছিল কম-বেশি পাঁচ বছর। পঁচিশ বছর পরে গভর্নমেণ্ট হাউস দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন লর্ড কার্জন। সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, বিনা দ্বিধায় বলা চলে সরকারি রাজ-প্রতিনিধির বাসস্থান হিসাবে এটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম।

নেপালযুদ্ধ বিজয়ী সার ডেভিড অক্টারলোনি ও সহযোদ্ধাদের স্মৃতিতে ১৫২ ফুট (প্রায় ৪৬ মিটার) উঁচু বিজয় মিনার গড়া হল ১৮২৮-এ। স্থাপত্য পরিকল্পনা ছিল অভিনব। তলার চৌকো বুনিয়াদের আকৃতি ও কারুকৃতি করা হয়েছে প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্যের অনুকরণে। মূল মিনারে আছে সিরীয় শিল্পের ছাপ এবং স্তম্ভ শীর্ষের শিবলিঙ্গ সদৃশ কিউপোলা বা গম্বুজ ছাদ ও ডোমটি সাক্ষ্য দেয় তুর্কী স্থাপত্যরীতির। বহু রীতির একটা সংহত রূপ প্রকাশ পেয়েছে স্মৃতি স্তম্ভটিতে।

ইংরাজ শাসনের মূল কেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিংসটা তুলনায় খুবই সাদামাটা ছিল। ড্যানিয়েলের পেন্টিংয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাড়িটি অলঙ্কারবর্জিত তিনতলা দালান হিসাবে দেখানো হয়। কেবল মাঝের অংশে ছ'টি আইয়োনিক শীর্ষযুক্ত স্তম্ভ দিয়ে তৈরি একটা কলনেড বা প্রবেশ বারান্দা ছিল। আইয়োনিক গ্রিক ও রোমান স্থাপত্যে স্তম্ভ অলঙ্করণের একটি শ্রেণী-বিশেষ। পরবর্তী যুগে বাড়িটির সামনে এ-মাথা ও-মাথা জুড়ে বাহারে বারান্দা যোগ করে তার শিল্পমূল্য বাড়িয়ে তোলা হয়। রাইটার্সের তুলনায় হাইকোর্ট ভবনটির ইতিকথা অনেক রোমাঞ্চকর। ১৭৮০ থেকে ১৭৮৪-এর মধ্যে তৈরি সুপ্রিম কোর্ট বিল্ডিংটি ভেঙে প্রায় একশো বছর পরে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে অংশত তার জায়গায় তৈরি হল হাইকোর্ট ভবন। অবলুপ্ত সুপ্রিম কোর্টের স্মৃতিতে লাগোয়া রাস্তার নাম হল ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট। হাইকোর্ট ভবনের ব্রিটিশ স্থপতির নাম সার ওয়াল্টার গ্র্যানভিল। মাথা খাটিয়ে কোনো ডিজাইন তৈরি করতে হয়নি তাঁকে। হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি কর্নেল ক্লিফের ইচ্ছায় বেলজিয়ামের ইপ্রেস (Ypress) টাউন হলের নকশা এক কপি আনিয়ে হুবহু সেই ছকে গড়ে তোলা হয় কলকাতার উচ্চ ন্যায়ালয়। কলকাতার কিন্তু পছন্দ হয়নি এর গথিক স্থাপত্য। দেশি সংবাদপত্রের মতে তা ছিল, 'Ugly so called Gothic style of Architecture!' মজার কথা, কলকাতার বাবুদের ভাল না লাগলেও টাউন হলের স্থাপত্য নিয়ে বেলজিয়ানদের গর্বের অন্ত ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইপ্রেস নগর সভাটি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল বোমার ঘায়ে। বেলজিয়ামবাসীরা দাবী করলেন পুনর্নির্মাণে টাউন হলটিকে আয়তনে, উচ্চতায়, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে হুবহু পুরনো হলের ছাঁচে গড়তে হবে। বেলজিয়ান সরকার পড়লেন বিপদে। টাউন হলের সঙ্গে তার নকশাপাতিও বিলুপ্ত! শেষে ইপ্রেসের মেয়র সার্ভেয়ার পাঠালেন কলকাতায়। হাইকোর্টের খুঁটিনাটি মাপজোখ নিয়ে তৈরি হল ইপ্রেসের নতুন টাউন হল। স্থাপত্যের ইতিহাসে নকলের নকল করার এটি একটি বিরল ঘটনা। সম্প্রতি হাইকোর্টের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে অ্যানেক্স তৈরি হল মূল ভবনের দক্ষিণে। নতুন ভবনটির স্থাপত্যে আধুনিকতার ছাপ থাকলেও আদলটি রাখা হয়েছে মূল ভবনের ইপ্রেসি গথিক ট্র্যাডিশনেই। হাইকোর্টের বছর চারেক আগে তৈরি

হয়েছিল জেনারেল পোস্ট অফিস। দু' মানুষ উঁচু পোডিয়াম, দু'দিক ঘিরে বিশাল পাথরের সিঁড়ি ৪ ফুট (১·২ মিটার) ব্যাসের তিনতলার সমান উঁচু গোল কোরিন্থিয়ান থাম ঘেরা চওড়া বারান্দা ও বিশাল ঘড়িধারী গোল রোমান ডোমের চূড়া মাটি থেকে ২২০ ফুট (৬৭ মিটার) উঁচু···সব মিলিয়ে মনের পর্দায় ফুটে ওঠে লণ্ডনের সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের ছবি। আইয়োনিকের মতই কোরিন্থিয়ান গ্রিক ও রোমান স্থাপত্যে স্তম্ভ অলঙ্করণের একটি শ্রেণী। তৃতীয় আর একটি শ্রেণী ডোরিক। ইতিমধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝ বরাবর কলকাতার বাস্তু-বিজ্ঞান অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। সেন্ট জেমস চার্চ (১৮২০), সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪), অক্টারলোনি মনুমেন্ট, (১৮২৮) মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৬), সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল (১৮৪৭)—স্থাপত্য মূল্যায়নের দিক দিয়ে এই সব বাড়ি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চার্নকের আমলে শ্বেতবর্ণের মানুষ ছিল বারশোর মত আর হাজার দশেক নেটিভ। বছর আট পরে আওরংজেবের নাতি আজিমুশ্বান ১৬,০০০ টাকা নজরানার বদলে কোম্পানি বাহাদুরকে ইজারা দিলেন তিন গ্রামের সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা। ধর্মতলা খালের দক্ষিণ বরাবর ইউরোপীয়দের বাস। টাউন ক্যালকাটা। উত্তরে নেটিভ মহল্লা বা বাজার ক্যালকাটা। কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিধি ও বসত বাড়তে লাগল দুই অঞ্চলে।

তবে মনে রাখতে হবে সেকালে গ্রামীণ সমাজে সদ্য গজানো শহুরে হাতছানি আজকের মত প্রবল জোয়ার জাগাতে পারত না। অবশ্য ধীর গতিতে হলেও স্বীকার্য, কলকাতায় লোক বাড়ছিল। সেই সঙ্গে নগরও বেড়ে উঠেছিল। পলাশীতে ক্লাইভের জয় তাকে ত্বরান্বিত করল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত শহরকে নবজন্ম দিতে কোম্পানি কিনে নিলেন ডিহি পঞ্চান্ন গ্রাম। ৫৫টি গ্রামের মধ্যে উত্তরে কাশিপুর, পাইকপাড়া, চিৎপুর থেকে শুরু করে শিয়ালদহ, আলিপুর, খিদিরপুর, গার্ডেনরিচ, ভবানীপুর কালীঘাট হয়ে দক্ষিণে বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য সেই সঙ্গে আরো কয়েকটা সাবেকী পথনাম প্রমাণ করে যে টাউনটা ঠিক নগর-পরিকল্পনার শাস্ত্রমাফিক ছকে বাঁধা আইন মোতাবেক সরল রাজপথ ধরে প্রসার লাভ করছিল না। ক্রুকেড লেন, কর্কস্ক্রু লেন, সার্কুলার রোড, সার্পেন্টাইন লেন, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, ক্রিক রো, ক্যানাল রোড প্রভৃতি নাম প্রমাণ করে শহরটা সর্পিল গতিতে এঁকেবেঁকে এলোমেলো বেড়ে উঠছিল খানা-খন্দ ধরে, সববাড়ি বাগান এড়িয়ে।

এই ডামাডোলের মাঝেও ইংরাজ সরকার একটা ব্যাপারে দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। চিফ ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল গুডউইনের প্রস্তাবে বাংলার লেঃ গভর্নর হ্যালিডে রাইটার্স বিল্ডিংসয়ের আঙ্গিনায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলার মঞ্জুরি দিলেন। বাজেট পাশ হল ৫,৮০,৮৫০ টাকা ১২ আনা ৫ পাই। কলেজ চালানোর মাসিক খরচ ১২,৫৫০ টাকা।[১] ছাত্রদের সেদিন বাস্তুবিদ্যায় পড়তে হত গ্রিকো-রোমান, গথিক, ভিক্টোরিয়ান রেনেশাঁস ইত্যাদি বিদেশি স্থাপত্য। গ্রিকো-রোমান গথিকের পূর্ববর্তিকালের দক্ষিণ ইউরোপীয় স্থাপত্য। খ্রিস্টপূর্ব আট থেকে চার অব্দ পর্যন্ত ওই রীতির ব্যাপ্তি। কলকাতায় এই রীতির উদাহরণ অধুনালুপ্ত সেনেট ভবন। ডোরিক, আইয়োনিক ও কোরিন্থিয়ান থামের শিল্পরীতি এই স্থাপত্যের অন্তর্গত। ভিক্টোরিয়ান রেনেশাঁস ইংল্যাণ্ডের ক্লাসিকাল স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ। ব্যাপ্তি পনেরো থেকে আঠারো শতাব্দী। গথিকের সুচলো আর্চের বদলে এখানে দেখা দিয়েছে গোলাকৃতি গম্বুজ বা ডোম। ভারতীয় নির্মাণশৈলীর চর্চা সম্ভব ছিল না সেখানে। ওখান থেকে পাশ করা প্রথম পূর্তবিদ্ (১৮৬১) দীননাথ সেন বাংলাদেশে সুপরিচিত

---

১ Centenary Souvenir · B E College Centenary Celebration Committee, 1956

হয়েছিলেন। সে যুগে পূর্তবিদ্‌রা শিক্ষালাভ করতেন মাদ্রাজের সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। তাই তাঁদের বলা হত মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার। কলকাতা কলেজ থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে মিলিটারির কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাই তাঁদের নাম দেওয়া হল সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বা বেসামরিক পূর্তবিদ্। কলেজের নামও হল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এই শিক্ষালয়ই পরে হাওড়ার বিশপ কলেজে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামে স্থানান্তরিত হয়। পূর্ব ভারতের স্থাপত্য সৃষ্টিতে এই কলেজের ইঞ্জিনিয়ারদের অবদান অসীম।

সে আমলে মন্দির-ঘাট, স্কুল-কলেজ ও ধনীদের বাসগৃহ লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিশ্বকর্মারা প্রাসাদনগরীর আবতি করেছিলেন স্থাপত্যের পঞ্চপ্রদীপে ·

১· বাংলার সাবেকী চালাঘরের ঐতিহ্য

২· খিলান ও পেঁয়াজাকৃতি ডোমযুক্ত ইসলামি বেওয়াজ

৩· দক্ষিণ ইউরোপীয় গ্রিকো - রোমান স্টাইল

৪· খাস ইংল্যান্ডের ভল্টেড গথিক ফ্যাশান

৫· প্রয়োজনভিত্তিক সাদামাটা উপনিবেশীয় স্থাপত্য।

কালজয়ী স্থাপত্যের জন্য প্রয়োজন টেঁকসই মালমশলা, যা ঝড়-জল-বৃষ্টি-বন্যা-ভূমিকম্প উপেক্ষা করে অটুট থাকবে হাজার বছর। বাংলাদেশে এ ধরনের উপাদান ছিল না। কাদা মাটি, বাঁশ, কাঠ. খড, গোলপাতা—স্থানীয় কাঁচা মাল মাত্রেই স্বল্পায়ু। পোড়ানো ইঁটের চল প্রাক-চার্নক যুগে ছিল না বললেই চলে। ভাঁটায় আঁচ ওঠানোর কৌশল খুব কম লোকেরই জানা ছিল। যাঁরা জানতেন. তাঁরাও বাংলা পাঁজায় কাঠের আগুনে ইঁট বানাতেন। তাপ কম হওয়ায় সে ইঁট পলকা, নোনাধরা হত। গাঁথুনি ক্ষয়ে ধ্বসে পড়তো কয়েক বছরেই। আঠারো শতকের গোড়ায় আমদানী হল ইঁট পোড়ানোর উন্নত বিলাতি পদ্ধতি। কোল ফায়ার্ড পগমিল প্রসেস। ভূগর্ভ ভাঁটায় সারি সারি ইঁট সাজানো হত পাথুরে কয়লার স্তরে স্তরে, লোহার চিমনি ঢাকা দিয়ে। আবদ্ধ উত্তাপ হত কয়েক গুণ। ইঁট বেরতো লাল টকটকে, মজবুত, ভারসহ। ফলে ঘরবাড়ির আয়ুও বহুগুণ বেড়ে গেল।

ইংরাজরা পোক্ত বিল্ডিংয়ের মালমশলা হিসাবে পাথর ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। গাঙ্গেয় বাংলায় পাথর অমিল। পাথুরে গাঁথুনি ছিল বাঙালির অচেনা। ইংরাজ চালু করে পাষাণের ব্যবহার। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের শিলা এনে তৈরি হল পাথুরিয়া গির্জা। পরে অক্টারলোনির নেপাল-বিজয়ের পর সেদেশ থেকে আমদানী করা হতে লাগল বেলে পাথর। রঙিন মার্বেল আসত ইটালি থেকে। রাজমহল মাইন্‌স থেকে পাওয়া বেলেপাথরও লাগত ডেরা তৈরির কাজে। ইংরাজ আমলের আর একটি নতুন উপকরণ কাস্ট্ আয়রন বা ঢালাই লোহা। রোল্ডস্টিল জয়েন্টের প্রচলন তখনও হয়নি, কিন্তু ঢালাই লোহার বাহারে রেলিং, থাম, জালি, গেট, ভেন্টিলেটার, আর্চ, সিঁড়ি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কারণ এগুলি সুদৃশ্য ও টেঁকসই।

এই সব কারণে কোম্পানি আমলের অজস্র দর্শনধারী প্যালেস অটুট থাকলেও প্রাক কোম্পানি যুগের দোর-দালানের কোনো চিহ্নই আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। এক সময়ে বাঙালির শিল্প-চেতনা অনুকরণপ্রিয়তায় আচ্ছন্ন ছিল। কলকাতার গৃহসজ্জার নব্যযুগের বাবু কালচারের দান। ইংরাজিতে কথা বলা, চিন্তা করা, স্বপ্ন দেখায় অভ্যস্ত দেশোয়ালিদের মোকামে ইউরোপীয় স্থাপত্যের আঙ্গিক ছড়িয়ে থাকবে—এ আর আশ্চর্য কি ? বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যটি প্রায় অদৃশ্য হতে চলল। তবে অতি ক্ষীণভাবে তা বেঁচে ছিল মাত্র

কয়েকটি মন্দিরের মাঝে। ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে মন্দির-মসজিদ যাঁরা প্রতিষ্ঠা করতেন, স্বভাবতই তাঁরা ছিলেন সাবেকী মনোভাবাপন্ন, সনাতন পন্থী। বিদেশি আর্টের তুলনায় দেশি ঘরানার আবেদনই তাঁদের কাছে তীব্রতর ছিল। তাই সাবর্ণ চৌধুরীদের সংস্কার করা কালীঘাট মন্দিরে বা রাণী রাসমণির বানানো দক্ষিণেশ্বরে আমরা দেখি খড়ের আটচালা মূর্ত হয়ে উঠেছে পাথরের গাঁথুনিতে। টালিগঞ্জের রামনাথ মণ্ডলের মন্দিরে, উত্তর কলকাতার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে নবরত্ন চূড়া সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে আশপাশের গ্রিকো-রোমান অনুকরণকে উপেক্ষা করে। চিৎপুরের চিত্তেশ্বরী দেউলের গ্রিক মিনারটি অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তবে চিত্তেশ্বরীর মূল দেবায়তন ছিল চাঁদনী শ্রেণীর। গ্রিক মিনার পরবর্তী সংযোগ। মোট কথা, বাংলার নিজস্ব বাস্তুশ্রী দেখতে হলে আমাদের দেবালয়-প্রদক্ষিণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। একই ভাবে দেশজ ইসলামী ধারার সাক্ষ্যের জন্যে গোঁড়া মুসলমান প্রতিষ্ঠিত মসজিদ-মাদ্রাসায় নজর দিতে হবে।

এছাড়া বাকি সবই—স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি, ট্যাভার্ন-গোডাউন, ধলার ধাম, কালার কোঠা সবই ইঙ্গবঙ্গীয় গাঁটছড়া বাঁধা সাম্রাজ্যবাদী স্থাপত্যের রোকোকো উদাহরণ। বাংলারীতি বা ইসলামী দস্তুরের সঙ্গে সন্ধি করেছে গ্রিকো-রোমান ক্রম কিংবা গথিক ঢং। স্থাপত্যের মিশ্রণ। তবে গ্রিকো-রোমানেরই প্রাধান্য দেখা যায়। ধবন-ধাবণে বলিষ্ঠ এই রীতির চোখা চোখা ডিটেল ভূমধ্যসাগরীয় পটভূমিতে আলোছায়ার খেলা রীতিমতো আকর্ষণীয় করে তুলত। ট্রপিক্যাল সমুদ্র তীরস্থ বাংলার সঙ্গে গ্রিস রোমের পরিবেশের বেশ মিল আছে। দু' জায়গাতেই নীল আকাশে কাঁচামিঠে রোদ পাওয়া যায় বারো মাস। তাই হয়ত আলোছায়ার খেলা জমানোর জন্যে গ্রিকো-রোমান রীতিই বেশি করে মনে ধরেছিল কলকাতার নেটিভ বাবুদের। সেই সঙ্গে কিছু কিছু গথিক ধারাবাহিকতার ঝোঁকও আছে—বিশেষত থামের মাথায় কোরিন্থিয়ান মুকুট পরানোর ক্ষেত্রে। গ্রিসের সাদামাটা ডোরিক কলমের তুলনায় কোরিন্থিয়ান লতাপাতার নরম ছন্দ বাবুদের মনে বেশি দোলা দিত। আশ্চর্য হতে হয় যে, হিন্দু বাস্তু-বেদের পদ্ম এবং ঘণ্টাকৃতি স্তম্ভশীর্ষ, বৌদ্ধ থাম্বার সুদৃশ্য মূর্তিরূপী (ক্যারিয়াটিড) ব্র্যাকেট তাদের শিল্প সুষমা সত্ত্বেও এঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি ; যতদিন না বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বেলুড় মঠ বা মহাজাতি সদনের নকশায় এই সব স্বদেশী খুঁটিনাটির উপর জোর দেয়।

আসলে রাজভক্তি অন্ধ করে দিয়েছিল আমাদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধিকে। রাজানুকরণ সত্ত্বেও কলকাতার নিজস্ব কিছু স্থাপত্য উপাদানের বহুল ব্যবহার নজরে আসে। বর্ষাবহুল গুমোট আবহাওয়ায় কায়িক স্বাচ্ছন্দের জন্য ঘরে চাই প্রচুর হাওয়া চলাচল। শীত-প্রধান ইউরোপের স্থাপত্যে যতটুকু দরজা জানালা ফাঁক-ফোকর থাকতো তা কলকাতার গুমোট কাটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। সাবেকী বাসগৃহের জানলাগুলি দরজার মত মেঝে অবধি লম্বা হত। জানালার তলার অংশটি আব্রুর কারণে খোলা না গেলেও, খড়খড়ি দেওয়া থাকত। এই খড়খড়ি ইচ্ছেমত খোলা-বন্ধ করা যেত। খোলা অবস্থায় খড়খড়ি এমন কোনাকুনি ভাবে থাকত যে, বৃষ্টির ছাঁট বা বাইরের নজর ভিতরে আসতে পারত না। অথচ হাওয়া ঢুকত বাধাহীন ভাবে। বর্তমানে খড়খড়ির চলন উঠে গেছে। যে বিশেষ ধবনের আংটাওয়ালা কব্জা লাগতো খড়খড়িতে তাও বাজারে এখন পাওয়া যায় না। মেঝে-ছোঁয়া জানালা, পাল্লার খড়খড়ি সম্পূর্ণ কলকাতা ঘরানার স্থাপত্য-স্বাতন্ত্র্য, এর সঙ্গে আরেকটি বহু ব্যবহৃত ব্যবস্থা ছিল বারান্দার অনড় খড়খড়ি যুক্ত কাঠের ওয়েদার বোর্ড বা ঘোমটা। উদ্দেশ্য একই। বৃষ্টির জল আটকে হাওয়া চলাচলে সাহায্য করা। এটিও সাবেকী

কলকাতার প্রায় প্রতি গৃহেই ছিল অবশ্য ব্যবহার্য। পৌরাণিক নির্মাণকলা কেবল আমাদের দেবস্থানগুলিতেই পাওয়া যায় বলে মহানগরীর স্থাপত্যের পর্যালোচনা হিন্দু মন্দির দিয়ে শুরু করা বিধেয়। তারপর ইসলামী হাভেলির চত্বর আছে। সেই সঙ্গে ভিলা-বাংলো-বিল্ডিংয়ে যাওয়া কর্তব্য যেখানে বিদেশি স্থাপত্যের মুন্সিয়ানা লক্ষ্য করা যায় দেশি ঘরানার সঙ্গে। বাড়ি-ঘরের বিভিন্ন স্থাপত্যের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটও উপেক্ষণীয় নয়, যেখানে পুর-স্থাপত্য ধারার দু'টি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম নজরে আসে। মন্দির-স্থাপত্যে প্রধানত তিন ধরনের প্রকাশভঙ্গিমা স্থান পেয়েছে :

১. বাংলা রীতি (চালা দেউল)

খড়ো চালের প্রকাশ ভঙ্গিমার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দোচালা, জোড়বাংলা, চারচালা, আটচালা এবং চাঁদনী। সাবেকী কুঁড়েঘর সাধারণত দোচালা। আগু পিছু দু'টি দোচালা জুড়লে ফুটে ওঠে জোড়বাংলা আকৃতি। কালনার অম্বিকা মন্দির জোড়বাংলা দেবায়তনের একটা দৃষ্টান্ত। কলকাতার বেশির ভাগ চালা দেউলই হয় চারচালা, নয় আটচালা। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিটে পুঁটে কালীর বাড়িটি চারচালা। মাথায় তিনটি চূড়া বা রত্ন বসানো। হিন্দু স্থাপত্যের এটি বিরল দৃষ্টান্ত। এটিতে চালা দেউল ও রত্ন মন্দিরের সমন্বয় ঘটেছে। কালীমূর্তি মাত্র ৬ ইঞ্চি (১৫ সেন্টিমিটার) লম্বা। তাই অধিষ্ঠাত্রীর নাম পুঁটে কালী।

একটি চারচালার মাথায় আরেকটি ছোটমাপের চারচালা বসিয়ে দিলে পাওয়া যায় আটচালা গঠন। বড়িশার জমিদার সন্তোষ সাবর্ণ চৌধুরির বানানো কালীঘাটে মায়ের বাড়ি এর দৃষ্টান্ত। দেউলের গায়ে নীলচে কাঁচকড়ার ছোট ছোট টালি বসানো আছে। এই অলঙ্করণের রীতি মনে হয় নবাবী ধারার কাছে ধার করা। অসম্ভব নয়। শোনা যায়, নবাবের তরফ থেকেও পূজা দেওয়া হত এখানে। ইংরাজরাও তা থেকে বাদ যাননি।

মার্সম্যানের লেখা থেকে জানা যায়, গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি ক'জন ইংরাজ কালীঘাটে যান এবং কোম্পানি সম্প্রতি যেসব যুদ্ধে জয়লাভ করেন তার জন্য হিন্দু দেবীর নিকট ৫০০০ টাকার পূজা দেন। সহস্রাধিক নেটিভ সমবেত হয়ে শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদের দেবী-অর্চনা প্রত্যক্ষ করেন। হয়ত এইজন্যই কালীবাড়ির নাটমন্দিরে থামের মাথায় দেখি কোরিন্থিয়ান ক্যাপিটালের ছড়াছড়ি। গড়ানো চালা ছাড়া এক ধরনের চাঁদোয়া সদৃশ সমতল ছাদ রয়েছে বাংলা ঐতিহ্যে। নাম চাঁদনী। এ ছাদ তৈরি হত কাঠের কড়ি-বরগার উপর শ্লেটের টালি ও পুরু চুনবালির পেটানো স্তর জমিয়ে। ইঁটের খিলানের উপর মশলা জমিয়েও সমতল চাঁদনীর রূপ দেওয়া হত। ঠনঠনের সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি ও লাগোয়া নাটমন্দিরের ছাদ চাঁদনী ঢংয়ের নিদর্শন। সিলিংয়ের বালিকাজে রয়েছে দেখার মত প্রাচীন কারুকার্য। কলকাতার আরো দুটি নামী চাঁদনী দেউল কবিয়াল এন্টনি ফিরিঙ্গি পূজিত বউবাজারের ফিরিঙ্গি কালীমন্দির এবং শ্যামবাজারের ছাতুবাবুর কালীমন্দির। ছাতুবাবুর মন্দিরের দেওয়ালে প্রশংসাযোগ্য মীনার কাজ আছে।

২. মিশ্র ক্রম (রত্ন মন্দির)

এখানে ছাদ ধনুক বা ছত্রাকৃতি। কখনো বা রথ-সদৃশ মন্দিরে রয়েছে একাধিক তল। খাস বাংলা ঢংয়ের ধনুকের মত বাঁকানো চালের উপর ইসলামী বা গথিক স্টাইলের টুঙ্গি বা মিনার বসানো হয়েছে মন্দিরের বাহার বাড়ানোর জন্যে। টুঙ্গির সংখ্যানুযায়ী দেবালয় এক রত্ন থেকে নবরত্ন পর্যন্ত হয়। টুঙ্গি খাঁজকাটা, পাপড়িযুক্ত বা ফুলের মোটিফে সাজানো হয়ে থাকে। এক রত্ন মন্দিরে টুঙ্গিটি ছাদের মাঝখানে বসানো।

এরপর ত্রিরত্ন মন্দির। তিনটি মিনার সামনে থেকে পিছনে বা পাশাপাশি বসানো থাকে

এক সারিতে। পঞ্চরত্নের বেলা মাঝের বড় টুঙ্গিটিকে ঘিরে চার কোণে চারটি টুঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। ইসলামী স্থাপত্যেও পঞ্চ রত্নের ব্যবহার দেখা যায় হুমায়ুন টুম, তাজমহল ও জামা মসজিদে। কার প্রভাব কার উপর পড়েছে বলা শক্ত। নবরত্ন ঢংয়ে পাঁচ প্রধান টুঙ্গিকে ঘিরে থাকে আরো চারটি ছোট মিনার। দোতলা, তিনতলা উঁচু নবরত্ন মন্দিরগুলি আভিজাত্যপূর্ণ লাবণ্যের আকর। নবরত্ন মন্দিরের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রাণী রাসমণি স্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ পূজিত দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দির। কলকাতায় আরো যে-কটি বিখ্যাত নবরত্ন মন্দির রয়েছে তা হল টালিগঞ্জে মাণিক মণ্ডলের মদন মোহন মন্দির, কোম্পানির অ্যাসিস্টেণ্ট জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র প্রতিষ্ঠিত বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী দেউল—এটি অক্টাবলোনি মনুমেণ্টের থেকেও উঁচু ছিল।

১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর এক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পে অজস্র ঘরবাড়ির সঙ্গে ভেঙে পড়ে সিদ্ধেশ্বরী দেউলের মূল টুঙ্গিটি। পরে চিৎপুরের মল্লিকরা এটি মেরামত করে দেবায়তনের গায়ে অপূর্ব মীনার কারুকার্য করিয়ে দেন।

৩. প্রাদেশিক প্রণালী (রেখদেউল ও বহুচূড় মন্দির)

ভারতীয় ধর্মীয় স্থাপত্যে কিছু প্রাদেশিক ঢং অনুসরণ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উৎকলী রেখদেউল। পশ্চিমবাংলার সীমান্ত শহর বরাকরে চারটি পাথুরিয়া রেখদেউল আছে। বর্তমানে বালিগঞ্জে বিড়লারা যে বিশাল লক্ষ্মীনারায়ণ দেবগৃহ তৈরি করছেন তা মূলত রেখদেউল। অন্যান্য প্রাদেশিক গঠন প্রণালীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ ভারতীয় গোপুরম। এই প্রণালীর আংশিক ছায়া পড়েছে বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে। আরেকটি প্রাদেশিক গঠন প্রণালী উত্তর ভারতীয় বহুচূড় গড়ন। এই পরম্পরার মাঝেই দেখা যায় জৈন ধারা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিটের শীতলনাথজীর মন্দিরের কথা বলা যায়। একে ভুলক্রমে বলা হয় পরেশনাথ মন্দির। স্তূপ-সদৃশ ডোমযুক্ত বৌদ্ধ আঙ্গিক এবং ইসলামী ও খ্রিস্টান প্রভাবযুক্ত নয়া কেতাও এই প্রণালীতে আছে মনে হয়।

বৈষ্ণবী ভজনালয়ে টেরাকোটা ভাস্কর্যের ছড়াছড়ি অথচ কলকাতার কালীবাড়িগুলিতে তা চোখেই পড়ে না। তবে বিলাতি ধরনের পঙ্কের কাজ ও ইসলামী ধাঁচের মীনার অলঙ্কার নজরে পড়ে শাক্ত মন্দিরে সর্বত্র। এ সবই স্থাপত্য সমন্বয়ের লক্ষণ। দেবালয়ের দেওয়ালচিত্র বা হিন্দুশাস্ত্র কথিত পুত্তলিকার একটি নির্দিষ্ট ক্রম আছে। সবার নীচে থাকে জীবজন্তু ও ইতর প্রাণীর ছবি। তার উপরে মানব সংসারের বারমাস্যা। তৃতীয় স্তরে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, মুনিঋষিদের প্রতিকৃতি। সর্বোচ্চ স্তরে দেবকুল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ঊর্ধ্বমুখী ক্রম উৎকর্ষের প্রতীক। গঙ্গাস্নান ছিল সাবেকী পুণ্যার্থীদের নিত্যকর্ম। সারি সারি ঘাট তৈরি করেছেন তাঁরা— কাশীপুরের রতনবাবুর ঘাট থেকে টালিগঞ্জের কুঁদঘাট অবধি। প্রতিষ্ঠাতারা গোঁড়া হিন্দু। নব্য বিলাতি স্টাইল খুব একটা ছাপ ফেলতে পারেনি ঘাট-স্থাপত্যে। দু' একটি ঘাট তাদের দেশি চেহারার জন্য রীতিমতো বিখ্যাত। এর মধ্যে অন্যতম জগন্নাথ ঘাট। জগন্নাথ ভক্ত শোভারাম বসাক তাঁর ইষ্টদেবের মন্দিরের লাগোয়া ঘাট বানিয়েছিলেন বড়বাজারে। ঘাটের লোহার থামগুলির মাথায় কোরিন্থিয়ান মুকুট থাকলেও সেগুলি স্থাপিত হয়েছে পদ্মস্থিত মঙ্গল কলসের উপরে—একেবারে খাঁটি হিন্দু মোটিফ। থামের মাথা জুড়ে খিলানাকৃতি ঢালাই লোহার জাফরি ; নকশায় তার হিন্দু ছাপ স্পষ্ট। ছাদের কার্নিশ ধরে সারি সারি ফুলের মুকুট এবং চারচালা ঢলের ছাঁদ। সবেরই ছিরিছাঁদ পুরো দেশি। সব মিলিয়ে বিদেশি উপাদানের সঙ্গে দেশি অলঙ্করণের অতি সুষ্ঠু সমন্বয় ক্ষেত্র জগন্নাথ ঘাট। আদি গঙ্গার পাড়ে মহীশূর ঘাট বিচিত্র কর্ণাটকী ধ্রুপদী স্থাপত্যের

বিরল দৃষ্টান্ত। দেখলে মনে পড়ে বেলুড়ের চমকদার মন্দিরের কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মহীশূরের মহারাজাকে দাহ করার জন্য এই ঘাটের প্রতিষ্ঠা এবং নাম হল মহীশূর ঘাট। মার্টিন বার্ন কোম্পানি কর্ণাটকী ঢংয়ে চুনা পাথরে গড়ে তুললেন ঘাটের চাঁদনী, শাহ্‌নগরের প্রবেশদ্বার, লাগোয়া গোলাপ বাগিচা।

মন্দির আর গঙ্গার ঘাটে দেশীয় স্থাপত্য শৈলীর সঙ্গে সমন্বয় হচ্ছে বিদেশি বাস্তু শিল্পেরও। জন্ম নিচ্ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশীয় স্থাপত্য। কলকাতাবাসীর দানে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু স্কুল ও ১৮৫৫-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ গড়ে উঠল। ইতিমধ্যে পৈত্রিক ঘড়ির ব্যবসা তুলে দিয়ে ঠনঠনিয়া ও পটলডাঙ্গায় স্কুল খুলেছিলেন হেয়ার সাহেব। পরে দুই স্কুল মিলে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হল হেয়ার স্কুল।

১৮৫৬-তে উঠল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ি, সেনেট হল। গ্রিক স্থাপত্যের উজ্জ্বল সাক্ষর। দ্বারভাঙ্গা মহারাজ রামেশ্বর সিংয়ের দেওয়া ২,৫০,০০০ টাকায় তৈরি হল দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং। তার আইয়োনিক থাম, সুদৃশ্য আর্চ আর গোল ঝুল বারান্দা গ্রিকো-রোমান স্থাপত্যের সঙ্গে চমৎকার মিলিয়ে ছিল ইন্ডো-সারাসেনিক স্টাইল। এই স্টাইলের ব্যাপ্তি দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী। আরব, স্পেন, পারস্য ও তুর্কিস্থান থেকে মুসলিম শাসকদের মারফত এ-দেশে আমদানী হল ইসলামী স্থাপত্য। তাতে প্রভাব পড়েছিল স্থানীয় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপত্যের। ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এই মিশ্র রীতি—ইন্দো সারাসেনিক স্টাইল। হেয়ার স্কুল, সিনেট, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং বা বেথুন স্থাপিত নেটিভ মেয়েদের বেথুন কলেজ—সবই কলোনীয় ধারার অন্তর্ভুক্ত। এই ধারায় ভিক্টোরিয়া সাম্রাজ্যের দেশে-বিদেশে রেনেশাঁস স্থাপত্য স্থানীয় আবহাওয়া, মাল-মশলা ও গঠন-শৈলীর প্রভাবে এক একরকম পরিবর্তিত রূপ নেয়। ফলে ইউরোপীয় স্থাপত্যের প্রভাব দেখা গেলেও তা খাঁটি গ্রিকো-রোমান, গথিক বা রেনেশাঁস স্টাইলভুক্ত নয়। যেমন, এ-দেশের বাংলো ধরনের বাড়ি। এ-রীতি এ-দেশে চলেছে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে। কলকাতার অধিকাংশ ধনী ভিলাই এই মিশ্র রীতিতে গড়া। কলোনীয় স্থাপত্যে গড়া আরেকটি পাঠশালা সার আশুতোষ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজ—এটি তারকনাথ পালিত (১৫ লক্ষ টাকা), আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (২ লক্ষ টাকা), রাসবিহারী ঘোষ (২১,৪৩,০০০) ও খয়রার কুমার গুরু প্রসাদ সিংহের (৫ লক্ষ টাকা) দানে পুষ্ট। বিজ্ঞান কলেজ ও দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ের স্থাপত্যের ক্ষেত্রে একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনে ভবনে একটা সামঞ্জস্য রাখাই এর উদ্দেশ্য। বিংশ শতাব্দীর আরেকটি শিক্ষাকেন্দ্র কলকাতা মাদ্রাসার (বর্তমান মৌলানা আজাদ কলেজ) সর্বাঙ্গে আধুনিকতার সঙ্গে ইসলামী ঘরানার সুন্দর সন্ধি লক্ষণীয়। একই ভাবে আধুনিক ও হিন্দু বাস্তু শিল্পের মিলন ঘটেছে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। খরচ পড়েছিল ১১ লক্ষ টাকা।

সিনথেসিসে গড়া উপনিবেশীয় স্থাপত্যের বহু বিচিত্র নিদর্শন রয়েছে এই শহরে। সে আমলের ধনীরা বসতবাটিতে বাংলা খড়ো চালের সঙ্গে সংহতি ঘটিয়েছিলেন মোগলাই গম্বুজ, ইউরোপীয় ভল্ট ও ত্রিকোণ পেডিমেন্টের। এই মিশ্রণে এসে মিশল পর্তুগিজ-ধারা। সাক্ষী ব্রাবোর্ন রোডের পর্তুগিজ চার্চ। তবে এই সব মিশেলের বেশিব ভাগ থেকেই কোনো স্বাতন্ত্র্য চরিত্র পরিস্ফুট হয়নি।

ঠাকুর বাড়ির আইয়োনিক কলম, এসপ্ল্যানেড ইস্টে রেলের বুকিং অফিসের মাথায় অজস্র ঝরোখা জানালায় হাওয়া মহলের নকল, ইংরাজ স্থাপত্যের অনুকরণে বানানো দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়া ভিলার পাথরের আর্চ, বিচিত্রা ভবনের রঙিন কাঁচের গথিক

জানালা, অউধের নির্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলি শার রাজপুরী সিরিয়াল হাউসের বিশাল ডোরিক কলম লক্ষ্য করলে তা অনুধাবন করা সম্ভব।

ইংরাজ এ-দেশে এসে সৃষ্টি করে বাংলোবাড়ি, যার নাম তারা ধার করেছিল 'Bengal' শব্দ থেকে। বাংলা দোচালা, চারচালা, আটচালার নীচে ঘরের বিন্যাস হয়েছিল বিলাতি ঢংয়ে, সাহেব-মেমদের প্রয়োজন অনুযায়ী। সামনের খিলানওয়ালা বারান্দার পিছনে সদর বা 'সাহিব মহল' ও পিছনের বারান্দার কোলে অন্দর বা 'মেম মহল'। বাড়ির পিছনে একটা করিডোর বেয়ে পৌঁছতে হত রসুইখানা ও তোশাখানায়। 'নবাবী জবানীতে চাকর-নোকরদের মহলকে তখন বলা হত তোশাখানা। যদিও সেকেলে আমিরি দশা থেকে আমাদের বাড়ি নেমে পড়েছিল অনেক নীচে, তবু তোশাখানা দফতরখানা বৈঠকখানা নামগুলো ছিল ভিত আঁকড়ে।'[১] প্রয়োজনভিত্তিক নকশায় প্রস্তুত এই সব দো-আঁশলা বাড়ির স্থাপত্য সুষমা নান্দনিক বিচারে খুব উঁচু দরের হত না। নিদর্শন ব্যারাকপুর গভর্নমেন্ট হাউস। তবে সবই যে উড়িয়ে দেবার মত তা নয়। বিশুদ্ধ গথিক কেতায় গড়া সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল (১৮৪৭) এবং তাজের অনুকরণে তৈরি সুষম উপনিবেশবাদের উদাহরণ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের রূপবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। সত্যি কথা বলতে কি, বিভিন্ন স্থাপত্যের সুষম সমন্বয় ইঁট-কাঠ-পাথরের কলাকৃতিকে কত শোভন, প্রাণবন্ত, নয়নাভিরাম করে তুলতে পারে, কলকাতাবাসী তা প্রথম প্রত্যক্ষ করল সার রাজেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে গড়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। অবশ্য এই সুষম সমন্বয় পরম রূপ পেয়েছে বেলুড় মঠে। সেখানে স্থাপত্য সত্যিই পরিণত হয়েছে সঙ্গীতের এক স্থিরচিত্রে ('Architecture is a frozen music'—Ruskin)। শ্রীরামকৃষ্ণের নশ্বর দেহ ইহলোক ত্যাগ করার পরে বিবেকানন্দ ও ঠাকুরের অন্যান্য শিষ্য গঙ্গাতীরে ঠাকুরের দেহাস্থির উপর এক সমাধিমন্দির তৈরি করে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করতে চাইলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল, এ স্মৃতিসৌধ হবে সমস্ত দেশি স্থাপত্য ধারা থেকে চয়ন করা রামকৃষ্ণ-দর্শনের মূল তত্ত্ব সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রকাশস্বরূপ। রামকৃষ্ণ-আদর্শকে ইঁট-কাঠ-পাথরের মাঝে তুলে ধরা খুব সহজ কাজ ছিল না। স্বামীজী তাঁর সহকর্মী স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে দিয়ে মন্দিরের নকশা করালেন। বিজ্ঞানানন্দ পূর্বাশ্রমে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, বাড়িমাত্রই একটা স্ট্রাকচার। স্ট্রাকচার মাত্রই কিন্তু স্থাপত্য নয়। স্থাপত্য একটা ভাব, একটা ছন্দোময় বাণী যার প্রকাশ স্ট্রাকচারের মাধ্যমে। বাংলার স্থাপত্য পরাধীনতার জন্যে নষ্ট হয়ে গেছে। ঠাকুরের মন্দিরের মাধ্যমে নতুন স্থাপত্য-দিগন্তের সন্ধান করতে হবে। স্বামীজীর এই কথা বিজ্ঞানানন্দকে উদ্দীপিত করেছিল। তৈরি হয়েছিল বেলুড় সমাধিসৌধের অসাধারণ ডিজাইন। নকশা তৈরি হলেও, অর্থাভাবে কাজ শুরু করা সম্ভব হল না। ১৯০২-এ স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ হয়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ বুধবার ঠাকুরের পুণ্য জন্মতিথিতে সমাধিভবনের ভিত্তি-পূজা হল খাঁটি বৈদিক মতে। কয়েক বছর বাদে স্বামীজীর দুই মার্কিন শিষ্যা শ্রীমতী অ্যানা কোস্টার ও কুমারী রুবেল ৬·৭৫ লাখ টাকা দান করলেন মন্দির তহবিলে। কাজে নেমে পড়লেন মার্টিন বার্ন—ইঁট, কংক্রিট, চুনার স্টোন নিয়ে।

২৩৫ ফুট (প্রায় ৭২ মিটার) লম্বা ও ১৪০ ফুট (প্রায় ৪৩ মিটার) চওড়া নাটমন্দিরের লাগোয়া ৭৮ ফুট (প্রায় ২৪ মিটার) উঁচু প্রবেশ পথ বা গোপুরম তৈরি হল সাঁচী স্তূপের গেটের অনুকরণে। তার মাথায় জড়ানো পট্টবস্ত্রের দু'পাশে কমলকোরকধারী হাতির

---

১ ছেলেবেলা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, (৮ মুদ্রণ) ১৩৫৪।

ভাস্কর্য। অজন্তার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত প্রবেশদ্বারের মাথায় মিশনের মনোগ্রাম, সর্পকুণ্ডলীর মধ্যে পদ্ম, সূর্য, জলতরঙ্গ। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের প্রতীক। উপরে শিবলিঙ্গ। হলের দু'পাশে দরজার মাথায় গণেশ ও হনুমান। মূল গোপুরমের শীর্ষে রাজপুত স্থাপত্য থেকে নেওয়া ঝুল বারান্দা। তবে তা রাজপুতানার অন্ধ অনুকরণ নয়। খাঁটি, বাঙালি পালকির মত দেখতে। ঝুল বারান্দার দুপাশে দুটি রাজপুত ছত্রী। তাও দেখতে বাংলার কুঁড়েঘরের মত, পঞ্চশিখর যুক্ত। সব মিলিয়ে প্রবেশদ্বারের আশ্চর্য আকৃতিগত মিল রয়েছে দক্ষিণ ভারতীয় গোপুরমের সঙ্গে। নাটমণ্ডপের ছাঁদ গির্জার। ছাদ গথিক ভল্টের মত। তলা থেকে সিলিংয়ের খিলানাকৃতি শির অজন্তার চৈত্যরীতিকে মনে করিয়ে দেয়। গথিক কাঠামোয় অজন্তা কারুকৃতির একীভবন। হলের স্তম্ভে নান্দনিক ভারসাম্য বজায় রেখে একীভূত হয়েছে ডোরিক অর্ডারের সঙ্গে মাদুরার হিন্দু ও কার্লের বৌদ্ধ ভাস্কর্য। স্তম্ভে, দেওয়ালে, দরজার কপাটে পদ্মের ছড়াছড়ি (বৈদিক মতে পদ্ম ভক্তি, সৃষ্টি ও সিদ্ধির প্রতীক)। স্তম্ভের পাদদেশে বাঙালি ঘরানার আলপনা প্রতিফলিত হয়েছে খোদাই কাজে। নাটমন্দিরের কার্নিশে সারি সারি পদ্ম-পাপড়ি দাঁড়িয়ে আছে যা উত্তর ভারতের দুর্গ প্রাকারের দৃশ্য মনে করায়। হলের প্রান্তে প্রশস্ত গর্ভগৃহ। মাথায় নবরত্ন গম্বুজ। মূল গম্বুজের শিখর ১০৮ ফুট (প্রায় ৩৩ মিটার) উঁচু। গম্বুজগুলি পেঁয়াজাকৃতি ঐস্লামিক চরিত্রের হলেও লিঙ্গরাজ মন্দিরের উড়িষ্যারীতিতে অলঙ্কৃত বলে দর্শনে অহিন্দু নয়। গম্বুজের মাথায় রেখদেউলের মত খাঁজকাটা আমলকী বা মহাপদ্ম। তার উপর সোনার কলস ও শিখর। গর্ভগৃহে নন্দলালের তত্ত্বাবধানে গোপেশ্বর পাল নির্মিত ঠাকুরের প্রমাণ মাপের জীবন্ত মর্মরমূর্তি। পিছনের গোল দেওয়ালে পাথুরে জালির মধ্যে নন্দলালের তৈরি নবগ্রহমূর্তি শোভা পাচ্ছে। মন্দিরের সমস্ত জালিই ফতেপুর সিক্রির ইসলামী ধারা থেকে নেওয়া। কার্নিশের তলার ব্র্যাকেটে মাউন্ট আবুর প্রভাব, আবার স্তম্ভশীর্ষের ব্র্যাকেটে বৌদ্ধ স্থাপত্যের ছাপ। গোপুরমের খিলান অজন্তা ঢংয়ের কিন্তু দু'পাশের অন্যান্য আর্চ পুরোপুরি মোগল চরিত্রের। এতগুলি ভিন্নধর্মী বাস্তুশিল্পের খুঁটিনাটি সমাহার কিন্তু সবই পরস্পরের মানানসই। সমন্বয় সাধনা এখানে সিদ্ধিলাভ করেছে। সমস্ত ব্যাপারটিই এক নজরে মনে হয় বাঙালি ঘরানার।

বর্তমানে কলকাতার ভাঙা-গড়ার খেলায় বিস্ফোরণ ঘটেছে। উনিশ শতকের গোড়ায় পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের বলে বলীয়ান হয়ে আসরে নেমেছে রিইনফোর্স্‌ড কংক্রিট। শুরু হয়েছে ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা। জন্ম নিচ্ছে অভূতপূর্ব এক স্থাপত্য-স্টাইল : ক্যান্টিলিভার স্ল্যাব, প্যারাবোলিক শেল, প্রিস্ট্রেস্‌ড কংক্রিটের বিপুল স্প্যান—চার্নকী শহরের দিগন্ত পাল্টে দিচ্ছে রাতারাতি।

রিইনফোর্স্‌ড কংক্রিটের প্রযুক্তিগত বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে শহরে দেখা দিয়েছিল এক সামাজিক বিস্ফোরণ। শহরের ভিতরের স্থান সীমিত। ফলে উত্তরে-দক্ষিণে মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্ট বেড়ে চলল চন্দননগর থেকে বারুইপুর, ব্যারাকপুর থেকে জোকা। এই সময়ে গড়ে উঠল সল্ট লেক সিটি। সেই সঙ্গে নব্য কলকাতার স্থপতিরা পেলেন স্বল্প উচ্চতা-বিশিষ্ট বাড়ির ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক বিস্তীর্ণ সুযোগ। নতুন শিল্প সৃজনের নেশায় সুন্দরের নিত্য আনাগোনা শুরু হল কলকাতার স্থাপত্যের অঙ্গনে।

চিত্র বা ভাস্কর্যের মত স্থাপত্য কেবল দৃষ্টিগ্রাহ্য রইল না, তা একাধিক ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ্য হয়ে উঠল। ষাট ও সত্তর দশকে শহরের স্থপতিরা মূল শহরের ভিতরে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য আকাশচুম্বী অট্টালিকা। নিউ সেক্রেটারিয়েট, জীবনদীপ, টাটা সেন্টার,

চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল, পার্কপ্লাজা, এয়ার কণ্ডিশান্‌ড্‌ মার্কেটের মত বহুতল অট্টালিকা কলকাতার বুকে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নগরবাসীর বিস্মিত চোখের সামনে কলকাতার আকাশরেখার নিত্য পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তবে এসব বাড়ির প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নয়নাভিরাম স্থাপত্যের তেমন কোনো পরিচয় নেই।

যে-কোনো বাড়ির ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ মাটি এবং প্রস্তরস্তরের চরিত্র বাড়ির নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণজনিত ভার ও অন্যান্য অস্থাবর ভার, প্রবহমান বায়ুর সর্বাধিক চাপ, এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা ও নক্‌শার বিশেষ ভূমিকা কাজ করে, সন্দেহ নেই, বিশেষ করে বহুতল বাড়ির ক্ষেত্রে তাব গুরুত্ব আরো উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ভূকম্পনজনিত চাপও বাড়ির ইঞ্জিনিয়ারিং পরিকল্পনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে—যদিও কলকাতার মত শহরে প্রায়শই এ-বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা হয় না। কলকাতার মাটি বহুতল বাড়ি করার উপযোগী এমন কথা বলা যায়। এই গাঙ্গেয় মোহনা অঞ্চল ভূতাত্ত্বিকদের মতে অতীতে এক বিস্তীর্ণ ও গভীর ডোবা ছিল এবং কালক্রমে পলিমাটিতে তা ভর্তি হয়।

যে-মাটির উপরে স্থপতিরা ভিত প্রস্তুত করবেন তা যদি ম্যানহাটান শহরের মত গ্রানাইট পাথর হয় তাহলে আশি বা একশো তলা উঁচু বাড়ি তৈরি করা কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু নদীবাহিত পলিমাটিতে পাথরের অস্তিত্ব নেই। এখানে ৩০ মিটারের বেশি গভীরেও পাথরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। কলকাতার মাটি ১ বর্গ মিটারে প্রায় ১০ টন বল সহ্য করতে পারে ধরে নেওয়া হয় এবং পাইলিং ছাড়া এখানে ১০ তলা পর্যন্ত বাড়ি তৈরি করা সম্ভব। তবে উপযুক্ত মাটি পরীক্ষা ছাড়া সাধারণ 'ভাল মাটি'র ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে প্রায় ৮ টনের বেশি ওজন চাপানো উচিত নয়। একটা কথা মনে রাখা দরকার—বাড়ির বহর যত বড় হবে তার চাপ মাটির তলায় তত বেশি গভীরে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, কোনো বাড়ির প্রস্থ যদি ১০ মিটার হয় তার চাপ মাটির তলায় প্রায় ৩০ মিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে উপরের দু-তিন মিটার মাটির স্তর দেখে নীচের স্তরের চরিত্র বোঝা সম্ভব নয়। এখানেই প্রয়োজন নির্দিষ্ট গভীরতা থেকে মাটির নমুনা উঠিয়ে তাকে গবেষণাগারে পরীক্ষা করা।

মনে রাখতে হবে পার্টিশান দেওয়ালবিহীন দশ তলা অফিসবাড়ি মাটির উপর যে চাপ দেয় তার থেকে বহু পার্টিশান দেওয়াল-বিশিষ্ট দশ তলা বসতবাড়ি বেশি চাপ সৃষ্টি করে। যদি ৯০ বা ১০০ টনের মত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কংক্রিট পাইল (যা সাধারণত ২০ থেকে ২৫ মিটার গভীরে প্রবেশ করে) ব্যবহার করা হয় তাহলে চৌরঙ্গির 'টাটা সেণ্টার' কিংবা ক্যামাক স্ট্রিটের 'ইণ্ডাস্ট্রি বিল্ডিং' (বিড়লা)-এর মত ২০ বা ২২ তলা বাড়ি কলকাতার বুকে তোলা সম্ভব।

আকাশচুম্বী বাড়ির ক্ষেত্রে বাতাসের চাপটা কোনোমতেই উপেক্ষণীয় নয়। অট্টালিকার উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসের চাপ বাড়ে। তবে দশ তলা পর্যন্ত উঁচু বাড়ির বেলায় বাতাসের চাপ কম করে প্রতি বর্গ মিটারেপ্রায় ২০০ কিলোগ্রাম।

সাধারণভাবে মনে করা হয়, আকাশচুম্বী অট্টালিকার ঊর্ধ্বমুখ ক্রমশ সরু হয়ে আসে কিন্তু এর পিছনে কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ নেই। নাগরিক সভ্যতায় আলো বাতাস চলাচলের সুযোগ রাখা উচিত, না হলে বদ্ধ শহরে আলো বাতাস চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়ে আসবে। সব দেশের ক্ষেত্রেই এ-কথাটা প্রযোজ্য। পৌর আইনের পরিকাঠামোর মধ্যে যথেষ্ট জায়গা চারদিকে ছাড়তে পারলে যে কোনো আকৃতির বৃহৎ অট্টালিকা গড়ে তোলা সম্ভব—অবশ্যই যোগ্য ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তাতেই।

বর্তমানে বহুতল উঁচু বাডিব ক্ষেত্রে বিম-ছাডা এবং বিম যুক্ত দু' বকমেবই উঁচু বাডি তৈবি হচ্ছে কলকাতা শহবে।

কলকাতায স্থাপত্যেব ক্ষেত্রে মূল্যাযনেব সময আজও হযনি। তবে তিনশো বছবেব কলকাতাব স্থাপত্য এখনও সমন্বয সাধনেব কাজ কবে চলেছে।

কলকাতার সংগ্রহশালা

অমিত চক্রবর্তী

মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা হল আমাদের ফেলে আসা অতীতের সাক্ষী। ভারতের প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম বা সাধারণ সংগ্রহশালার স্থাপন কলকাতার ৩০০ বছরের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান ঘটনা। এর জন্য সুদূর ডেনমার্কের এক উদ্ভিদবিজ্ঞানীর কাছে কলকাতাবাসীদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। স্বাধীনতালাভের পর ভাবতের প্রথম শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালাটিও গড়ে উঠেছিল এই কলকাতায়। কলকাতার বিশিষ্ট নাগবিক ও ইতিহাসপ্রেমী মানুষদের উদ্যোগে গত দু'শো বছরে কলকাতায় নতুন নতুন সংগ্রহশালা যেমন গড়ে উঠেছে, তেমনি পুরনো সংগ্রহশালাগুলিও সমৃদ্ধতর হয়েছে। কলকাতার বিশিষ্ট সংগ্রহশালাগুলির এক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত রাখা হয়েছে এখানে।

এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহশালা

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। 'ক্রোকোডাইল' নামে এক রণতরীতে চেপে ইংল্যাণ্ড থেকে ভাবতে আসছেন সার উইলিয়াম জোনস। কলকাতাব সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির দায়িত্ব নিয়ে তাঁর এদেশে আসা। কলকাতায় আসার কথা চূড়ান্ত হওয়া মাত্রই নতুন এক স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন তিনি। পৃথিবীব বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য, তাদের সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান সম্পর্কে পড়াশুনো—গবেষণার এক কেন্দ্র গড়ে তোলাব স্বপ্ন জাহাজে বসেই তিনি স্মাবকলিপিব আকারে লিখে ফেললেন তাঁব স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করাব যাবতীয় পবিকল্পনা।

উইলিয়াম জোন্স কলকাতায় পৌঁছোন ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর। এর ঠিক তিন মাস পরে কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছে এক বিশেষ সভার আমন্ত্রণপত্র পাঠালেন তিনি। সভার উদ্দেশ্য : প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে পঠন-পাঠন ও গবেষণার জন্য এদেশে একটি সোসাইটি তৈরি করা। সভা ডাকা হয়েছিল কলকাতার পুরনো সুপ্রিম কোর্টের 'গ্র্যাণ্ড জুরি রুম'-এ ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় তিরিশজন ইংরাজ এবং সভা পরিচালনা করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাব রবার্ট চেম্বার্স। উইলিয়াম জোন্স সেই সভায় সোসাইটি গঠনের সপক্ষে জোরালো যুক্তি উত্থাপন করেন। ওই সভাতেই বাংলার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে পৃষ্ঠপোষক এবং উইলিয়াম জোন্সকে সভাপতি নির্বাচিত করে তৈরি হল 'দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি'।

এশিয়াটিক সোসাইটির অঙ্গ হিসাবে মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা তৈরির কোনো পরিকল্পনা ছিল না উইলিয়াম জোন্স-এর। সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর প্রথম বারোটি বছর সোসাইটির নিজস্ব কোনো বাড়ি ছিল না। প্রতি মাসে একবার করে সোসাইটির সভ্যরা

মিলিত হতেন সুপ্রিম কোর্টের গ্র্যাণ্ড জুরি রুম-এ—প্রথম যেখানে সভা হয়েছিল সেখানেই। এদিকে কলকাতার ইউরোপীয় সমাজের কাছ থেকে কিছু কিছু উপহার-সামগ্রী আসছিল—পুরনো আমলের প্রাচ্য সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন। উইলিয়াম জোন্‌স যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনিই সব সংরক্ষণ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের এক সাধারণ সভায় কোনো কোনো সদস্য সোসাইটির বইপত্র এবং বিভিন্ন দ্রষ্টব্য জিনিস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাড়ি তৈরির প্রস্তাব আনেন। ঠিক হল—বিনামূল্যে জমি পাওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠানো হবে। সেই সঙ্গে সদস্যপিছু বার্ষিক চাঁদা হিসাবে চারটি করে মোহরও ধার্য হবে, এবং বছর কয়েকের মধ্যে তহবিলে যে-চাঁদা জমা পড়বে তাই দিয়ে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হবে।

বিনামূল্যে জমি চেয়ে সোসাইটি যে-আবেদন রেখেছিলেন, সরকার থেকে তার কি উত্তর এসেছিল জানা নেই। তবে বছর কয়েক পর ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই তারিখে জমির জন্য নতুন করে যে আবার আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় আবেদনপত্রে পার্ক স্ট্রিটের এক কোণে এক টুকরো জমির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। পার্ক স্ট্রিটের ওই অঞ্চলে ঘোড়ায়-চড়া শেখানোর এক স্কুল ছিল; তারই সম্পত্তি ছিল জমিটা। পরে ওটা সরকার অধিগ্রহণ করে। সোসাইটির আবেদন এবারে মঞ্জুর হল। জমির পশ্চিম দিকের সামান্য একটু অংশ পুলিশ-থানা এবং দমকলের জন্য ছেড়ে রেখে বাকি জমিটা সোসাইটিকে দিয়ে দেওয়া হল। এটি ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। বাড়ি তৈরি হতে সময় লাগল আরো তিন বছর। খরচ পড়ল মোট ৩০ হাজার টাকা।

নতুন বাড়িতে সোসাইটির যাবতীয় বইপত্র, হাতে-লেখা পুঁথি এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত সাংস্কৃতিক ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিকে সরিয়ে নিয়ে আসা হল। সোসাইটির বইপত্র ব্যবহারের অনুমতি না পাওয়া গেলেও, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা শোনার জন্য নতুন বাড়ির অডিটোরিয়ামে ঢোকার অনুমতি ছিল সাধারণ লোকজনের। ওই সময়েই কোপেনহেগেন থেকে আগত 'ন্যাথানিয়েল ওয়ালিচ' নামে এক সার্জন বন্দী হলেন কলকাতার ইংরাজ শাসকদের হাতে। ভদ্রলোক ডেনমার্কের বাসিন্দা। ডেনমার্কের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধ চলছে তখন। ডেনমার্কের বাসিন্দা বলেই ওয়ালিচকে বন্দী করে রাখা হল শ্রীরামপুরে। মানুষটির চোখে স্বপ্ন ছিল। দেশ ছাড়ার আগে দেখে এসেছেন সেখানে জাতীয় সংগ্রহশালা সবে তৈরি হয়েছে। নিজে নানা জাতের উদ্ভিদ সংগ্রহ করে বেড়ান, শিক্ষার্থী আর গবেষকদের কাছে মিউজিয়ামের গুরুত্ব কতটা তা তিনি জানতেন। বন্দী অবস্থায় শ্রীরামপুর থেকে তিনি চিঠি লিখলেন এশিয়াটিক সোসাইটিতে। সেই চিঠি পেয়ে সোসাইটির সদস্যরা পার্ক স্ট্রিটের বাড়ির পুরো একতলাটা জুড়ে মিউজিয়াম তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি। এই দিনটিকে এ-দেশের প্রথম মিউজিয়ামের জন্মদিন হিসাবে ধরা যেতে পারে।

মিউজিয়ামের আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করা হলেও সোসাইটির সংগ্রহে যেসব মুদ্রা, তাম্রফলক, পাথরের মূর্তি, শিলালিপি ছিল সেগুলিকে লাইব্রেরি-ঘরে রাখা হল গ্রন্থাগারিকের জিম্মায়। সোসাইটির সংগ্রহে যেসব ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং মৃত প্রাণীর নমুনা ছিল সেগুলিকে মিউজিয়ামে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখার দায়িত্ব নিলেন ডক্টর ওয়ালিচ নিজেই। এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যরা ইতিমধ্যে ডেনমার্কের ওই মানুষটিকেই মিউজিয়ামের কিউরেটর হিসাবে মনোনীত করেছেন।

মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার বছর থেকেই প্রধানত ভারতের ইউরোপীয় সমাজের কাছ থেকে

নানারকম মূর্তি, প্রাচীন হাতিয়ার, বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত মুদ্রা, উল্কাপিণ্ড, খনিজ, পাথর, আদিবাসী মানুষদের ব্যবহার্য নানা জিনিস আসতে শুরু করে। ওয়ালিচ সাহেবের নিজের সংগ্রহে ছিল বিয়াল্লিশ রকমের জিনিস। সে-সব তিনি দান করলেন মিউজিয়ামে। প্রথম যুগের ভারতীয় দাতাদের মধ্যে বেগম সামরু, রামকমল সেন, শিবচন্দ্র দাস, রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, মথুরানাথ ও রাজেন্দ্র মল্লিকের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের পিতামহ রামকমল সেন দিয়েছিলেন বাদ্যযন্ত্র আর চড়কের সময়ে বড়শি-কাঁটা-লোহার ব্যবহারযোগ্য অস্ত্র। ইনি পরে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সম্পাদক হন। শোনা যায়, রাধকান্ত দেব দু' মাথাওয়ালা একটা পায়রা দিয়েছিলেন। উইলিয়াম কেরিরও দান ছিল মিউজিয়ামে।

ওই সময়কার সংগ্রহে যেসব মূর্তি এসেছিল সেগুলির মধ্যে গান্ধার অঞ্চল থেকে পাওয়া দু' হাজার বছরের প্রাচীন বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির মূর্তি অন্যতম। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কাশীর কাছে সারনাথে সেনাবাহিনীর এক ক্যাপ্টেন মাটি খুঁড়ে পেলেন একটি বৌদ্ধ স্তূপ। সেখান থেকে ৬০-৭০টি মূর্তি এল মিউজিয়ামে।

প্রথম দিকে মিউজিয়ামের কিউরেটরের মাইনে বলতে কিছু ছিল না। মিউজিযাম চালু হওয়ার বছর কয়েক পর ডঃ ওয়ালিচ কিউরেটরের পদ থেকে সরে আসেন। তাঁর জায়গায় মাসিক ৫০ টাকায় মিউজিয়ামেব সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পদে নিযুক্ত হলেন মিস্টার গিবন। মিউজিয়ামের বিভিন্ন সংগ্রহের অবশ্য ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছিল না। প্রাণীতত্ত্ব এবং ভূতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আছে—বিনা মাইনেয় এমন লোকের সাহায্য পাওয়া সম্ভব ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দিয়ে যেসব ইংরাজ এদেশে আসতেন তাঁদেবই কেউ কেউ সাধ্যমতো সাহায্য করতেন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে সোসাইটিব ফিজিক্যাল কমিটি মাসিক ১৫০ টাকা পারিশ্রমিকে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিয়োগের প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। এরও প্রায় বছর দশেক পরে মিউজিয়ামেব কিউরেটরের মাইনে হিসাবে মাসিক ২০০ টাকা ও মিউজিয়ামের সংগ্রহে রাখার উপযোগী জিনিস কেনার জন্য নির্দিষ্ট অর্থের অনুদান পাওয়া গেল সরকারের কাছ থেকে। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে মাসিক সরকারি অনুদানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০ টাকা।

এরপরই সোসাইটির কোনো সদস্য মিউজিযামেব কিউরেটর হিসাবে ইউরোপ থেকে বিশেযজ্ঞ আনার পরামর্শ দেন। সোসাইটির লণ্ডনের প্রতিনিধি ডঃ উইলসনের উপর কিউরেটর নির্বাচনের ভার পড়ে। শেষ পর্যন্ত ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দেব সেপ্টেম্বর মাসে এডওয়ার্ড ব্লিথ নামে এক প্রকৃতিবিদ্ কিউরেটরের দায়িত্ব নিয়ে এদেশে আসেন। সেই মানুষটির উৎসাহেই মিউজিয়ামের সংগ্রহে নূতন নূতন জিনিস এল। ইতিমধ্যে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারের তরফ থেকেও 'ইকনমিক জিওলজি'র উপর আলাদা একটি সংগ্রহশালা খোলা হয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটির বাড়িতেই। পরে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হলে সংগ্রহশালাটিকে ওখানেই সরিয়ে নেওয়া হয।

ভূতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সরে যাবার পর মিউজিয়ামের প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের নিদর্শনগুলি রাখার বাড়তি জায়গা পাওয়া গেল। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার লালদীঘি থেকে দড়ির ফাঁস দিয়ে ধরা হল এক কুমীর। সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল এশিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়ামে। এর বছর কয়েক আগে একখানা মরা মানুষের হাত এসেছিল। তিন হাজার বছর আগেকার মানুষের 'মমি' করে রাখা হাত।

সোসাইটির তরফ থেকে ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলকাতায় একটি 'ইম্পিরিয়াল

মিউজিয়াম' প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন রাখা হয় ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে। এই ধরনের সরকারি সংগ্রহশালায় এশিয়াটিক সোসাইটি তার লাইব্রেরির বইপত্র, মুদ্রা ও পাণ্ডুলিপি ছাড়া মিউজিয়ামের যাবতীয় জিনিস স্থানান্তরিত করবে এমন অঙ্গীকারও করা হল। এ-প্রস্তাবে সরকার রাজী হয়নি। এরপর সিপাহী বিদ্রোহের দরুণ ওই বিষয়টি কিছুদিনের জন্য ধামা চাপা পড়ে। সিপাহী বিদ্রোহ কেটে যাওয়ার পর কোম্পানির রাজত্ব শেষ হলে নতুন করে তদানীন্তন ব্রিটিশরাজের কাছে পূর্ণাঙ্গ একটি মিউজিয়াম তৈরিব আবেদন রাখা হয়। এবারের আবেদনে সরকারি সাহায্য পাওয়া যায়। সবকার তার সম্মতির কথা জানাল ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। জনসাধারণের জন্য 'দ্য ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম' স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিল সরকার। এশিয়াটিক সোসাইটির তরফে সংগৃহীত প্রায় সমস্ত জিনিস আনুষ্ঠানিকভাবে নবনির্মিত সরকারি যাদুঘরে স্থানান্তরিত কবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর। সোসাইটির লাইব্রেরিতে যে-বইপত্র, হাতে-লেখা পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি এবং দেশবিদেশের মুদ্রার সংগ্রহ ছিল সেগুলি ছাড়া মিউজিয়ামের যাবতীয় জিনিস একে একে চলে গেল চৌরঙ্গি বোডে ভারতীয় জাদুঘরের নতুন বাড়িতে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে মিউজিয়ামের স্থানান্তবণের কাজ শেষ হওয়ার পর সোসাইটির নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কিছু ছবি ও পুরাতাত্ত্বিক জিনিস রেখে দেওয়া হয়। এগুলি সংখ্যায় অল্প হলেও খুবই মূল্যবান।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে এখনও রয়েছে উইলিয়াম জোন্‌স, এইচ কোলব্রুক, জে প্রিন্সেপ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর মত বৃটিশ আমলেব অতি বিশিষ্ট মানুষজনের আবক্ষমূর্তি ও তৈলচিত্র। কোম্পানির আমলে রবার্ট হোম নামে এক ব্রিটিশ শিল্পী অযোধ্যার নবাব গাজিউদ্দিন হায়দারের অধীনে কাজ নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্টুডিওর যাবতীয় শিল্পকর্ম সোসাইটিকে দান করেছিলেন ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে। সেই ছবিগুলি নিয়েই তৈরি হল ভারতের প্রথম আর্ট-গ্যালারি। মিউজিয়াম সরে গেলেও রবার্ট হোমের ছবিগুলি এখনও রয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটিতে। সেই সঙ্গে আছে রুবেন্স, গুইডো, রেনোল্ড্‌স, অতুল বসুর আঁকা ছবি। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলার গভর্নর পদ্মজা নাইডু সোসাইটিকে উপহার দিয়েছেন অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতাকে নিয়ে শিল্পীদের তৈরি এনগ্রেভিং, মোট সংখ্যা ১৩৪। প্রিন্সেপ ও ড্যানিয়েলের আঁকা ছবির প্রিন্টও রয়েছ সোসাইটির এখনকার সংগ্রহে। এছাড়া আছে হ্যামিল্টনের আঁকা জন্তু-জানোয়ারের অসাধারণ সব ছবি।

এশিয়াটিক সোসাইটির এখনকার সংগ্রহে আছে প্রায় ৪২,০০০ পুঁথিপত্র ও হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি। ভারতে পুঁথিপত্রের সবচেয়ে বড় সংগ্রহ এটি। অসমীয়া, বাংলা, গুজরাতি, সংস্কৃত, মারাঠি, ওড়িয়ার মত ভারতীয় ভাষা ছাড়াও সিংহলী, আর্মেনীয়, ফার্সি, জাভানিজ, তুর্কি, চিনা, তিব্বতী ভাষার পাণ্ডুলিপির সংখ্যাও কম নয়। তালপাতা, ভূর্জপত্র থেকে শুরু করে নানা ধরনের কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপিব মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লেখা তন্ত্রসম্পর্কিত 'কুবুজিকানতম' প্রাচীনতম। সপ্তম শতাব্দীতে তালপাতার উপবে লেখা ওই পাণ্ডুলিপির হরফগুলিতে গুপ্তযুগের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দশম শতাব্দীতে লেখা 'অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'-তে ধ্যানরত বুদ্ধের বেশ কিছু ছবিও আঁকা হয়েছে। কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হল ঋকবেদের এক খণ্ডিত সংস্করণ—এটি লেখা হয়েছিল ত্রয়োদশ শতকে।

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে সেখানকার আরবি,

সংস্কৃত, ফার্সি, উর্দু ও বাংলাভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপির বিরাট সংগ্রহ চলে আসে এশিয়াটিক সোসাইটিতে। সোসাইটির গ্রন্থাগারিকের পদে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁর মৃত্যুর পরে ওই পদে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এসে যোগ দেন। তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাংলাভাষায় লেখা পুঁথিপত্র সংগৃহীত হতে থাকে। এইসব পুঁথিপত্রের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবির লেখা রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও মঙ্গলকাব্য। জ্যোতিষ বিষয়ে খনার বচন এবং শুভঙ্করের লেখা অঙ্কের হিসাব-সংক্রান্ত বিষয়ের উপরও প্রাচীন পাণ্ডুলিপি রয়েছে সোসাইটির সংগ্রহে।

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন দেশের মুদ্রা সংগৃহীত হয়েছে। সেইসব মুদ্রার এক তালিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে। সোসাইটির এখনকার সংগ্রহে রোম সম্রাট অগাস্টাসের সময়কার মুদ্রা থেকে শুরু করে ভারতে কুষাণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত মুদ্রা যেমন আছে, তেমনি বিভিন্ন যুগে ভারতের আদিবাসীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন মুদ্রাও নজরে আসে। সোসাইটির অন্যান্য সংগ্রহের মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ অব্দে পাথরের উপর ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা সম্রাট অশোকের অনুশাসন ও দ্বাদশ শতাব্দীর ব্রহ্মামূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় জাদুঘর

এশিয়াটিক সোসাইটির তরফে কলকাতায় সর্বসাধারণের জন্য সংগ্রহশালা স্থাপনের বিষয়ে যে-প্রস্তাব রাখা হয়েছিল সে-ব্যাপারে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি পাওয়া যায় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাণীতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক সংগ্রহকে কিভাবে সরকারি সংগ্রহশালার অন্তর্ভুক্ত করা হবে সে-বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলে দীর্ঘ তিন বছর ধরে। শেষে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে সোসাইটি এবং সরকারের মধ্যে যে-চুক্তি হয় তার মূল কথা : সরকারি সংগ্রহশালার জন্য নির্দিষ্ট ভবনে সোসাইটি তার ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক যাবতীয় সংগ্রহ স্থানান্তরিত করবে, সেই সঙ্গে সেগুলি প্রদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব নেবে। এই চুক্তি কার্যকর করার জন্যে সরকারি আইন (Act XVII) পাশ হল ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে। একই সঙ্গে প্রস্তাবিত মিউজিয়ামের দায়িত্বভার দেওয়া হল এক ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে ; বোর্ডের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সোসাইটি মনোনীত। বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব নিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের অন্তর্গত বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি সার বার্নেস পীকক্।

এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনের কাছেই চৌরঙ্গি রোডে ভারতীয় জাদুঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে। বাড়ি তৈরি হতে সময় লাগল আট বছর। স্থপতি ছিলেন ডব্লিউ এল গ্র্যানভিল। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় যাদুঘরের যাবতীয় দ্রষ্টব্য আগের মতই সাজানো ছিল সোসাইটির নিজস্ব বাড়িতে। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের পয়লা ডিসেম্বর থেকে সোসাইটিকে এ-বাবদ বাৎসরিক ভাড়া হিসাবে সরকার ৪০০ টাকা মঞ্জুর করেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে মিউজিয়ামের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হল। এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত যে-ভূতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার নিজস্ব বাড়িতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেগুলিকে নবনির্মিত জাদুঘরে ফেরত নিয়ে আসা হয় ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে। ইতিমধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়াম থেকে মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর নমুনাগুলিকে সরিয়ে আনা হয়েছে। পুরাতত্ত্ব, পাখি ও প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ক

গ্যালারিগুলিকে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের পয়লা এপ্রিল। এর চোদ্দ বছর পরে ১৮৯২-এর সেপ্টেম্বর মাসে খোলা হল আর্ট গ্যালারি। নৃতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্যালারির উদ্বোধন হয় তার পরের বছর। মিউজিয়ামকে পাঁচটি বিভাগে ভাগ করবার প্রস্তাব করা হল ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে। বিভাগগুলির বিষয় : ১· প্রাণীতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব ২· পুরাতত্ত্ব ৩· ভূতত্ত্ব ৪· স্থাপত্য ও চিত্রাঙ্কন এবং ৫· শিল্প। ওই প্রস্তাব কার্যকরী হতে সময় লাগল ছ' বছর। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে যাদুঘরের শতবর্ষ পূর্তির বছরে উদ্ভিদের বিষয়ে স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়। বাদ্যযন্ত্রের গ্যালারিটি তৈরি হয় ১৯৬৬-এর অগাস্ট মাসে। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং অন্যান্য সূত্র থেকে যেসব প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়, সেগুলিকে নিয়ে মুদ্রা-গ্যালারি চালু হয়েছে হালে—১৯৮১-এর নভেম্বর মাসে।

যাদুঘরের দোতলায় পৃথক মিশরীয় গ্যালারির উদ্বোধন হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ ডিসেম্বর। এখানেই কাচে ঘেরা কফিনের মধ্যে রাখা আছে চার হাজার বছরের প্রাচীন সেই বিখ্যাত মমি। মুখের মাংস খসে গিয়ে কঙ্কাল বের করা মুখ। পাশে রাখা কফিনের ঢাকনায় আঁকা আছে সে-মুখের আসল ছবি। ঠিক কবে, কিভাবে ওই মমি যাদুঘরে এসে পৌঁছেছিল কাগজপত্রে তার হদিশ পাওয়া যায়নি। শুধু জানা যায় ই সি আর্চবোল্ড নামে এক ইংরাজ লেফটেন্যান্ট মিশরের কোনো এক সমাধি থেকে মমিটিকে উদ্ধার করে এক যুদ্ধজাহাজে চাপিয়ে পাঠিয়ে দেন ভারতের দিকে। শোনা যায়, জাহজে করে মমি বয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে প্রবল আপত্তি তুলেছিল জাহাজের মুসলমান নাবিকেরা। শেষ পর্যন্ত ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তালিকায় দেখা যায়, মমিটি জাদুঘরে এসে পৌঁছেছে। মিশরের মমি কিভাবে সুয়েজ খাল এবং আরব সাগর পেরিয়ে বোম্বাই হয়ে কলকাতার যাদুঘরে এসে পৌঁছল সে-রহস্যের সমাধান আজও হয়নি। মমির আসল পরিচয়, শারীরিক বৃত্তান্তও আমাদের অজানা ছিল এই সেদিন পর্যন্ত। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে গোটা মমিটার এক্স-রে করা হয়। এদেশে মমির এক্স-রে সেই প্রথম। রিপোর্টে জানা গেল, মমিটি একজন বয়স্ক পুরুষ মানুষের। মৃত্যুর সময়ে লোকটির বয়স ছিল পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। হাঁটুতে ছিল গেঁটেবাত, বুক ও পিঠের পাঁজর ভাঙা—মনে হয়, মানুষটিকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বিশাল এক পাথরের তোরণ এসেছিল যাদুঘরে। তোরণটি এসেছিল মধ্যপ্রদেশের 'ভারহুত' নামে এক গণ্ডগ্রাম থেকে। যিশুখ্রিস্টের জন্মের দুশো বছর আগে বিশাল এক বৌদ্ধস্তূপ তৈরি হয়েছিল সেখানে। সেই স্তূপের চারদিকে ছিল চারটি তোরণ। তিনটি তোরণ নষ্ট হয়েছে বহু আগেই। চতুর্থটিও ভেঙেচুরে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল মাটিতে। লাল পাথরের সেই তোরণের বিশাল খণ্ডগুলিকে প্রথমে গরুরগাড়ি এবং পরে ট্রেনে করে কলকাতায় নিয়ে আসেন আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম। তারপর প্রায় ৪২৫ খণ্ড পাথরকে পর পর সাজিয়ে তোরণের পুরনো চেহারা ফিরিয়ে আনা হল। তোরণের স্তম্ভ আর দেওয়ালে আছে মানুষ-প্রমাণ যক্ষ-যক্ষীর মূর্তি। পাথরের ফলকে খোদাই করা রয়েছে জাতকের সব কাহিনী, আছে ফুল-ফল, লতা-পাতা। পাথরের গোল একটা ফলকে বুদ্ধের জন্মের দৃশ্য খোদাই করা। গৌতম বুদ্ধের মা স্বপ্ন দেখছেন, সাদা হাতির রূপ ধরে তাঁর ছেলে যেন নেমে আসছে মর্ত্যলোকে। মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভারহুত-গ্যালারির এটাই এখনও প্রধান আকর্ষণ।

ভারতের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে বড় এই মিউজিয়ামের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, এর পুরাতত্ত্ব বিভাগে সংরক্ষিত নিদর্শনগুলি। পুরনো ও নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার,

হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর শীলমোহর, পোড়ামাটির মূর্তি ও নকশা করা মাটির পাত্রের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে মৌর্যযুগের অশোকস্তম্ভেব সিংহের মাথা, সাঁচীর যক্ষী, গান্ধার শিল্পের নিদর্শন হিসাবে বুদ্ধের জীবনালেখ্য, কুষাণ যুগের বুদ্ধমূর্তি, শাতবাহন রাজাদেব আমলে তৈরি অমরাবতীর অনুপম স্থাপত্য, গৌরবঙ্গের পাল ও সেন যুগে তৈরি হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্তি। মূর্তি ছাড়াও পুরাতত্ত্বের গ্যালারিতে রয়েছে মূল্যবান শিলালিপি, তাম্রফলকে খোদাই করা রাজারাজড়াদের অনুশাসন, চিত্র-সম্বলিত পুঁথি ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপি।

ব্যবহারিক উদ্ভিদের গ্যালারিব অন্যতম আকর্ষণ মূল্যবান সব ভাবতীয় কাঠের নমুনা ও নিত্যব্যবহার্য কাঠের সামগ্রী। প্রত্যেক কাঠের টুকরোর গায়ে তার বৈজ্ঞানিক নাম, গোত্র ও ব্যবহারিক নাম লেখা আছে। খাদ্যদ্রব্য বিভাগে মানুষ এবং গরু-মোষের আহার্য হিসাবে ব্যবহৃত প্রায় ১২০০ উদ্ভিদজাত জিনিস সংরক্ষিত আছে। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল ও কাশ্মীর উপত্যকা থেকে পাওয়া ওষধি গাছের যেসব নমুনা সাজানো আছে তার সংখ্যা ১৪০০। গাছ-গাছড়া থেকে বিশেষ কয়েকটি ওষুধ তৈবিব প্রক্রিয়াও এখানে ধাপে ধাপে প্রদর্শিত। উদ্ভিজ্জ তন্তু ও উদ্ভিজ্জ রঙের বিভিন্ন নমুনা ছাড়াও নানা ধরনের উদ্ভিজ্জ তেলের সংগ্রহ দর্শকদের আকৃষ্ট কবে। ব্যবহাবিক উদ্ভিদের মূল গ্যালারি-সংলগ্ন স্বতন্ত্র কক্ষে বাঁশ, শোলা ও নানা জাতের কাঠ দিয়ে তৈরি শিল্প-সামগ্রীর পাশাপাশি সাজানো আছে গাছের বাকল আব ভূর্জপত্রের হরেক নমুনা। উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত গ্যালারির প্রধান রূপকার সার জর্জ ওয়াট। ১৮৮২ থেকে ১৮৯৬—এই চোদ্দ বছরে বিভাগটিকে যেমন মনের মত করে সাজিয়েছেন, তেমনি ব্যবহারিক উদ্ভিদেব উপর প্রামাণ্য অভিধান লিখে বিশেষজ্ঞমহলে তিনি অমর হয়ে আছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় যাদুঘরের প্রাণীতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্যালারিটির প্রচুর ক্ষতি হয়। বোমার আক্রমণের আশঙ্কায় গ্যালারিব যাবতীয় দ্রষ্টব্য বারাণসীর কাছে কাইজার ক্যাসেলে স্থানান্তরিত করা হয়। স্বাধীনতার পরে সেগুলিকে ফেরত আনার সময় কিছু কিছু মূল্যবান নিদর্শন খোয়া যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে ভারতীয় যাদুঘবে প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ে দুটি গ্যালারি রয়েছে; একটিতে স্থান পেয়েছে স্তন্যপায়ী প্রাণীর অসংখ্য নমুনা, আব অন্যটিতে মাছ, রেপটাইল ও পাখি। ব্রহ্মদেশের আরাকান সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর থেকে পাওয়া তিমির ২৬ মিটার লম্বা এক চোয়াল দাঁড় করানো আছে স্তন্যপায়ী-গ্যালারির প্রধান দরজার দু'পাশে। অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের উত্তরাংশ থেকে পাওয়া 'নীল তিমি'র খুলি রাখা আছে ওই গ্যালারিতেই। তিমি ছাড়াও ওখানে রয়েছে জিরাফ, দু-কুঁজওয়ালা উট, হাতি, শিঙওয়ালা গণ্ডার আর ওরাং ওটাং-এর কঙ্কাল; মৃত জন্তু-জানোয়ারের 'স্টাফ' করা গোটা শরীর ও হরেক জাতের কীট-পতঙ্গের নমুনা। মাছের গ্যালারির অন্যতম আকর্ষণ—স্টাফ করা এক হাতুড়িমুখো হাঙর।

নৃতত্ত্ব বিভাগটি একসময়ে প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের অন্তর্গত থাকলেও এখন এর আলাদা অস্তিত্ব। এর একদিকে প্যালিওঅ্যানথ্রপোলজি গ্যালারি; চার্ট ও মডেলের সাহায্যে মানুষের ক্রমবিবর্তনের ধারাকে তুলে ধরা হয়েছে এখানে। এই গ্যালারিটি ভারতীয় যাদুঘরের সাম্প্রতিক সংযোজন (১৯৮৭)। কালচারাল অ্যানথ্রপোলজি-গ্যালারিতে ভারতের বিভিন্ন নরগোষ্ঠী আদিবাসীদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, হাতিয়ার, আসবাবপত্র, প্রসাধন ও আনন্দ-উপকরণ সংরক্ষিত।

জাদুঘরের ভূতত্ত্ব গ্যালারির সামনে বারান্দায় পড়ে আছে বিশাল এক গাছের জীবাশ্ম; বয়স ২০ কোটি বছর। এছাড়াও ফসিল বা জীবাশ্মের জন্য নির্দিষ্ট গ্যালারি দু'টির একটিতে

ভারতবর্ষের শিবালিক অঞ্চলে পাওয়া মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জীবাশ্মের মূল্যবান সংগ্রহ প্রদর্শিত। এই গ্যালারির অন্যতম আকর্ষণ ভারতীয় হাতির পূর্বপুরুষ 'স্টেগোডন গণেশ' নামে বিশাল হাতির জীবাশ্ম। অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবাশ্মের জন্য নির্দিষ্ট গ্যালারির দৃশ্যাধারে বিন্ধ্য পর্বতমালার শিলাস্তর থেকে পাওয়া ৬০ কোটি বছর আগেকার 'ফারমোরিয়া'র জীবাশ্ম সংরক্ষিত। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া সামুদ্রিক জীবের ফসিলগুলিও এই গ্যালারিব অন্যতম আকর্ষণ। ভূতত্ত্ব বিভাগের অন্তর্গত শিলা-গ্যালারিতে ৬০ হাজারের বেশি শিলাখণ্ড এবং বিভিন্ন খনিজের প্রায় ২০ হাজার নমুনা প্রদর্শিত। ভারতীয় যাদুঘরের উল্কাপিণ্ড-সংগ্রহ এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। এখানকার সর্ববৃহৎ উল্কাখণ্ডটি উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ অঞ্চলে এসে পড়েছিল—১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অগাস্ট।

ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'কার্বন-ডেটিং' এবং 'পটাশিয়াম-আর্গন' পদ্ধতি অনুসৃত হয়। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির বয়স নিরূপণের জন্য যাদুঘরের বিশেষজ্ঞরা নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। প্রাচীনযুগের প্রস্তরমূর্তি অথবা ধাতুর তৈরি মুদ্রা ও অন্যান্য সামগ্রীর গায়ে কোনো লিপির সন্ধান মিললে তা থেকে ওই জিনিসটির বয়স আন্দাজ করা কঠিন নয়। প্যালিওগ্রাফি নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার লিপি থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মী ও অন্যান্য লিপির বিবর্তন-ধারা তাঁদের অজ্ঞাত নয়। তাছাড়া মূর্তি ও অন্যান্য সামগ্রীর গঠনশৈলী থেকেও সেগুলির বয়স অনুমেয়। কোনো প্রস্তরমূর্তির চুলের বিন্যাস, মুখের ধাঁচ, শারীবিক গঠন দেখেও বিশেষজ্ঞরা তাব নির্মাণ-যুগটিকে চিনে নিতে পারেন। যেমন গুপ্তযুগের মূর্তির মধ্যে যে পেলব নমনীয়তা দেখা যায় তা মৌর্যযুগ বা পালযুগের মূর্তির মধ্যে অনুপস্থিত। অন্যদিকে মৌর্যযুগের প্রস্তরমূর্তি বা স্থাপত্যের মধ্যে এমন এক ঔজ্জ্বল্য ও মসৃণতার দেখা মেলে যা একেবারেই অনন্য। প্রতিটি পুঁথি, চিত্রকলা বা শিল্পসামগ্রীব এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা থেকে তার সৃষ্টির সমযটিকে অভিজ্ঞ দৃষ্টিব সাহায্যে অনায়াসেই চিনে নেওয়া যায়।

ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্ব সংক্রান্ত নিদর্শনগুলি রক্ষণাবেক্ষণেব দাযিত্ব যথাক্রমে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিযা, জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ও বটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ওপর ন্যস্ত। যাদুঘরের প্রদর্শিত জৈব ও অজৈব নিদর্শনগুলির যথাযথ সংরক্ষণেব জন্য আবহাওয়াব উষ্ণতা ২০ ডিগবি থেকে ২৪ ডিগরি সেলসিয়াস এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ৪৫ থেকে ৫৫ ভাগের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। শীতের দুটি মাস ছাড়া বছরের বাকি সময়ে কলকাতার অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার হাত থেকে বিভিন্ন দ্রষ্টব্যের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। হুইরলিং হাইগ্রোমিটার, থার্মোহাইগ্রোগ্রাফ ইত্যাদির সাহায্যে বিভিন্ন গ্যালাবির তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার পরিমাপ করা হয়। বাতাসের জলীয় অংশ শুষে নেওয়ার উদ্দেশ্যে কাঁচের দৃশ্যাধারগুলির মধ্যে তুলো অথবা সিলিকা জেল রাখা থাকে। এ ব্যাপারে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং কাঠও যথেষ্ট কার্যকরী।

কলকাতার দূষিত বাতাস যাদুঘরের বিভিন্ন নিদর্শন সংরক্ষণের পক্ষে বিরাট বাধাস্বরূপ। মিউজিয়ামের চারপাশের বাতাসে সালফাব ডাই-অকসাইড, কার্বন ডাই-অকসাইড ও বিষাক্ত ধূলিকণার উপস্থিতি যথেষ্ট বেশি। জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে সালফার ডাই-অকসাইড ও কার্বন ডাই-অকসাইড রূপান্তরিত হয় যথাক্রমে সালফিউরিক অ্যাসিড ও কার্বোনিক অ্যাসিডে। বাতাসের ধুলো আবার ওই অ্যাসিডকে যাদুঘরের নিদর্শনগুলির গায়ে

লেগে থাকতে সাহায্য করে। যাদুঘরেব উন্মুক্ত পরিবেশে যেসব প্রাচীন মূর্তি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সাজানো আছে—সেগুলিই বায়ুদূষণের প্রধান শিকার। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রস্তর ও ধাতুর নিদর্শনগুলিকে ঝাড়া-মোছা করা ছাড়াও পাথরের ভিতর সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে যে লবণজাতীয় জিনিস জমা হয় তা জলে-ভেজানো কাগজের মণ্ডের সাহায্যে বের করে আনার ব্যবস্থা আছে। পাথরের গায়ে চিড় ধরলে পলিভিনাইল অ্যাসিটেট (PVA)-এর সাহায্যে তা মেরামত করা হয়। পাথর এবং ধাতুর তৈরি জিনিসেব বাড়তি ক্ষয়ক্ষতি রোধ করতে 'মিথাইল মিথাক্রাইলেট' নামে ক্ষয়রোধক রাসায়নিকের প্রলেপ দেওয়া হয়ে থাকে। ধাতুর সামগ্রীর গায়ে মরচে পড়লে তা ব্রাশ অথবা স্ক্র্যাপারেব সাহায্যে ঘষে তুলে ফেলাটাই রীতি, তবে তা যাতে ওই জিনিসটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও গঠন-বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ না করে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। ব্রোঞ্জ এবং পিতলের তৈবি জিনিসের রঙ চটে গেলে সিলভার অকসাইড ও ইথানলের মিশ্রণের সাহায্যে স্বাভাবিক রঙ ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

যাদুঘরের মূল্যবান সংগ্রহ বিশেষ কবে সেলুলোজ-জাত সামগ্রীগুলিকে জীবাণু ও পোকা-মাকড়ের হাত থেকে বাঁচানোব ব্যাপক বন্দোবস্ত আছে। ফাংগাস প্রতিরোধক হিসাবে প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন বা থাইমল জাতীয় রাসায়নিক খুবই কার্যকবী। স্টাফ করে রাখা মৃত জন্তু-জানোয়ারদের জীবাণুর হাত থেকে বাঁচাতে 'মিথাইল ব্রোমাইড' নামক রাসায়নিকেব সাহায্য নেওয়া হয়। ইঁদুর ও পোকা-মাকড়েব উপদ্রব এড়াতে নিয়মিত রাসায়নিক ওষুধ ছড়ানো হয় যাদুঘরের সর্বত্র। অতিরিক্ত আলো, বিশেষ করে অতিবেগুনী রশ্মি যাতে সংরক্ষিত নমুনাগুলিব রাসায়নিক পরিবর্তন না ঘটায় সেজন্য বিভিন্ন দৃশ্যাধারেব চারপাশে বিশেষ ধরনের ফিল্টার লাগানোর প্রস্তাব রেখেছেন ভারতীয় যাদুঘরেব বিশেষজ্ঞরা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ চিত্রশালা

ভারতেব অন্যতম প্রধান সারস্বত প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। এর একুশ বছর আগে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার পথপ্রদর্শক জন বীম্‌স্ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বাংলা ভাষার অনুশীলন ও উন্নয়নেব জন্য একাডেমি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে একটি ইংরাজি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। বীম্‌স-এর প্রস্তাব কার্যকর হল ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে)। সেই দিন বিনয়কৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে তাঁরই শোভাবাজারের বসতবাড়িতে 'বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচর' প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকমাস পরে প্রতিষ্ঠানেব নাম পাল্টে রাখা হল 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'। পরিষদের নিজস্ব বাড়ি তৈরি হয় ১৩১৫ বঙ্গাব্দে (১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে)।

পরিষদের অন্যতম দুটি শাখার একটি হল গ্রন্থাগার, অন্যটি মিউজিয়াম (চিত্রশালা)। কলকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন উপলক্ষে ১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ) পৌষ মাসে যে-শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় সেখানে শিক্ষাসংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছিল। মহাসভা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে কতকগুলি প্রাচীন জিনিস—যেমন, তাম্র ও প্রস্তর লিপির ছাপ, প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্থানের ও মন্দিরের আলোকচিত্র, প্রাচীন চিত্রকলার কিছু নিদর্শন, প্রথম মুদ্রিত বাংলা বই এবং প্রাচীন পুঁথি সেই প্রদর্শনীতে পাঠানো হয়। প্রদর্শনীটি চলেছিল ৬ পৌষ থেকে ১৪ ফাল্গুন পর্যন্ত।

ওই সময় পরিষদের সভাপতি ছিলেন সারদাচরণ মিত্র, সহসভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

জাতীয় মহাসভা আয়োজিত প্রদর্শনীতে পরিষদের পাঠানো জিনিসগুলি দেখে দর্শক এবং পরিষৎ-হিতৈষীরা সেগুলিব যথাযথ সংরক্ষণ এবং নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার জন্য সাহিত্য পরিষৎ-কে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে পরিষদের তদানীন্তন পরিচালন সমিতি পৃথক চিত্রশালা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই পরিষদে যে-অসংখ্য পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছে সেগুলিই চিত্রশালার প্রধান আকর্ষণ। পবিষদের সংগ্রহে বর্তমানে তিন হাজারের বেশি বাংলা পুঁথি এবং আড়াই হাজাবের বেশি সংস্কৃত পুঁথি রয়েছে। এছাড়া আছে তিব্বতী, ওড়িয়া, হিন্দি, অসমীয়া ও ফার্সি পুঁথি। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবি বড়ু চণ্ডীদাসেব 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর একমাত্র পুঁথিখানি পবিষদেব চিত্রশালায় সংবক্ষিত আছে।

পরিষদের প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহে রয়েছে প্রাচীন মুদ্রা, ধাতু ও পাথরের তৈরি দেবদেবীর সব মূর্তি। এছাড়া আছে বিভিন্ন যুগেব ভাবতীয় ও বিদেশী মুদ্রা, প্রাচীন চিত্র, বিশিষ্ট মানুষের ব্যবহার করা জিনিসপত্র, হস্তলিপি, চিঠিপত্র এবং প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র। পবিষদের মিউজিয়ামে রাখার উদ্দেশ্যে নানা ধরনের জিনিসের সংগ্রহ শুরু হয়েছিল ১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ)। প্রথম দিকে পরিষদের সহকারী সম্পাদক প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একক চেষ্টায় বহু প্রাচীন মুদ্রা ও মূর্তি সংগ্রহ করেন এবং মিউজিয়ামেব একটি সংগ্রহ-তালিকা তৈরি করেন। তাঁর লিখিত 'ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অব স্কাল্পচার্স এনড কয়েনস ইন দ্য মিউজিয়াম অব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' প্রকাশিত হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। পরিষদের প্রথম চিত্রশালাধ্যক্ষ ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বসু।

মূলত দেশীয় রাজা ও গুণীজনের অকৃপণ দানে পবিষদেব মিউজিয়াম সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাব মধ্যে এখানকার সংগ্রহে আছে উত্তর ভাবত, রাজগৃহ, তক্ষশীলা, অযোধ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া মুদ্রা। এছাড়া রয়েছে ইন্দো-গ্রিক যুগেব মুদ্রা, শক, কুষাণ, গুপ্তযুগের মুদ্রা, বাংলার হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বেব সময়কার মুদ্রা।

এখানে সংরক্ষিত পাথবের মূর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গান্ধার ভাস্কর্য, মথুরা ভাস্কর্য, মগধ ভাস্কর্য, জৈন ভাস্কর্য এবং টেরাকোটার মূর্তি। মূর্তি চুরি যাওয়া ও তা পরে ফিরে পাওয়ার একাধিক ঘটনা ঘটেছে এখানে। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হওয়াব আগেই ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে একাদশ শতাব্দীর তিনটি দুর্লভ বিষ্ণুমূর্তি সংগৃহীত হয়েছিল। পরিষদেব সে-সময়কার সম্পাদক বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী থেকে মূর্তি তিনটি সংগ্রহ করেন। ধাতুর তৈরি মূর্তিগুলিতে পালযুগের প্রভাব ছিল। ওগুলি পাওয়া গিয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি অঞ্চলে মাটিব নীচে। মূর্তিগুলির মধ্যে যেটি ছিল সবচেয়ে ছোট, সেটি চুরি যায় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে পয়লা মার্চ। মাস তিনেক পরে সেটির সন্ধান মেলে কলকাতার এক শিল্প সংগ্রহকারীব কাছে। নগদ ৫০০ টাকা দিয়ে পরিষৎকে ফের কিনতে হয়েছিল সে-মূর্তি।

এই ঘটনাব আট বছর বাদে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি পবিষৎভবনের দোতলায় মিউজিয়ামের তালা ভেঙে সাগরদীঘি থেকে পাওয়া অন্য দুটি মূর্তি চুরি হয়ে যায়। তাদের একটির খোঁজ মিলল ন' বছর বাদে—আমেরিকার বস্টন মিউজিয়ামে। সেখানকার এক

শিল্পব্যবসায়ীর কাছ থেকে ওঁরা বিষ্ণুমূর্তিটি কিনেছিলেন ৫০,০০০ ডলার দিয়ে। পরিষৎ-কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বস্টন মিউজিয়াম সেই মূর্তি ফেরত পাঠায় ভারতে। পরিষদের মিউজিয়ামে বিষ্ণুমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ১২ ফেব্রুয়ারি। চুরি যাওয়া দ্বিতীয় মূর্তিটি অবশ্য এখনও নিখোঁজ হয়েই রয়েছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালা

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর লর্ড কার্জন মহারাণীর স্মৃতি রক্ষার্থে এক সৌধ তৈরির প্রস্তাব করেন। ওই স্মৃতিসৌধের মধ্যে অতীতের বিশিষ্ট মানুষদের ছবি ও মূর্তি সংরক্ষণের প্রস্তাবও রাখা হয়েছিল। লর্ড কার্জনের ওই প্রস্তাবকে দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং সাধারণ মানুষ সমর্থন করেন এবং স্মৃতিসৌধ নির্মাণকল্পে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি এবং নির্মাণকার্য শেষ হবার পর সাধারণের জন্য এর দরজা উন্মুক্ত হল ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে।

মূলত ব্রিটিশ যুগের ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি এবং স্মারক দিয়ে সাজানো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গ্যালারিগুলি। টমাস ড্যানিয়েলের আঁকা পুরনো কলকাতার ছবিগুলি এখানকার অমূল্য সম্পদ। পোর্ট্রেট গ্যালারির সেরা আকর্ষণ ফার্সি ভাষায় লেখা চিত্রিত পুঁথির সম্ভার। আবুল ফজলের লেখা 'আইন-ই-আকবরী'-এর মূল পাণ্ডুলিপি এখানে সংরক্ষিত আছে। মধ্যযুগ এবং তার পরবর্তিকালের ভারতবর্ষে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শনের জন্য স্বতন্ত্র গ্যালারি রয়েছে এখানে। টিপু সুলতানের সৈন্যবাহিনীতে অন্তত ৫ হাজার তীরন্দাজ ছিল। এদের কাজ ছিল অগ্নিবান নিক্ষেপ করা। তীরের ডগায় বিশেষ রাসায়নিক ব্যবস্থায় আগুন লাগিয়ে তা ছোঁড়া হত শত্রুপক্ষের দিকে। এই বিষয়ে আঁকা ছবি ও অগ্নিবানের নিদর্শন রয়েছে এই গ্যালারিতে। এছাড়া আছে ইউরোপীয়দের ব্যবহৃত কামান ও বন্দুকের বেশ কিছু নমুনা। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র জনৈক বাঙালি কারিগরকে দিয়ে যে-বন্দুক তৈরি করিয়েছিলেন তাও সংরক্ষিত আছে এখানে।

পুরনো ছবির প্রকৃত রঙকে ফিরিয়ে আনা, কোল্ড লাইনিং পদ্ধতির সাহায্যে ছেঁড়া-খোড়া ছবিকে মেরামত করা, পলিভিনাইল অ্যাসিটেট (PVA) জাতীয় রাসায়নিকের সাহায্যে তেলরঙা ছবির গায়ে লেগে থাকা বহু বছরের ধুলো-নোংরা পরিষ্কার করা এবং সেগুলির ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনা, ব্রোঞ্জ এবং অন্যান্য ধাতুর তৈরি স্মারকগুলিকে মরচে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করা, ছবিকে পুরনো ক্যানভাস থেকে নতুন ক্যানভাসে এবং হাল-আমলে উদ্ভাবিত গ্লাস-ফাইবার কাপড়ে স্থানান্তরিত করার ব্যাপক ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় পুরনো শিল্পকলা মেরামত এবং সেগুলির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধারের জন্য পূর্বভারতের একমাত্র কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে এখানেই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা

ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসাবে সাধারণ সংগ্রহশালা স্থাপনের ঘটনা প্রথম ঘটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'আধুনিক যুগের ভারতীয় চিত্রকলা'র উপর এই সংগ্রহশালাটি মাত্র পাঁচটি দ্রষ্টব্য জিনিস নিয়ে স্থাপিত হয়। মাত্র তিরিশ বছরের ব্যবধানে এখানকার প্রদর্শিত বস্তুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজারে।

এ-ব্যাপারে প্রধান কৃতিত্ব মিউজিয়ামের প্রথম কিউরেটর দেবপ্রসাদ ঘোষের। বস্তুত তাঁরই প্রচেষ্টায় পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাচীন চিত্রকলা ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের বহু নিদর্শন সংগৃহীত হয়।

এই মিউজিয়ামের সংগ্রহে রয়েছে প্রাচীন যুগের ভাস্কর্য, লোককলার বৈচিত্র্যময় নিদর্শন, কাপড়ের উপর আঁকা ছবি ও সূচীকর্ম, টেরাকোটা শিল্পের নানা নমুনা। এসব থেকে পূর্বভারতের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ফুটে ওঠে। গুপ্তযুগের যেসব প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন এখানে রয়েছে, সেগুলির মধ্যে উড়িষ্যার উদয়গিরি থেকে পাওয়া খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর উষ্ণীষ-শোভিত দ্বাররক্ষীর মূর্তি, উত্তর বাংলা থেকে সংগৃহীত কার্তিকের মস্তকহীন মূর্তি (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক) এবং চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া কুষাণযুগের এক বেলেপাথরেব বুদ্ধমূর্তি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

সংগ্রহশালাটি চালু হওয়ার পব থেকে এযাবৎ বেশ কয়েকবার স্থান পরিবর্তন করেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো সেনেট হলের পিছন দিকের একটি ছোট অংশে এটি প্রথমে স্থাপিত হয়েছিল। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় বোমা পড়াব আশঙ্কায় মিউজিয়ামের বেশ কিছু দ্রষ্টব্য জিনিসকে নিয়ে যাওয়া হয় মুর্শিদাবাদের ইমামবাড়ায় এবং পাথরের ভারি মূর্তি ও স্থাপত্য কর্মগুলি মাটির নীচে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়েব চত্বরে পুরনো জায়গায় সংগ্রহগুলিকে ফিরিয়ে আনা হয় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। এর সাত বছব পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত শতবার্ষিকী ভবনে মিউজিয়ামটি স্থানান্তবিত হয়।

মূলত আশুতোষ মিউজিযামের প্রচেষ্টায় উত্তরবঙ্গে বাণগড়ের বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভেব পর চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত চন্দ্রকেতুগড়ের (বেড়াচাঁপা, বারাসত) প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য এই প্রতিষ্ঠানেব উদ্যোগেই সম্পন্ন হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামবিদ্যা বিভাগটিও আশুতোষ মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত।

গুরুসদয় সংগ্রহশালা

বাংলার ব্রতচারী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্তেব ব্যক্তিগত সংগ্রহকে ভিত্তি করে কলকাতাব দক্ষিণপ্রান্তে গড়ে উঠেছে গুরুসদয় সংগ্রহশালা। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে আই সি এস পরীক্ষায় পাশ কবে গুরুসদয় বিহারের আরা জেলার এস ডি ও পদে যোগ দেন। পবে তিনি বঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগেব সচিব নিযুক্ত হন। কার্যোপলক্ষ্যে দুই বাংলার বিভিন্ন জেলায় তাঁকে ঘুরতে হয়েছিল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি স্থাপন করে অবহেলিত লোকসংস্কৃতি পরিচায়ক শিল্পবস্তু সংরক্ষণের চেষ্টা করেন তিনি। সেই বছরেই ব্রতচারী আন্দোলনেরও সূত্রপাত হয়।

১৯২৯ থেকে ১৯৪১—এই বারো বছরের মধ্যে গুরুসদয় বাংলার প্রাচীন স্থাপত্য ও লোকসংস্কৃতির ২৩২৫টি অমূল্য নিদর্শন সংগ্রহ করেন। ব্রতচারী সমিতির অঙ্গ হিসাবে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলার পরিকল্পনা থাকলেও জীবদ্দশায় তিনি তা কবে যেতে পারেননি। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পব তাঁর যাবতীয় সংগ্রহ ব্রতচারী সমিতিকে হস্তান্তরিত করা হয়। ওইসব সংগ্রহকে নিয়ে মিউজিয়াম গড়ে তুলতে আরও প্রায় বাইশ বছর কেটে যায়। সর্বসাধারণের জন্য সংগ্রহশালাটি খুলে দেওয়া হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে মিউজিয়ামেব দায়িত্বভার 'গুরুসদয় দত্ত লোকশিল্প সমিতি'কে অর্পণ করা হয়। এই সমিতি এখন ভারত সরকাবেব বস্ত্রমন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় মিউজিয়ামের সংস্কার এবং উন্নতিসাধনে ব্রতী রয়েছেন।

এই মিউজিয়ামের সংগ্রহে রয়েছে বাংলাব বিভিন্ন অঞ্চলের নকশি কাঁথা, বিচিত্র পাড়ওয়ালা পুরনো আমলের ধুতি ও শাড়ি। কাঁথার শিল্পকর্মের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে। এখানকাব সংগ্রহে ২০১টি কাঁথা রয়েছে। সেগুলির অধিকাংশ সংগৃহীত হয়েছিল অবিভক্ত বাংলার ফবিদপুর, খুলনা, যশোহর ও ঢাকা জেলা থেকে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মন্দিবেব শোভাবর্ধনের জন্য ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীব মধ্যে যেসব টেরাকোটার কারুকার্য করা হয় তার ২০৯টি নিদর্শন রয়েছে এই সংগ্রহশালায়। এছাড়া রয়েছে গত তিনশো বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তৈরি কালীঘাটেব পট, চালচিত্র, চিত্রিত সরা, গোটানো পুঁথি ও কাপড়ে আঁকা লোকগাথা। পাল ও সেনযুগের স্থাপত্য, কাঠেব উপব খোদাই কবা মূর্তি ও শিল্পকর্ম, বাংলাব বিভিন্ন অঞ্চলের মিষ্টান্ন তৈরির ছাঁচ ছাড়াও মাটিব পুতুল ও খেলনার এক বিচিত্র সম্ভার এই সংগ্রহশালার আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছে অনেকখানি। বাংলাব লোকশিল্প ও লোককথা নিয়ে পঠন-পাঠন ও গবেষণারও সুযোগ আছে এখানে।

বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালা

বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেব কাছে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতের প্রথম বিজ্ঞান ও কাবিগরি সংগ্রহশালাটি স্থাপিত হয় কলকাতায় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২ মে। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এনড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের আর্থিক আনুকূল্য না পেলে এই সংগ্রহশালা ভারতেব মধ্যে কলকাতায় প্রথম গড়ে উঠত কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। লণ্ডন এবং মিউনিখের বিজ্ঞান মিউজিয়াম দেখে কলকাতায় ওই ধরনেব একটি সংগ্রহশালা স্থাপনে উৎসাহী হয়েছিলেন বিধানচন্দ্র। তাঁরই অনুরোধে কলকাতাব বিড়লা পরিবাবের রাজা বলদেওদাস বিড়লা পার্কসাকাসের কাছে গুরুসদয় রোডের উপব একটি বাড়ি সহ দু-খণ্ড জমি দান করেন। জমিব মোট বিস্তার ১,৩৬,০০০ বর্গফুট (প্রায় ১২,৬৩৫ বর্গমিটার)। প্রয়োজনীয় মেবামতের পব পুরনো বাড়িটিতেই সামান্য কিছু বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ও মডেল নিয়ে সংগ্রহশালা চালু হয়। সে-সময় ন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটরি নামে একটি সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কলকাতা থেকে হায়দ্রাবাদে স্থানান্তবিত হয়। সেই প্রতিষ্ঠানের সাত জন উদ্বৃত্ত কর্মী এই সংগ্রহশালায় নিযুক্ত হলেন। এছাড়া আরো কয়েকজনকে নিয়োগ করা হয় শিল্পদ্রব্য, মডেল ইত্যাদি তৈরির জন্য। 'প্ল্যানিং অফিসার' হিসাবে মিউজিয়ামের দায়িত্ব নেন অমলেন্দু বসু।

মিউজিয়াম চালু হয়েছিল সাতটি গ্যালারি নিয়ে। এদেব মধ্যে অন্যতম ছিল ধাতুবিদ্যা সংক্রান্ত গ্যালারিটি। পরবর্তিকালে পুরনো বাড়ির পরিবর্ধন করে নূতন নূতন গ্যালারি চালু করা হয়। বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র একটি অডিটোরিয়ামও তৈরি হল। মূল মিউজিয়াম ভবনের প্রায় সমান আয়তনের আর একটি প্রদর্শনীগৃহ তৈরি হয়েছে এ-দশকেব গোড়ায়। আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর ছাপ রযেছে নূতন বাড়িটির গায়ে। এই বাড়িরই গর্ভগৃহে তৈবি হয়েছে নকল এক কয়লাখনি। নূতন বাড়ির একতলাটি নানা বিষয়ে অস্থায়ী প্রদর্শনীব জন্য নির্দিষ্ট।

সংগ্রহশালার মূল ভবনে এখন যে যে বিষয়ে গ্যালারি রয়েছে সেগুলি হল . পরমাণু, যান্ত্রিক শক্তি, যানবাহন, ধাতু ও খনিসংক্রান্ত বিদ্যা, তামা, লোহা ও ইস্পাত, পেট্রোলিয়াম,

বিদ্যুৎ, ইলেকট্রনিক্স এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা। এছাড়া পপুলার সায়েন্স বা জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি গ্যালারিও রয়েছে এখানে। খেলাব মাধ্যমে ছোট শিশুদেব বিজ্ঞানে আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র একটি গ্যালাবি সংযোজিত হয়েছে ১৯৮৮-এর মে মাসে।

পরমাণু কী দিয়ে তৈরি, তার গুণাগুণ এবং প্রয়োজনীয়তা বোঝানোব উদ্দেশ্যে নানা ধরনের চার্ট ও মডেল সাজানো রয়েছে পরমাণু-গ্যালারিতে। তেজস্ক্রিয়তা ও পারমাণবিক বিকিরণ সম্পর্কে দর্শককে অবহিত করার আকর্ষণীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি দেশ-বিদেশের অ্যাটমিক রিঅ্যাকটরের ছবি ও মডেল রাখা আছে এই গ্যালারিতে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ কিভাবে শক্তির চাহিদা মিটিয়েছে সে-বিষয়ে নানা রকম মডেল সাজানো আছে যান্ত্রিক-শক্তি সম্পর্কিত গ্যালারির দৃশ্যাধারে। বাতাস-কল বা স্টিম-ইঞ্জিনকে বোতাম টিপে চালু কবার ব্যবস্থা আছে এখানে। দর্শকবা নিজেরাই তা করতে পারেন। পেট্রোল বা ডিজেল চালিত ইঞ্জিন, গ্যাস টারবাইন ও জেট ইঞ্জিনের বিভিন্ন মডেল দর্শকের কৌতূহল মেটায়। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ের মডেলটিও আকর্ষণীয়।

যানবাহনের ক্রমবিবর্তনকে তুলে ধরা হয়েছে স্বতন্ত্র আর একটি গ্যালারিতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতার রাস্তাঘাটে যেসব যানবাহন চলত, ছোট ছোট মডেলের সাহায্যে তার ছবি তুলে ধরা হয়েছে স্বতন্ত্র একটি দৃশ্যাধারে। চাকা কিভাবে প্রথম তৈরি হল, ধাপে ধাপে তার কেমন উন্নতি ঘটল, রেলগাড়ির চেহারা কেমন করে পাল্টাল সে-বিষয়ে সাধাবণ মানুষের কৌতূহল মেটানোর বিপুল আয়োজন রয়েছে এখানে। এই গ্যালাবির দ্বিতীয় ঘরটিতে রয়েছে বিভিন্ন সময়কার মোটরগাড়ি ও উড়োজাহাজের অসংখ্য মডেল। মডেলের সাহায্যে জলযানের ক্রমবিবর্তনও এই গ্যালারির একটি বিশেষ আকর্ষণ। কনভেয়াব বেল্ট কিভাবে কাজ করে, কিভাবে তা নানা ধরনের জিনিস এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যায় তা-ও সহজে বোঝা যায়। এই গ্যালারির মডেলগুলিকে বোতাম টিপে সচল করতে পারেন দর্শকেবা। গ্যালাবির তৃতীয় হলঘরটিতে রয়েছে পুবনো আমলের কিছু মোটরগাড়ি। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যে-ফিয়াট গাড়িটি ব্যবহার করতেন তা রাখা আছে এখানে।

প্রাত্যহিক জীবনে যেসব প্রশ্ন অহরহ আমাদের মনে জাগে সেগুলির বেশ কিছুর উত্তব সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে জনপ্রিয় বিজ্ঞানের গ্যালারিতে। ঘড়ি কিভাবে কাজ করে, কিংবা আমরা শব্দ শুনি কেমন করে—এসব প্রশ্নের উত্তর দেওযা হয়েছে মডেলের সাহায্যে। দর্শকের নিজের কণ্ঠস্বর টেলিফোনে নিজের কানে শুনতে কেমন লাগে তা জানার মজার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। ইলেকট্রনিক্সের সাহায্যে দর্শকদের বোকা বানানোর মজাব আয়োজনও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ঘরে ঢুকলেই আলো পাখা জ্বলে ওঠে অথবা বন্ধ দরজায় হাত ছোঁয়ালেই ঘণ্টা বাজে।

মাটির নীচ থেকে খনিজ-আকরিক নিষ্কাশন এবং পরিশোধনের ধাপগুলিকে আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে পৃথক এক গ্যালারিতে। এখন থেকে কোটি কোটি বছর আগে ভূ-স্তরে কয়লার কিভাবে জন্ম, স্লাইড ছবির সাহায্যে তা দেখানো হয় দর্শকদেব। যেসব ভূস্তরে কয়লার সন্ধান মেলে তার নমুনাও রাখা আছে এখানে। কয়লাখনির ভিতর শ্রমিকরা যাতে দুর্ঘটনার শিকার না হন সেজন্য যেসব সাবধানতা নেওয়া হয় তাও বোঝানো হয়েছে। আর টেকনোলজি সেন্টারের নীচে যে নকল কয়লাখনি বানানো হয়েছে, তার

ভিতর নামলে সত্যিকারেব কয়লাখনিব মধ্যে চলাফেরার অনুভূতি জাগে। খনিসংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের কাজেও এই নকল কয়লাখনির সাহায্যে নেওয়া হয়।

তামা এবং লোহা-ইস্পাতেব জন্য নির্দিষ্ট গ্যালারিতে আকবিক অবস্থা থেকে কিভাবে ধাপে ধাপে ওই সব ধাতুকে তার সঠিক চেহারায় নিয়ে আসা হয় তা যেমন বোঝানো হয়েছে, তেমনি ওই দুটি ধাতু দিয়ে তৈরি শিল্পকর্মেব নমুনাও রাখা হয়েছে দর্শকদের জন্য। 'ইলেকট্রনিক্স ও টেলিভিশন' শীর্ষক গ্যালারিতে দর্শক নিজেকে যেমন টিভি-র পর্দায় দেখার সুযোগ পান, তেমনি মিউজিযামের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ যে-রোবটটি—সেটাও রয়েছে এখানেই। টেলিগ্রাম থেকে শুরু করে হাল আমলের উপগ্রহ-যোগাযোগের বিষয়টিও ছবি ও মডেলের সাহায্যে উপস্থাপিত 'যোগাযোগ' সম্পর্কিত গ্যালাবিতে। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবাব পর্যন্ত ভূগর্ভে যে-টেলিগ্রাফের তাব বসানো হয় তার কিছু নমুনাও প্রদর্শিত হয়েছে এই বিভাগে। আমাদের নিত্যব্যবহার্য সরঞ্জাম যেমন, বাইসাইকেলের ডায়নামো, ক্যামেরা, সেলাই মেশিন, কলিং বেল ইত্যাদি কিভাবে কাজ করে তা আছে স্বতন্ত্র গ্যালাবিতে। এগুলির কার্যকারিতা বোঝার জন্যে দর্শকদেরও খানিকটা আগ্রহী হওয়া দরকার। যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করে অথবা বৈদ্যুতিক সুইচ টিপে অজানা বিষয়গুলিকে ভাল করে জানার সুযোগ দেওয়াটাই এই মিউজিয়ামের উদ্দেশ্য এবং বৈশিষ্ট্য।

বিভিন্ন মনীষীর স্মারকগুলি নিয়ে আলাদা আলাদা সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে কলকাতায়। উদাহরণ হিসাবে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েব মিউজিয়ামের কথা বলা চলে। এখানে রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের বিভিন্ন মানুষের ব্যবহৃত নানা জিনিস, ফটোগ্রাফ ও শিল্পকলা রয়েছে। এছাড়া ব্যারাকপুরের গান্ধী স্মারক সংগ্রহশালা, এলগিন রোডেব নেতাজী মিউজিয়াম, বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতিব সংগ্রহশালা রয়েছে। এগুলির প্রত্যেকটিই ব্যক্তিবিশেষের নামের সঙ্গে যুক্ত।

কলকাতায় অন্যান্য আর যেসব মিউজিয়ামে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ রয়েছে সেগুলি হল :

নৃতত্ত্ব সংগ্রহশালা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র সংগ্রহশালা
সরকারি কারিগরি ও বাণিজ্য সংগ্রহশালা
বিড়লা শিল্প ও সংস্কৃতি অকাদেমি
মিউনিসিপাল সংগ্রহশালা
রাজ্য প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা

কলকাতার যানবাহন

নিখিলেশ মিত্র

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে যানবাহনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এক অর্থে যানবাহনের উন্নতি সভ্যতার বিকাশের মাপকাঠি। তিনশো বছর ধরে নগরায়নের পথে কলকাতার যানবাহনের ভূমিকা অপরিসীম।

জোব চার্নক যখন সুতানুটি এসেছিলেন তখন পালকিই ছিল মুখ্য বাহন। মন্থরগতি পালকির একচেটিয়া রাজত্ব চলেছিল একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে। এরপরে আসে ঘোড়ার গাড়ির যুগ। ঘোড়ার গাড়িই গতি নিয়ে এল টাউন কলকাতার পথে। এই শতকের গোড়ায় আসে বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ি ও মোটরযান। ফলে দ্রুতগতির সঞ্চার হল। পরবর্তিকালে নগর পরিবহণের অনেক উন্নতি হয়েছে। প্রচলন হল অধিকতর শক্তিশালী, দ্রুতগামী যানবাহনের। পক্ষান্তরে অবনতি ঘটেছে পথচলার গতির। সেকালে পালকি চড়ে কালীঘাট থেকে চিৎপুর যেতে যে-সময় লাগতো, কোনো সন্দেহ নেই, ঘোড়ার গাড়ি এসে সে-অবস্থার উন্নতি করে। শোনা যায়, গত শতকের শেষের দিকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বালিগঞ্জ থেকে হাতিবাগান যাওয়া যেত ৩০-৩৫ মিনিটে। আজ অনেক উন্নত ও বেশি অশ্বশক্তির যান চেপে একই সময়ে এই পথ অতিক্রম করা কঠিন। অফিসটাইমে জনবহুল রাস্তায় ঘণ্টা প্রতি ১০ থেকে ১২ কিলোমিটারের বেশি জোরে পথ চলা আজ দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কলকাতার জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সেই সঙ্গে গাড়ির ভিড়। তুলনায় রাস্তা বাড়েনি। আধুনিক শহরের মোট জমির ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বরাদ্দ থাকে রাস্তা ও ভবিষ্যৎ রাস্তা গড়ার জন্য। দিল্লি শহরে বিশ শতাংশ জমি জুড়ে রয়েছে পথ। বয়সে নবীন অথচ বৃহত্তর মহানগর কলকাতায় রাস্তার জন্য ব্যবহৃত হয় মাত্র ৬·৫ শতাংশ জমি। আবার ওই জমির পুরোটাই গাড়ি চলার জন্য ব্যবহার করা যায় না। রাস্তার কোল জুড়ে রিকশা, ঠেলাগাড়ি, মোটর গাড়ি ও লরির অবৈধ 'পার্কিং'। বড় বড় রাস্তার ফুটপাথ জুড়ে কেনা-বেচা, বিপনির সম্ভার। বে-আইনি দোকান-চালায় ভরে যাচ্ছে ফুটপাথ। ফুটপাথ আর পথচারী মানুষদের দখলে নেই। তাঁরা বাধ্য হয়ে নেমে পড়ছেন রাস্তায়। ফলে আরো সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে গাড়ি চলার পথ। তার উপর রয়েছে খানা-খন্দ, রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি এবং মেরামতির গাফিলতি। সুতরাং রাস্তা সুগম রাখা কঠিন। এই শহরের প্রান্তিক রেলস্টেশনগুলির মাধ্যমে দৈনিক আসা-যাওয়া করছেন মফঃস্বলের প্রায় ১৪ লক্ষ যাত্রী। শহরের পথে দৈনিক একমুখী যাত্রী-আয়তন ৬০ থেকে ৬৫ লক্ষ। অথচ কলকাতার ব্যবহার্য পথে ট্রাম, বাস, রিকশা, ট্যাক্সির মত সর্ববিধ প্রচলিত যানবাহনের মিলিত যাত্রীবহন ক্ষমতা দৈনিক ২৮ থেকে ৩০ লক্ষ। তাই ট্রামে-বাসে স্থান সংকুলান দিনে দিনে কঠিন হয়ে উঠছে।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঙ্গালোর, চণ্ডীগড়, দিল্লি ও বোম্বাইয়ের মত ভারতের

অনেক ছোট-বড় শহরে আধুনিক পথযান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। কলকাতায় তেমনটি ঘটেনি।

স্বাধীনতার পরে চার দশক ধরে পৌরপিতারা অনেক পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার রূপায়ণ করেও এ-অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেন নি। কারণ এ-অবস্থা সৃষ্টি একদিনে হয়নি। সুদীর্ঘকালের অবহেলা ও অবক্ষয়ের ফলে আজকের এই দুর্দশা। আসল গলদ ছিল গোড়ায়। ইংরাজ কোম্পানি সুতানুটিতে কুঠি স্থাপনের পরে পৌনে একশো বছর কোনো পথঘাট তৈরি করেনি। শহর গড়ে উঠেছে যত্রতত্র, এলোমেলোভাবে।

জোব চার্নকের মৃত্যুর একশো বছর পরে লর্ড ওয়েলেসলি গভর্নর-জেনারেল হয়ে এসেই প্রথমে পরিকল্পিত নগর-বিকাশ ও পথঘাট নির্মাণের কাজের উপরে জোর দেন। আজ মহানগর গড়ে উঠেছে মূলত পৌনে দু'শ বছর আগে লর্ড ওয়েলেসলি পরিকল্পিত নগরকে অবলম্বন করে।

১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় বা শেষবার জোব চার্নক যখন আসেন, তখন তাঁর শহর গড়ার পরিকল্পনা আদৌ ছিল কিনা জানা যায়নি। জন কোম্পানির পরবর্তী এজেন্ট বা অধ্যক্ষরাও কোনো নগর-পরিকল্পনা হাতে নেয়নি। নগর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে রাজকীয় সনদ বলে মেয়রের কোর্ট স্থাপিত হয়। তা সত্ত্বেও পলাশীর যুদ্ধের আগে পর্যন্ত নতুন কোনো বড় রাস্তা কলকাতায় তৈরি হয়নি। চিৎপুর থেকে কালীঘাট যাওয়ার বহু প্রাচীন মেঠো পথই ছিল কলকাতার প্রধান সড়ক। শহর ছাড়িয়ে এই সড়ক প্রসারিত ছিল উত্তরে হালিশহর ও দক্ষিণে বড়িশা পর্যন্ত। কয়েক শো বছর ধরে ওই পথ বেয়ে অগণিত তীর্থযাত্রী কালীঘাটে যাতায়াত করেছেন। কালীঘাটের পথের একটা অংশ ছিল ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন। চৌরঙ্গির পশ্চিমে ওই পথের ধারে খানিকটা জায়গায় আবার ধান ও তুলোর ক্ষেত আর জলাভূমি। সত্তর দশক ধরে নগর কলকাতা গড়ে উঠেছে ওই পথ অবলম্বন করে।

নগর কলকাতার উন্নতি লক্ষ্য করা যায় পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বছর আগে থেকেই। জঙ্গল ও জলাভূমি উদ্ধার করে তৈরি হয় এসপ্লানেড ও ময়দান। গোবিন্দপুরের অধিবাসীদের সুতানুটিতে সরিয়ে দিয়ে সেখানে স্থাপন করা হয় নূতন কেল্লার ভিত্তি—অর্থাৎ আজকের ফোর্ট উইলিয়াম। এর নির্মাণ-কার্য সম্পূর্ণ হয় ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে। পলাশীর যুদ্ধের পরে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে প্রাসাদ, অট্টালিকা, বাড়ি-ঘর ও বস্তির সংখ্যা যত্রতত্র পরিকল্পনাহীন ভাবে বেড়ে চলে। স্পষ্টত দুটি অঞ্চলে ভাগ হয়ে যায় শহর কলকাতা। লালদীঘি ও তার দক্ষিণে সুদৃশ্য হোয়াইট টাউন বা সাহেবদের এলাকা। এ-অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ছিল ঝকঝকে পথঘাট, আলো-হাওয়া যুক্ত প্রশস্ত ও মজবুত সুদৃশ্য গৃহের সারি। আর উত্তরে মূলত সুতানুটি অঞ্চলে ব্ল্যাক টাউন, এ-দেশীয় বা নেটিভদের বাসভূমি। সেখানে দেখা যেত যথেচ্ছভাবে তৈরি, অপ্রশস্ত ও ঘিঞ্জি বাড়িঘর, ঝুপড়ি। রাস্তাঘাট গড়ে উঠেছিল সরু ও সর্পিল আকারের। রাস্তার ধারে খোলা ও দুর্গন্ধময় নর্দমা ও আবর্জনার স্তূপ ছিল নেটিভ পাড়ার বৈশিষ্ট্য। পরবর্তিকালে ব্ল্যাক টাউনের বুক চিরে ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর তিনটি এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে আরো পাঁচটি বড় রাস্তা তৈরি করা হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তৈরি হয় কয়েকটি বড় রাস্তা। ১৭৬৬-তে রোড সার্ভেয়ার নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনিও কোনো নূতন পথ তৈরি করতে পারেন নি। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী ও সুপ্রিম কোর্ট কলকাতায় স্থাপিত হওয়ায় শহরটির গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং জনস্ফীতি শুরু হয়। তবে তখনও কোনো

নগর ও পরিবহণ পরিকল্পনার সূচনা লক্ষ্য করা যায়নি। সুসংহত নগরবিকাশ ও রাজপথ নির্মাণের জন্য ওই শতকের শেষে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির আগমন কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়। কলকাতায় কয়েকটি রাস্তা বাঁধানো বা পাকা করার কাজ হাতে নেওয়া হয় ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৭৯৯-এ নির্মিত হয় প্রথম পাকা রাস্তা সার্কুলার রোড। ওই বছরই লর্ড ওয়েলেসলি এদেশে এসেই প্রথমে নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর নিজের নেতৃত্বে 'টাউন ইম্প্রুভমেন্ট কমিটি' গড়ে তোলেন। ওই কমিটি প্রস্তাবিত পরিকল্পনাসমূহের রূপায়ণের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য ১৮১৪-এ তৈরি হয় লটারি কমিশন। তিন বছর বাদে লটারি কমিশনের বদলে তৈরি হল লটারি কমিটি। আঠারো বছর অস্তিত্বকালে ওই কমিটি লটারির মাধ্যমে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করে বেশ কয়েকটি নূতন রাজপথ তৈরি করেছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম হল আমহার্স্ট স্ট্রিট, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট ও ফ্রি স্কুল স্ট্রিট।

কালীঘাটের পথে তীর্থযাত্রীরা অনেকে পায়ে হেঁটেই যেতেন। ডুলি ও পালকিরও চল ছিল। আগে বাঙালি দুলে বাগদী বা কাহার সম্প্রদায়ের লোকেরা বাহকের কাজ বেছে নিত। দুলে কথাটার উৎপত্তি হয়েছে ডুলি থেকে। পরে শোভাবাজারের রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণদেব কলকাতায় ওড়িয়া পাচক বেহারার আমদানী করেন। তাঁকে দেখে অন্যান্য রাজা ও জমিদারেরা ওড়িয়া বেহারা আনতে থাকেন। কালক্রমে এই শহরে বাঙালি বেহারাদের সরিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ওড়িয়া বেহারাদের একচেটে অধিকার। সেই সময়ে গাড়ি চলার উপযুক্ত ভাল রাস্তা না থাকায় পালকির ব্যবহার বেড়ে যায়। আঠারো শতকে 'টাউন' কলকাতায় পালকিই হয়ে উঠেছিল অন্যতম মুখ্যবাহন। তখন অফিস-কাছারি, দেব-দেউল কিংবা আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদের বাড়ি সর্বত্রই লোকে যেত পালকি চেপে।

ভারত জুড়ে পালকির প্রচলন ছিল বহুকাল আগে থেকে। সতেরো শতকে বিদেশি পর্যটক তাভার্নিয়েরের বর্ণনা থেকে জানা যায়, পালকি হল ৬-৭ ফুট (প্রায় ২ মিটার) লম্বা ও প্রায় ৩ ফুট (প্রায় ১ মিটার) চওড়া ঝুলন্ত খাটিয়া বা শয্যার মত যার চারিধারে উঁচু রেলিং থাকে। বহনের জন্য বাঁশ নামে একটি বেত জাতীয় দণ্ডের ব্যবহার হয়। কচি অবস্থায় ওই বাঁশের ঠিক মাঝখানের খানিকটা অংশ অর্ধবৃত্তাকারে বেঁকিয়ে ধনুকের আকৃতি দেওয়া হয়। ধনুকের অংশ ছাড়িয়ে বাঁশ দু'দিকে (৫-৬) ফুট (প্রায় ১.৫ থেকে ২ মিটার) করে প্রসারিত থাকে। আরোহীদের মাথার উপর উন্নত ধনুকাকৃতি অংশের উপর থেকে ঝোলানো থাকে 'সাটিন' বা ব্রোকেডের আচ্ছাদন। পালকি চলার সময় একজন বেহারা ওই আচ্ছাদনের নিম্নপ্রান্ত টেনে ধরে যেতে যেতে আরোহীকে রোদ্দুর থেকে রক্ষা করে। পালকির মোড় ঘোরার সময় আরেকজন লাঠির মাথায় ঝুড়ির মতো দেখতে এক ছাতা নিয়ে ছুটে চলে আরোহীর গায়ে পড়া রোদ আগলাতে। দু' প্রান্তে তিনজন করে মোট ছ'জন বেহারা পালকি কাঁধে নিয়ে স্বচ্ছন্দে দ্রুত তালে ছুটে চলে।

কলকাতায় প্রথম দিকে যেসব সাধারণ পালকির ব্যবহার হত তাদের চারদিক খোলা ও চালের মাঝখানটাও ছিল উঁচু। ধনী ব্যক্তিরা ভাড়াটে পালকির চেয়ে বড় সুদৃশ্য নানা ধরনের পালকি ব্যবহার করতেন। এই সব পালকির পিছনে ও দু' পাশে থাকতো তাকিয়া ও তলাটা বেতের বোনা। বড় বড় রাজপুরুষেরা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্যবহার করতেন কিংখাপের ঝালর দেওয়া পালকি। এই সব পালকির সঙ্গে সম্মান জড়িত ছিল বলে এদের ব্যবহারের জন্য বাদশাহের অনুমতি প্রয়োজন হত।

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের বিদেশি মিশনারি কীর্নণ্ডার, সার্জন এডওয়ার্ড ইড্‌স ও আরো অনেকের লেখা থেকে জানা যায়. ওই সময়ে পালকির মাথায় কাঠের ছাদ ও বসার জন্য গদি প্রচলন হয়েছিল।

কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা গোড়া থেকেই পালকি ব্যবহার করতেন। এক সময় তাঁরা মনে করতেন, পালকি প্রাচ্যদেশীয় বিলাসিতার উপকরণ। তাই তাঁরা এদেশীয় কর্মচারীদের পালকি চড়া ও ছাতাবরদার নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।

প্রথম প্রথম পালকি তৈরি হয়ে আসত উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলা ও বীরভূমের গ্রামাঞ্চল থেকে। প্রয়োজনের তাগিদে পালকি তৈরির জন্য সুদক্ষ কারিগর ও দেশি-বিদেশি চিত্রকরের আমদানী হয়। এদের প্রচেষ্টায় কারুকার্যে ও বর্ণবাহারে দিনে দিনে পালকি হয়ে ওঠে আরো আকর্ষণীয়। প্রখ্যাত বেলজিয়ান চিত্রকর বি এফ সলভিন্‌স্ কলকাতায় এসেছিলেন ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে। এখানে বারো বছর অবস্থানকালে তিনি বেশ কয়েকটি পালকি অলংকরণের কাজ করেছিলেন। পালকির গায়ে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন সেকালের জনজীবনের বিচিত্র দিক। লর্ড কর্নওয়ালিস মহীশূরের রাজকুমারদের ব্যবহারের জন্য ৬০০০ ও ৭০০০ টাকা মূল্যের দুটি বিশেষ পালকিতে অলংকরণের কাজ করিয়েছিলেন তাঁকে দিয়ে। সলভিনসের সচিত্র পুস্তকে সে-যুগের নানা রকম পালকির সচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায়।

ঝাল্লাদার শ্রেণীর পালকি ব্যবহার করতেন রাজপুরুষ ও অভিজাত ব্যক্তিরা। এই জাতীয় পালকির মাঝের উন্নত অংশ থেকে যে-আচ্ছাদন ঝোলানো হত তা সাধারণত তৈরি হত সোনা কিংবা রূপোর এমব্রয়ডারি করা দামি কাপড় দিয়ে। বাঁশের প্রান্তে বসানো হত বাঘ কিংবা অন্য প্রাণীর মাথা বা লেজের প্রতিরূপ। বেহারাদের পরতে হত রঙচঙে পোশাক ও রঙিন পাগড়ি। শোভাযাত্রা, উৎসব ও বিবাহাদি অনুষ্ঠানে 'চৌপাল'-এর যথেষ্ট চাহিদা ছিল। চৌপাল হালকা পালকি। বেহারার দল ছাড়াও পালকির সঙ্গে ছুটে চলত 'বাউণ্ডেল বয়' বা ছাতাবরদার। এরা গোলপাতার ছাতা ধরে আরোহীকে রোদ্দুর থেকে বাঁচাত। ইউরোপীয় অঞ্চলে 'লং পালকি'-এর চাহিদা ছিল। শোনা যায়, প্রথম প্রথম এই জাতীয় পালকি বিলেত থেকে তৈরি হয়ে আসত। এছাড়া আমদানী হয়েছিল 'পোস্ট সেজ' বা 'সিডান চেয়ার' (চেয়ারের মত পালকি)। এর চাহিদা ছিল সাহেবদের কাছে। খোলা যায় এমন হুড যুক্ত 'তাঞ্জাম'-ও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। এই জাতীয় পালকির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন লেডি উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক। ডেভিড হেয়ারও বরাবর পালকি ব্যবহার করতেন। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে সাধারণ পালকির দাম ২০ থেকে ৪০ পাউণ্ডের মধ্যে থাকলেও কারুকার্য খচিত কোনো কোনো পালকির দাম হত ৮০০ থেকে ১২০০ পাউণ্ড। ওই সময় পালকির ব্যবহার আশাতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে সেন্ট জন চার্চ কর্তৃপক্ষকে প্রবেশদ্বারের মুখ থেকে ঢালু পথ ও পালকি রাখার 'শেড' নির্মাণ করতে হয়।

বেহারাদের সকলে সমান লম্বা না হলে অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি লোকটিকে কাঁধের উপর ভাঁজ করা কাপড় নিয়ে চলতে হত সমতা বজায় রাখতে। নৈশ ভ্রমণে বেহারারা ছাড়াও দরকার হত মশালচি ও পাখাওয়ালার. মশালচি পালকি বাহকদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত। পাখাওয়ালা পাখার সাহায্যে মশা তাড়াতে তাড়াতে পালকির সঙ্গে ছুটত। পথে কখনো কখনো পালকিতে দস্যুর উৎপাত হত। তাই অবস্থা বিশেষে সঙ্গে নিয়ে যেতে হত লেঠেল বরকন্দাজ।

ইউরোপীয়দের অনেকে দূরপাল্লায় যাত্রাকালে কানে তুলো এঁটে যাওয়ার জন্য তাদের

বন্ধুদের পরামর্শ দিতেন। বেহারাদের তীক্ষ্ণ স্বরে সমবেত সঙ্গীত (সাহেবদের ভাষায় গোঙানি) যাতে কানের পীড়ার কারণ না হতে পারে সেইজন্যই ওই পরামর্শ। অন্যদিকে মিস ফ্যানি পার্কস (ইনি কলকাতায় ছিলেন ১৮২২ থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত) তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে বেহারাদের প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, তাদের মুখের আওয়াজের তাল ছিল অভিনব ও ছন্দোময়। এমন দক্ষ বেহাবাও পাওয়া যেত যারা পালকি না দুলিয়ে দ্রুত ছুটতে পারত।

১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ওড়িয়া বেহারারা প্রতি বছর কলকাতা থেকে দেশে পাঠাত ৩ লক্ষেরও বেশি টাকা। তবুও তাদের চাওয়ার শেষ ছিল না। যথেষ্ট বেশি ভাড়া আদায়ের জন্য তারা সুযোগমত যাত্রীদের নাজেহাল করত। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে সরকার ঘণ্টা ধরে ভাড়া নির্ধারিণের আইন চালু করেন। এর প্রতিবাদে বেহারারা একদিন শহর থেকে উধাও হয়ে যায়। যখন কলকাতা একেবারে অচল হল, তখন কোম্পানির হোমরাচোমরারা হিন্দুস্থানি বেহারা নিয়োগ শুরু করেন। অপরদিকে কলকাতা নিবাসী জনৈক মিস্টার ব্রাউন লো বুদ্ধি খাটিয়ে পালকির নিচে চাকা লাগিযে ও টাট্টু ঘোড়া জুড়ে অফিস যাতায়াত শুরু কবেন। তখন ক্ষতি-বৃদ্ধির ভয়ে ওড়িয়ারা ধর্মঘট তুলে নেয়।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের এক বিবরণে দেখা যায়, ওই সময়ে কলকাতা ও শহরতলিতে ২৮৭৫টি পালকি এবং ১১,৫০০ জন বেহারা ছিল।

সেকালে বনেদী হিন্দু পরিবারের মেয়েবা বিশেষ বিশেষ তিথিতে ঘেরাটোপ পালকি চড়ে যেতেন গঙ্গাস্নানে। বড় অদ্ভুত ছিল সেই সব স্নানদৃশ্য। পালকি শুদ্ধ তাঁদের গঙ্গায় চোবানো হত। কষ্ট করে বাইরে আসার প্রয়োজন হত না।

পালকি চড়ে দূর-দূরান্তে যাওয়ারও রেওয়াজ ছিল। এজন্য কিছুদূব অন্তর পরিবর্তন কবা হত বেহারাদের। আঠারো শতকের শেষে কলকাতা থেকে পালকিতে বারাণসী যেতে খরচ ছিল ৫০০ টাকা। আর পাটনা পর্যন্ত যেতে লাগত ৪০০ টাকা। কম দূরত্বে ২ মাইল (প্রায় ৩.২৫ কিলোমিটার) খরচ পড়ত ১ টাকা ২ আনা। ডাক-পালকির ভাড়া ছিল অপেক্ষাকৃত কম। সরকাবি ডাকের সঙ্গে ডাক-পালকি চড়ে বারাণসী পর্যন্ত যাওয়া যেত।

পালকি-বেহারাদের মধ্যে হিন্দুস্থানীদের সংখ্যা ওড়িযাদের চেয়ে কম ছিল। হিন্দুস্থানীদের মজুবিও ছিল সস্তা। তা সত্ত্বেও ওড়িয়া বেহারারা এমনই দক্ষ ছিল যে চারজন ওড়িয়ার বদলে ছ'জন হিন্দুস্থানী বেহারার প্রয়োজন হত।

পালকির পাশাপাশি প্রচলন ছিল গরুর গাড়ির। ড্যানিয়েলেব বহুবর্ণ চিত্রে সেকালের কলকাতাব রাজপথে যাত্রীবাহী হাতি, উট ও ঘোড়ার মত প্রাণীর ব্যবহার দেখা যায়। কলকাতার পথে হাতি ব্যবহারের ফলে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল বেঙ্গল হরকরা এমনই একটি দুর্ঘটনার খবর ছেপেছিল। মিস্টার ও মিসেস হুইটমান ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে বাড়ি ফিরছিলেন। এসপ্লানেডের কাছে তাদের গাড়িব ঘোড়া হাতি দেখে ঘাবড়ে যায়। গাড়ি ও আরোহী মিস্টার ব্রাণ্ডিব বাড়িব সামনে ময়লা ড্রেনে গিয়ে পড়ে।

গরুর গাড়ির মধ্যে সাধারণ ভাড়ার গাড়ি বা হ্যাকারি পণ্য বহনের জন্য বাবহৃত হত। গাড়ি তৈরি হত কাঠের। 'বাহু' ছিল হালকা গড়নের দু' চাকার যাত্রীবাহী গাড়ি। লম্বা একটি পোলের ওপর আড়াআড়ি কাঠ বসিযে তৈরি হত এবং জোড়া বলদে তা টানত। 'রথ' হল চার চাকার যাত্রীবাহী গাড়ি। যথেষ্ট পরিসরযুক্ত এব বসার জাযগা তৈবি হত টুকরো বাঁশ ও রঙিন চ্যাঁচারি দিয়ে। মাথার আচ্ছাদন হত চুড়োব মত এবং সু-অলংকৃত। বলিষ্ঠ দুটি বলদ

ব্যবহৃত হত এই গাড়ি টানার জন্য, এদের নখ ও লেজ রাঙানো হত লাল রঙে এবং শিং ও নাকে শোভা পেত সোনা কিংবা রুপোর রিং।

ব্রাউন লো সাহেবের পরিকল্পিত গাড়ির ব্যবহার ঘোড়ার গাড়ির প্রতি নগরবাসীদের অধিকতর আকৃষ্ট করে। ইতিমধ্যে উপযুক্ত রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি। কলকাতার পথে নিত্য নূতন ঘোড়ার গাড়ির আবির্ভাব হতে থাকে, জুড়ি, চৌঘুড়ি, দু'ঘুড়ি, আটঘুড়ি। ছ্যাকরা, ল্যাণ্ডো, ব্রুহাম, ফিটন, ল্যাণ্ডোলেট, হুইস্কি, জিগ, বগি, সোসিয়েবল, সারাবান, রোমলি, পালকি গাড়ি, ব্রাউনবেরি ডাক-গাড়ি, টমটম ও এককার মত নানা নামের গাড়িতে পথ ভরে যায়। ঘোড়ার গাড়ি চড়ে অফিস-আদালত, স্কুল, কারো বাড়ি কিংবা বিকেলে হাওয়া খেতে ময়দানে, সর্বত্র যাতায়াত শুরু হয়। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনকার কলকাতার যানবাহনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে আছে, তখন ঠিকাগাড়ি ও পালকির সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। বড়লোক অর্থাৎ ধনীদের ধনবত্তা দেখাবার অন্যতম প্রধান উপায় ছিল সকালে সুদৃশ্য জুড়ি, অথবা চৌঘুড়ি কিংবা ছয়ঘুড়ি পর্যন্ত সুদৃশ্য ল্যাণ্ডোতে যুতে শহরের দেশীয় পল্লীর মধ্যে নিজে হাঁকিয়ে বেড়ানো ও দুর্গন্ধ বায়ুসেবন এবং একটি সুদৃশ্য পালকি গাড়ি বা অফিস ব্রাউনবেরি গাড়িতে চড়ে অফিসে বা স্কুলে যাতায়াত। বিকালে ধনীবাবুরা আবার সুদৃশ্য ওয়েলার জুড়ি যুতে ল্যাণ্ডো, ফিটন কিংবা অন্যপ্রকার মাথা-খোলা গাড়িতে গঙ্গার ধারের রাস্তায় হাওয়া খেয়ে পরে বিলাতি ব্যাণ্ড বুঝুন আর নাই বুঝুন ইডেন গার্ডেনের ধারে গাড়ি রেখে তাতে বাজনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতেন। উঁচু দরের ডাক্তার, জজ প্রভৃতি যাঁরা নিজেদের গাম্ভীর্য গৌরব বাইরে বজায় রাখতে প্রচলিত রীতি অনুসারে বাধ্য হতেন—ভিতরে তাঁরা যতই কেন হল্লাবাজ, মদমাতাল হোন না—তাঁরাই ব্রুহাম গাড়ি ব্যবহার করতেন। ব্রুহাম গাড়ির আরোহীদের দেখলে সকলের মনে একটা সমীহ ভাব জেগে উঠত। পথচারীদের দুর্দশার অন্ত ছিল না, বেগে অনেক পথিক মারা পড়ে, বাবুদের হাত-পা ভাঙে। পথে জায়গা থাকা সত্ত্বেও ড্রাইভাররা পথিকদের গায়ের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেয়। ফলে নগরবাসীরা সর্বদা সন্তর্পণে যাতায়াত করেন। গ্রামের লোকজন, যারা আগে কখনো কলকাতায় আসেনি, তারাই আগে গাড়ি চাপা পড়ে।

ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল 'এককাগাড়ি'। একজোড়া ছোট চাকার অক্ষধুরা (axle) থেকে লাল কাপড়ে মোড়া 'চেইন' দিয়ে বাঁধা একটি ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যেত এ-গাড়ি। মিস্টার ব্রাউন লোর গাড়ির উন্নত সংস্করণ হল পালকি গাড়ি। কয়েক প্রকার পালকি গাড়ির উপরের অংশ তুলে নিয়ে প্রয়োজন বোধে পালকি রূপে ব্যবহার করা যেত। যাত্রীবাহী ভাড়ার গাড়ি ছ্যাকরা গাড়ি ছিল জন পরিবহণের প্রধানতম সম্বল। এ-গাড়ি চলত ঝাঁকুনি দিতে দিতে। মাঝে মাঝে লাফিয়েও উঠত। ভাড়ার গাড়িগুলির মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল ফিটনগাড়ি। ফিটনগাড়ি অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক ছিল।

তখনকার দিনে রেজিস্ট্রেশনের জন্য গাড়িগুলি ভাগ করা হত তিনটি শ্রেণীতে।

প্রথম শ্রেণী : ফিটন গাড়ি।

দ্বিতীয় শ্রেণী : ক· হাল্কা রবারের চাকা যুক্ত ফিটন গাড়ি।

খ৷ ১· লোহার চাকাযুক্ত হালকা ফিটন গাড়ি ও

২· ৪ মণ (১৫০ কিলোগ্রাম) পর্যন্ত মাল বহনক্ষম ছাদওয়ালা যে-কোনো ঢাকা গাড়ি।

তৃতীয় শ্রেণী : পালকি গাড়ি ও ওই শ্রেণীর অন্যান্য গাড়ি।

প্রথম দু' শ্রেণীর গাড়ির চালক ও সহিসদের পরনে থাকত খাঁকি চাপকান, ছোট প্যান্ট,

কোমরের পট্টি, নীল বেল্ট এবং গাড়িব বঙের সঙ্গে মিলিয়ে রঙিন পাগড়ি। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির চালক ও সহিসদের পরতে হত খাঁকি জামা ও লাল ফেজ টুপি। বিত্তবানেদেব বাবুগিরি বা বিত্ত প্রদর্শনের জন্য যেসব দামি গাড়ি ব্যবহৃত হত সেইসব গাড়িব মালিকদেব মান অনুযায়ী কোচম্যান, সহিস, চাপবাশি, এমনকি মশালচিরও পরিধেয় হত অভিনব এবং জাকজমকপূর্ণ। ঘোড়া ও গাড়ি সাজানো হত রকমারি সাজে।

স্টুয়ার্ট এনড কোম্পানি কলকাতায় ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে ঘোড়ার গাড়ি তৈরিব ব্যবসা শুরু করে। বালিগঞ্জে এদের কারখানায় কয়েকটি সেবা গাড়ি তৈবি হয়েছিল ভারতীয় রাজা-মহারাজা ও সরকারি কর্তাব্যক্তিদের জন্য। পবে এরা মোটরগাড়ির ব্যবসা চালাত। অন্য যেসব কোম্পানি গাড়ি তৈরির ব্যবসা শুরু করেছিল তাদেব কয়েকটিব নাম হল আর বার্টলেট, নানাভাই ধুনজি এনড কোং, হরিশচন্দ্র ঘোস, শেখ মকসুদ আলি, সেটান কুক, হার্ট ব্রাদার্স, জন বুলটন, জেমস স্টুয়ার্ট, কুলনস এনড কোং, জে কার এনড কোং, ভেশাল্ট ও ব্রাউন কোং ইত্যাদি। এদের ব্যবসা ছিল মূলত ধর্মতলা, মধ্য কলকাতা ও ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট অঞ্চলে। কয়েকটি কোম্পানিব কারবার ছিল গাড়ি-ঘোড়া জমা রাখা ও যত্ন নেওয়া এবং গাড়ি-ঘোড়া ভাড়া দেওয়া ও বিক্রি করা। এজন্য এদেব বড় বড় আস্তাবল ছিল। এ-ধরনের কারবার চালাত বুক এনড্ কোং, হান্টাব এনড কোং, হার্ট ব্রাদার্স ও মিলটন এনড্ কোং এবং অন্যান্যরা।

ঘোড়ার গাড়ি করে কলকাতার ডাক বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় ১৮২৫-এ। কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার ও ব্যারাকপুরে ঘোড়ার গাড়িতে ডাক ও সেই সঙ্গে কিছু যাত্রী নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও চালু হয়। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দেব ৩০ নভেম্বর কলকাতা থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত তিন ঘোড়ায় টানা 'অমনিবাস' সার্ভিস চালু হয়। যতদূর জানা যায়, সেটাই কলকাতার প্রথম বাস সার্ভিস।

কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম প্রথম নিয়ে এল এক প্রাইভেট কোম্পানি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে। তখন পাকাপাকিভাবে কলকাতার পথে ট্রামলাইন পাতার জন্য এই কোম্পানির প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি।

ট্রামের জন্য ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে টাউন হলে এক জনসভা হয়। ওই সভায় বিশিষ্ট নাগরিক ও ব্যবসায়ীরা কলকাতার পৌর কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় শিয়ালদহ রেলস্টেশন থেকে বন্দর এলাকা পর্যন্ত ট্রামলাইন বসানোর প্রস্তাব করেন। সরকারি অনুমোদন, অনুদান ও আর্থিক সহায়তা পেয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ রেল কোম্পানির সহযোগিতায় ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে শিয়ালদহ থেকে বৈঠকখানা, বৌবাজার স্ট্রিট, ডালহৌসি স্কোয়ার, কাস্টমস্ হাউস হয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোড পর্যন্ত ট্রামলাইন পাতা শুরু করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি তিনটি ট্রামগাড়ি, প্রথমটি প্রথম শ্রেণীর ও অপর দুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর, নিয়ে শোভাযাত্রা করে দেড়লাখ টাকা খরচে তৈরি কলকাতার প্রথম 'ট্রামওয়ে'-এর উদ্বোধন হয়। প্রথম শ্রেণীর গাড়িটি তিনজন ইউরোপীয় ও দু' জন ভারতীয়, অর্থাৎ মোট পাঁচজন যাত্রী নিয়ে স্বচ্ছন্দে ছুটে যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি দুটিতে ক্ষমতার অতিরিক্ত ভিড় হওয়ায় ঘোড়ারা টানতে পারেনি। এমনকি রেল কোম্পানির ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিস্টার ব্রাণ্ডোর বেত্রাঘাতেও কোনো কাজ হয়নি। তখন ট্রামের কর্মচারিরা ঠেলে ঠেলে ওই গাড়ি দুটি চালিয়ে নিয়ে যায়।

একালের ট্রামের সঙ্গে সেকালের ওই একবগি ট্রামের কোনো মিল ছিল না। তবে নাকি গাড়ি হিসাবে সেটা ছিল অনেক আরামদায়ক। ওই ট্রামগাড়ির চাকা, লাইন, বগি ও বগির ছাদ ছিল কাঠের তৈরি। বগির চারপাশ ছিল খোলা। সামনে চালকের আসন (ডিক্কি সিট)

ও পিছনে ওঠা-নামার জন্য পাদানি ছিল। কণ্ডাক্টরকে ওই পাদানিতে দাঁড়িযে যেতে হত। প্রতিটি বগিতে যেতে পারত ৮ থেকে ১০ জন যাত্রী। ২·৪ মাইল (৩·৮৫ কিলোমিটার) দীর্ঘ ও এক মিটার (৩ ফুট ৩ ৭৫ ইঞ্চি) গেজের ওই ট্রামপথে ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি গড়ে ঘণ্টায় ৬-৭ মাইল (প্রায় ১০·৫ কিলোমিটাব) গতিবেগে ছুটতে সক্ষম হত। ট্রামগাড়ি টানতে দরকার হত দুটি অস্ট্রেলীয় ঘোড়া। অবশ্য এবা এদেশেব গবম ও ভ্যাপসা আবহাওযায় বেশিদিন বাঁচেনি। এই ট্রামলাইন মূলত পাতা হয়েছিল নদী তীবের বন্দব থেকে শিয়ালদহ রেলস্টেশনে পণ্যসম্ভার বয়ে নিয়ে যাওযাব উদ্দেশ্য নিযে। অল্প কিছুদিন পবে রেল কোম্পানির মালগাড়ি নদী তীর ববাবব যাতায়াত শুরু করায় ট্রামেব আব মাল পবিবহণের কাজ মিলত না। যাত্রীব সংখ্যাও পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে গড়ে দৈনিক ৫০০ টাকা করে আর্থিক ক্ষতি হতে থাকে। লোকসানের বহব বাড়তে থাকায় পৌর কর্তৃপক্ষ ১৮৭৩-এব নভেম্বব থেকে ট্রাম সার্ভিস বন্ধ কবে দেন।

বর্তমান ট্রাম সার্ভিসের সূচনা করেছিলেন তিনজন বৃটিশ ব্যবসাযী দিলউইন প্যাবিস, আলফ্রেড প্যাবিস ও রবিনসন সাউট্টব। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দেব ২ অক্টোবর এরা পৌর-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি ও কিছুকাল পরে গৃহীত 'দ্য ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ অ্যাক্ট (১৮৮০)' অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কলকাতায কয়েকটি ট্রামলাইন পাতা ও বক্ষণাবেক্ষণের অধিকার অর্জন করেন।

শিয়ালদহ থেকে মোটামুটি একই পথ ধবে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত এঁদের প্রথম লাইন পাতা হয়। ১৮৮০-এব পয়লা নভেম্বব চালু হয় ওই লাইন। এবারের ট্রামলাইন ছিল লোহার, চাকাগুলিও লোহাব ছিল। আশ্চর্যজনকভাবে এই ট্রাম সার্ভিস শুরু থেকেই যাত্রীদের আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। কয়েকদিন পরে ২২ ডিসেম্বব লণ্ডনে স্থাপিত হয 'দ্য ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ লিমিটেড কোম্পানি'। এই সংস্থা কলকাতার ট্রাম ব্যবস্থায় যাবতীয আইন প্রদত্ত ক্ষমতা অধিগ্রহণ কবে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ডালহৌসি থেকে চিৎপুব এবং নভেম্বরে চৌরঙ্গির দিকে ট্রাম লাইন বিস্তৃত হয। চিৎপুবে লাইন পাতার সময অনেকদিন ধরে রাস্তা খুঁড়ে রাখায় ও রাস্তার ধারে স্তূপাকারে মাটি ফেলে রাখায পথযাত্রী ও গাড়ি চলাচলের অসুবিধাব সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ লোকের কথায ট্রাম কোম্পানি কর্ণপাত করেনি। তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়াব হুমকি দিলে আশ্চর্য দ্রুততায় ওই লাইন সম্পূর্ণ হয়।

পরবর্তী তিন বছরে ধর্মতলা, স্ট্র্যাণ্ড রোড, খিদিরপুর ও ওয়েলেসলিতে ট্রাম লাইনের প্রসার ঘটে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের প্রথম পরীক্ষামূলক ব্যবহাব হয় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে চৌরঙ্গি লাইনে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনে টানা ট্রাম চলত বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। ইঞ্জিনেব আওযাজ ও সিটিতে চমকে উঠে অনেক শৌখিন গাড়ির ঘোড়ারা মাঝে মধ্যে ছোটাছুটি শুরু করে দিত। ফলে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় অধিবাসীদের আপত্তিতে তখন বাষ্পীয় ইঞ্জিনগুলি সরিয়ে দেওয়া হয় খিদিরপুর লাইনে। ওই লাইনের অনেকটাই গিয়েছিল জনবসতির বাইরে দিয়ে। তবে দুর্গাপূজা ও অন্যান্য পরবের সময় ভিড় সামাল দিতে বিশেষ অনুমতি নিয়ে দিনের বেলায় বাষ্পীয় ট্রাম চালান হত চৌরঙ্গি-কালীঘাট লাইনে। উনিশ শতকের শেষে কলকাতায় মোট ১৯ মাইল (প্রায় ৩১ কিলোমিটার) লাইন, ১৮৬টি ট্রামগাড়ি, গাড়ি টানার জন্য ১০০০টি ঘোড়া ও ৭টি বাষ্পীয় ইঞ্জিন ছিল।

ট্রামলাইন বৈদ্যুতিকরণ ও লাইনের গেজ ৩ ফুট ৩·৭৫ ইঞ্চি থেকে ৪ ফুট ৮·৫ ইঞ্চি (১ মিটার ১ সেন্টিমিটার থেকে ১ মিটার ৪৩·৫ সেন্টিমিটার) পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ

হাতে নেওয়া হয় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে খিদিরপুর লাইনে চলে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ি। ট্রাম বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে।

১৯০৫-এর আগে ট্রামের কোনো নির্দিষ্ট স্টপেজ ছিল না। যাত্রী তুলে নেওয়ার জন্য পথে যেখানে-সেখানে ট্রাম দাঁড়াত। রাস্তায় কিছুদূর অন্তর তখন ঘোড়া-বদলের জন্য কোম্পানি হর্স স্টেশন বা সাময়িক আস্তাবলের ব্যবস্থা করেছিলেন যেখানে পরিশ্রান্ত ঘোড়াদের বদল করার জন্য কিছু তাজা ঘোড়া মজুদ থাকত। হর্স স্টেশনে গাড়ি কিছুক্ষণ দাঁড়াত, আর যাত্রীরা জলযোগ করে নেওয়ার সময় পেতেন। ঘোড়াদের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য পথের ধারে থাকত লোহার টব বা চৌবাচ্চায় জলের ব্যবস্থা। এখনো কয়েকটি রাস্তায় পরিত্যক্ত ওই লোহার টব দেখা যায়।

ট্রাম কোম্পানির বড় আস্তাবলগুলি ছিল যথাক্রমে শ্যামবাজার, চিৎপুর, কলিঙ্গা, শিয়ালদহ, খিদিরপুর ও ভবানীপুরে। ট্রামওয়ে বৈদ্যুতিকরণের পর নতুন ট্রামলাইনের প্রসার হতে থাকে শহরের বিভিন্ন দিকে—টালিগঞ্জ ও বেলগাছিয়ায় ১৯০৩-এ, বাগবাজারে ১৯০৪-এ, বেহালা ও মোমিনপুরে ১৯০৮-এ, রাজাবাজারে ১৯১০-এ, পার্কসার্কাসে ১৯২৫-এ এবং রাসবিহারী মোড় থেকে বালিগঞ্জে ১৯২৮-এ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বাগবাজার থেকে শ্যামবাজার (১৯৪১) এবং পার্কসার্কাস থেকে গড়িয়াহাট (১৯৪৩) পর্যন্ত ট্রামের প্রসার ঘটে। হাওড়ায় তিনটি ট্রামলাইন চালু হয়েছিল ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তবে ১৯৭০-৭৬-এর মধ্যে হাওড়ার সব ট্রামলাইন বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি ট্রামগাড়িই প্রথম নতুন হাওড়া ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত শুরু করে। তখন ট্রামলাইনের মোট দৈর্ঘ্য হয়েছিল ৪২·০৯ মাইল (৬৭·৭৪ কিলোমিটার)।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রাম কোম্পানির পরিচালন-ভার নিজের হাতে তুলে নেন। পরে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ নভেম্বর এক আদেশ বলে সরকার কলকাতার ট্রামওয়েজ কোম্পানি অধিগ্রহণ করে। সরকারি অধিগ্রহণের পর ট্রামলাইন বিস্তৃত হয়েছে দক্ষিণে বেহালা থেকে জোকা এবং উত্তরে রাজাবাজার থেকে ফুলবাগান, সি আই টি রোড হয়ে বিধাননগর রোড রেলস্টেশন পর্যন্ত।

অটোমোবাইল আবিষ্কারের এক দশকের মধ্যে কলকাতায় মোটরগাড়ির আবির্ভাব হয় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৯০৬-এ ফ্রেঞ্চ মোটরকার কোম্পানির প্রচেষ্টায় শহরে ট্যাকসির চলাচল শুরু হয়। প্রথমে বাঙালি ও পরে শিখ ড্রাইভাররা ট্যাকসি চালাতেন। এখনকার মত তখনও ট্যাক্সি মিটারযুক্ত ছিল। ভাড়া দিতে হত মাইল প্রতি ৮ আনা। ম্যালেন স্ট্রিটে এদের গ্যারেজ ছিল। আর প্রথমে অফিস ছিল এখনকার ফ্রাঙ্ক রস কোম্পানির জায়গায়।

বাস-সার্ভিস চালু হয়েছিল জনৈক মিস্টার এ শোভানের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। তিনি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অমনিবাস চালু করেন ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। কলকাতা ও শহরতলির মধ্যে তাঁর বাস চলত অনিয়মিত ভাবে। নিয়মিত পরীক্ষামূলক বাস সার্ভিস চালু করেন কলকাতার ট্রাম কোম্পানি—১৯২০ খ্রিস্টাব্দে পার্ক সার্কাস থেকে পুরনো হাওড়া ব্রিজের মুখ পর্যন্ত। পরীক্ষামূলক ওই বাস সার্ভিস চলেছিল ১৯২৫ পর্যন্ত। এরপর ১৯২৬-এ ওয়ালফোর্ড কোম্পানি কলকাতায় দীর্ঘস্থায়ী নিয়মিত বাস-সার্ভিসের ব্যবস্থা করেন। ওই বছরই কোম্পানিটি এনেছিলেন প্রথম দোতলা বাস বা ডবল ডেকার।

প্রথম ডবল ডেকার বাসের রুট ছিল শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট। পরে তা প্রসারিত হয় গোলপার্ক পর্যন্ত। কালীঘাটের মন্দিরের কাছে বর্তমান হকার্স মার্কেটের জায়গায় ছিল

ঋাস আস্তানা। প্রাইভেট কোম্পানির ওই দোতলা বাসের মাথায় প্রথম কোনো ছাদ ছিল না। সারা পথে মুক্ত বায়ু সেবন করা যেত। কিন্তু বর্ষার হাত থেকে আত্মরক্ষা এবং রোদ্দুর থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য সঙ্গে ছাতা নিতে হত। অনেক পরে দোতলা বাসের মাথায় ছাদ আঁটা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এক ঝড়ের দিনে কলেজ স্ট্রিটে দোতলা বাসেব ছাদ ভেঙে দুর্ঘটনা হয়। সেই থেকে প্রাইভেট দোতলা বাস বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই স্টেট বাসের সূচনা। রাজ্য পরিবহণ সংস্থা একতলা ও দোতলা বাস ছাড়াও চালু করেছেন ট্রেলার বাস বা 'ত্রিতলিকা'র। সরকারি নীতি অনুযায়ী রাজ্য পরিবহণ ধীরে ধীরে কলকাতার সব রুট হাতে নিতে থাকে এবং প্রাইভেট বাস চলে যায় ক্রমশ মফঃস্বল এলাকায়। ষাটের দশকের গোড়ায় তিনটি ছাড়া শহরেব সমস্ত বাস রুট ছিল রাজ্য পরিবহণ সংস্থার অধীনে। ১৯৬৬-এর ডিসেম্বরে ট্রাম-বাসের যৌথ ধর্মঘটকালে যান-সমস্যার সুরাহার জন্য সরকাব মফঃস্বলের প্রাইভেট বাস আবার ডেকে নিয়ে আসেন শহরে সাময়িক অনুমতি দিয়ে। পরে ওই সাময়িক অনুমতি পাকা হয়ে যায়। কলকাতায় ওই সব প্রাইভেট বাস শুধু টিকেই যায় তাই নয়, উত্তরোত্তর তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বর্তমানে প্রাইভেট বাস রুট ও বাসেব সংখ্যা স্টেট বাসের চেয়ে অনেক বেশি। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, কলকাতায় দৈনিক যাত্রীর ৬২·৯ শতাংশ (৪৪·৫ লক্ষ) বহন করে প্রাইভেট বাস। স্টেট বাস বহন করছে দৈনিক যাত্রীব মাত্র ১৪·২ শতাংশ (৯·৪ লক্ষ)। মিনিবাস চালু হয়েছে ১৯৭২-এ। ১৯৮১·তে মিনিবাস দৈনিক ২·৩ শতাংশ (১·৫ লক্ষ) যাত্রী বহন কবেছে। এই মিনিবাস চলে বেসরকাবি মালিকানায়।

শহর যখন জলমগ্ন হয় তখন হাতে টানা রিকশাই আমাদের চলাচলেব প্রধান ভবসা। রিকশার প্রচলন প্রথম হয় জাপানে, আর ভারতে আসে ১৮৮০-তে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার চিনারা কয়েকটি রিকশা এনেছিলেন নিজেদের ব্যবহারের জন্য। ১৯১৩-১৪-তে এঁরা এরই কয়েকটা সাধারণের জন্য ভাড়া খাটাতে থাকেন। কয়েক বছর পবে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রিকশার ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকাব চিনাদের হাত থেকে চলে যায় ভারতীয়দের হাতে। বর্তমানে কলকাতায় রিকশার সঠিক সংখ্যা বলা কঠিন। তবে রেজিস্ট্রিকৃত রিকশাব সংখ্যা প্রায় ৬০০০। একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, সি এম ডি এ অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের ৮ শতাংশ জড়িত আছে হাতে টানা ও সাইকেল রিকশা ব্যবসায়ের সঙ্গে। চালকদের শতকরা ৯২ ভাগই আসে বিহার থেকে। উড়িষ্যা ও বাংলারও বেশ কিছু লোক এই ব্যবসায়ে জড়িত এবং লক্ষাধিক পবিবাব রিকশা ব্যবসায়েব উপর নির্ভরশীল।

গতির যুগে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে ধীরগতি রিকশা একটা সমস্যা সন্দেহ নেই। কিন্তু দিনে-রাতে যে-কোনো সময়ে সহজলভ্য, বর্ষায় জলমগ্ন পথে চলাচলেব উপযোগী, সঙ্কীর্ণ রাস্তায় অবাধ বিচরণে সক্ষম—রিকশা ছাড়া আপাতত আর কোনো যানেব কথা চিন্তা করা যায়? শহরের পৌর এলাকায় হাতে-টানা রিকশা প্রতিদিন ৭ লক্ষ ট্রিপ দেয় যা ট্রামের ট্রিপের সমান।

দ্রুতগামী ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি ও মিনিবাস ইত্যাদির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বিদায় নিয়েছে পালকি, গরুর গাড়ি, ছ্যাকরা গাড়ির মত যান। কিন্তু মন্থরগতি হাতে টানা রিকশার সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখীন।

কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থাব উন্নতিকল্পে ভারত সবকারের যোজনা কমিশন নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ দল দীর্ঘ সমীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এখানে ভূগর্ভ রেল ছাড়া পরিবহণ

সমস্যা সমাধানের আর কোনো বিকল্প পথ নেই। এর অনেক আগে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলকাতায় ভূগর্ভ রেল স্থাপনের প্রস্তাব রেখেছিলেন এবং ভূগর্ভ রেলের সম্ভাবনা সম্পর্কে ফরাসি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সমীক্ষাও করিয়েছিলেন। ষাটের দশকে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অরগানাইজেসন বা সি এম পি ও-বিশদভাবে যাত্রী ও যানবাহন সমীক্ষা করে তিনটি ভূগর্ভ লাইনের খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। তাতে প্রথম দফায় দুটি লাইন—দমদম থেকে টালিগঞ্জ (পূর্বে ফরাসি বিশেষজ্ঞ দল প্রস্তাবিত) এবং সল্ট লেক থেকে শিয়ালদহ ও হাওড়া হয়ে রামরাজাতলা পর্যন্ত, আর দ্বিতীয় দফায় বরানগর থেকে ঠাকুরপুকুর পর্যন্ত তৃতীয় লাইনের প্রস্তাব ছিল। পরিকল্পনায় দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম লাইন টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে গড়িয়া রেলস্টেশন পর্যন্ত প্রসারণের প্রস্তাবও করা হয়।

রেলমন্ত্রক ভূগর্ভ রেল বা মেট্রোরেলের পুঙ্খানুপুঙ্খ জরিপ, পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন ও রূপায়ণের জন্য কলকাতায় মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ) সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। ওই সংস্থা সি এম পি ও-সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে প্রস্তাবিত প্রথম লাইনের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দ্বিতীয় লাইনের জরিপ শেষ করেন। প্রথম লাইনটি তৈরির অনুমোদন পাওয়া গেলে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। কাজ শুরু হয় ১৯৭৩-এ এবং ১৯৮৪-এর ২৪ অক্টোবর এই লাইনের কিছু অংশে, ভবানীপুর থেকে এসপ্লানেড, চালু হয় ভারতের প্রথম মেট্রোরেল সার্ভিস। এখন মেট্রোরেল নিযমিত চলছে দক্ষিণে এসপ্লানেড থেকে টালিগঞ্জ (৯ কিলোমিটার) এবং উত্তরে দমদম থেকে বেলগাছিয়া (৪ কিলোমিটার)। নির্মীয়মান ১৬·৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ লাইনের ১৩·০ কিলোমিটার লাইন এবং ১৭টি প্রস্তাবিত স্টেশনের মধ্যে ১৩টি চালু হয়ে গিয়েছে। প্রস্তাবমত ১৯৯০-৯১-এ বাকি অংশের কাজ সম্পূর্ণ হলে এই লাইনে চলাচল করবে দৈনিক ১৫ থেকে ১৭ লক্ষ যাত্রী।

বহুদিনের প্রস্তাবিত চক্ররেলের কাজ হাতে নেওয়া হয় ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে যখন বন্দর কর্তৃপক্ষ নদী-তীর বরাবর তাঁদের রেল লাইনের বেশ খানিকটা অংশ তুলে দেন রেলমন্ত্রকের হাতে। পরিকল্পিত চক্ররেলের এক-তৃতীয়াংশ, উল্টোডাঙ্গা থেকে প্রিন্সেপ ঘাট পর্যন্ত চালু হয়ে গিয়েছে। প্রিন্সেপ ঘাট ছাড়িয়ে ওই লাইনের নূতন ৪ কিলোমিটার অংশ প্রস্তাবিত উড়াল পুলের উপর দিয়ে এসে মিশবে মাঝেরহাট স্টেশনের কাছে বজবজ-শিয়ালদহ শাখা লাইনের সঙ্গে। ওই অংশ এবং উল্টোডাঙ্গা থেকে দমদম জংশন পর্যন্ত সংযোজক লাইন তৈরি হয়ে গেলে চক্ররেলের প্রথম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হবে। তখন উত্তর অংশের অনেক লোকাল ট্রেন শিয়ালদহে না ঢুকে চক্ররেল ধরে শহর ঘুরে ফিরে যাবে। যাত্রীরা তাঁদের গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি কোনো স্টেশনে নেমে স্বচ্ছন্দে হেঁটেই বাড়ি পৌঁছতে পারবেন।

নির্মীযমান মেট্রোরেলের প্রথম লাইন ও চক্ররেলের কাজ ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের শেষে সম্পূর্ণ হলে এই মহানগরে ট্রাম-বাস-ট্যাকসি, মেট্রোরেল ও চক্ররেল নিয়ে যাবতীয় যানের সম্মিলিত যাত্রী পরিবহণ ক্ষমতা হবে দৈনিক ৫৪ থেকে ৫৫ লক্ষ। ততদিনে মহানগরে একমুখী যাত্রীর দৈনিক সংখ্যার গড় ৬৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। এতে প্রায়-বিপর্যস্ত যানবাহন সমস্যার সমাধান হবে কি ?

কোনো পরিকল্পনার সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে তার সময়মত রূপায়ণের উপর। দেরি হলে সেই পরিকল্পনার উপযোগিতা কিছুটা কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘনবসতি পূর্ণ এই মহানগরের (গড় জনবসতি পৌর এলাকায় প্রতি বর্গ

কিলোমিটারে ৩২, ২৭৬ এবং সি এম ডি এ অঞ্চলে ২৮,৪০০) ক্ষেত্রে সেই আশঙ্কাই দেখা যাচ্ছে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সি এম পি ও-রচিত পরিকল্পনার অধিকাংশ শুরুই হয়নি, শেষ হওয়া তো দূরের কথা! সল্ট লেক থেকে রামরাজাতলা পর্যন্ত মেট্রোরেলের দ্বিতীয় লাইন ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ হবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তা শুরুই হয়নি। এমনকি প্রথম লাইন সম্পূর্ণ চালু হয়নি নির্ধারিত সময়ের পর একযুগ অতিবাহিত হলেও। চক্ররেলের অবস্থাও তদৃশ। এভাবে চললে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এখনই প্রয়োজন বিকল্প চিন্তার। শুধু চিন্তা নয়, বিকল্প ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে নির্ধারিত সময়ে জরুরিকালীন ভিত্তিতে। নইলে একবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় চলাফেরা করা এক দুর্বিষহ ব্যাপার হয়ে উঠবে।

যানবাহনের ক্ষেত্রে অতীতের কলকাতার সঙ্গে বর্তমানের পার্থক্য রীতিমতো লক্ষ্য করাব মত। তিনশো বছর আগের কলকাতার যানবাহন ছিল মূলত মানুষের বাহুবল নির্ভর। তারপর সেখানে স্থলাভিষিক্ত হল অশ্বশক্তি। সঙ্গে এল কারিগারি-কুশলতা। আজ গতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আমাদের যেখানে এনে পৌঁছে দিয়েছে, তা বিস্ময়কর। কিন্তু অতীতের সঙ্গে তার সেতুবন্ধটি ছিন্ন হয়ে যায়নি।

কলকাতার বাতি-ব্যবস্থা

অনীশ দেব

কলকাতা শহরের ধারাবাহিক উন্নয়ন অব্যাহত থেকেছে গত তিনশো বছর ধরে। নগরায়ণের পথে, সন্দেহ নেই, উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে কলকাতার বাতি-ব্যবস্থা। বাতির কথা উঠলে সবার প্রথমে বৈদ্যুতিক বাতির কথাটাই মনে পড়া স্বাভাবিক। তবে এ-কথা ঠিক যে এই শহরের গোড়াপত্তনের সময় পথঘাটে বাতিব কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। তখন পথ চলতে গেলে দিনের বেলায় সূর্যদেবতা সম্বল আর রাতে চাঁদিনীই ছিল অন্ধের যষ্ঠি। এছাড়া আগুনের ব্যবহার যখন প্রাচীনকাল থেকে জানা ছিল তখন মশালের ব্যবহারও ছিল বইকি। আর গৃহস্থবা তাদের ঘরে ব্যবহার করতেন উদ্ভিদজাত তেল। কারণ ঘরে ঘরে খনিজ তেলের ব্যবহার শুরু হয় ঊনবিংশ শতকে। আর বৈদ্যুতিক বাতি তো সে-তুলনায় নিতান্তই হাল আমলের ব্যাপার।

কলকাতার বাতি-ব্যবস্থাকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় : ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থা ও পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থা। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় অনেক ব্যাপক। তবে সে-কারণে প্রথমটিকে মোটেই উপেক্ষা করা যায় না।

ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থা

'যখন আমার বয়স তেরো···কোনো কোনো দিন পড়েছি রাত দুটো পর্যন্ত। তখনকাব অপ্রখর আলোর যুগে রাত্রে সমস্ত পাড়া নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে শোনা যেত 'হরিবোল' শ্মশানযাত্রীদের কণ্ঠ থেকে। ভেরেণ্ডা তেলের সেজের প্রদীপে দুটো সলতের মধ্যে একটা সলতে নিবিয়ে দিতুম, তাতে শিখার তেজ হ্রাস হত কিন্তু হত আয়ুবৃদ্ধি।'[১]

রবীন্দ্রনাথের এই লেখা থেকে বোঝা যায় যে-সময়ের কথা তিনি বলছেন সেটা ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ। তখনও ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় 'তৈল যুগের' অবসান ঘটেনি। অথচ কলকাতায় গ্যাসের বাতির আবির্ভাব ঘটে গেছে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। এ-বিষয়ে 'বেঙ্গল হরকবা' একটি প্রতিবেদন প্রকাশ কবে ২০ মার্চ .

'GAS LIGHTS : The warehouse of Mr. Bathgate, the ingenious chemist and druggist in Old Court House Street, was on Tuesday night brilliantly and beautifully illuminated with gas light, almost the first display, we believe, of this ingenious and valuable invention in India. Crowds of the better description of natives flocked round the place, expressing their admiration at the beautiful contrivance.'

১· আশ্রমেব রূপ ও বিকাশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব। বিশ্বভারতী সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪১।

* আঠেরোশো শতকের প্রথমভাগ থেকেই কলকাতার কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে পথঘাট আলোকিত করার জন্য কেরোসিন-বাতি ব্যবহার করা হত। তবে ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় বিভিন্ন উদ্ভিদজাত তেলের প্রচলনই ছিল বেশি। যেসব তেল ঘরে ব্যবহার করা হত তা হল, ভেরেণ্ডার তেল বা রেড়ির তেল, নারকোল তেল ও সরষের তেল। এখনও বিভিন্ন পুজো-আর্চা বা পবিত্র অনুষ্ঠানের কাজে তেলের প্রদীপ জ্বালানো হয় ঘরে। এছাড়া লোডশেডিংয়ের মোকাবিলা করতে মোমবাতি কিংবা হ্যারিকেন এখনও অপরিহার্য।

যেসব জ্বালানি তেল ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হয় তাদের আলো দেবার ক্ষমতার তারতম্য আছে। এই ক্ষমতা নির্ভর করে তেলের ক্যালরিফিক ভ্যালু বা তাপন মূল্যের উপরে। নীচের তালিকায় এ-জাতীয় কয়েকটি জ্বালানি তেলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম উল্লেখিত হল :

জ্বালানি তেলের নাম	শ্রেণী	মূল রাসায়নিক উপাদান	গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব	তাপন মূল্য (প্রায়) (জুল/গ্রাম)
কেরোসিন তেল	খনিজ	হাইড্রোকার্বন	০.৮৫	৪১,০০০
ভেরেণ্ডার তেল বা রেড়ির তেল	উদ্ভিদজাত	ট্রাইগ্লিসারাইড্‌স্	০.৯৬-০.৯৭	৩৯,৭৬৭
নারকোল তেল	,,	,,	০.৯২৬	,,
সরষের তেল	,,	,,	০.৯২০	,,

তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে কেরোসিন-বাতির আলো অন্যান্য তেলের আলোর চেয়ে জোরালো। কিন্তু সে-সময়ে কেরোসিন সহজলভ্য ছিল না। সুতরাং উদ্ভিদজাত তেলের কদরই ছিল বেশি। কিন্তু বর্তমানে অন্যান্য তেলের তুলনায় কেরোসিন দামে সস্তা। ফলে তার ব্যবহারও বেশি।

জ্যোৎস্না রাতে আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে ভূপৃষ্ঠে এক বর্গমিটার জায়গায় যে-পরিমাণ চাঁদের আলো এসে পড়ে তা হল ১ লুমেন। সংক্ষেপে এই দীপনমাত্রাকেই বলা হয় ১ লাক্স। একটি সাধারণ প্রদীপে মাঝারি ব্যাসের সলতে ব্যবহার করলে সরষের তেলের প্রদীপ যে-পরিমাণ আলো দেয় তার গড় মান ১১ লুমেন। কেরোসিন বাতির ক্ষেত্রে এই মান অপেক্ষাকৃত বেশি। তবে অন্যান্য উদ্ভিদজাত তেলের ক্ষমতাও প্রায় সরষের তেলের মতই।

চেহারা বা আকৃতির দিক থেকে তেলের বাতির নানা রকমফের ছিল। বিভিন্ন কারুকাজ করা প্রদীপ থেকে শুরু করে আলঙ্কারিক সেজ বাতি অথবা দেওয়ালগিরির অভাব ছিল না। এছাড়া কখনও কখনও ব্যবহার করা হত গ্যাসের বাতি। যেমন হুতোম প্যাঁচার নকশা-র 'দুর্গোৎসব' রচনায় পাওয়া যায় : 'ক্রমে ছটা বাজলো, দালানের গ্যাসের ঝাড় জ্বেলে দিয়ে প্রতিমার আরতি আরম্ভ করে দেওয়া হলো এবং মা দুর্গার শেতলের জলপান ও অন্যান্য

সরঞ্জামও সেই সময় দালানে সাজিয়ে দেওয়া হলো—[১]

এইখানে যে-গ্যাসের বাতির কথা বলা হয়েছে তাতে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাসিটিলিন গ্যাস (রাসায়নিক সংকেত : $C_2 H_2$)। ১৮২৩ থেকে এই গ্যাস কলকাতার বাতি-ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। পরবর্তী কালে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও, তার উপরে আমাদের আস্থা যে কিছুমাত্র কমেনি তার প্রমাণ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে 'দ্য স্টেট্স্‌ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত বার্ন এন্ড কোম্পানি-র বিজ্ঞাপন। সেই বিজ্ঞাপনে অ্যাসিটিলিন গ্যাসকে বলা হয়েছে 'আগামী দিনের আলো'। ক্যালসিয়াম কার্বাইড (চলতি কথায় যাকে শুধুই কার্বাইড বলা হয়) যৌগের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় অ্যাসিটিলিন গ্যাস তৈরি হয়। বার্ন এন্ড কোম্পানির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে এক পাউণ্ড ক্যালসিয়াম কার্বাইডের দাম সাত আনা। পাওয়া যাবে তাদের পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র ৩, ওয়াটার্লু স্ট্রিটে। সেই সময়ে সাইকেল আরোহীরাও তাদের সাইকেলে অ্যাসিটিলিন গ্যাসের বাতি ব্যবহার করত।

অ্যাসিটিলিন গ্যাস বর্ণহীন, বিষাক্ত এবং দাহ্য। কিন্তু উজ্জ্বল আলো দেবার কাজে এই গ্যাসের দক্ষতা মানুষকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে গ্যাসটি কতটা বিপজ্জনক। এখনও কলকাতার কোনো কোনো এলাকায় ফিরিওয়ালাদের দেখা যায় অ্যাসিটিলিন গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে ফিরি করতে বসেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল অ্যাসিটিলিন। অথচ তার বেশ কয়েক বছর আগেই সমাজের উচ্চবিত্তদের বাড়িতে শুরু হয়ে গেছে বিদ্যুৎ-বাতির ব্যবহার। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি 'দ্য স্টেট্স্‌ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর থেকে এ-তথ্য জানা যায় : 'The handsome reception rooms at Belvedere...were never seen to better advantage than on the occasion of the ball given by Sir Alexander and Lady Mackenzie on Thursday night. In the ball room alone there were...5 handsome cut glass electriliers, each of 12 lamps, suspended in the centre of the room, besides 18 wall brackets, each comprising 3 lamps. The adjoining boudoir was fitted with bracket lamps, while the staircase and vestibule were lighted with cut-glass pendants. In the same way, the supper room was fitted with bracket lamps besides coloured lamp shades which together lit up the apartment very effectively.'

এ তো গেল উচ্চবিত্তদের কথা; তাঁরা নিজেদের বাড়িতে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানোর জন্য জেনারেটার ব্যবহার করতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের সে-উপায় ছিল না। তাদের ভরসা তখনও সেই তেলের বাতি, বা কখনও কখনও গ্যাসের বাতি। এই প্রসঙ্গে আর এক ধরনের ঘরোয়া বাতির কথা বলা প্রয়োজন যা এখনও সমানভাবে জনপ্রিয়। এই বাতিটি হল মোমবাতি।

খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে থেকেই প্রাচীন মিশরীয়রা মোমবাতির ব্যবহার জানত। তবে পরোক্ষ উল্লেখ থেকে যতটুকু আঁচ করা যায় তাতে ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় আধুনিক মোমবাতির ব্যবহার সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ অথবা বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে আধুনিক ঢঙের মোমবাতি তৈরির

---

১ হুতোম প্যাঁচার নকশা, দ্বিতীয় ভাগ। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, প্রথম প্রকাশ ১৮৬৩।

যৌথ পেটেন্ট নেন দুই ফরাসি রসায়নবিজ্ঞানী মিশেল ইউজিন শেভ্রুল ও জোসেফ লুই গে-লুসাক। আধুনিক ঢঙের মোমবাতি তৈরি শুরু হয় ১৮৪৮ নাগাদ। তার কয়েক বছরের মধ্যেই মোমবাতির ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বর্তমানে যে-মোমবাতি আমরা ব্যবহার করি তাতে যে-প্যারাফিন ওয়াক্স বা মোম ব্যবহার করা হয় তা পেট্রোলিয়ামের পাতনের ফলে পাওয়া হাইড্রোকার্বন। এর গড় গলনাঙ্ক ৫১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আপেক্ষিক গুরুত্ব ০·৯ এবং গড় তাপন মূল্য প্রায় ৯৫০০ জুল/গ্রাম। ২৪ সেন্টিমিটার দীর্ঘ, ১·৮ সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট ৫২·৫ গ্রাম ওজনের একটি মোমবাতি গড়ে ছ' ঘণ্টা আলো দিতে পারে এবং তার গড় লুমেন আউটপুট ১১·৭। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে মোমবাতির শিখাকে একটি সুষম আলোক প্রভব বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বায়ুমণ্ডলের চাপ ও আর্দ্রতার উপরে নির্ভর করে একটা মোমবাতি কতক্ষণ জ্বলবে সেই সময়ের তারতম্য হতে পারে।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে এই সব উপকরণের সাহায্যে ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থার কাঠামো যখন দাঁড়িয়েছিল তখন নগরায়ণের জন্য অত্যন্ত জরুরি উপকরণ বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কে 'বেঙ্গল অ্যাক্ট—নাইন' প্রণয়ন করা হয়—যার অপর নাম 'ক্যালকাটা ইলেকট্রিক লাইটিং অ্যাক্ট'। এই আইনের সারমর্ম হল, বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য স্থানীয় সরকার বিভিন্ন কোম্পানিকে অনুমতি দিতে পারবেন।

কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রথম দিকে বেশ কয়েকটি কোম্পানি আবেদন করে। ১৮৯৭-এর জানুয়ারি মাসে লণ্ডনের 'ক্রম্পটন এন্ড্ কোম্পানি লিমিটেড'-এর তৎকালীন প্রতিনিধি 'কিলবার্ন এন্ড্ কোম্পানি' আবেদন করে সবার প্রথমে। এই আবেদনে তারা লণ্ডনে রেজিস্ট্রিকৃত একটি কোম্পানি 'দ্য ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড'-এর প্রতিনিধি হিসাবে নিজেদের পরিচয় রাখে। এই কোম্পানির তখন নামমাত্র মূলধন ছিল ১০০০ পাউণ্ড। ওই বছরেই ফেব্রুয়ারি মাসে 'দ্য ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড'-এর নাম বদল করে 'দ্য ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড' রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একই সঙ্গে কোম্পানির মূলধন বাড়িয়ে ১ লক্ষ পাউণ্ড করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বর্তমানে এই কোম্পানির নাম 'সি ই এস সি লিমিটেড'।

কলকাতার প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু হয় ১৮৯৯-এর ১৭ এপ্রিল। এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছিল বর্তমান বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিটের কাছাকাছি ইমামবাগ লেন-এ। কিন্তু ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় বিদ্যুতের ব্যবহার ব্যাপকভাবে তখনও শুরু হতে পারেনি। এর কারণ বিদ্যুৎ সম্পর্কে নগরবাসীদের অহেতুক আতঙ্ক। তারা তাদের তেলের বাতি বা গ্যাসের বাতিতেই দিব্যি খুশি। সে-সময়ে 'নতুন যুগের জাদুকর' বিদ্যুতের গুণাগুণ নিয়ে প্রায়ই বিজ্ঞাপন দিতে হত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানিকে। তারা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে নিয়মিত প্রচার চালাত। যেমন, বৈদ্যুতিক পাখা, বিজলি বাতি, ধোঁয়াহীন রান্নার উনুন, বৈদ্যুতিক হিটার ইত্যাদি। এই সব যন্ত্রপাতি প্রদর্শনের জন্য বর্তমান ভিক্টোরিয়া হাউসে 'দ্য ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড'-এর একটি শো-রুমও ছিল। ১৯৩০-এর দশকেও দেখা যেত কৌতূহলী দর্শকরা সেখানে ভিড় করে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলোর ব্যবহারিক প্রদর্শনী দেখছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের সূচনা যখন হয়ে গেল তখন ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় এসে গেল ইনক্যানডিসেন্ট ল্যাম্প বা তাপদীপ্ত বিজলি বাতি। এই ধরনের বাতিকে চলতি কথায়

আমরা বলি বাল্ব। এর কাচের আবরণের ভেতরে থাকে ধাতব ফিলামেন্ট। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন আবিষ্কারক টমাস আলভা এডিসন বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করেন। এই বাল্বের ফিলামেন্ট হিসাবে তিনি ব্যবহার করেছিলেন অন্তর্ধূম পাতনে কার্বনিত সাধারণ সেলাইয়ের সুতো। ফিলামেন্টটিকে তিনি প্লাটিনামের তৈরি টার্মিনালে যুক্ত করে বায়ুশূন্য কাচের বাল্বের মধ্যে রেখেছিলেন। ১ ওয়াট বৈদ্যুতিক ক্ষমতার বিনিময়ে এই বাতি থেকে যে-আলো পাওয়া যেত তার পরিমাণ মাত্র ১·৪ লুমেন। পরবর্তিকালে বাল্বের ফিলামেন্টের অনেক উন্নতি হয়েছে এবং একই সঙ্গে বাল্বের লুমেন আউটপুটও বেড়ে উঠেছে। নীচের তালিকায় তাপদীপ্ত বৈদ্যুতিক বাতির উন্নতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ দেখানো হল :

তাপদীপ্ত বাতির ধরন	খ্রিস্টাব্দ	আনুমানিক বৈদ্যুতিক ক্ষমতা (ওয়াট)	গড় লুমেন আউটপুট (লুমেন)	ওয়াট প্রতি লুমেন আউটপুট (লুমেন/ওয়াট)
এডিসন আবিষ্কৃত প্রথম বাতি	১৮৭৯	—	—	১·৪
কার্বনিত বাঁশের ফিলামেন্টযুক্ত বাতি	১৮৮০-১৮৮৪	—	—	১·৬
বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি কার্বনিত সেলুলোজ ফিলামেন্টযুক্ত বাতি	১৮৯৪	—	—	৩·৩
জেনারেল ইলেকট্রিক মেটালাইজড় বাতি	১৯০৫	৬০	২৫২	৪·২
অসমিয়াম ফিলামেন্টযুক্ত বাতি	—	৬০	৩৫৪	৫·৯
টাংস্টেন পাউডার থেকে তৈরি ফিলামেন্টযুক্ত বায়ুশূন্য বাতি	১৯০৭	৬০	৪৬৮	৭·৮
টাংস্টেন তার থেকে তৈরি ফিলামেন্টযুক্ত বায়ুশূন্য বাতি	১৯১১	৬০	৬০০	১০·০
টাংস্টেন তার থেকে তৈরি ফিলামেন্টযুক্ত গ্যাসপূর্ণ বাতি	১৯১৩	১০০০	২০,০০০	২০·০

আধুনিক যে-ফিলামেন্ট বাতি ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাতে টাংস্টেন ধাতু দিয়েই বাল্বের ফিলামেন্ট তৈরি করা হয়। টাংস্টেন-এর গলনাঙ্ক ৩৪১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে এই ধাতুর তৈরি ফিলামেন্টকে না গলিয়ে ফেলে খুব উঁচু তাপমাত্রায় তোলা সম্ভব এবং তা থেকে পর্যাপ্ত আলোক-শক্তি পাওয়া যায়। টাংস্টেন ফিলামেন্টযুক্ত

বাল্ব বায়ুশূন্য হতে পারে, অথবা নিষ্ক্রিয় গ্যাস পূর্ণ হতে পারে। গ্যাসপূর্ণ বাল্বে বায়ুমণ্ডলীয় চাপে নাইট্রোজেন বা আর্গন গ্যাস ভর্তি করা থাকে। কোনো কোনো সময় এই দুই গ্যাসের মিশ্রণও ব্যবহার করা হয়। তবে নাইট্রোজেন গ্যাসপূর্ণ বাল্বের আলোয় কিছুটা লালচে-হলুদ ভাব থাকে। কিন্তু বাল্ব যদি আর্গন গ্যাসপূর্ণ হয় তাহলে আলো অনেক সাদা হয়। সেই কারণেই আর্গনের দাম নাইট্রোজেনের তুলনায় অনেক বেশি হলেও বর্তমানে বেশিরভাগ বাল্ব কোম্পানিই আর্গন গ্যাস ব্যাবহার করে থাকে।

তাপদীপ্ত বাতির ফিলামেন্টের ডিজাইন দু' রকমের হতে পারে : সিঙ্গল কয়েল বা কয়েল্‌ড্ কয়েল। সিঙ্গল কয়েলে একটি তারকে উপর-নীচে আঁকা-বাঁকা করে ফিলামেন্টটি গঠন করা হয়। আর কয়েল্‌ড্ কয়েলে তারটিকে প্রথমে সূক্ষ্ম স্প্রিংয়ের মত করে পাকানো হয়, তারপর সেই পাকানো তারটি দিয়ে গঠন করা হয় প্রয়োজনীয় ফিলামেন্ট।

তাপদীপ্ত বাতি ছাড়া আর যে-বাতি ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় ভীষণ জনপ্রিয় তা হল ফ্লুওরেসেন্ট লাইট বা টিউব লাইট। ফরাসি রসায়নবিদ জর্জেস ক্লদ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আবিষ্কার করেন যে তড়িৎ মোক্ষণের ফলে নিওন গ্যাস থেকে আলো পাওয়া সম্ভব। এর পরবর্তিকালের ক্রমোন্নত গবেষণা ১৯৩০-এ প্রতিপ্রভ পদার্থের আস্তবণ দেওয়া ফ্লুওরেসেন্ট টিউব লাইট তৈরি সম্ভব করে তোলে। টিউব লাইট প্রকৃতপক্ষে নিম্নচাপের মার্কারি বাতি। সাধারণত দু' ফুট (০·৬১ মিটার) বা চার ফুট (১·২২ মিটার) দৈর্ঘ্যের হয়, এবং এর কাচনলের ব্যাস ৩·৫ সেন্টিমিটার। এই বাতির লম্বা কাচনলের দু' প্রান্তে থাকে দুটো ধাতব ফিলামেন্ট। তাপ পেলে যাতে ফিলামেন্টগুলো সহজে ইলেকট্রন মুক্ত করতে পারে তার জন্য ধাতব ফিলামেন্টের উপরে থাকে বিশেষ ধরনের অক্সাইডের আস্তরণ। কাচনলের ভিতরে চাপ রাখা হয় খুব কম (১ মিলিমিটার পারদস্তম্ভেব চাপের কাছাকাছি), আর তার মধ্যে রাখা থাকে খুব সামান্য পরিমাণ পারদ ও নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গন। তড়িৎ মোক্ষণ শুরু হওয়ার কাজে আর্গন গ্যাস সাহায্য করে। বাতি চালু করলে পারদ বাষ্পীভূত হয়। তখন উত্তপ্ত ফিলামেন্ট থেকে নির্গত ইলেকট্রন কণার সঙ্গে পারদ পরমাণুর সংঘর্ষের ফলে অতিবেগুনি রশ্মি উৎপন্ন হয়। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রার অতিবেগুনি রশ্মি আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাছাড়া এই রশ্মির আলোয় আমরা কিছু দেখতে পাই না। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান করতে টিউব লাইটের কাচনলের ভেতরে প্রতিপ্রভ পদার্থের আস্তরণ দেওয়া থাকে। উৎপন্ন অতিবেগুনি রশ্মি এই আস্তরণের উপরে আছড়ে পড়লেই প্রতিপ্রভার ফলে আমরা পাই দৃশ্য আলো বা ভিজিবল্ লাইট।

দু' ফুট ও চার ফুট দীর্ঘ টিউব লাইটের বৈদ্যুতিক ক্ষমতা যথাক্রমে ২০ ওয়াট ও ৪০ ওয়াট। সাধারণ তাপদীপ্ত বাতির তুলনায় টিউব লাইটের আলোর পরিমাণ বেশি, আর এই বাতির ওয়াট প্রতি লুমেন আউটপুটের মানও তাপদীপ্ত বাতির কয়েকগুণ। পরের পাতায় বিভিন্ন তাপদীপ্ত বাতি ও টিউব লাইটের কয়েকটি গুণাগুণ তুলনা করে দেখানো হল :

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে চার ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৩৬ ওয়াট বৈদ্যুতিক ক্ষমতার এক ধরনের অপেক্ষাকৃত সরু টিউব লাইট গত কয়েক বছর ধরে চালু হয়েছে। এর ব্যাস ২·৫ সেন্টিমিটার। এই বাতি উৎপাদনকারী কোম্পানি দাবি করেছিল যে এর লুমেন আউটপুট ৪০ ওয়াটের টিউব লাইটের সমান। অর্থাৎ, এর ওয়াট প্রতি লুমেন আউটপুট ৭০·৮৩, ফলে এই টিউব লাইট ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ খরচ বাঁচবে—অথচ ৪০ ওয়াটের টিউব লাইটের সমান আলো পাওয়া যাবে। কিন্তু গত কয়েক বছরের ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রমাণ করেছে এই সরু টিউব লাইটের লুমেন আউটপুট ও গড় আয়ু ৪০ ওয়াটের টিউব

বাতির ধরন	বৈদ্যুতিক ক্ষমতা (ওয়াট)	গড় লুমেন আউটপুট (লুমেন)	ওয়াট প্রতি লুমেন আউটপুট (লুমেন/ ওয়াট)
বায়ুশূন্য সিঙ্গল্ কয়েল তাপদীপ্ত বাতি	২৫	২৩০	৯·২
	৪০	৪২৫	১০·৬২৫
	৬০	৭২০	১২·০
গ্যাসপূর্ণ কয়েল্‌ড্ কয়েল তাপদীপ্ত বাতি	১০০	১৩৮০	১৩·৮
	১৫০	২১০০	১৪·০০
	২০০	৩০৪০	১৫·২
	৩০০	৪৮০০	১৬·০
	৫০০	৮২০০	১৬·৪
গ্যাসপূর্ণ সিঙ্গল্ কয়েল তাপদীপ্ত বাতি	১০০০	১৮,৪০০	১৮·৪
টিউব লাইট	২০	৯৭০	৪৮·৫
	৪০	২৫৫০	৬৩·৭৫

লাইটের তুলনায় কম। ফলে বর্তমানে এই সরু টিউব লাইটের ব্যবহার অনেক কমে গেছে।

উপরের তালিকায় যে-সব তাপদীপ্ত বাতির কথা বলা হয়েছে তাদের কাচ-বাল্ব সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। অনেক সময় কাচ-বাল্বের ভিতরের দেওয়ালে প্রতিপ্রভ পদার্থের আস্তরণ দেওয়া থাকে। এর ফলে সুষম আলো পাওয়া যায়। তবে এই ধরনের তাপদীপ্ত বাতির ব্যবহার খুব সীমিত। ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় যে-তাপদীপ্ত বাতি ব্যবহার করা হয় তার একপ্রান্তে একটি ধাতব টুপি থাকে। এই টুপির দু' প্রান্তে দুটি ছোট ছোট পিন উঁচু হয়ে থাকে। বাল্ব হোল্ডারে লাগানোর সময়ে এই পিন দুটি বাল্বকে হোল্ডারের সঙ্গে সঠিকভাবে যুক্ত করে। হোল্ডারের বৈদ্যুতিক টার্মিনাল দুটির স্প্রিংয়ের চাপ এই কাজে বাড়তি সাহায্য করে। এই ধরনের পিনযুক্ত টুপিকে বলা হয় বেয়নেট ক্যাপ বা সঙ্গিন টুপি।

এবারে ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় ব্যবহৃত তাপদীপ্ত বাতি ও টিউব লাইটের আয়ু ও দামের তুলনা করা যেতে পারে। একটি তাপদীপ্ত বাতির গড় আয়ু ১০০০ ঘণ্টা। অর্থাৎ, প্রতিদিন গড়ে পাঁচ ঘণ্টা করে ব্যবহার করা হলে একটি তাপদীপ্ত বাতি সাড়ে ছ' মাস চলতে পারে। সেই তুলনায় টিউব লাইটের গড় আয়ু ৮০০০ থেকে ১০,০০০ ঘণ্টা। অর্থাৎ, একই হিসাব মত টিউব লাইট টিকবে চার বছর চার মাস থেকে পাঁচ বছর পাঁচ মাস। একথা ঠিক যে একই ওয়াটের তাপদীপ্ত বাতির দামের তুলনায় টিউব লাইটের দাম তার প্রায় ছ'-সাত গুণ, এবং তার লাগানোর ব্যবস্থার খরচও বেশি। কিন্তু সমান ওয়াটের তাপদীপ্ত বাতির তুলনায় টিউব লাইটের ওয়াট প্রতি লুমেন আউটপুট প্রায় পাঁচ থেকে ছ'গুণ, আর তার আয়ুও তাপদীপ্ত বাতির আয়ুর আট-দশগুণ। সেই কারণেই আধুনিক ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় টিউব লাইটের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি।

ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় বাতির বাইরের চেহারা একটু-আধটু পাল্টালেও প্রধানত তা

তাপদীপ্ত বাতি অথবা টিউব লাইট। বর্তমান বৈদ্যুতিক বাতি-ব্যবস্থায় বিদ্যুতের প্রধান জোগানদার সি ই এস সি লিমিটেড ও ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড। প্রতিটি বাড়িতেই বৈদ্যুতিক মিটারের সাহায্যে বিদ্যুৎ খরচ মাপার ব্যবস্থা রয়েছে এবং মিটারের পাঠ অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানিকে দাম দিতে হয়। বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তাপদীপ্ত বাতি আমাদের শহরের ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় আলোর চাহিদা মিটিয়ে আসছে। আর তার তুলনায় কিছুটা কম সময় ধরে হলেও টিউব লাইটের ব্যবহার কলকাতায় প্রায় তিন-চার দশকের পুরনো হয়ে গেছে। এখনও এই দুই ধরনের বাতির জনপ্রিয়তা দেখে অনুমান করা কঠিন নয় যে আগামী বেশ কয়েক দশক ধরেও এগুলির ব্যবহার অব্যাহত থাকবে।

পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থা

'আজি, এমন চাঁদের আলো—
মরি যদি সেও ভাল,
সে মরণ স্বরগ সমান।'[১]

আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে কবি এ-কথা বলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু অন্ধকার পথে পথিকের কাছে এই আলোর দীপনমাত্রা বড়জোর ১ লাক্স। প্রাচীন কলকাতায় পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থা বলতে রাতের বেলা চাঁদের আলো, জোনাকির আলোকবিন্দু, অথবা মশাল। আর দিনের বেলা সূর্য। সূর্যের আলো যে কৃত্রিম আলোর তুলনায় বহু গুণ বেশি তা আমরা জানি। কিন্তু ঠিক কত তার দীপনমাত্রা ? জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের আলোর কতগুণ ? জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দুপুরবেলা, যখন সূর্য তার আপেক্ষিক গতিপথের সর্বোচ্চ বিন্দুতে, তখন সূর্যের আলোর দীপনমাত্রা ১,১০,০০০ লাক্স। সুতরাং পথঘাটে দিনের আলো উপভোগ করার পর রাতে চাঁদের আলোয় কাজ চলতে পারে না। চাই কৃত্রিম আলোক-উৎস। এ-থেকেই পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থার সূচনা।

আদি যুগ : গ্যাস ও তেলের বাতি

কলকাতায় পথঘাটের সূচনা আঠারো শতকের গোড়ায়। ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দে জমিদারী আমলে কলকাতায় মাত্র দুটি রাস্তা ছিল : ক্লাইভ স্ট্রিট ও চিৎপুর রোড। তারপর নিয়মিত হারে রাস্তা, গলি ও তস্য গলি তৈরি হয়ে ১৭৯৪-এ এগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৬৩, ৫২০ ও ৫১৭। সন্দেহ নেই জলা-জঙ্গলে আচ্ছন্ন কলকাতা পরিকল্পনাহীন নগরায়ণের শিকার হয়েছিল। প্রযুক্তিবিদদের মতে কোনো আধুনিক শহরে অন্তত শতকরা ২০-২৫ ভাগ এলাকা পথঘাটের জন্য বরাদ্দ হওয়া উচিত। কলকাতার মোট ক্ষেত্রফল ১৮৭·৩৩ বর্গ কিলোমিটার। অথচ এর মাত্র ৬·৫% এলাকা জনপথের জন্য বরাদ্দ। কলকাতা কর্পোরেশনের (ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের নথি অনুযায়ী কলকাতার কর্পোরেশন এলাকায় রাস্তা, গলি, তস্য গলি, বস্তি অঞ্চলের নামহীন জনপথ ইত্যাদি মিলিয়ে মোট পথের সংখ্যা ৩৪০৩টি। এইসব পথগুলির মোট দৈর্ঘ্য ৪৮৮৬·৫

১ গান · দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ২য় খণ্ড। সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, ১৯৮৯।

কিলোমিটার। গত দু-বছরে যেসব নতুন পথঘাট তৈরি হয়েছে, অথবা যেসব নতুন এলাকা কলকাতা কর্পোরেশনের আওতায় এসেছে তার জন্য যদি অতিরিক্ত পথদৈর্ঘ্য শতকরা দশ ভাগ হয় তাহলে বর্তমানে কলকাতার মোট পথদৈর্ঘ্য প্রায় ৫৩৭৫ কিলোমিটার।

সন্দেহ নেই, এই প্রায় ৫৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথের বাতি-ব্যবস্থার কর্মকাণ্ড মোটেই ছোট খাটো ব্যাপার নয়। কিন্তু পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থার শৈশবে অবস্থাটা কী রকম ছিল ?

১৮৫৭-এর জুলাই মাসের আগে কলকাতার পথঘাটে শুধুই ছিল কেরোসিন তেলের বাতি। ১৮৩৬-এ কর্পোরেশনের জনৈক এক্সিকিউটিভ অফিসার বাঁধা দরে বাতি ও বাতি-স্তম্ভ সরবরাহ করতেন। লেফ্‌টেন্যান্ট অ্যাবারকোম্বির অধীনস্থ এই অফিসারকে মাসে তিনশো সিক্কা টাকা[১] দেওয়া হত। শহর কলকাতার পথঘাটে তখন মোট বাতির সংখ্যা ছিল ৩১৩। শহরের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে বাতি লাগানোর কোনো চেষ্টা সে-সময়ে হয়নি। মিস্টার স্ট্যাথাম নামে একজন ঠিকাদার এই ৩১৩টি বাতির তেল, সলতে ইত্যাদি সরবরাহ করতেন। এ-জন্য বাতি পিছু তাঁকে দেওয়া হত এক টাকা দু' আনা ছ' পাই। অর্থাৎ তখন পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থার বার্ষিক খরচ ছিল সাত হাজার টাকারও কম। এই ঠিকাদারের কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্য ছিলেন মাসিক ৬০ সিক্কা টাকা মাইনের একজন ওভারসিয়ার। মিস্টার স্ট্যাথামের উন্নত মানের 'রোজ' মার্কা কেরোসিন বাতি যে সে-সময়কার গ্যাস-বাতির সমকক্ষ ছিল তার প্রমাণ মেলে ১৮৪১-এর ৪ অগাস্টের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে :

' On Tuesday evening last, the new improved lamps made under the superintendence of Mr. Statham and put up in the following streets were lighted, viz., Old Court House Street, Hasting's Street, Durrumtollah...The great superiority of these lamps over the former ones must be evident to everyone who has seen them burning. They emit a brilliant steady light little inferior, if at all, to that of gas, and in appearance they are much more ornamental. '

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চাশতম অধ্যায়ের অ্যাক্ট XII অনুযায়ী বাতি-ব্যবস্থার নতুন একটি নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। এই নিয়মে যেসব বাড়ির কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্য মূল্য মাসিক ৭০ টাকা বা তার বেশি সেসব বাড়ির বাসিন্দাদের নিজ খরচে বাড়ির সদরে আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই নিয়মটি ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনে প্রবর্তিত নিয়ম অনুসারে কলকাতায় চালু করা হয়। কিন্তু ১৮৫৬-তে নতুন অ্যাক্ট XXVIII বলবৎ করা হলে পুরনো নিয়মটি রদ হয়। নতুন নিয়মের ফলে যেসব বাড়ির কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্য মূল্য বার্ষিক ১২০ টাকা বা তার বেশি তাদের বাসিন্দাদের উপরে বার্ষিক মূল্যের শতকরা ২ ভাগ বাতি-কর চাপানো হয়। যেহেতু বাসিন্দারা প্রায়ই বাড়ি বদল করতেন সেহেতু এই কর ঠিকমতো আদায় করা সম্ভব হত না। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩৪,২৯৩ টাকা।

১৮৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার পথঘাটে মোট ৪১৭টি কেরোসিন বাতি ছিল। এর জন্য কর্পোরেশনের সে-বছর খরচ হয়েছিল ১৬,৪৮৭ টাকা। ১৮৫৫-এর পয়লা জানুয়ারি থেকে মিস্টার স্ট্যাথামের সঙ্গে পাঁচ বছর মেয়াদের একটি নতুন চুক্তি হয়। বাতি-ব্যবস্থার

---

১. সেই সময়ে কোনো কোনো নেটিভ স্টেটের এক টাকার মুদ্রার এক পিঠে নবাবের মোহর থাকত এবং অপর দিকে থাকত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছাপ। তাই সেই টাকাকে বলা হত সিক্কা রুপিজ বা সিক্কা টাকা।

এই নতুন চুক্তির ফলে বাতি পিছু মাসিক সাড়ে তিন টাকা হিসাবে দর ধার্য করা হয়। ছ'মাসের আগাম নোটিস দিয়ে কর্পোরেশনের কমিশনাররা যে-কোনো সময়ে এই চুক্তি বাতিল করতে পারেন, এই ধরনের একটি শর্ত নতুন চুক্তিতে সংযোজিত হয়।

এরপর থেকে কলকাতার পথঘাটে তেলের বাতির সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯০০-০১ পর্যন্ত তেলের বাতির সংখ্যা বেড়ে সর্বোচ্চ ২২৯৫টিতে দাঁড়ায়। কিন্তু ইতিমধ্যে তেলের বাতির বদলে গ্যাস-বাতি প্রচলনের কাজ শুরু হয়ে যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই চৌরঙ্গী অঞ্চলে প্রথম গ্যাস-বাতি জ্বালানো হয়।

১৮২৩-এর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতায় যে গ্যাস-বাতির সূচনা ঘটেছিল সে-কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেই বাতি-ব্যবস্থা জনপথের জন্য ছিল না। এছাড়া তাতে ব্যবহার করা হয়েছিল অ্যাসিটিলিন গ্যাস। ১৮৫৭-তে জনপথের জন্য গ্যাস-বাতির আয়োজন করা হয় এবং তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল কোল গ্যাস। কয়লার পাতনের ফলে পাওয়া এই গ্যাসের বিভিন্ন উপাদানের আয়তনগত শতকরা হিসাব গড়ে এই রকম :

হাইড্রোজেন—৫০%, মিথেন—৩০%, কার্বন মনোক্সাইড—৮%, অন্যান্য হাইড্রোকার্বন—৪%, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অকসাইড ও অক্সিজেন—৮%।

কলকাতা শহরকে যে গ্যাসের সাহায্যে আলোকিত করতে হবে, এমন সিদ্ধান্ত কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছিলেন ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৪১-এর ৬ মার্চ 'ওরিয়েন্টাল অবজার্ভার' পত্রিকায় এ-বিষয়ে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন দু' দিন পরে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। এই প্রতিবেদন থেকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সরাসরি প্রমাণ মেলে :

'We observe that the Conservancy of Calcutta, driven to take some steps for illuminating the town, have advertised for tender to light it with gas! ...We earnestly hope that the committee may be overwhelmed with tenders and that the parties submitting them may be able to carry out the scheme effectively, for nothing can be more deplorably dismal than Calcutta by night excepting on the occasions when the poet's 'Cynthia' condescends to smile upon us.'

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের একটি চুক্তি হয়। চুক্তির বিষয় : কলকাতা শহরকে গ্যাসের আলোয় আলোকিত করা। বঙ্গীয় সরকারের কাছ থেকে এই চুক্তি অনুমোদন পায় ১৮৫৭-এর জুনে। চুক্তি অনুযায়ী ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি ১২·২২ ক্যাণ্ডেলা[১] দীপনশক্তি বিশিষ্ট ৬০০টি গ্যাস-বাতি জনপথে লাগানোর দায়িত্ব পায়। নিয়মিত বাতি পরিষ্কার করা বা জ্বালানোর দায়িত্বও থাকে গ্যাস কোম্পানির কর্মীদের উপরে। ঠিক হয়, প্রত্যেকদিন রাতে প্রতিটি বাতি গড়ে ১০ ঘণ্টা করে জ্বলবে এবং তার জন্য বাতিপিছু বার্ষিক খরচ হবে ৯০ টাকা। এছাড়া ২০,০০,০০০ ঘন ফুটের (৫৬,৬৩৩·৬ ঘন মিটার) অতিরিক্ত প্রতি ১০০০ ঘন ফুট (২৮·৩২ ঘন মিটার) গ্যাস ব্যবহারের জন্য আট আনা করে বাটা পাওয়া যাবে। গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ যদি ২৫,০০,০০০ ঘন ফুট (৭০,৭৯২ ঘন মিটার) ছাপিয়ে যায়

১· কোনো বিন্দু আলোক-প্রভব কোনো নির্দিষ্ট দিকে এক ঘনকোণে প্রতি সেকেণ্ডে যে-পরিমাণ আলো দেয় তাকে বলা হয় ওই আলোক-প্রভবের দীপন শক্তি। এই শক্তিকে 'ক্যাণ্ডেলা' এককের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়।

তাহলে আরো আট আনা করে বাড়তি বাটা পাওয়া যাবে। গ্যাস-বাতির জন্য প্রয়োজনীয় স্তম্ভ ও ব্র্যাকেট সরাসরি বিলেত থেকে আমদানি করা হয়। গ্যাস কোম্পানি তার কাজ শেষ করে ১৮৫৭-এর ৬ জুলাই, এবং সেই দিনই সন্ধ্যায় চৌরঙ্গি অঞ্চলে প্রথম গ্যাস-বাতি জালানো হয়।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের শেষে কমিশনাররা বার্ষিক ৯০ টাকা হারে ৬০০টি গ্যাস-বাতি ও বার্ষিক ৪২ টাকা হারে ১০০০টি তেলের বাতি অনুমোদন করেন। প্রস্তাবিত বাজেটে এই অতিরিক্ত বাতি-ব্যবস্থা বাবদ খরচ ৯৬,০০০ টাকা হলেও দেখা যায় যে বাতি-ব্যবস্থা থেকে আয়ের প্রায় ৭৫,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকছে। সুতরাং কলকাতার পথে গ্যাস-বাতির প্রসারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শহরের চওড়া রাস্তাগুলি ঠিকমতো আলোকিত করার জন্য রাস্তার মাঝ-বরাবর গ্যাস-বাতির স্তম্ভ বসানো হয়।

১৮৬০-এ আরো ১০০০টি গ্যাস-বাতি ও ৮০০টি তেলের বাতি অনুমোদিত হয়। এর জন্য বার্ষিক খরচের পরিমাণ ধার্য হয় ১,২৩,৬০০ টাকা। বছরের শেষে কর্পোরেশনেব দায়িত্বে ৭৬৬টি গ্যাস-বাতি বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়। এছাড়া কলকাতার পুলিস কমিশনারের তহবিল থেকে ময়দান, স্ট্র্যাণ্ড রোড ও ইডেন গার্ডেনে মোট ৬০টি গ্যাস-বাতি লাগানো হয়।

ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানি করা বাতি, ব্র্যাকেট ও বাতি-স্তম্ভ সমেত এক-একটি গ্যাস-বাতির খরচ ছিল ৩৫ টাকা। এগুলি জায়গা মত লাগানোর দায়িত্ব ছিল ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির। এর জন্য তারা বাতি পিছু আট টাকা চার আনা পেত। কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির সময় ঠিক করা হয়েছিল এক-একটি গ্যাস-বাতির জন্য ঘণ্টায় ৫ ঘন ফুট (০·১৪ ঘন মিটার) গ্যাসের জোগান লাগবে। ১৮৬০-এ গ্যাস কোম্পানি বাড়তি গ্যাস খরচ করা হয়েছে এই দাবিতে কর্পোরেশনের কাছ থেকে অতিরিক্ত ৭৭৩৩ টাকা চায়। কিন্তু দুটি কারণে এই দাবি নাকচ হয়ে যায়। প্রথমত, কোম্পানির লোকেরা নিজেদের সুবিধে মত সঠিক সময়ের আগেই কোনো কোনো রাস্তায় বাতি জ্বেলে দেয়। দ্বিতীয়ত, গ্যাসের খরচ মাপার জন্য কোনো মিটারের ব্যবস্থা ছিল না।

১৮৬০-এর শেষে তেলেব বাতির সংখ্যা ছিল ৮০৫টি। এই সময়ে নতুন একটি চতুর্বার্ষিকী চুক্তি সম্পন্ন হয়। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে তেলের বাতির বার্ষিক দর কমিয়ে বাতিপিছু ৩৯ টাকা করা হয়। চুক্তির মেয়াদের শেষ বছরে, ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে, এক প্রলয়ংকর ঘূর্ণিঝড় কলকাতার গ্যাস-বাতিগুলির মারাত্মক ক্ষতি করে। তখন কলকাতা শহরে তেলের বাতি ও গ্যাস-বাতির সংখ্যা যথাক্রমে ৬৭৭ ও ১০৮৪।

গ্যাস-বাতির সাহায্যে জনপথ আলোকিত করার ব্যাপারে প্রথম দিকে কলকাতার সাহেব-পাড়াগুলি প্রাধান্য পেলেও পরে এই বাতির ব্যবহার কলকাতার উত্তরাঞ্চলের বহু জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৬১-৬২-তে কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে প্রথম গ্যাস-বাতি লাগানো হয়। উজ্জ্বল এই বাতির আলোর তারিফ করতে বহু লোক সেখানে ভিড় করে। অবাক বিস্ময়ে তারা দেখতে থাকে আলাদীনের 'আশ্চর্য প্রদীপ'টিকে। অথচ বিজ্‌লি বাতির প্রচলনের পর এই 'আশ্চর্য প্রদীপ'-এর দর ভীষণভাবে কমে যায়। তখন বরানগর কি শিবপুর অঞ্চলের বাসিন্দারাও 'টিমটিমে' গ্যাস-বাতি গ্রহণ করতে নারাজ।

১৮৬০-এর দশকে গ্যাস-বাতির রমরমা থাকলেও তেলের বাতি পুরোপুরি পরাজিত হয়নি। পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় এই দুই ধরনের বাতির ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় :

•'এদিকে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং, টুং টাং ঢং, করে রাত চারটে বেজে গ্যালো—বারফট্‌কা বাবুরা ঘরমুখো হয়েচে। উড়ে বামুনরা ময়রার দোকানে ময়দা পিষতে আরম্ভ করেচে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নাই।'[১]

'সন্ধ্যা হয় হয় হয়েচে—গয়লারা দুধের হাঁড়া কাঁধে করে দোকানে যাচ্চে। মেচুনীরা আপনাদের পাটা, বঁটি ও চুবড়ি ধুয়ে প্রদীপ সাজাচ্চে। গ্যাসের আলো জ্বালা মুটেরা মৈ কাঁধে করে দৌড়ুচ্চে—'।[২]

প্রথম উদ্ধৃতিটি পরোক্ষভাবে যে তেলের বাতির কথাই জানাচ্ছে সেটা বোঝা যায় রাস্তার আলোর 'তেজ' কমে আসার উল্লেখ থেকে। যতই রাত ভোরের দিকে এগোবে ততই কমে যাবে তেলের সঞ্চয়। শেষের দিকে তাই তেলের বাতির তেজ কমে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

গ্যাসের বাতি থেকে ঠিকমতো আলো পাওয়া যাচ্ছে কিনা সে-সম্পর্কে ১৮৬৯-এর আগে কোনোরকম দীপ্তিমিতীয় পরীক্ষা করা হয়নি। কোম্পানির জোগান দেওয়া গ্যাসের গুণমান ও পরিমাণ নিয়ে জনগণের লাগাতার অভিযোগ ছিল। ফলে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এ-বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করা হয়। তাদের সুপারিশেই ইংল্যাণ্ড থেকে দীপ্তিমিতীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয় এবং তার সাহায্যে নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় ১৮৭১-এর পয়লা এপ্রিল থেকে।

ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানির সঙ্গে ১৮৫৭-তে যে-চুক্তি হয়েছিল তার মেয়াদ শেষ হয় ১৮৭৮-এ। তখন নতুন করে আবার চুক্তি করা হয়। নতুন চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শর্ত নীচে দেওয়া হল :

১· সে-সময়ে যে-৩৭৯১টি বাতি ছিল তাদের জন্য মাসিক দর ঠিক হয় চার টাকা তেরো আনা চার পাই। এর অতিরিক্ত প্রতিটি বাতির জন্য মাসিক দর চার টাকা ধার্য করা হয়।
২· প্রতিটি বাতির দীপনশক্তি ১৪·২৬ ক্যাণ্ডেলা হওয়া চাই এবং বাতিপিছু বার্ষিক অতিরিক্ত চার আনা দিলে দীপনশক্তি বাড়িয়ে ১৫·২৮ ক্যাণ্ডেলা করা হবে।
৩· গ্যাসের জোগান কম হলে গ্যাস কোম্পানির বিল থেকে প্রতি ১০০০ ঘন ফুটে (২৮·৩২ ঘন মিটার) তিন টাকা হারে কেটে নেওয়া হবে।
৪· শহরাঞ্চলে কর্পোরেশনকে কমপক্ষে ৩৭৯১টি বাতি চালু রাখতে হবে।

১৮৭০-এর দশকের শুরু থেকে প্রায় উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাতি-ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল ; যেমন, রাস্তার দু'পাশে বাতি-স্তম্ভগুলোকে মুখোমুখি না লাগিয়ে কিছুটা সরিয়ে বসানো। এর ফলে রাস্তার এক দিকের পর পর দুটি বাতি-স্তম্ভের মধ্যে যে-দূরত্ব, ঠিক তার মধ্যবিন্দুর বিপরীতে রাস্তার অপর পাশের বাতি-স্তম্ভটি অবস্থিত হয়। এ-ধরনের ব্যবস্থাকে বলা হয় স্ট্যাগার্ড অ্যারেঞ্জমেণ্ট বা আঁকাবাঁকা স্তম্ভ-সজ্জা। আধুনিক বাতি-ব্যবস্থাতেও বহু রাস্তায় এই ভাবে বাতি-স্তম্ভ বসানো হয়ে থাকে। এছাড়া রাস্তার বাঁকের মুখে অপেক্ষাকৃত জোরালো বাতি লাগানো হয়েছিল। আর রাস্তার যাবতীয়

১· কলিকাতার চড়কপার্ব্বণ। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, প্রথম ভাগ। বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ, ১৮৬২।

২· কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, প্রথম ভাগ। বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ, ১৮৬২।

বাতি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল উন্নত

স্ট্যাগার্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট বা আঁকাবাঁকা স্তম্ভ-সজ্জা
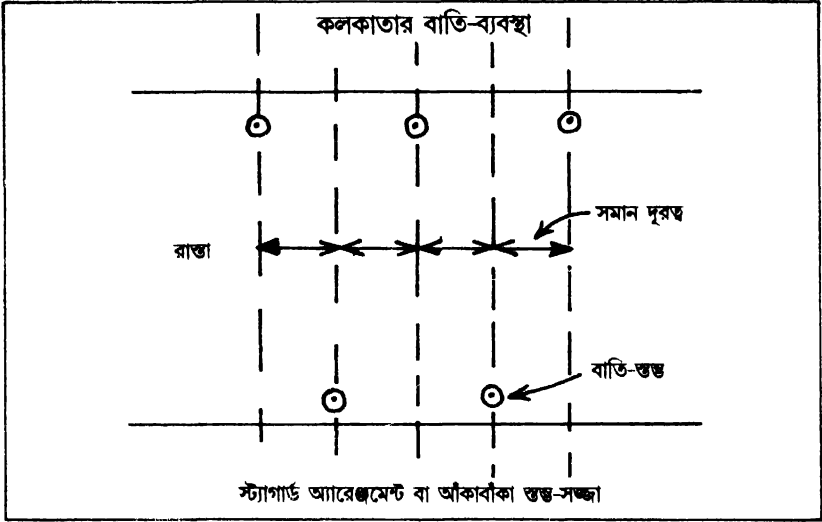
১৯০১-এর পয়লা মে গ্যাস কোম্পানির সঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের চুক্তির নবীকরণ হয় দশ বছর মেয়াদের জন্য। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পুরোনো বাতির বদলে তাপদীপ্ত বার্নার লাগানোর কাজ শুরু হয়। এর ফলে বাতিগুলির কর্মদক্ষতা অনেকগুণ বেড়ে যায়।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থার জন্য টেণ্ডার ডাকা হয়। টেণ্ডারে বলা ছিল, গ্যাস, বিদ্যুৎ বা অন্য কোনো পদ্ধতির সাহায্যে কলকাতা শহরকে আলোকিত করতে হবে। বৈদ্যুতিক বাতি-ব্যবস্থার দু'-দুটি টেণ্ডার জমা পড়লেও শেষ পর্যন্ত ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির কোল গ্যাসই জয়ী হয়। আজ এ-ঘটনা আমাদের অবাক করলেও সেকালে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল বাস্তবে।

১৯০৯-এ আরও একটি নতুন চুক্তি হয় গ্যাস কোম্পানির সঙ্গে। তাতে বলা হয় যে এখন থেকে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি শুধুমাত্র জ্বালানি গ্যাসেরই জোগান দেবে। পথঘাটের বাতি জ্বালানো-নেভানো বা রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব কলকাতা কর্পোরেশন নিজেই গ্রহণ করবে। প্রথম পাঁচ বছরে জোগান-দেওয়া গ্যাসের চাপ থাকবে ২ ইঞ্চি (প্রায় ৫ সেন্টিমিটার) পারদস্তম্ভের সমান। পরে ক্রমে ক্রমে তা বাড়িয়ে ৪ ইঞ্চি (প্রায় ১০ সেন্টিমিটার) করা হবে। এই সময়ে পথঘাটের বাতিগুলি নবীকরণের জন্য প্রায় ৮০০০ ম্যাক্সফিল্ড ইনভার্টেড বার্নার ও ২০০০ কার্ন বার্নার যাবতীয় সরঞ্জাম সমেত আমদানি করা হয়। হিসাব কষে দেখা গিয়েছিল, গ্যাসের চাপ ২ ইঞ্চি থাকলে দীপনশক্তি ২৪·৪৫ থেকে ৬১·১২ ক্যাণ্ডেলার মধ্যে থাকতে পারে। রাস্তার বাতির জন্য দীপনশক্তির গড় মান এই দুই সীমার মধ্যে থাকাটাই কর্পোরেশন সমীচীন বলে মনে করেছিল। বাস্তবে যদিও রাস্তার গুরুত্ব ও প্রস্থের উপর নির্ভর করে গড় মান ৪০·৭৫ থেকে ৮১·৫ ক্যাণ্ডেলার মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, গ্যাসের দাম মিটারের সাহায্যে নির্ণয় করা হবে না, বরং দাম নির্ভর করবে বার্নারের নিপল্-এর মাপের উপরে।

চুক্তিপত্রে আরো বলা ছিল যে জ্বালানি গ্যাসে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন থাকবে না

এবং গ্যাসের তাপন মূল্য হবে৪৫০ ব্রিটিশ থার্মাল একক (প্রায় ৪৭৫ কিলোজুল)। এই সব মান ও গুণ যাচাইয়ের জন্য গ্যাস কোম্পানি ও কলকাতা কর্পোরেশনের পরীক্ষাগারে যৌথভাবে পরীক্ষা চালানো হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাতি-ব্যবস্থার গ্যাসের মানের এতই অবনতি হয়েছিল যে নিপল্-এর ছিদ্রের মুখে আলকাতরা জমে যাচ্ছিল। এর ফলে কয়েক ঘণ্টা জ্বলার পরেই বাতি নিভে যেত।

এত সত্ত্বেও গ্যাস-বাতির রমরমা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছিল ১৯৫১ সালে। তখন কলকাতা শহরে গ্যাস-বাতির সংখ্যা ছিল ১৯,০০০, আর সে-বছরে শহরে মোট বিজলি-বাতির সংখ্যা ছিল ১০,৬৭০টি। এরপর থেকে গ্যাস-বাতির সংখ্যা নিয়মিত ভাবে কমে গিয়ে ১৯৬০-৬১-তে দাঁড়ায় ৩৮০০টি। এই বাতিকে কলকাতা শহর চিরবিদায় জানায় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। তার পরই শুরু হয় শুধুই বিজ্‌লি-বাতির যুগ।

কলকাতা শহরে যে-সব গ্যাসের বাতি ব্যবহার করা হত তা ছিল দু-ধরনের : অর্ডিনারি ল্যান্টার্ন টাইপ এবং পাওয়ার-ইনভেস্টেড টাইপ। এই সব বাতিতে ছোট, বড় ও মাঝারি, তিন রকম মাপের ম্যান্ট্‌ল্ ব্যবহার করা হত। সাধারণ লণ্ঠনের মত যে-বাতিগুলো, তার স্তম্ভের উচ্চতা ছিল ১১ ফুট (৩·৩৫ মিটার), আর রাস্তার দু-দিকেই স্তম্ভগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে ১৫০ ফুট (৪৫·৭২ মিটার) দূরত্বে বসানো হত। স্তম্ভগুলো বসানো হত স্ট্যাগার্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট অনুযায়ী। পাওয়ার-ইনভেস্টেড টাইপ বা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস-বাতি হত তিন রকমের : দশ-বাতির ঝাড়, ছ'-বাতির ঝাড় এবং পাঁচ-বাতির ঝাড়। 'ইউকে' এবং 'ব্ল্যানলাইট' ব্র্যাণ্ডের এই বাতিগুলি সাধারণত বসানো হত এমন সব রাস্তায় যেখানে যানবাহনের যাতায়াত অত্যন্ত বেশি। তখন দশ-বাতির ঝাড় ছিল মাত্র দুটো। তার একটি বসানো হয়েছিল রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে, আর অপরটি ছিল ডিস্ট্রিক্ট[১] ফোর-এ। এছাড়া ডিস্ট্রিক্ট ফোর-এ আরো বাহান্নটি ছ'-বাতির ঝাড় ছিল। ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান এবং ডিস্ট্রিক্ট থ্রি-তে ছ'-বাতির ঝাড় ছিল যথাক্রমে আটটি এবং দু'টি।

গ্যাস ও বিদ্যুতের দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল বিদ্যুৎ। এর কারণ গ্যাসের তুলনায় বিদ্যুতের খরচ কম এবং বিজ্‌লি-বাতি থেকে তুলনামূলকভাবে আলোও পাওয়া যায় বেশি। এছাড়া বৈদ্যুতিক বাতির জ্বালানো-নেভানো কিংবা তার রক্ষণাবেক্ষণের কাজটাও অনেক সহজ। এই সব গুণগত দিক খতিয়ে দেখে স্বাধীনতার কিছু পরেই কলকাতা কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত নেয় যে তাদের যাবতীয় তেল ও গ্যাসের বাতিকে বদল করে বিজ্‌লি-বাতি লাগানো হবে। যদিও তার প্রায় পাঁচ দশক আগেই পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় বিজ্‌লি-বাতি ব্যবহারের সূচনা ঘটে গেছে।

১৮৬৪ থেকে ১৯১৪-১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় গ্যাস-বাতি ও তেলের বাতি কী সংখ্যায় ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তার পিছনে বার্ষিক খরচের পরিমাণটাই বা কী রকম ছিল তার খতিয়ান পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল :

---

১. ১৯৮৪-৮৫-র আগে পর্যন্ত কলকাতার কর্পোরেশন এলাকা চারটি ডিস্ট্রিক্টে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে দশটি বোরো এবং কিছু বাড়তি জায়গা নিয়েই মোট কর্পোরেশন এলাকা।

খ্রিস্টাব্দ		তেলের বাতি		গ্যাস-বাতি	বার্ষিক মোট খরচ (টাকা) (প্রাতিষ্ঠানিক খরচ, জ্বালানীর খরচ, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য খরচ)
১৮৬৪		৬৭৭		১০৮৪	১,১৫,০৬৬
১৮৭০		৬২১		২৭১১	২,১২,২০২
১৮৮০		১৫১		৩৮৫৯	২,৪৪,৭৬০
১৮৮৯-৯০	শহর	৩৬৮	শহর	৪৫২৪	৩,০০,৭৪৭
	অতিরিক্ত এলাকা	৬৮৭	অতিরিক্ত এলাকা	৪৯৪	
১৮৯০-৯১		১১৫৮		৫৩৯৭	৩,২৩,০১৫
১৯০০-০১		২২৯৫		৬৮১১	৪,৬১,৮০৪
১৯০৫-০৬		২৩৭৯		৮৯৯৭	৫,৮৩,২৪৬
১৯১০-১১		২১৯২		১০,১৮৫	৬,৬৫,৮২৯
১৯১৪-১৫[১]		১৭৫৯		১১,৯০০	৭,৯৭,০৩৯

আধুনিক যুগ : বৈদ্যুতিক বাতি

কলকাতা শহরের প্রথম যে-রাস্তায় বিজ্‌লি-বাতি বসানোর পরিকল্পনা হয় তার নাম হ্যারিসন রোড (বর্তমান নাম মহাত্মা গান্ধী রোড)। হ্যারিসন রোড তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে। তখন কর্পোরেশনের হর্তাকর্তারা বার্ষিক ৯৭৫০ টাকা দরে কিলবার্ন এন্‌ড্‌ কোম্পানির সঙ্গে বিজলি-বাতি-ব্যবস্থার চুক্তি করেন। ঠিক হয় যে বাতিগুলোর দীপনশক্তি হবে ১২২২·৪১ ক্যাণ্ডেলা এবং প্রথম তিন মাস কিলবার্ন এন্‌ড্‌ কোম্পানিই বাতিগুলির তত্ত্বাবধানের কাজ করবে। এর জন্য হ্যালিডে স্ট্রিট পাম্পিং স্টেশনে (বর্তমান মহম্মদ আলি পার্ক) ৯২০০০ টাকা খরচ করে জেনারেটার বসানো হয়। ১৮৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে হ্যারিসন রোডের ওভারহেড বিদ্যুৎবাহী তারগুলিকে মাটির নীচ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে একবার ভাবা হয়েছিল যে সদ্য গঠিত ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন হয়ত অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে এই বাতি-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারবে। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় যে বাতি-ব্যবস্থার জন্য আলাদা বিদ্যুৎ-কেন্দ্রই আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে সুবিধেজনক। ফলে কিলবার্ন এন্‌ড্‌ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির নবীকরণ করে মেয়াদ বাড়ানো হয়।

১৯০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে হ্যারিসন রোডের বাতি-ব্যবস্থার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরদাতাদের মধ্যে ছিল ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি এবং ইলেকট্রিক সাপ্লাই

১· এই বছরে চৌরঙ্গি রোডে ৯১৬৮ ক্যাণ্ডেলা দীপনশক্তি সম্পন্ন ৭৩টি বিজ্‌লি-বাতি পরীক্ষামূলকভাবে লাগানো হয় এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস-বাতির সঙ্গে এই বাতির গুণমানের তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়।

এসোসিয়েশন । শেষ পর্যন্ত গ্যাস কোম্পানির প্রস্তাবই গৃহীত হয় । তারা বার্ষিক ৮২২০ টাকা দরে সত্তরটি 'লুকাস' গ্যাস-বাতির সাহায্যে হ্যারিসন রোড আলোকিত করার দায়িত্ব পায় । ১৯০৫-০৬ খ্রিস্টাব্দে হ্যালিডে স্ট্রিটের বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বিক্রি করে দেওয়া হয় ।

কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির বাতি-ব্যবস্থা উন্নত করা যায় কি না সেই বিষয়টি ১৯০৯-১১ খ্রিস্টাব্দে খতিয়ে দেখা হয় । ১৯১৪-১৫-তে গ্যাস-বাতি ও বিজ্‌লি-বাতির তুলনামূলক একটি ব্যবহারিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয় । ৫০৯·৩৪ ও ১০১৮·৭ ক্যাণ্ডেলা দীপনশক্তির 'কীথ্' বাতিযুক্ত গ্যাসের আলো লাগানো হয় কর্পোরেশন স্ট্রিট (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড) ও চৌরঙ্গি রোডে । ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন নিজের খরচে কর্পোরেশন স্ট্রিটে উচ্চ ক্ষমতার বিজ্‌লি-বাতি লাগিয়ে এই দু' ধরনের বাতির আর্থিক ও কর্মদক্ষতার দিক তুলনা করে দেখে । গ্যাসের তুলনায় বিদ্যুতের ব্যবহার যে সব দিক থেকেই সুবিধাজনক সেটা তারা হাতেকলমে দেখিয়ে দেয় । এই সময়ে মানিকতলা ও উল্টাডাঙ্গা অঞ্চলের নতুন কয়েকটি রাস্তায় ১০০ ওয়াটের ৩৪টি বৈদ্যুতিক বাতি লাগানো হয়েছিল । এছাড়া সেই সময়ে সদ্যগঠিত সংস্থা সি আই টি তাদের অধীনস্থ বেশিরভাগ উদ্যান ও রাস্তায় গ্যাস-বাতির বদলে বিজ্‌লি-বাতি ব্যবহার করাটাই সমীচীন মনে করেছিল ।

কলকাতার একটি মাত্র এলাকায় তেলের বাতি থেকে গ্যাস-বাতিতে না গিয়ে সরাসরি বিজ্‌লি-বাতির ব্যবহার শুরু হয়েছিল । এলাকাটি হল গার্ডেনরিচ (সার্কুলার গার্ডেনরিচ রোড, গার্ডেনরিচ রোড ও পাহাড়পুর রোড) । ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে এই এলাকায় ৭০টি কেরোসিন-বাতি ছিল । সে-বছরেই তাদের বিদায় জানিয়ে সেখানে ১৬২টি বিজ্‌লি-বাতি লাগানো হয় ।

১৯২৭-এর পর থেকে কলকাতায় মোটরযানের সংখ্যা বাড়তে থাকে । ফলে গাড়ির চালক ও পথচারী উভয়েরই নিরাপত্তার খাতিরে উন্নত বাতি-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় । ১৯৩০-এর পর থেকে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড বাতি-ব্যবস্থায় অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে । সে-সময়ে বাতি-ব্যবস্থায় ২২৫ ভোল্ট ডি সি এবং ২৩০ ভোল্ট এ সি সাপ্লাই ব্যবহার করা হত । ১৯৩৪-এ বৈদ্যুতিক শক্তির দর ছিল কিলোওয়াট-ঘণ্টা পিছু এক আনা সাড়ে চার পাই ।

বৈদ্যুতিক বাতি উৎপাদনের উন্নতির সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে কলকাতার পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থা ক্রমেই উন্নত হয়েছে । ১৯৫০ পর্যন্ত কলকাতার রাস্তায় চার ধরনের বাতির ব্যবস্থা ছিল :

১· সরু পথের জন্য প্রতিটি বাতি-স্তম্ভে একটি মাত্র ৭৫ ওয়াটের বাতি ।
২· সামান্য হারে মোটরযান চলাচল আছে এমন পথের জন্য প্রতিটি বাতি - স্তম্ভে একটি মাত্র ১০০ ওয়াটের বাতি ।
৩· মোটামুটি যানবাহন চলাচল আছে এমন রাস্তার জন্য প্রতিটি বাতি-স্তম্ভে তিনটি করে ৭৫ ওয়াটের বাতি ।
৪· মোটরযান অধ্যুষিত প্রধান রাস্তাগুলোর জন্য প্রতিটি বাতি-স্তম্ভে তিনটি করে ১০০ ওয়াটের বাতি ।

তিনটি করে ১০০ ওয়াটের বাতি যেসব বাতি স্তম্ভে লাগানো হত তাদের গড় উচ্চতা ছিল ২৫ থেকে ৩০ ফুট (৭·৬২ থেকে ৯·১৪ মিটার) । আর একই সারিতে বসানো পর পর

দুটি বাতি-স্তম্ভের মধ্যে গড় দূরত্ব ছিল ১৫০ ফুট (৪৫·৭২ মিটার)।

এই সময় পর্যন্ত যেসব বাতি ব্যবহার করা হত তার সবই ছিল ফিলামেণ্টযুক্ত তাপদীপ্ত বাতি। এই বাতিগুলি হোল্ডারে লাগানো হত প্যাঁচ দিয়ে। কারণ এই বাতির ক্যাপগুলি প্যাঁচযুক্ত—যাকে পরিভাষায় বলা হয় স্ক্রু ক্যাপ। এখনও যেসব তাপদীপ্ত বাতি পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হয় তা একই ধরনের।

এর পরে একে একে প্রচলিত হয়েছে ফ্লুওরেসেন্ট বাতি বা টিউব লাইট, উচ্চচাপের মার্কারি বাতি ও সর্বাধুনিক উচ্চচাপের সোডিয়াম বাতি।

একথা ঠিকই যে পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত সঠিক পরিকল্পনার অভাব ছিল। ফলে কোনো কোনো রাস্তায় অপ্রয়োজনীয় ভাবে বাড়তি আলোর ব্যবস্থা ছিল। আবার দেখা গেছে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় আলোর পরিমাণ কম। পথচারী ও যানবাহনের গড় সংখ্যা বিচার করে কোনো রাস্তার বাতির সঠিক প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের কোনো মানদণ্ড ছিল না। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় মানক সংস্থা (ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড্‌স্‌ ইন্‌সটিটিউশন) পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। ফলে পঞ্চাশের দশকে বাতি-ব্যবস্থার অনেকটাই নির্ভর করত কোনো প্রযুক্তিবিদের নিজস্ব বিচার-বিবেচনার উপরে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক বাতি ও তাদের ফিটিংস ইত্যাদি তখনও ততটা উন্নত হয়নি। ফলে বাতির আলোক-জ্যোতি পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব হত না। এমন দেখা গেছে, রাস্তার বাতির অর্ধেকেরও বেশি আলো আশপাশের বাড়িতে এবং আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া বাতির গ্লেয়ার বা চোখ-ধাঁধানো দীপ্তি পথচারী ও মোটর চালকদের যথেষ্ট অসুবিধেয় ফেলত।

যাই হোক, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাতি ও তার ফিটিংস-এর ডিজাইনে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আর তার পাশাপাশি সুদৃঢ় হয়েছে দীপন-প্রযুক্তির শাখা। ফলে কলকাতার আধুনিকতম বাতি-ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্যান্য বড় শহরের সমকক্ষ না হলেও তাদের তুলনায় মারাত্মকভাবে পিছিয়ে নেই। এই উন্নতির কারণেই ভারতীয় মানক সংস্থা ১৯৬১-তে প্রকাশিত বাতি-ব্যবস্থা সংক্রান্ত পুস্তিকাটির সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করতে বাধ্য হয় ১৯৭১-এ।

রবীন্দ্রনাথের লেখায় আমরা জেনেছি, রেড়ির তেলের প্রদীপের দুটো সলতের মধ্যে একটা তিনি নিভিয়ে দিতেন শিখার তেজের বিনিময়ে আয়ুবৃদ্ধির জন্য। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে অনেকটা ঠিক এই পদ্ধতিই কলকাতা কর্পোরেশন গ্রহণ করেছিল বিদ্যুৎ-শক্তির অপচয় রোধ করতে। একে বলা হয় 'হাফ নাইট অ্যারেঞ্জমেণ্ট'। এই ব্যবস্থায় কলকাতার বেশ কিছু রাস্তায় তিনটি তাপদীপ্ত বাতিওয়ালা বাতি-স্তম্ভের দুটি করে বাতি রাত বারোটার পর নিভিয়ে দেওয়া হত। বড় বা মাঝারি রাস্তাগুলোয় যানবাহন চলাচল রাত বারোটার পর শতকরা আশি ভাগেরও বেশি কমে যায়। আর পথচারী প্রায় থাকেই না। সুতরাং তখন অপেক্ষাকৃত কম আলোয় মোটরযান চলাচলের কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এই কারণেই 'অর্ধরাত্রি ব্যবস্থা' গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে ঢিলেঢালা পরিচালন ব্যবস্থা ও উপযুক্ত দায়িত্বশীল কর্মীর অভাবে এই ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে।

একটা সময়ে কলকাতা শহরের পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থা পুরোপুরি কলকাতা কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আরো তিনটি সংস্থা বাতি-ব্যবস্থার কিছু কিছু অংশের দায়িত্ব নেয়। এই সংস্থাগুলো হল সি আই টি, পি ডব্লিউ ডি এবং সি এম ডি এ। কলকাতা শহরে এখন রাস্তার আলোর সংখ্যা প্রায় ১,০৪,০০০। এই হিসাবের মধ্যে

তাপদীপ্ত বাতি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে টিউব লাইট, উচ্চচাপের মার্কারি বাতি ও উচ্চচাপের সোডিয়াম বাতি। শতকরা হিসাবে প্রকাশ করলে চারটি সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন বাতির অংশ কীরকম হতে পারে তা নীচের তালিকায় দেখানো হল :

তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা	নিয়ন্ত্রণাধীন বাতির সংখ্যার শতকরা হিসাব (প্রায়)[১]
কলকাতা কর্পোরেশন	৮০
সি এম ডি এ	১৩
পি ডব্লিউ ডি	৫
সি আই টি	২

কলকাতার পথঘাটের বৈদ্যুতিক বাতি-ব্যবস্থায় আধুনিক যুগ শুরু হয় মোটামুটিভাবে সত্তরের দশকের গোড়ায়। যদি প্রযুক্তিগত দিক থেকে সঠিকভাবে বাতি-ব্যবস্থার ডিজাইন করা যায় তাহলে তা আর্থিক এবং সামাজিক দিক থেকে জনগণের কাছে লাভজনক। যেমন, উপযুক্ত বাতি-ব্যবস্থা রাতের বেলায় পথ-দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়ে দেয়, অপরাধের সংখ্যা কমিয়ে পুলিসের কাজে সাহায্য করে. যানবাহন চলাচলের পক্ষে সুবিধাজনক, রাতের বেলায় ব্যবসা ও শিল্পের অগ্রগতির সুবিধা ইত্যাদি।

রাতের বেলায় যানবাহন চলাচলের নিরাপত্তা মূলত নির্ভর করে ভিজিবিলিটি বা দৃশ্যতার উপর। আবার যেসব কারণ বা বিষয় দৃশ্যতাকে সরাসরি প্রভাবিত করে সেগুলি হল :

১. রাস্তায় বা রাস্তার কাছাকাছি অবস্থিত কোনো বস্তুর ঔজ্জ্বল্য
২. রাস্তার পটভূমির গড় ঔজ্জ্বল্য
৩. কোনো বস্তুর মাপ এবং তার খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য
৪. কোনো বস্তু এবং তার পরিপার্শ্বের মধ্যে কনট্রাস্ট বা বৈসাদৃশ্য
৫. দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে ফুটপাথ ও তার পরিপার্শ্বের আলোকমিতীয় ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত
৬. বস্তুকে দেখার জন্য হাতে-পাওয়া সময়
৭. চোখ-ধাঁধানো দীপ্তি

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, রাস্তায় শুধুমাত্র জোরালো আলোর ব্যবস্থা করলেই বাতি-ব্যবস্থা উন্নত হয় না। রাস্তা ও তার আশপাশের অংশ এমনভাবে আলোকিত করতে হবে যাতে দৃশ্যতা উন্নত মানের হয়।

উন্নত বাতি-ব্যবস্থার জন্য ডিজাইনারদের বহু বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন, রাস্তার তল থেকে বাতির উচ্চতা, ফুটপাথের কিনারা থেকে বাতিটি রাস্তার উপরে কতটা

১ এই শতকরা হিসাবের মুদ্রিত কোনো তালিকা নেই। তবে চারটি সংস্থার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে এবং পথঘাটের বাতির সংখ্যার কয়েকটি পরিসংখ্যান থেকে এই হিসাব নির্ণয় করা হয়েছে।

ঝুঁকে আছে (পরিভাষায় 'ওভারহ্যাঙ'), রাস্তা কতটা চওড়া, সবচেয়ে কাছাকাছি দুটি বাতি-স্তম্ভের (স্তম্ভ দুটি রাস্তার একই ফুটপাথে বা বিপরীত ফুটপাথে অবস্থিত হতে পারে) মধ্যে লম্ব দূরত্ব, বাতি-স্তম্ভের গোড়া থেকে বাতির লম্ব দূরত্ব (পরিভাষায় 'আউটরিচ'), বাতি-স্তম্ভের গোড়া থেকে ফুটপাথের কিনারার দূরত্ব। অবশ্য এই বিষয়গুলো প্রধানত নির্ভর করে রাস্তার মাপ এবং তাতে যানবাহন চলাচলের ব্যস্ততার উপরে। এছাড়া রয়েছে বাতির ধরন ও রাস্তার পরিপার্শ্বের অবস্থা। এইভাবে সব দিক বিবেচনা করে বাতি-স্তম্ভগুলি কী ভাবে বসানো হবে সেটা ঠিক করা হয়। জনপথ আলোকিত করার জন্য ভারতীয় মানক সংস্থা তাদের নির্দেশাবলীর পুস্তিকায় মূলত যে-চাররকম স্তম্ভ-সজ্জার সুপারিশ করেছে তা ছবিতে দেখানো হল :

ভারতীয় মানক সংস্থা অনুমোদিত চার রকমের স্তম্ভ-সজ্জা
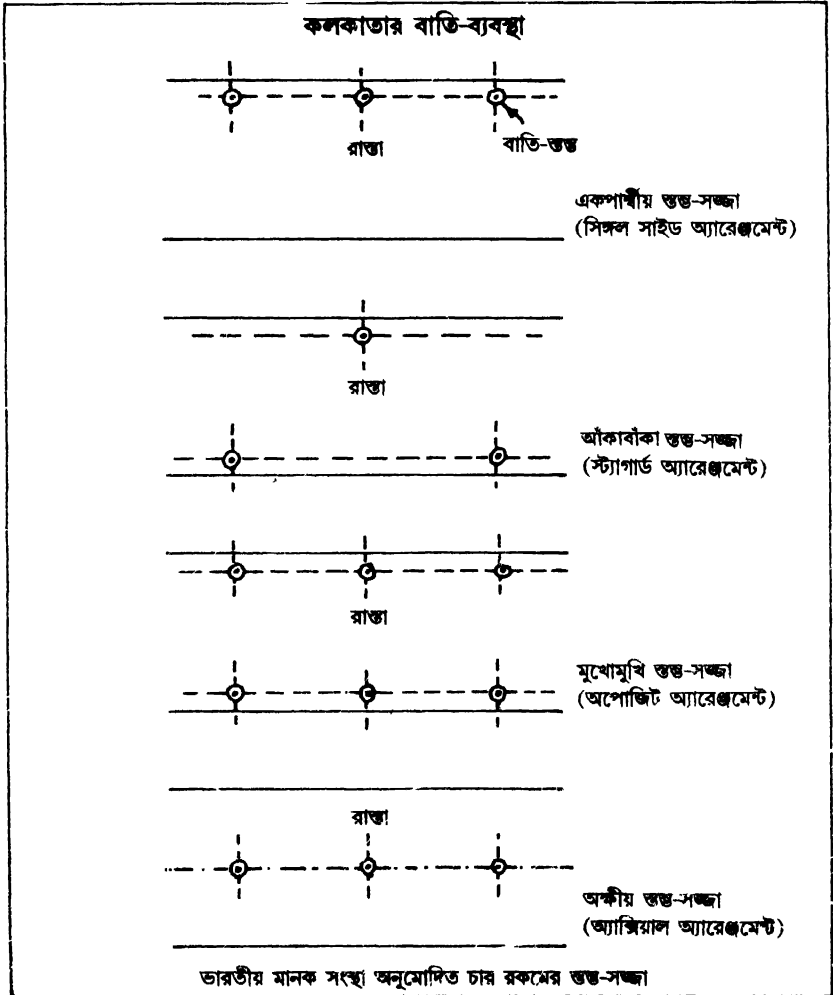
*রাস্তার প্রস্থ বাতি-স্তম্ভের বাতির উচ্চতার সমান অথবা তার কাছাকাছি হলে এক-পার্শ্বীয় স্তম্ভ-সজ্জা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু রাস্তার প্রস্থ যদি সে-তুলনায় বেশি হয় অথচ বাতির উচ্চতার দেড়গুণের চেয়ে কম হয়, তাহলে ব্যবহার করা হয় আঁকাবাঁকা স্তম্ভ-সজ্জা। রাস্তা যদি বাতির উচ্চতার দেড়গুণের চেয়ে বেশি চওড়া হয় তাহলে মুখোমুখি স্তম্ভ-সজ্জাই বাঞ্ছনীয়। আর অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তার ক্ষেত্রে, যেখানে রাস্তার প্রস্থ বাতির উচ্চতার চেয়ে কম, ব্যবহার করা যেতে পারে অক্ষীয় স্তম্ভ-সজ্জা। দু'পাশে গাছপালাওয়ালা রাস্তায় এই ধরনের স্তম্ভ-সজ্জা সুবিধাজনক। বেশি চওড়া রাস্তায় এই ধরনের স্তম্ভ-সজ্জা ব্যবহার করলে মোটর-চালকদের নজর অহেতুক রাস্তার মাঝবরাবর চলে আসে, আর রাস্তার দু' প্রান্তের দীপনমাত্রা অনেক কমে যায়। ফলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা যায় বেড়ে।

পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থার জন্য তিন শ্রেণীর বাতি ব্যবহার করা হয়। সেগুলি হল কাট-অফ লুমিনেয়ার, সেমি-কাট-অফ লুমিনেয়ার এবং নন-কাট-অফ লুমিনেয়ার। বাতি ও তার ফিটিংসকে একসঙ্গে লুমিনেয়ার বলা হয়।

কাট-অফ লুমিনেয়ার এমন ধরনের হয় যার মোট লুমেন আউটপুটের প্রায় সবটাই উল্লম্বরেখার ± ৭০ ডিগ্রির মধ্যে (নীচের ছবির ক-ক রেখা দুটির মধ্যে) থাকে। উল্লম্বরেখার ± ৮০ ডিগ্রিতে (ছবির খ-খ রেখা দুটির মধ্যে) লুমেন আউটপুট বাতির মোট লুমেন আউটপুটের শতকরা দশ ভাগের বেশি হয না। আর ± ৯০ ডিগ্রিতে (ছবির গ-গ রেখা বরাবর) এর মান হয় শতকরা আড়াই ভাগ বা তার চেয়ে কম।
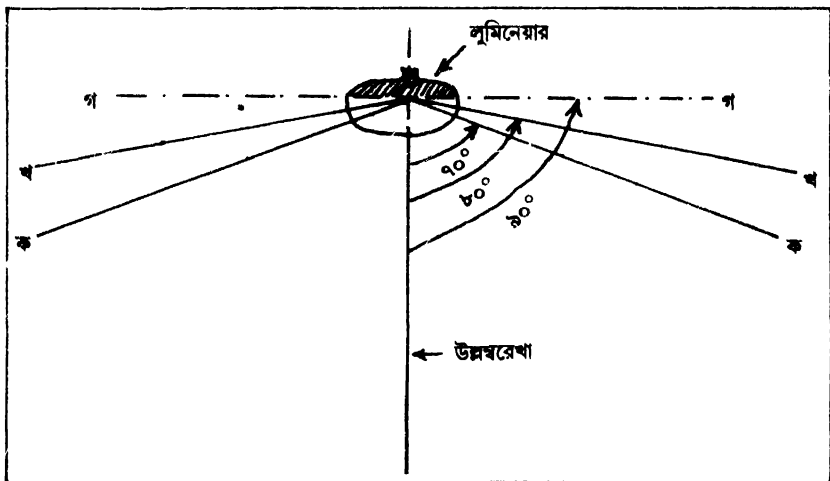
সেমি-কাট-অফ লুমিনেয়ারের ক্ষেত্রে উল্লম্ব রেখার ± ৭০ ডিগ্রির মধ্যে লুমেন আউটপুটের শতকরা পরিমাণ কাট-অফ বাতির তুলনায় কম। আর উল্লম্ব রেখার ± ৮০ ও ± ৯০ ডিগ্রি বরাবর শতকরা লুমেন আউটপুট যথাক্রমে ২০ ও ৫ ভাগ কিংবা তার চেয়েও কম।

নন-কাট-অফ লুমিনেয়ারের ক্ষেত্রে এরকম কোনো শর্ত নেই। যেমন, কোনোরকম ঘেরাটোপ ছাড়া লাগানো সাধারণ একটি তাপদীপ্ত বাতিকে নন-কাট-অফ বাতি বলা যেতে পারে।

রাস্তা যদি মসৃণ না হয়, তার দু'পাশে যদি ঘর-বাড়ি না থাকে, থাকে বড় বড় গাছ, আর ক্রসিং খুবই কম থাকে তাহলে সেখানে কাট-অফ লুমিনেয়ার ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

আর মসৃণ রাস্তার দু' পাশে যদি সুদৃশ্য ঘর-বাড়ি থাকে, রাস্তায় বহু ক্রসিং থাকে, বিভিন্ন বাধার জন্য বার বার যানের গতি মন্থর করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেমি-কাট-অফ লুমিনেয়ার ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

এই দু' শ্রেণীর বাতির তুলনায় নন-কাট-অফ লুমিনেয়ারের ব্যবহার খুবই কম।

পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় শুধু আলোর চাহিদা মিটলেই হবে না। একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হয় এই ব্যবস্থা যেন শহরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে।

পথঘাটের জন্য সুপরিকল্পিত বাতি-ব্যবস্থার সূচনা ১৯৬৬-তে। প্রায় ৭·৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ভি আই পি রোড (বর্তমান নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ) উচ্চচাপের মার্কারি বাতি দিয়ে আলোকিত করার প্রকল্প হাতে নেয় পি ডব্লিউ ডি। বিধান নগর রোড ও ভি আই পি রোডের সংযোগস্থল থেকে কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত ৪২৫টি বাতি-স্তম্ভ বসানো হয় এবং সেই বাতি-স্তম্ভে লাগানো হয় ২৫০ ওয়াট বৈদ্যুতিক ক্ষমতাসম্পন্ন কাট-অফ ধরনের উচ্চ-চাপের মার্কারি বাতি। এই বাতি-ব্যবস্থার সাফল্য কলকাতার অন্যান্য বহু অঞ্চলেই উচ্চচাপের মার্কারি বাতির ব্যবহার বাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে অবশ্য এই রাস্তায় উচ্চচাপের সোডিয়াম বাতি লাগানো রয়েছে।

বৈদ্যুতিক বাতির জগতে উচ্চচাপের মার্কারি বাতির প্রচলন শুরু হয় ১৯৩৫ নাগাদ। এই বাতিটি হাই-ইনটেনসিটি ডিসচার্জ ল্যাম্প বা উচ্চ তীব্রতার মোক্ষণ বাতি। উচ্চচাপের সোডিয়াম বাতিও একই শ্রেণীতে পড়ে।

উচ্চচাপের মার্কারি বাতির মধ্যে গলিত সিলিকার তৈরি একটি আর্ক টিউব থাকে। তড়িৎ পরিবাহী হিসাবে এর দু' প্রান্তে মলিবডেনাম ধাতুর পাতলা ফিতে লাগানো থাকে। আর্ক টিউবের ভিতরে থাকে সামান্য পারদ এবং আর্গন গ্যাস। ভোল্টেজ দেবার পর প্রথমে আর্গন গ্যাস আয়নিত হয়ে তড়িৎ প্রবাহ শুরু হয়। এর ফলে আর্ক তৈরি হয়। আর্কের তাপে টিউবের ভিতরের পারদ বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং আয়নিত হয়ে পড়ে। আর্ক টিউবের ভিতরে চূড়ান্ত চাপ কত হবে তা নির্ভর করে পারদের পরিমাণের উপরে। সাধারণত এই চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের ২ থেকে ৪ গুণ। এ-ধরনের বাতিতে যে-তড়িৎদ্বার ব্যবহার করা হয় তা সাধারণত টাংস্টেন কয়েল ও ধাতব অক্সাইডের তৈরি।

উচ্চচাপের মার্কারি বাতির আর্ক টিউবের বাইরে দ্বিতীয় একটি বাল্ব থাকে। এই বাল্বটি আর্ক টিউবকে বায়ুপ্রবাহ এবং তাপমাত্রার তারতম্যের প্রভাব থেকে রক্ষা করে। এর ভিতরে নিষ্ক্রিয় গ্যাস (সাধারণত নাইট্রোজেন) ভর্তি করা থাকে। আর এর ভিতরের দেওয়ালে ফসফরের আস্তরণ দেওয়া থাকে। আর্ক টিউবে তড়িৎ মোক্ষণের ফলে যে-অতিবেগুনি বিকিরণ ছড়িয়ে পড়ে ফসফরের আস্তরণ তাকে দৃশ্য সাদা আলোয় রূপান্তরিত করে। বাইরের বাল্বটি সাধারণত বোরোসিলিকেট কাচের তৈরি হয়।

পি ডব্লিউ ডি-র পর ১৯৭২-এ সি এম ডি এ উচ্চচাপের মার্কারি বাতি শহরের রাস্তায় ব্যবহার করা শুরু করে। একই বছরের অগাস্ট মাসে কলকাতা কর্পোরেশন দেশবন্ধু পার্ক ও দেশপ্রিয় পার্ক এই বাতির সাহায্যে আলোকিত করে।

উচ্চচাপের মার্কারি বাতির পর সর্বাধুনিক লুমিনেয়ার হল উচ্চচাপের সোডিয়াম বাতি। এই বাতিতে সোডিয়াম বাষ্পের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। এর আর্ক টিউবটি পলিক্রিস্টালাইন অ্যালুমিনার তৈরি। প্রাথমিক তড়িৎ মোক্ষণের সুবিধার জন্য আর্ক

টিউবের ভিতরে নিষ্ক্রিয় গ্যাস জিনন রাখা হয়। এছাড়া থাকে সোডিয়াম ও পারদের অ্যামালগাম। এই বাতিরও বাইরে দ্বিতীয় একটি বাল্ব থাকে। বায়ুশূন্য এই বাল্বটি বোরোসিলিকেট কাচের তৈরি। বায়ুপ্রবাহ ও বাইরের তাপমাত্রার প্রভাব থেকে এই বাল্ব আর্ক টিউবকে রক্ষা করে।

বর্তমানে যে-সব বিজ্‌লি-বাতি পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হয় তাদের তুলনামূলক গুণাগুণ নীচের তালিকায় দেখানো হল :

বাতির ধরন	বৈদ্যুতিক ক্ষমতা (ওয়াট)	গড় লুমেন আউটপুট (লুমেন)	ওয়াট প্রতি লুমেন আউটপুট (লুমেন/ওয়াট)	ব্র্যাকেট/ ফিটিংস সমেত বাতির গড় দাম (টাকা)
তাপদীপ্ত বাতি[১]	১০০	১৩৮০	১৩.৮০	১৬
	২০০	৩০৪০	১৫.২০	২৬
	৩০০	৪৮০০	১৬.০০	৪২
টিউব লাইট	২০	৯৭০	৪৮.৫০	৫৫০[২]
	৪০	২৫৫০	৬৩.৭৫	৬০০
উচ্চচাপের মার্কারি বাতি	১২৫	৬২৫০	৫০.০০	১৩৩০
	২৫০	১৩,৫০০	৫৪.০০	৩০১৫
	৪০০	২৩,০০০	৫৭.৫০	৩৩২০
উচ্চচাপের সোডিয়াম বাতি	৭০	৬,০০০	৮৫.৭১	২২৫০
	১৫০	১৫,২০০	১০১.৩৩	৩১৫০
	২৫০	২৮,০০০	১১২.০০	৪১০০
	৪০০	৫০,০০০	১২৫.০০	৪৭৭০

এই প্রসঙ্গে উচ্চচাপের সোডিয়াম বাতি নিয়ে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। এই বাতি থেকে যে-আলো পাওয়া যায় তার রঙ কমলা। অর্থাৎ, সাধারণত যে-সাদা আলোয় আমরা অভ্যস্ত এই বাতির আলো তার তুলনায় একেবারেই অন্যরকম। আর এ-কথা ঠিক যে আমাদের চোখে এই আলো কিছুটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিদেশে পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় যখন প্রথম সোডিয়াম বাতির ব্যবহার শুরু করা হয়েছিল তখন জনগণের মধ্যে অসন্তোষের সীমা ছিল না। এই কমলা রঙের 'বিচিত্র' আলোকে প্রায় কেউই মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু পরে তা ধীরে ধীরে সয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হল, পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় সোডিয়াম বাতি কেন প্রযুক্তিবিদদের পছন্দ হয়েছিল। এর প্রধান কারণ, সোডিয়াম বাতির ওয়াট প্রতি লুমেন আউটপুট উচ্চচাপের মার্কারি বাতির দ্বিগুণেরও বেশি (তালিকা দ্রষ্টব্য)। এছাড়া রাস্তায় সঠিক আলো বন্টনের

১ তাপদীপ্ত বাতির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাল্ব ও হোল্ডারের দাম ধরা হয়েছে।
২. দুটি বাতি সমেত দাম।

জন্য এবং উন্নত মানের দৃশ্যতার জন্য যে যে গুণাগুণ প্রয়োজন তার বেশির ভাগই সোডিয়াম বাতির মধ্যে বর্তমান। আর গড় আয়ুর হিসাবে সোডিয়াম বাতির গড় আয়ু মার্কারি বাতির গড় আয়ুর মোটামুটি সমান—পনেরো থেকে বিশ হাজার ঘণ্টা।

সুতরাং বিদ্যুৎ খরচের সাশ্রয় এবং বাতি-ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত দিক থেকে চাহিদা-মেটানো গুণের জন্য উচ্চচাপের সোডিয়াম বাতি বর্তমানে সবার সেরা।

১৯৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে সি এম ডি এ সংস্থা কলকাতায় প্রথম সোডিয়াম বাতি ব্যবহার করে। পরে ১৯৮৪-তে কলকাতা কর্পোরেশনও এই বাতির ব্যবহার শুরু করে। অন্য দুটি সংস্থা, সি আই টি এবং পি ডব্লিউ ডি-ও পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় উচ্চচাপের সোডিয়াম বাতি ব্যবহার করছে।

কলকাতা শহরের বাতি-ব্যবস্থার যে শতকরা আশি ভাগ বাতি কলকাতা কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে রয়েছে তার মধ্যে যেমন অনুন্নত বস্তি অঞ্চল রয়েছে তেমনি রয়েছে প্রধান সড়ক। প্রধান সড়কের উদাহরণ হিসাবে কয়েকটির নাম করা যেতে পারে . চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, সি আই টি রোড (উল্টাডাঙ্গা-ভি আই পি রোডের মোড় থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত) ইত্যাদি। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, কলকাতা কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে মোট ৭১,৩৬২টি বাতি রয়েছে। পরের পৃষ্ঠায় এই বাতির ধরন ও সংখ্যা বিস্তারিত ভাবে দেখানো হল।

পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় কলকাতা কর্পোরেশন আগে যে-হাফ নাইট অ্যারেঞ্জমেন্ট চালু করেছিল এখন সে-রকম ব্যবস্থা আর নেই। সন্ধ্যা-সকালে বাতি জ্বালানো-নেভানোর জন্য প্রায় ৪৩০ জন কর্মী রয়েছেন। আর রাস্তাঘাটের বেশিরভাগ বাতি জ্বালানো-নেভানো হয় ক্লাস্টার সুইচের সাহায্যে। এক-একটি ক্লাস্টার সুইচ গড়ে ৯-১০টি বাতি-স্তম্ভকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া সরু সরু গলিতে বা বস্তি অঞ্চলে বাতিপিছু একটি করে সুইচ রয়েছে। কর্পোরেশনের ব্যবহারের জন্য বর্তমানে প্রায় ২২৪০টি ক্লাস্টার সুইচ রয়েছে। বাতি জ্বালানো-নেভানোর জন্য কলকাতা কর্পোরেশন একটি বার্ষিক সময়-সারণি অনুসরণ করে। এই সারণিতে গোটা বছরকে গড়ে ১৫ দিন করে ২৪টি ভাগে ভাগ করা আছে। যেমন, পয়লা জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি বাতি জ্বালাতে হবে সন্ধ্যা পাঁচটা বেজে ছ' মিনিট থেকে পাঁচটা ছত্রিশ মিনিটের মধ্যে। আর নেভাতে হবে ভোরবেলা পাঁচটা ষোলো থেকে পাঁচটা ছেচল্লিশ মিনিটের মধ্যে। অর্থাৎ, বাতি জ্বালানো বা নেভানোর জন্য আধঘণ্টা করে সময়। আবার মে মাসের প্রথম পনেরো দিন বাতি জ্বালাতে হবে সন্ধ্যা ছ'টা ষোলো থেকে ছ'টা ছেচল্লিশের মধ্যে। আর নেভাতে হবে ভোর চারটে বেজে এক মিনিট থেকে চারটে একত্রিশের মধ্যে।

যদি এই সময়-সারণি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় তাহলে সারা বছরে একটি বাতি ৩৯৪৪ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট জ্বলে। কলকাতার পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থার জন্য শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সি ই এস সি লিমিটেড, বাকিটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। কর্পোরেশনের বাতির জন্য যে-বিদ্যুৎ খরচ হয় তার কোনো মিটারিং-এর ব্যবস্থা নেই। একটা বিশেষ ধরনের বাতি সারা বছরে মোট কত ঘণ্টা জ্বলে (বার্নিং আওয়ার্স) তার উপর হিসাব কষেই সি ই এস সি বিল করে। কর্পোরেশনের সময়-সারণি অনুযায়ী বাতি জ্বলে থাকার সময় প্রায় ৪০০০ ঘণ্টা। ফলে কোনো বাতি যদি অকেজো হয়ে যায় তাহলেও সি ই এস সি লিমিটেড বিদ্যুতের দাম পায়। তবে বিদ্যুৎ চুরির কোনো ঘটনা ঘটলে (কলকাতা

বাতির ধরন	বৈদ্যুতিক ক্ষমতা (ওয়াট)	সংখ্যা
তাপদীপ্ত বাতি	১০০	৪২,০৪৭
	২০০	৩৮৯৯
	৩০০	১৬
টিউব লাইট	২০	২৪
	৪০	২৩,৮১৭
উচ্চচাপের মার্কারি বাতি	১২৫	৪২
	২৫০	১১২
উচ্চচাপের সোডিয়াম বাতি	৭০	১২
	১৫০	২১৮
	২৫০	১১০৩
	৪০০	৩৮
হ্যালোজেন বাতি[১]	৫০০	২৮
	১০০০	৬
	মোট :	৭১,৩৬২

শহরে যা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার) তার জন্য কর্পোরেশনকে বাড়তি খরচ পোহাতে হয় না।

কর্পোরেশনের কিছু বাতি আছে যেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ বা তত্ত্বাবধান করে সি ই এস সি লিমিটেড। যেমন, টালিগঞ্জ এলাকায় এরকম ৭৩০০টি বাতি রয়েছে। তবে এর জন্য কর্পোরেশনকেই খরচ মেটাতে হয়।

পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থার জন্য বিদ্যুৎ বাবদ কলকাতা কর্পোরেশনের বছরে আর্থিক খরচ কত তার একটা হিসাব করা যেতে পারে। ১৯৮৯-এর জুন থেকে নভেম্বর, এই ছ' মাসের গড় হিসাবে কর্পোরেশনের বার্ষিক আর্থিক খরচ ৩১৫·৬৬ লক্ষ টাকা।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দের পয়লা অগাস্ট কর্পোরেশন তার নিজস্ব লাইটিং ডিপার্টমেন্ট চালু করে। এই বিভাগের খরচ প্রতি বছরেই প্রয়োজনমাফিক বেড়েছে। সাম্প্রতিক কালের বাজেটের হিসাবে দেখা যায়, ১৯৭০-৭১-এ এই বিভাগের খরচ ধরা হয়েছে ১৪,৭০,১০০ টাকা। ১৯৮০-৮১-তে এই অঙ্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৩৭,৪৪,৫০০ টাকা, এবং ১৯৮৯-৯০-তে এই হিসাব হল ৫,৭৫,৮৮,০০০ টাকা। অর্থাৎ, ৭০-৭১-এর তুলনায় ৮৯-৯০-এ বাজেটে অর্থবৃদ্ধির শতকরা মান ৩৮১৭·২৮%। সুতরাং পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থার জন্য বরাদ্দ অর্থের বৃদ্ধির শতকরা হিসাব এ-থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। তবে কলকাতা শহরের বাতি-ব্যবস্থার উন্নতি একই হারে হয়েছে কিনা সে-বিষয়ে সংশয় থাকা স্বাভাবিক।

---

১ এই বাতি কোনো উদ্যানের ভাস্কর্য বা মূর্তি আলোকিত করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

তেলের বাতি বা গ্যাস-বাতির সময়ে বাতি-স্তম্ভগুলোর উচ্চতা গড়ে ৩·৫ মিটার বা অল্প কম ছিল। আর বাতি-স্তম্ভ ছাড়াও ছিল ওয়াল-ব্র্যাকেট বা দেওয়ালগিরি। আজও বহু গলিতে বা বস্তিতে ওয়াল-ব্র্যাকেটে ঝোলানো তাপদীপ্ত বাতি দেখা যায়। তবে বর্তমানে কর্পোরেশন যেসব বাতি-স্তম্ভ ব্যবহার করে তার গড় উচ্চতা ৮·৫, ৯, ১১ অথবা ১২ মিটার। এই একই ধরনের বাতি-স্তম্ভ অন্যান্য তিনটি সংস্থাও ব্যবহার করে। ১৯১৪-১৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে তেলের বাতি, গ্যাস-বাতি ও বিজলি-বাতির সংখ্যার নিয়মিত তারতম্য ঘটেছে। মোটামুটিভাবে বিজলি-বাতির সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চললেও তেলের বাতি কিংবা গ্যাস-বাতির ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটি ঘটেনি। ১৯২০ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই তিন ধরনের বাতির সংখ্যা কীভাবে পাল্টেছে তা নীচের তালিকায় দেখানো হল :

সময়	তেলের বাতির সংখ্যা	গ্যাস-বাতির সংখ্যা	বিজলি-বাতির সংখ্যা
১৯২০-২১	১১৭০	১৩,৬১২	২০৬
১৯৩০-৩১	১০০৫	১৮,৬৯৩	২৪১২
৩১-৩-১৯৪১	৩৫৫	১৮,৮৪৪	৮৫১৮
৩১-৩-১৯৫১	৩৩৩	১৯,০০১	১০,৬৬৯
৩১-৩-১৯৬১	১৫৩	৩৮১৮	৩৯,৭৪৮
৩১-৩-১৯৭১	—	—	৭৫,৮১৬
৩১-৩-১৯৭৭	—	—	৭৪,৩৫৪

পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কলকাতা কর্পোরেশনের তুলনায় সি এম ডি এ-এর পরিচালন ব্যবস্থা যে কিছুটা উন্নত সে-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। সি এম ডি এ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলকে উন্নত করেছে। একই সঙ্গে সেই সব অঞ্চলের বাতি-ব্যবস্থার দায়িত্বও তারা নিয়েছে। সি এম ডি এ, সি আই টি, কিংবা পি ডব্লিউ ডি—এই তিনটি সংস্থা যখন তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে কলকাতার পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থা হাতে নেয় তখন প্রাথমিক সমঝোতা এই ছিল যে পরে উন্নত এলাকাগুলির দায়িত্ব নেবে কলকাতা কর্পোরেশন। ঠিক এরকমটাই হয়ে আসছিল। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে পরিচালন ব্যবস্থার পরিকাঠামো উপযুক্তভাবে শক্তিশালী হয়ে না ওঠায় কর্পোরেশন নতুন উন্নত এলাকাগুলির দায়িত্বভার নিতে পারছে না। সেই কারণেই বর্তমানে কলকাতার বেশিরভাগ প্রধান সড়কের বাতি-ব্যবস্থার দায়িত্ব রয়ে গেছে সি এম ডি এ-এর উপরে। এর কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড (জওহরলাল নেহরু রোড পর্যন্ত), বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, হাজরা রোড, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, পার্ক স্ট্রিট, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস, জওহরলাল নেহরু রোড (ধর্মতলার মোড় থেকে এলগিন রোডের মোড় পর্যন্ত। তবে এই রাস্তায় ময়দান মার্কেটের কাছে মাত্র বারোটি বাতি কলকাতা কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে রয়েছে), রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, বিধান সরণি ইত্যাদি। পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় সি এম ডি এ যেসব বাতি ব্যবহার করে সেগুলি হল : ৪০ ওয়াটের টিউব লাইট, আর ২৫০ ও

৪৫০ ওয়াটের উচ্চচাপের মার্কারি এবং সোডিয়াম বাতি।

বাতি জ্বালানো-নেভানোর জন্য সি এম ডি এ তাদের বাতি-ব্যবস্থায় প্রোগ্রামেবল্ টাইম সুইচ ব্যবহার করে। এরই সাহায্যে তারা 'হাফ নাইট অ্যারেঞ্জমেন্ট' চালু রাখতে পেরেছে। সন্দেহ নেই, এর ফলে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যুতের সাশ্রয় হচ্ছে। বিশেষ করে কলকাতা শহরে যখন বিদ্যুৎ সঙ্কট এত ভয়াবহ তখন এ-ধরনের পদক্ষেপ সমাজের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। তাছাড়া সি এম ডি এ-এর বাতি-ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ খরচ মাপার জন্য উপযুক্ত মিটারের ব্যবস্থা রয়েছে। মিটারের পাঠ অনুযায়ী তারা সি ই এস সি লিমিটেডকে টাকা দেয়। ফলে 'হাফ নাইট অ্যারেঞ্জমেন্ট' তাদের আর্থিক খরচও কিছুটা লাঘব করে। বর্তমানে বাতি-ব্যবস্থার বিদ্যুতের জন্য সি এম ডি এ-এব বার্ষিক খরচেব পরিমাণ প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা।

কলকাতার পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় সি এম ডি এ একটি নতুন ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছিল। সাধারণত লক্ষ্য করা যায় যে কোনো রাস্তাব বেশ কয়েকটি বাতি-স্তম্ভেব টার্মিনাল বক্স কোনো একটি বাতি-স্তম্ভের গোড়ায় বসানো বয়েছে। এইভাবে টার্মিনাল বক্স বসালে কলকাতার ক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধা এই যে বর্ষাকালে বেশির ভাগ রাস্তাতেই টার্মিনাল বক্সটি জলে ডুবে যায়। তার ফলে শর্টসার্কিট দুর্যোগ অনিবার্য এবং বাতি নিভে যায়। দ্বিতীয় অসুবিধাটি বাতি-কর্মীদের। টার্মিনাল বক্স নীচে থাকায় তাদের নীচু হয়ে কাজ কবতে হয়। কর্মীদের শারীরিক সুবিধার কথা চিন্তা কবলে বক্সের এই অবস্থান মোটেই 'আর্গোনমিক' ছিল না। এই দুটি অসুবিধা অতিক্রম করার জন্য সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষ তাদেব বেশ কিছু বাতি-স্তম্ভে বক্সটিকে এক-মানুষ উচ্চতায় বসায। এর জন্য বাতি-স্তম্ভের পাইপেব একটা দিকের কিছুটা অংশ কেটে টার্মিনাল বক্সেব জাযগা করতে হয। সেই সময়ে আশঙ্কা ছিল, এর ফলে বাতি-স্তম্ভটি হয়ত কমজোরি হয়ে পড়বে। কিন্তু বিগত প্রায় এক দশকে এ-রকম কোনো বাতি-স্তম্ভ নিজে থেকে কমজোরি হয়ে হেলে পড়েনি।

১৯৮৭-তে কলকাতায় যখন বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয তখন কলকাতার বাতি-ব্যবস্থায় নতুন একটি সংযোজন করে সি এম ডি এ। এই সংযোজনটি হল 'হাই মাস্ট লাইটিং'। বাতি-ব্যবস্থার অন্যান্য বাতি বা বাতি-স্তম্ভ আমাদের দেশে তৈরি হলেও হাই মাস্ট লাইটিং-এর সরঞ্জাম আমদানি করতে হয়েছিল বিদেশ থেকে। এ-ধরনের বাতি সাধারণত ব্যবহার করা হয় ফ্লাইওভাব, সেতু বা বড় চৌরাস্তায়—অর্থাৎ যেখানে বহু সংখ্যক বাতি-স্তম্ভ বসানোর অসুবিধা রয়েছে, অথচ আলোর চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশি।

সম্প্রতি দ্বিতীয় হুগলি সেতুর উপরে গঙ্গার পাড় পর্যন্ত সি আই টি ১৪টি হাই মাস্ট লাইটিং ইউনিট বসিয়েছে।

হাই মাস্ট লাইটিং-এর বাতি-স্তম্ভের উচ্চতা ৩০ মিটার। স্তম্ভটি তিনটে টুকরো জুড়ে তৈরি। টুকরোগুলোর মাপ যথাক্রমে ৭·৭৫ মিটার, ১১·৯ মিটার ও ১১·৯ মিটার। টুকরোগুলোর মধ্যে দুটি ওভারল্যাপের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ০·৬৫ মিটার ও ০·৯ মিটার। তবে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী এই মাপের কমবেশি তারতম্য হতে পারে। এই স্তম্ভে চক্রাকারে লাগানো থাকে ৯টি ধাতব বাহু। প্রত্যেকটি বাহুর প্রান্তে থাকে ৪০০ ওয়াটের একজোড়া করে উচ্চচাপের সোডিয়াম বাতি। অর্থাৎ, সবগুলো বাতির সম্মিলিত বৈদ্যুতিক ক্ষমতা ৭২০০ ওয়াট। ইচ্ছে করলে ৯টি বাহুতে একটি করে ১০০০ ওয়াটের উচ্চচাপের সোডিয়াম বাতিও লাগানো যায়। সেক্ষেত্রে সম্মিলিত বৈদ্যুতিক ক্ষমতা হবে ৯০০০ ওয়াট।

হাই মাস্ট লাইটিং-এর বাতি-স্তম্ভ মোটামুটিভাবে ৮-৯ তলা বাড়ির সমান উঁচু। সুতরাং ঝড়ের দাপটে এই সুদীর্ঘ বাতি-স্তম্ভের যেন বিপর্যয় না ঘটে সেদিকে ডিজাইনাররা লক্ষ্য রেখেছেন। এই স্তম্ভ ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার বেগের বাতাসের তিন সেকেণ্ড একটানা দাপট অক্লেশে সইতে পারে। এর অর্থ প্রতি বর্গ মিটারে প্রায় ২০০ কিলোগ্রাম বাতাসের চাপ সহ্য করা। এছাড়া স্তম্ভটিব অনুনাদী কম্পাঙ্ক ১ হার্ৎস-এরও কম। ফলে স্তম্ভে অনুনাদের সময়ে বাতাসের বেগ ও পীডনেব প্রভাব কম।

হাই মাস্ট লাইটিং-এর বাতিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ বা তত্ত্বাবধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। কেনো কারণেই ৩০ মিটার উঁচুতে বেয়ে উঠে কারো পক্ষে এই তত্ত্বাবধানের কাজ করা সম্ভব নয়। তাই এর পাইপের ভিতর দিয়ে রয়েছে পুলি ও দড়ির ব্যবস্থা। দড়িটি স্টেইনলেস স্টিলের তৈবি এবং এব টেনসাইল স্ট্রেংখ বা চরম পীডনের মান প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ১৬·৫ মেট্রিক টন। বাইরে থেকে ২৪০ ভোল্টেব একটি বিশেষ মোটর লাগিয়ে পুলি ও দড়ির সাহায্যে ন' বাহুওয়ালা ল্যাম্প ব্র্যাকেটটিকে একেবারে নীচে নামিয়ে আনা যায়। নামানোর পর রক্ষণাবেক্ষণ বা তত্ত্বাবধানের কাজ হয়ে গেলে মোটরটিকে উল্টোদিকে ঘুবিয়ে ল্যাম্প ব্র্যাকেটকে আবার ৩০ মিটার উপবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাতি-স্তম্ভ, ব্র্যাকেট, বাতি ও লাগানোর খরচ যোগ করে এক-একটি হাই মাস্ট লাইটিং ইউনিটের খরচ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুব হাই মাস্ট লাইটিংগুলিতে 'হাফ নাইট অ্যারেঞ্জমেন্ট'-এর ব্যবস্থা রয়েছে। রাত বারোটার পর টাইম সুইচের সাহায্যে প্রতিটি বাতি-স্তম্ভেব অর্ধেক বাতি নিভিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, প্রতি স্তম্ভের প্রতিটি বাহুতে তখন দুটিব বদলে একটি করে ৪০০ ওয়াটের সোডিয়াম বাতি জ্বলবে।

হাই মাস্ট লাইটিং ছাড়াও দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে সি আই টি-এর তত্ত্বাবধানে (গঙ্গাব পুব পাড়ে) ১৩৫টি বাতি-স্তম্ভ বয়েছে। এই বাতি-স্তম্ভগুলোতে একটি করে ২৫০ ওয়াটের উচ্চচাপের সোডিয়াম বাতি লাগানো আছে।

দ্বিতীয় হুগলি সেতু ছাড়া আরো যেসব অঞ্চলের বাতি-ব্যবস্থা সি আই টি-এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল : প্রিন্স আনোয়ার শা রোড, বেলগাছিয়া মিল্ক কলোনির সি আই টি-এর রাস্তা, কাঁকুড়গাছির মোড থেকে মানিকতলা খাল পর্যন্ত মানিকতলা মেন রোডের অংশ, বেলেঘাটা সুভাষ সরোবর, রবীন্দ্র সরোবর, বিজন সেতু ইত্যাদি।

বাতি-ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলেও তার বিদ্যুৎ খরচের হিসাবের বেলায় সি আই টি কলকাতা কর্পোরেশনেব মতই 'বার্নিং আওয়ার্স' পদ্ধতি অনুসরণ করে। সমাজের উপকারিতার দিকে তাকিয়ে এই পদ্ধতি অবশ্যই বদল করা উচিত।

সেদিক থেকে অবশ্য চতুর্থ সংস্থা পি ডব্লিউ ডি মিটার অনুযায়ী সি ই এস সি লিমিটেডকে বিদ্যুতের দাম দেয়। প্রাতিষ্ঠানিক খরচ ধরে বাতি-ব্যবস্থার জন্য পি ডব্লিউ ডি-এর বার্ষিক খরচ প্রায় ৪৮·৫ লক্ষ টাকা। পি ডব্লিউ ডি-এর তত্ত্বাবধানে কলকাতার যেসব অঞ্চল রয়েছে সেগুলির কয়েকটি হল : নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, বি টি রোড, কলকাতা ময়দান ইত্যাদি। এছাড়া কলকাতার বেশ কিছু মূর্তি বা ভাস্কর্য আলোকিত করার দায়িত্ব রয়েছে এই সংস্থার উপরে। এই ধরনের কাজে তারা ব্যবহার করে ১০০০ ওয়াটের মেটাল হ্যালাইড বাতি, ৪০০ ওয়াট ও ১০০০ ওয়াটের উচ্চচাপের মার্কারি বাতি। এছাড়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের উদ্যান আলোকিত করার কাজে তারা ব্যবহার করছে ১২৫

ওয়াটের উচ্চচাপের মার্কারি বাতি।

পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় পি ডব্লিউ ডি ব্যবহার করে ৪০ ওয়াটের টিউব লাইট, আর ১৫০, ২৫০ বা ৪০০ ওয়াটের উচ্চচাপের সোডিয়াম বাতি। কিছু কিছু উদ্যান আলোকিত করার কাজে তারা একজোড়া ৪০০ ওয়াটের সোডিয়াম বাতি এক-একটি বাতি-স্তম্ভে ব্যবহার করেছে।

কোনো রাস্তায় সুষম এবং সঠিক মাত্রার আলো কেন প্রয়োজন পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থার বিশদ আলোচনায় তা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু এই চারটি সংস্থা সে-রকম গুরুত্ব দিয়ে রাস্তার আলো মাপজোখের কাজ সাম্প্রতিক কালে করেনি। ভারতীয় মানক সংস্থা তাদের নির্দেশাবলীর পুস্তিকায় বলেছে, রাস্তার শ্রেণীর উপরে নির্ভর করে কী ধরনের লুমিনেযার ব্যবহার করা উচিত আর তাদের দীপনমাত্রাই বা কতটা হওয়া দরকার। সেই তথ্যগুলি পরের পৃষ্ঠায় তালিকার সাহায্যে প্রকাশ করা হল।

১৯৮৯-এর শেষ দিকে পি ডব্লিউ ডি-এর তত্ত্বাবধানে ক্ষুদিরাম বোস রোডে ৪০০ ওয়াটের উচ্চচাপের মার্কারি বাতি পরিবর্তন করে একই বৈদ্যুতিক ক্ষমতার সোডিয়াম বাতি লাগানো হয়। খরচ সাশ্রয় করার জন্য বাতিগুলির কেস পরিবর্তন করা হয়নি। নতুন বাতি লাগানোর পর ওই রাস্তায় গড় দীপনমাত্রার মান পাওয়া গিয়েছিল ৯.০ লাক্স। যদি সোডিয়াম বাতির যাবতীয় সরঞ্জাম ব্যবহার করা হত তাহলে দীপনমাত্রার মান সম্ভবত ১০.০ লাক্সে পৌঁছত।

কলকাতার পথঘাটে পথচারী ও যানবাহনের সংখ্যা প্রতিদিন যে-হারে বেড়ে চলেছে তাতে এটুকু অনুমান করা যায়, পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া দরকার। তিনশো বছরের 'যুবক' এই শহরটিতে জনপথের জন্য বরাদ্দ এলাকা শহরের ক্ষেত্রফলের মাত্র ৬.৫%। তা সত্ত্বেও এর পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থাকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে সে-রকম ভাবে ময়না তদন্ত করে দেখা হয়নি। একদিকে হাই মাস্ট লাইটিং-এর প্রয়োগের মাধ্যমে আধুনিকতম প্রযুক্তির ব্যবহার, আর অন্যদিকে আদিম 'বার্নিং আওয়ার্স' পদ্ধতিতে বিদ্যুতের দাম মেটানো! এছাড়া দিনের বেলা জ্বেলে রাখা বাতির মাধ্যমে বিদ্যুতের অপচয়, বাতি-স্তম্ভ থেকে ব্র্যাকেট, বাতি ইত্যাদি চুরি ও তার চুরির ঘটনা পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থাকে ক্রমশ কমজোরি করে দিচ্ছে। সুতরাং কলকাতার পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থাকে সুপরিকল্পিতভাবে খতিয়ে দেখা এবং সে-বিষয়ে গঠনমূলক পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ বর্তমানে অত্যন্ত জরুরি।

'কল্লোলিনী তিলোত্তমা' হতে গেলে রাতের কলকাতাকে আলোর প্রসাধনে সেজে উঠতে হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার এই লেখার তথ্য সংগ্রহের কাজে সাহায্য করেছেন সুশীলকুমার সেন (ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল কলিকাতা কর্পোরেশন) সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় (প্রেস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশন) এ কে গুহঠাকুরতা (ডাইরেক্টর ট্রাফিক এনড ট্রান্সপোর্ট সি এম ডি এ) স্বপন বসু (অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর ট্রাফিক এনড ট্রান্সপোর্ট সি এম ডি এ), দিবাকর দাস (এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, পি ডব্লিউ ডি), এস কে গুপ্ত (অ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার, পি ডব্লিউ ডি) বি এন দাস (এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সি আই টি) শিবাল ভট্টাচার্য (সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, সি আই টি) ও অমলকান্তি ঘোষ (প্রফেসর ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। —অনীশ দেব

রাস্তার শ্রেণী	রাস্তার তলে গড় দীপনমাত্রা (লাক্স)	সর্বনিম্ন এবং গড় দীপনমাত্রার অনুপাত	লুমিনেয়ারের শ্রেণী	
			বাঞ্ছনীয়	মঞ্জুর করা যেতে পারে
দ্রুতগামী মোটরযান চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা	৩০	০·৪	কাট-অফ	সেমি-কাট-অফ
মিশ্র যানবাহনের উপযোগী অন্যান্য বড় রাস্তা—যেমন শহরের প্রধান সড়ক	১৫	০·৪	কাট-অফ	সেমি-কাট-অফ
উল্লেখযোগ্য যানবাহন চলাচল আছে এমন অথচ অপ্রধান রাস্তা—যেমন স্থানীয় যানবাহনের পথ, দোকানপাট অঞ্চলের পথ ইত্যাদি	৮	০·৩	কাট-অফ অথবা সেমি-কাট-অফ	নন-কাট-অফ
হালকা যানবাহন চলাচল আছে এমন অপ্রধান রাস্তা	৪	০·৩	কাট-অফ অথবা সেমি-কাট-অফ	নন-কাট-অফ

কলকাতার শিল্পায়ন

সিদ্ধার্থ ঘোষ

ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে ভারতের একটি বিচিত্র সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, শিল্প বিপ্লবের পুঁজি সরবরাহের পিছনে উপনিবেশ হিসাবে ভারত-লুণ্ঠনের ভূমিকা নগণ্য ছিল না। সামান্য একটি উদাহরণ বক্তব্য প্রমাণ করবে। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত কারখানা সোহো-র বোল্টন এনড ওয়াট কোম্পানি স্টিম ইঞ্জিন নির্মাতা হিসাবে শিল্প বিপ্লবের 'শক্তিদাতা' রূপে পরিচিত। স্টিম ইঞ্জিনের উদ্ভাবক রূপে পরিচিত জেম্‌স ওয়াট ছিলেন এই কোম্পানির কারিগরি মস্তিষ্ক আর পুঁজি-সরবরাহকারী বোল্টন। এই কোম্পানির প্রথম ব্যবসায়িক সাফল্য আসে ভারত সহ বিভিন্ন দেশের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুদ্রা নির্মাণের অর্ডার সংগ্রহ করার সূত্রে। এটি প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে নজরে পড়ে ইংল্যাণ্ডে তৈরি মুদ্রা জাহাজ ভরে ভারতে এনে ব্যবসায়িক লেন-দেন চালানোর অসুবিধা। ফলে কলকাতায় বসানো হল আধুনিক যন্ত্রচালিত টাঁকশাল। সেই টাঁকশালের বেশির ভাগ ভারি যন্ত্রপাতি ও স্টিম ইঞ্জিন ওই বোল্টন এনড ওয়াট-ই সরবরাহ করে।

ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে শুধু যে কল-কারখানার উৎপাদনই ভারতের বাজার দখল করল তাই নয়, বাষ্পীয় পোত ও রেলওয়ে প্রবর্তনের পরে ভারত জুড়ে তার বিলি ব্যবস্থার সুযোগ হল, সম্প্রসারিত হল বাজার। একই সঙ্গে ভারতের সুদূর প্রান্ত থেকেও কাঁচামাল সংগ্রহ ও সাগরপারে রপ্তানির সুযোগ পেল ইংরাজ বণিক।

এই প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিক ভাবেই বড় মাপের উৎপাদনক্ষম কোনো কারখানা বা ভারি শিল্প ভারতে স্থাপনের জন্য বিদেশি পুঁজির কোনো উৎসাহ থাকার কথা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতে শিল্প বিপ্লব—উত্তরকালে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের কারখানা স্থাপন শুরু হয়। শুরু হয়, প্রধানত মেরামতির তাগিদ থেকে এবং প্রধানত জাহাজ, রেলওয়ে ইত্যাদি পরিবহণ ব্যবস্থা ঘিরে ও সামরিক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে।

নদীর তীরে একটি বন্দর-শহর হিসাবেই কলকাতার পত্তন। জোব চার্নক সে-শহরের প্রতিষ্ঠাতা কি না বা তার প্রতিষ্ঠার কাল নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু কলকাতার নদীতান্ত্রিক উৎপত্তি নিয়ে নয়। রেলওয়ে ব্যবস্থার প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত কলকাতার অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণত একটি বন্দর শহরের স্বাভাবিক নিয়মের অনুগামী। কলকাতার প্রথম কারখানা তথা উৎপাদন কেন্দ্রও গড়ে ওঠে নৌ-বাণিজ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার জন্য। অর্থাৎ, জাহাজ মেরামতি ও জাহাজ তৈরির কারখানা।

জাহাজি কারখানা

খিদিরপুরে এখন যেটি কবিতীর্থ সরণি, পুরনো ওয়াটগঞ্জ স্ট্রিট নামেই সেটি বেশি পরিচিত। এলাকাটিরও নাম ওয়াটগঞ্জ। কর্নেল ওয়াটসনের নাম থেকে এই নামকরণ।

গঙ্গার তীরে ওয়াটগঞ্জেই বসেছিল হেনরি ওয়াটসনের জাহাজ তৈরি ও মেরামতির বিশাল কারখানা। সময় ১৭৭৯—১৭৮০। ওয়েট ডক, ড্রাই ডক, যন্ত্রশালা, জাহাজঘাঁটি—সব মিলিয়ে বিপুল উদ্যোগ। তখনও বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আমদানি হয়নি, কারখানার যন্ত্র চালানোর জন্য ওয়াটসন স্থাপন করলেন দুটি বিশাল উইণ্ড মিল বা পবন চক্র। উইণ্ড মিলের মাথায় নৌকার পালের মত টাঙানো কয়েকটা কাপড়ের ফালিতে হাওয়া ধরলেই বনবন্ করে ঘুরত হাওয়া-কলের চাকা। প্রায় ৩৫ মিটার করে উঁচু প্রত্যেক মিলে পাঁচটি তলা ছিল। উপরের তলাগুলিতে শস্য পেষাই করা হ'ত আর নীচের তলায় বায়ুশক্তির সাহায্যে চক্রাকার কর'ত ঘুরিয়ে কাঠ-চেরাই।

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে এখান থেকে প্রথম জাহাজ ৩৬টি কামান বিশিষ্ট ফ্রিগেট 'ননসাচ' তৈরি হয়। ১৭৮৮-তে নির্মিত হয় আরেকটি বিখ্যাত ফ্রিগেট 'সারপ্রাইজ'। এছাড়াও বহু জাহাজ তখন তৈরি হয়েছে এখানে। আট বছরে জাহাজ কারখানার পিছনে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন ওয়াটসন।

ওয়াটসন ব্যবসা গোটালেও জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র হিসাবে খিদিরপুর অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। শুধু ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য নয়, শ্রমিকদের একটা এলাকাও ততদিনে গড়ে উঠেছে এই কারখানা ঘিরে।

কলকাতার পরবর্তী জাহাজ-নির্মাতা জেম্‌স কিড ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই অঞ্চলেই স্থাপন করলেন তাঁর কারখানা ও ডক-ইয়ার্ড। কিডের নাম থেকেই খিদিরপুর কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে কিন্তু খিদিরপুরের বিশেষ সমৃদ্ধি যে এই জাহাজী-কারবারকে ঘিরে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮৩৬-এ কিডের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এটি ছিল কলকাতার বৃহত্তর শিল্পোদ্যোগ।

কিডের ডক-ইয়ার্ডে তৈরি পালতোলা জাহাজের মধ্যে বিখ্যাত হেস্টিংস ১৮১৮-এ জলে নামে। ৭৪টি কামান বিশিষ্ট রণতরী। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পাটোয়ারি ব্যবসায় নিযুক্ত দুটি প্রসিদ্ধ জাহাজও তৈরি হয় এখানে। ৩৬৯ টনের ক্লিপার বার্ক 'ওয়াটারউইচ' ১৮৩১-এ এবং ৩৭৭ টনের ক্লিপার 'এরিয়েল' ১৮৩৭-এ জলস্পর্শ করে। দুটি জাহাজই মূলত চিনের সঙ্গে বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল। ১৮৩৮-এ ক্যান্টন থেকে কলকাতা পাড়ি দেওয়ার সময়ে সব প্রতিযোগী জাহাজকে পরাস্ত করেছিল 'ওয়াটারউইচ'। পঁচিশ দিনে যাত্রা সাঙ্গ করায় নূতন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছিল।

১৭৮১ থেকে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলকাতায় ২৩৭টি জাহাজ তৈরি হয়। সেকালে কলকাতার কাছে আরো দুটি স্থানে জাহাজ তৈরি হত। টিটাগড়ে ১৮০১ ও ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল যথাক্রমে 'কাউন্টেস অব সাদারল্যাণ্ড' (১৪৬৮ টন) ও 'সুসান'। আর ফোর্ট গ্লসেস্টারে (বাউরিয়া) ১৮১১ থেকে ১৮২৮-এর মধ্যে তৈরি হয় ২৭টি জাহাজ। তাছাড়া ছিল নদীর ওপারে হাওড়ার ড্রাই ডক ইয়ার্ড।

জেম্‌স কিডের মৃত্যুর পরে প্রধানত দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রুস্তমজী কাওয়াসজীর উদ্যোগে গঠিত হয় ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানি। এই কোম্পানি খিদিরপুর ও হাওড়ার ডক-ইয়ার্ড কিনে নেয়। ১৮৩৭-এ খিদিরপুর ইয়ার্ডের পূর্বাংশটি তারা গভর্নমেণ্ট স্টিম ডিপার্টমেণ্টকে তাদের কারখানা বসানোর জন্য বিক্রি করে দেয়। অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ অবধি তার অস্তিত্ব বজায় রাখে।

বাষ্পের যুগ : টাঁকশাল ও জেসপ এন্‌ড্‌ কোম্পানি

এতক্ষণ আমরা পালতোলা নৌকার কথাই আলোচনা করেছি। কিন্তু জেম্‌স কিডের জীবদ্দশাতেই কলকাতায় বাষ্পীয় নৌকা ও স্টিম ইঞ্জিনের প্রচলন ঘটেছে। দু' তিনটি ব্যতিক্রমের কথা বিবেচনা না করলে কলকাতায় আধুনিক বাষ্পচালিত যন্ত্রাদি নির্মাণ ও সংস্কার ইত্যাদির কারখানা স্থাপিত হয় বাষ্পীয় নৌকা বা স্টিমারের প্রবর্তনের সূত্রে।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে জেম্‌স কিডের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয় কলকাতার প্রথম কার্যকর স্টিমার 'ডায়না'। ১৬ অশ্বশক্তির দুটি ইঞ্জিন আমদানি করা ছাড়া এই প্যাডেল হুইল (নৌকার দু'ধারে চাকা-জোড়া) স্টিমারটি পুরোপুরিই তৈরি হয় খিদিরপুরে। ছোটখাটো 'ডায়না' কয়েক বছর পরে বর্মার যুদ্ধে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর মধ্যে তখন এই একটিই স্টিমার ছিল। বলা হয় ডায়নাই নাকি ব্রিটেনের প্রথম বাষ্পীয় রণতরী। যুদ্ধে স্টিমারের উপযোগিতা প্রমাণিত হওয়ায় একে একে আরো স্টিমার আসতে শুরু করে। কিডের কারখানাতেও বিদেশি ইঞ্জিন জুড়ে তৈরি হয় আরো স্টিমার। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইরাবর্দি, গ্যাঞ্জেস ও ব্রহ্মপুত্র।

১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড থেকে প্রথম স্টিমার 'এণ্টারপ্রাইজ' এসে পৌঁছয় কলকাতায়। এণ্টারপ্রাইজের কম্যাণ্ডার জনস্টন কিছু দিন বাদে নিযুক্ত হন সরকারি স্টিমার দপ্তরের পরিচালক—কন্ট্রোলার অব গভর্নমেণ্ট স্টিম ভেসেল্‌স্‌। জনস্টনের সমান ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সামরিক ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম নেয়ার্ন ফোর্ব্‌স। ফোর্ব্‌স নিযুক্ত হয়েছিলেন যাবতীয় সরকারি স্টিম ইঞ্জিনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ফলে স্টিমারের ইঞ্জিনের মেরামতি ও নির্মাণের দায়িত্বও ছিল তাঁরই হাতে, জনস্টনের হাতে নয়।

অত্যন্ত সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ফোর্ব্‌স। শুধু বাষ্পীয় যন্ত্রাদির ব্যাপারে নয়, স্থপতি হিসাবেও তাঁর কুশলতার সাক্ষী সেণ্ট পল্‌স্‌ ক্যাথিড্রাল। ১৮৩৭-এ খিদিরপুর ডকে কারখানা বসার আগে ফোর্ব্‌স স্টিমার ইঞ্জিনের মেরামতির জন্য প্রধানত বেসরকারি সংস্থা জেসপ এন্‌ড্‌ কোম্পানি, কাশিপুরের গভর্নমেণ্ট গান ফাউণ্ড্রি ও হাওড়া ব্রিজের কাছে বর্তমানে প্রায় পরিত্যক্ত মিণ্টের (টাঁকশালের) যন্ত্রালয়ের সাহায্য নিতেন। এই তিনটি সংস্থাই প্রাচীন কলকাতার সবচেয়ে প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা।

বাষ্পচালিত্‌ যন্ত্রাদি বিশিষ্ট, লেদ ও লোহা ঢালাইয়ের কিউপোলা সম্বলিত স্ট্র্যাণ্ড রোডের মিণ্টের কারখানাটি ফোর্ব্‌স নিজের হাতে স্থাপন করেন। টাঁকশালের বাড়ির স্থপতি ও নির্মাতাও তিনি। এত বড় কারখানা কলকাতায় আর তখন দ্বিতীয় ছিল না। মিণ্টের প্রধান কাজ মুদ্রা তৈরি হলেও বড় কারখানা বলে এই কারখানার সুযোগ সরকারি স্টিমাররাও গ্রহণ করত। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের 'সমাচার দর্পণ' থেকে টাঁকশালের বিশাল কর্মকাণ্ডের সামান্য পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা যাক :

> 'ক্লাইব স্ট্রিট নামক রাস্তার গড়ে ২৫ ফুট নীচে অথচ টাক্‌শালের মেজের সাড়ে ছাব্বিশ ফুট নীচে গঙ্গা হইতে প্রাপ্ত চড়ার উপরে বঙ্গদেশস্থ গৃহাদি নির্মাণের অধ্যক্ষ অথচ তদ্বিষয়জ্ঞ শ্রীযুক্ত কাপ্তান ফর্ব্‌স সাহেব কর্তৃক ১৮২৪ সালের মার্চ মাসের শেষে ঐ গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয় অতএব উপরি লিখিত ইমারত অপেক্ষা মৃত্তিকার নীচে অধিক ইমারত আছে। ছয় বৎসরে ইহার তাবৎ কম সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার মধ্যে বাষ্পীয় পাঁচ কল আছে বিশেষত: দুই কল ৪০ অশ্ব ও এক কল ২৪ অশ্ব ও এক কল ২০ অশ্ব এবং এক কল ১৪ অশ্বতুল্য বল এই যন্ত্রের

দ্বারা দিবসে সাত ঘণ্টার মধ্যে ৩,০০,০০০ খান রূপা মুদ্রিত হইতে পারে।'

মিন্টের মত কাশিপুরের কারখানাও তার প্রধান কাজ অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ গ্রহণ করত। উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে এই বাষ্পচালিত কারখানায় স্টিম ইঞ্জিনও তৈরি হয়েছে।

জেসপ কোম্পানি কলকাতার প্রাচীনতম ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা যা আজও সগৌরবে বর্তমান। শুধু তাই নয়, এই কারখানাটিই কলকাতার আদি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যা বাষ্পীয় যুগের সূচনার সঙ্গে তাল রেখে আধুনিকতম সুযোগ-সুবিধা অর্পণ করেছিল।

জেসপ কোম্পানির স্থপতি হেনরি জেসপ ভারতে আসেন লক্ষ্ণৌর নবাবের জন্য একটি ঢালাই লোহার ব্রিজ বসানোর কাজ নিয়ে। কালক্রমে তিনি কলকাতায় স্থাপন করেন কোম্পানিটি। উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতাব কারখানাটি স্থাপিত হলেও, এই কোম্পানির ইংল্যাণ্ডের শাখার ইতিহাস আরো প্রাচীন। কলকাতার প্রথম জলতোলার কলটি বসানোর কৃতিত্বও হেনরি জেসপের। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপাল ঘাটের কাছে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত এই পাম্পটি স্থাপিত হয়। পুরনো কলকাতার মানচিত্রে ও ছবিতে এটির হদিশ পাওয়া যায় স্টিম ইঞ্জিন লেখা থেকে বা ইঞ্জিনের বয়লাব হাউসের চিমনি লক্ষ্য করে। বাষ্পচালিত এই পাম্পের জল পান দূরেব কথা, হিন্দু পল্লীতে রাস্তা ধোওয়ার জন্যও তা ব্যবহার করা হত না। কারণ যন্ত্রের মধ্যে তেল, গ্রিজ, চামড়ার মত বিজাতীয় দ্রব্যের সংস্পর্শ। শুধু তাই নয়, স্টিম ইঞ্জিন বসানোব আগে হেনবি জেসপকে মিলিটারি বোর্ডের অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন কোব্বেকে চিঠি লিখে আশ্বস্ত করতে হয়েছিল যে, বাষ্পের কল বস্তুটি আসলে অতি নিরীহ, কারুর কোনো ক্ষতি করে না। তাঁর অভিমত, চুল্লীতে প্রথম আগুন দেওয়ার সময়ে ঘন কালো ধোঁয়া বেরোয় ঠিকই কিন্তু এই কাজটা সেরে ফেলা হবে ভোরবেলায়, বাতাস যখন পাতলা থাকে, তাই ধোঁয়া কখনোই নীচে নেমে আসবে না। তা ছাড়া কল (ইঞ্জিন) যদি ঠিক মত তৈরি হয় একটুও কাঁপুনি বা আওয়াজ টের পাওয়ার কথা নয়। জেসপের বিশ্বাস স্টিম ইঞ্জিন অসুবিধা সৃষ্টি করে এটা শুধু নিছক ধারণা, কথাটা সত্য নয়।

বিখ্যাত শিল্পী কোল্‌সওয়ার্দি গ্রান্টের লেখা 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ডোমেস্টিক লাইফ' (১৮৬২) থেকে জেসপ কোম্পানি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য :

> "...... to shew you what Calcutta can do in the large way, as indicative of what she may do hereafter in the small and the neat, I may mention that the principal and the eldest of these establishments (that of Messrs. Jessop & Co.) besides constructing steam-engines of moderate power, for our steamers and ferries-boilers-pumps-hydrostatic and other presses—screws—copper stills and worms—fire engines—beams—ornamental railings—palisades and gates for public buildings, and bells also for our churches, has ventured to cater so far to out domestic wants as to manufacture parlour and kitchen grates—stoves and cast-iron choolahs......"

খিদিরপুরের গভর্নমেণ্ট ডক-ইয়ার্ড

সরকারি স্টিমারের তদারকির জন্য ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে একদল ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার ও বয়লার-মেকার এসে পৌঁছোয় কলকাতায়। কিন্তু ভারতীয় আবহাওয়ায় তাদের মধ্যে মার্ক জোন্‌স ছাড়া কেউই বেশি দিন টেকেনি। ১৮৩৭-এ খিদিরপুর কারখানা স্থাপনের পর জোন্‌স তার চিফ সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হন। ততদিনে অবশ্য কুশলী ভারতীয় সূত্রধর ও কর্মকাররা বাষ্পীয় যন্ত্রের কারিকুরি অনেকটাই আয়ত্ত করে ফেলেছেন। ১৮৩৭-এ খিদিরপুরের কারখানায় নিযুক্ত ভারতীয় শ্রমিকদের পরিচয় ও বেতনহারের চিত্রটি তুলে দিচ্ছি এখানে :

বিবরণ	মাসিক বেতন
'জয়নার' মিস্ত্রি	১২ টাকা
'জয়নার' মিস্ত্রির সহায়ক	৮ টাকা
সূত্রধর	১০ টাকা
সূত্রধরের সহায়ক	৬½ টাকা
'ককার' মিস্ত্রি	৬ টাকা
'ককার' মিস্ত্রির সহায়ক	৫ টাকা
পেইন্টার মিস্ত্রি	১০ টাকা
পেইন্টার মিস্ত্রির সহায়ক	৭ টাকা
কুলি	৪½ টাকা
'ভাইসম্যান'	১২ টাকা
'ব্রেজিয়ার' মিস্ত্রি	১৬ টাকা
'ব্রেজিয়ার' মিস্ত্রির সহায়ক	১২ টাকা

ভারতীয় কারিগররা যে কুশলতায় শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয় তাব সেরা প্রমাণ গোলোকচন্দ্র নামে টিটাগড়ের এক কর্মকার অবশ্য ইতিপূর্বেই পেশ করেছিলেন। শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের স্থাপিত কাগজের কলে নিযুক্ত বাষ্পের ইঞ্জিনটি পর্যবেক্ষণ করে তিনি নিজে হাতে তার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ নির্মাণ করেন। গোলোকচন্দ্রের তৈরি এই ইঞ্জিনটি ১৮২৮-এ এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীতে ৫০ টাকার একটি বিশেষ পুরস্কার অবধি অর্জন করে। স্টিম ইঞ্জিন নির্মাতা এই অর্থেই গোলোকচন্দ্রই প্রথম ভারতীয় 'ইঞ্জিনিয়ার'।

১৮২৮-এর ১৭ জানুয়ারি 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকা থেকে গোলোকচন্দ্রের কৃতিত্বের কথা পেশ করা হচ্ছে,

> 'A curious model of a Steam Engine, made by Goluk Chunder, Blacksmith of Tittighur, near Barrackpur, without any assistance whatever from European artists, was likewise exhibited; and although not coming within the immediate sphere of the Society's exertions was considered so striking an instance of native ingenuity and imitative skill as to deserve encouragement.'

গুরু জোন্‌সের কারখানা

শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ে কলকাতায় আগত বিদেশি ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে সেরা সম্ভবত উইলিয়ম জোন্‌স। এবং আরো উল্লেখযোগ্য তিনি সামরিক বা সরকারি কোনো লেজুড়বাহী ছিলেন না। জোন্‌স কলকাতায় আসেন ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। হাওড়ার লোক তাঁকে ডাকত 'গুরু জোন্‌স' নামে। হাওড়ার শিল্পাঞ্চলের অন্যতম বীজটি তিনিই বপন করেছিলেন। আর ওই 'গুরু' সম্বোধনের মধ্যেই রয়েছে স্থানীয় মানুষের কলকব্জা সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে পাঠ-গ্রহণের ইঙ্গিত। জানা যায় অনর্গল বাংলা বলতেও শিখেছিলেন তিনি। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ হাওড়ার অ্যালবিওন ঘাটে তিনি একটি ক্যানভাস তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। ছোট একটি কাগজ তৈরির মিলও বসিয়েছিলেন। সেখান থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে জাভা অভিযানের আগে সরকারি সেনাবাহিনীকে কার্তুজের জন্য কাগজ সরবরাহ করা হয়েছিল। শ্রীরামপুরে ভারতের প্রথম বাষ্পচালিত আধুনিক কাগজের কলের জন্য স্টিম ইঞ্জিন আমদানি করার পরামর্শও জোন্‌সই দিয়েছিলেন। স্থপতি হিসাবে ভারতের প্রথম গথিক রীতির সৌধটি নির্মাণেরও কৃতিত্ব তাঁর। সেই প্রাক্তন বিশপ্‌স কলেজ বর্তমানে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাঙ্গণে আজও এক দর্শনীয় বস্তু। শুধু দুঃখের কথা, এ-যুগের পড়ুয়া ইঞ্জিনিয়াররা কেউই হয়ত এই ঐতিহাসিক সৌধের নির্মাতা, কলকাতার আদি ইঞ্জিনিয়ার জোন্‌সের নামও শোনেননি। জোন্‌সের সেরা কীর্তি অবশ্য ভারতের প্রথম কয়লাখনি পরিচালনায় সাফল্য। ব্যবহারিক ভাবে রাণীগঞ্জ কয়লাখনির পত্তন তাঁরই হাতে। অর্থকরীভাবে তিনি অবশ্য সফল হননি, সে-সাফল্য এসেছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে কার টেগোর কোম্পানির আমলে। পরবর্তিকালে এই রাণীগঞ্জ কয়লাখনিকে কেন্দ্র করেই 'বেঙ্গল কোল কোম্পানি' একটি মহীরূহে পরিণত হয়।

দূরবিন কারখানা

উড স্ট্রিটে ভারতীয় জরিপ বিভাগের 'ম্যাথ্‌মেটিক্যাল ইন্‌সট্রুমেন্ট্‌স ডিপার্টমেন্ট' এই নামেই সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। এর কারণ, এই পর্বে প্রতিষ্ঠানটি থেকে ২০,০০০ দূরবিন (বাইনোকুলার), ১২,০০০ টেলিস্কোপ ও কম্পাস ইত্যাদি আরো অজস্র যন্ত্র নির্মিত হয়।

'ম্যাথ্‌মেটিক্যাল ইন্‌সট্রুমেন্ট্‌স ডিপার্টমেন্ট' মূলত একটি কারখানা। এর পত্তন ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে। প্রধানত জরিপের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির মেরামতি বা উন্নতি সাধনের জন্য ৭/১৬ থিয়েটার স্ট্রিটে (লায়ন্‌স রেঞ্জের কাছে) শিবপ্রসাদ ঘোষের বাড়িতে মাসিক ১৭৫ টাকা ভাড়ায় এই কারখানায় প্রথম কাজ শুরু হয়। ভারতীয় জরিপ বিভাগের স্বনামধন্য জর্জ এভারেস্ট মনোনীত ইংল্যাণ্ডের যন্ত্রবিদ্‌ হেনরি বারো, 'ম্যাথ্‌মেটিক্যাল ইন্‌সট্রুমেন্ট মেকার' হিসাবে সংস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মাহিনা মাসে ৫০০ টাকা। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের পুরনো নথি থেকে দেখা যায়, বারো ছাড়া এই দপ্তরের সব কর্মী ও কারিগরই ভারতীয়।

১৮৩০-এর দশকেই কলকাতায় লেদ মেশিনের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কারিগরদের আবির্ভাব হয়। প্রথম লেদম্যান ঈশ্বর ১৮৩৩-এর পর বিদায় নিলে ৩ টাকা বেশি মাইনের নারায়ণ নিযুক্ত হলেন সেই জায়গায়। তার সঙ্গে পীতাম্বরও ৮ টাকা মাহিনায় লেদম্যানের কাজ পান। দু'জনেই এর আগে ভাইসম্যান হিসাবে এখানে নিযুক্ত ছিলেন। বোঝা যায়, তাঁরা ইতিমধ্যে লেদ চালানো রপ্ত করেছেন। পরের মাসেই দেখা যায়, লেদম্যান নারায়ণ

		মাসিক বেতন
১	রাইটার	২৫ টাকা
১	হেড ভাইস মিস্ত্রি (রাধানাথ)	১২ টাকা
১	লেদম্যান (ঈশ্বর)	৭ টাকা
৩	ভাইস মিস্ত্রি (পুরান, নারায়ণ ও মাথুর)	৭ টাকা
১	সূত্রধর (শঙ্কর)	১৪ টাকা
১	পিয়ন (আবদুল)	৫ টাকা
১	দারোয়ান (হরানন্দ)	৫ টাকা
২	চৌকিদার (ঠাকুর সিং ও চেরাঙ্গি)	৬ টাকা
১	জমাদার (কাল্লু)	৪ টাকা

বিদায় নিয়েছেন, তাঁর জায়গায় নিযুক্ত হয়েছেন ৮ টাকা মাহিনায় হলধর। ৩ টাকা মাহিনা বাড়িয়েও নারায়ণকে ধরে রাখা যায়নি। নিশ্চয় আরো ভাল চাকরি পেয়েছিলেন তিনি। ১৮৩৪-এর জুন মাসে পীতাম্বরও কাজ ছেড়ে দেন, তার জায়গায় আসেন রাম সোনা এবং ডিসেম্বরে রাম সোনা বিদায় নিলে লেদম্যান নিযুক্ত হন পোরান বা পুরান (Poran)।

১৮৩০ থেকে ১৮৩৬ অবধি সূত্রধর শঙ্কর মিস্ত্রি কিন্তু একটানা কাজ করে গেছেন। নারায়ণ ছাড়া আর কোনো লেদম্যানের মাইনে বৃদ্ধি হতে দেখা যায় না। অন্যদের মধ্যে একমাত্র হেড ভাইস মিস্ত্রি রাধানাথের ৩ টাকা মাইনে বাড়ানো হয় ১৮৩৪-এর জানুয়ারিতে। কিন্তু পরের মাসেই তিনি কাজ ছেড়ে দেন এবং শিবচাঁদ মিস্ত্রি ওই ১৫ টাকা মাহিনাতেই কাজে যোগ দেন।

এই ছবির সঙ্গে ইতিপূর্বে বিবৃত সরকারি জাহাজি কারখানার ভারতীয়দের কথা যুক্ত করলে সহজেই বোঝা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই কলকাতায় আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ওয়াকিবহাল শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে এবং তার জন্যে কোনো কারিগরি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন হয়নি।

ম্যাথমেটিক্যাল ইন্‌সট্রুমেন্ট্‌স ডিপার্টমেন্টের প্রবাদ প্রতিম প্রাণপুরুষ হিসাবে যিনি বারো-র পরে প্রতিষ্ঠিত হন তিনি মাদ্রাজের আর্কট নামক স্থানের বাসিন্দা সৈয়দ মীর মহসিন হোসেন। ১৮২৩ থেকে ১৮২৭ অবধি ভারতের জরিপ বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন ভ্যালেন্টিন ব্ল্যাকার। ব্ল্যাকারই মহসিনকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। ১৮৩৬-এ মহসিন লাভ করেন গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিকাল সার্ভের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট পদ।

বারোর অবসর গ্রহণের কয়েক বছর পরে, ১৮৪৩-এ মহসিন 'ম্যাথমেটিক্যাল ইন্‌সট্রুমেন্ট মেকার'-এর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে কলকাতার কারখানার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ অবধি, আমৃত্যু মহসিন অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে সার্ভের কাজে ব্যবহৃত অসংখ্য যন্ত্রপাতির মেরামতি, সংস্কার ও উন্নতিসাধনে তাঁর সৃজনীশীল কারিগরি কল্পনার ও দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, মহসিন ইংরাজি লিখতে পারতেন না বলে তাঁর নিয়োগ নিয়ে কিছু মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল কিন্তু এভারেস্টের হস্তক্ষেপে (পূর্ববর্তী সাহেব ইন্‌সট্রুমেন্ট মেকারের অর্ধেক মাহিনা, অর্থাৎ মাসে ২৫০ টাকায় হলেও) পদটি তিনি লাভ করেন।

এভারেস্ট জরিপের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র সংক্রান্ত কাজকর্মে সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন মহসিনের উপরে। অ্যাজিমুথ সার্কল, বেস লাইন মাপার কাজে এভারেস্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী বড় মাপের থিওডোলাইট, সাইট ভেন্‌স বা আরগ্যাণ্ড ল্যাম্প ইত্যাদি নির্মাণে মহসিনের কুশলতা উপলব্ধি করে এভারেস্ট লিখেছিলেন,

> '.......I must do that artist the justice to say that for excellence of workmanship, accuracy of division, steadiness, regularity, and glibness of motion, and the general neatness, elegance and nice fitting of all parts, not only were my expectations exceeded but I really think it as a whole as unrivalled in the world as it is unique.'

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ম্যাথ্‌মেটিক্যাল ইন্‌সট্রুমেন্ট্‌স আফিস উড স্ট্রিটে তার নিজস্ব নবনির্মিত ভবনে উঠে আসে। সেই অফিসের ডান ধারে রয়েছে একটি সুদৃশ্য চিমনি। এই চিমনিই সাক্ষী, কারখানার যন্ত্রপাতি চালানোর কাজে স্টিম ইঞ্জিন ব্যবহার হত। তারই বয়লারের অঙ্গ এই চিমনি। এ যে-সময়ের কথা তখনও বৈদ্যুতিক মোটরের প্রচলন হয়নি।

১৯৫৫ অবধি কারখানাটি এখানেই ছিল। তারপব পাবলিক সেক্টর আণ্ডারটেকিং হিসাবে মিনিস্ট্রি অব ইণ্ডাস্ট্রি এন্ড্‌ সাপ্লাই কারখানাটির দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সেটি যাদবপুরের নব-নির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। নামও পরিবর্তিত হয়। অতীত গৌরবের জের বহন করে 'ন্যাশনাল ইনসট্রুমেন্ট্‌স'-এর অগ্রগতি আজও অব্যাহত।

আতস বাজি ও কাচের কারখানা

ছাপাখানা, গয়নার দোকান ইত্যাদিকে কারখানার অন্তর্ভুক্ত করার যুক্তি নেই। এই বিবেচনায় জাহাজি কাবখানার চেয়েও প্রাচীন কলকাতার আদি কিছু উৎপাদন সংস্থার পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে স্টার্নডেল সংকলিত কলকাতার কাছারির ঐতিহাসিক বিবরণে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাচ ও বাজি তৈরির কারখানা। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে কাচ-নির্মাতা হিসাবে বাৎসরিক ৯০০ টাকার লাইসেন্স নিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ ঘোষ। ১৭৬৫-তে ওই একই লাইসেন্স ৮৬০ টাকায় নিয়েছিলেন বাবুরাম ঘোষ এবং ১৭৬৮-তে ৫০০ টাকায় কালি শিশগড়। অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতায় কাচ তৈরির কারখানা ছিল, এটা বিস্ময়কর সংবাদ। সম্ভবত কাচ নয়, আয়না তৈরি হত এইসব কারখানায়। তবে 'শিশগড়' উপাধিধারী শেষোক্ত লাইসেন্স-গ্রহীতা এ-বিষয়ে আরো অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে। 'শিশগড়' শব্দটির অর্থই তো কাচ নির্মাণকারী! ('শিশমহল'-এর সঙ্গে তুলনা করলেও স্পষ্ট হবে।)

কাচের কারখানা ছাড়াও এই পর্বে স্থাপিত হয়েছিল আতসবাজি তৈরির কারখানা। ময়েনদি বারুদগড় ১৭৬৩-তে, কালিচরণ সিং ১৭৬৫-তে এবং অ্যান্টনি ড'লিভেবা ১৭৬৮-তে যথাক্রমে ৯৭০, ৮২৫ ও ১৮৫০ টাকায় লাইসেন্স নিয়েছিলেন আতসবাজি বিক্রির জন্য। কাচের তুলনায় আতসবাজির কদর বৃদ্ধির একটা স্পষ্ট পরিচয়ও রয়েছে লাইসেন্স ফি'র হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে।

রাসায়নিক ও ওষুধ তৈরির কারখানা

সব সত্ত্বেও উনিশ শতকের মধ্যভাগেও কলকাতাকে ঠিক শিল্পনগরী হিসাবে অভিহিত করা যায় না। আর একবার কোল্‌সওয়ার্দি গ্রান্টের সাক্ষ্য গ্রহণ করে উল্লেখ করা যাক

সে-কালের অন্যান্য প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্রের কথা। জুতো বা আসবাবপত্র নির্মাণে চিনা কারিগরদের কুশলতার কথা স্মরণে রাখলেও কারখানা-পদবাচ্য নয় সে-সব প্রতিষ্ঠান। বাকি থাকে দুটি ময়দা পেষাইয়ের কল, তিন বা চারটি ট্যানারি, কাশিপুরে একটি মোমবাতি তৈরির কারখানা আর হাওড়ায় এ টমসন এন্‌ড্ কোম্পানির দড়িদড়া তৈরির বাষ্পীয় কারখানা। শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের চেয়ে আমদানি ও কেনাবেচার মধ্যেই সেকালের ব্যবসায়ীরা মোক্ষ সন্ধান করেছেন।

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম, প্রকৃত কলকাতায় না হলেও, ডেভিড ওয়াল্‌ডি স্থাপিত 'দক্ষিণেশ্বর কেমিক্যাল ওয়ার্ক্‌স'। শুধু কলকাতায় নয়, ভারতেও মূল রাসায়নিক দ্রব্য নির্মাতাদের পথিকৃৎ ওয়াল্‌ডি আজ বিস্মৃত একটি নাম। স্কটল্যাণ্ডের সন্তান ওয়াল্‌ডি চল্লিশ বছর বয়সে কলকাতায় এসে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কারখানা স্থাপন করেন। ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৯ অবধি আমৃত্যু তিনি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। বেশ কিছু রচনাও প্রকাশিত হয়েছিল সোসাইটির জার্নালে। কলকাতায় পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের ব্যাপারে তাঁর অভিমত ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। একথা সুবিদিত যে এডিনবরার প্রোফেসর সিম্পসন ক্লোরোফর্মের আবিষ্কারক। ওয়াল্‌ডিও সে-সময়ে এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন, সিম্পসনের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপও চলত, কিন্তু ওয়াল্‌ডির অবদান পুরোপুরি অস্বীকৃত হয়েছিল।

কলকাতায় রাসায়নিক দ্রব্য-সংশ্লিষ্ট বড় কারখানার মধ্যে এর পরেই উল্লেখযোগ্য হেমেন্দ্রমোহন বসুর সংস্থা, এইচ বোস ম্যানুফ্যাক্‌চারিং পারফিউমার। ১৮৯০-এ 'কুন্তলীন' কেশতৈল দিয়ে এর যাত্রা শুরু। ২৪ নং মুসলমান পাড়া লেনের কারখানা থেকে তারপর একে একে 'দেলখোস' সেন্ট, পান-মশলা 'তাম্বুলীন', 'কোকোলীন' সাবান, হেয়ারওয়াশ বা শ্যাম্পু ও বিভিন্ন ধরনের সিরাপ উৎপাদন শুরু হয়। এইচ বোসের প্রতিটি পণ্য বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছিল। এ-ছাড়াও সি কে সেন, পি এম বাগচি, নগেন্দ্র সেন, পি শেঠ এন্‌ড্ কোম্পানি ও বটকৃষ্ণ পাল নানা ধরনের দ্রব্যের ব্যবসায়ে প্রায় সমকালে সাফল্য অর্জন করেন।

কিন্তু কলকাতার সেরা রাসায়নিক দ্রব্য নির্মাতারূপে আবির্ভূত হয়েছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে ১৮৯৩-এ স্থাপিত বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্‌ড্ ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস। সোদপুরে জনৈক আসগর মণ্ডলের ছোট একটি সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানা কিনে আচার্য রায় প্রথম ব্যবসায়ে নামেন। তারপরে ৯১ আপার সার্কুলার রোডে প্রফুল্লচন্দ্রের বাসভবনেই স্থাপিত হয় বেঙ্গল কেমিক্যাল। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে লিমিটেড কোম্পানি হওয়ার পরে তার নামের পিছনেও শব্দটি যুক্ত হয়।

প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্যোগে প্রথম যুক্ত হন তাঁর সতীর্থ চিকিৎসক অমূল্যচরণ বসু। তিনি শুধু মূলধন সরবরাহ করেননি, তাঁর মধ্যস্থতাতেই চিকিৎসক মহলে চালু হল বেঙ্গল কেমিক্যালের ওষুধ। অমূল্যচরণের বান্ধবরাও সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন—রাধাগোবিন্দ কর, নীলরতন সরকার, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী। রাধাগোবিন্দ ও অমূল্যচরণ তাঁদের প্রেসক্রিপশনে কালমেঘ, কুর্চি, বাসকের সিরাপ, অ্যাকোয়া-টাইকোটিস বা যোয়ানের আরক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে বেঙ্গল কেমিক্যালে উৎপাদিত কবিরাজি ওষুধের প্রচলনেও সাহায্য করেন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিলেন প্রসিদ্ধ ওষুধ ও রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রেতা বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানির স্বত্বাধিকারী ভূতনাথ পাল, ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বোস

(বোসেজ ল্যাবোরেটরি-খ্যাত), প্রেসিডেন্সি-কলেজের কেমিস্ট্রির ডেমনস্ট্রেটর চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ি।

এই মিলিত প্রয়াসে কোম্পানির প্রসার ঘটে। ইতিপূর্বেই মানিকতলা অঞ্চলে ১০ বিঘার (প্রায় ১·৩৪ হেক্টর) মত জমি কেনা ছিল। ১৯০৫-এ মানিকতলার নবনির্মিত কারখানায় ওষুধ ছাড়াও সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির কাজ শুরু হল।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে রাজশেখর বসু বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯০৪ থেকে তিনি কারখানার ম্যানেজার। একাধারে তিনি ছিলেন কেমিস্ট, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, হিসাবরক্ষক ও সেল্স ম্যানেজার। অর্থাৎ তিনি এক কথায় সংস্থার কাণ্ডারী। রাজশেখর বসুর সঙ্গে কর্মোদ্যোগী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের নামও করা উচিত। ১৯২৫ অবধি তিনি ছিলেন কারখানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

মানিকতলার কারখানায় স্থানাভাব হলে ১৯১৯-এ পানিহাটিতে ১৩৫ বিঘা (১৮ হেক্টর) জমি কিনে নূতন কারখানা বসানোর কাজ শুরু হয়। ১৯২২-এ এই দ্বিতীয় কারখানায় 'কোল টার' পাতনের কাজ শুরু হয়। ১৯২৪ থেকে এখানে ফটকিরি এবং ১৯৩১ থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন শুরু হয়।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল কেমিক্যালের বোম্বাইয়ের কারখানা ও ১৯৪৭-এ কানপুরের কারখানা চালু হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর পরেই কলকাতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ওষুধ তৈরির সংস্থা বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি। এই কোম্পানি ভারতে প্রথম সিরাম তৈরি শুরু করে। নীলরতন সরকার, কৈলাসচন্দ্র বসু ও বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ চিকিৎসকদের উদ্যোগে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা। ডিপথিরিয়া, টিটেনাস ও ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি প্রভৃতির প্রতিষেধক তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯১৯ থেকে কলেজ স্ট্রিট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে ছোট একটি ল্যাবোরেটরিতে কাজ শুরু হয়। কিছুদিন পরে গবেষণাগারটি ২০৫ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। সিরাম তৈরির জন্য কয়েকটি ঘোড়া কিনে মানিকতলার এক আস্তাবলে রাখার পর ডাঃ চারুব্রত রায় ও ডাঃ অমূল্য উকীল প্রমুখ কাজ শুরু করেন।

স্থান অকুলান হওয়ায় গবেষণাগারটি ১৩৫ প্রিন্সেপ স্ট্রিটে সরিয়ে আনা হয়। ১৯২৩-২৪ নাগাদ কোম্পানির অর্থনৈতিক অবস্থা যখন সঙ্গীন ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ণধার হিসাবে এর সব ভার গ্রহণ করলেন। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও দূরদর্শিতার ফলে বেঙ্গল ইমিউনিটি অবশেষে তার প্রাপ্য সম্মান ও প্রতিপত্তি আদায় করে নিল। কালক্রমে বরানগরে স্থাপিত হল আস্তাবল সমেত বিরাট কারখানা ও বর্তমান জগদীশচন্দ্র বসু রোডে বেঙ্গল ইমিউনিটি রিসার্চ ইন্‌সটিটিউট। কোম্পানির হেড অফিস ১৫৩ ধর্মতলা স্ট্রিটের ইমিউনিটি হাউস।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে খগেন্দ্রচন্দ্র দাশ, বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও রাজেন্দ্রনাথ সেনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি। খগেন্দ্রচন্দ্র জাপান ও আমেরিকা থেকে উচ্চ-কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। মাত্র ৯০০০ টাকা মূলধনে ৩৫ পণ্ডিতিয়া রোডে স্থাপিত কারখানায় প্রথমে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির পরিত্যক্ত আবর্জনা 'স্পেন্ট অক্‌সাইড' কিনে এনে তার থেকে ইয়েলো প্রুশিয়েট অব পটাশ উৎপাদন শুরু হয়।

পরবর্তিকালে নিমের তেল থেকে তৈরি 'মার্গো' সাবান ও নিম টুথপেস্ট-এর জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও ক্যালকাটা কেমিক্যাল প্রথম দিকে ছিল রাসায়নিক কারখানা। ভারতে প্রথম স্টিয়ারিক, ওলিক ও ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং পটাশিয়াম কার্বনেট ইত্যাদি তাঁরাই উৎপাদন করেন।

তিলজলায় কোম্পানির দ্বিতীয় কারখানাটি ১৯৩৮-এ এবং ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের কোডাম্বকমে তৃতীয় কারখানাটি স্থাপিত হয়।

১৯৩৬-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের পত্তন করেন অশোক সেন। ৮ হেয়ার স্ট্রিটে মাত্র জনা ছয়েক কর্মী নিয়ে যাত্রা শুরু। ১৯৪০-এ যেখানে বিক্রি মাত্র ৪২ হাজার টাকার, ১৯৬৮-তে সেই অঙ্ক পৌঁছোয় ৩·৫ কোটিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রসায়নে এম এস সি ডিগ্রিধারী অশোক সেনের হাতেখড়ি হয়েছিল বেঙ্গল ইমিউনিটিতে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের অব্যবহিত আগে ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল অবধি কলকাতায় স্বদেশী উদ্যোগের একটি হাওয়া এসেছিল। সে-কথায় আসার আগে কলকাতার স্থল-পরিবহণ, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য পেশ করা দরকার।

ঘোড়ার গাড়ির কারখানা

কলকাতার প্রাচীনতম ও সবচেয়ে বিখ্যাত ঘোড়ার গাড়ি নির্মাতা বা 'কোচ মেকার্স' স্টুয়ার্ট এন্‌ড্ কোম্পানি স্থাপিত হয় ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৮৩-তে কোম্পানিটি উঠে আসে ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নারে। ১৯০৭-এর পর সেটি স্থানান্তরিত হয় ৩ ম্যাঙ্গো লেনে এবং ১৯৩০-এ ফ্রি-স্কুল ও পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে। অনেক হাত বদলের পর আজও ভারতীয় মালিকানায় স্টুয়ার্ট এন্‌ড্ কোম্পানি পণ্ডিতিয়া স্ট্রিটে নগণ্য এক মোটর মেরামতিব কারবার চালিয়ে যাচ্ছে।

ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নারে দু বিঘারও (প্রায় ০·২৭ হেক্টর) বেশি জায়গা জুড়ে স্টুয়ার্ট কোম্পানির কারখানায় যাবতীয় ঘোড়ার গাড়ি তৈরি হত—চেরোট, বগি, ফিটন, ল্যাণ্ডো, ভিক্টোরিয়া, ব্রুহাম, ব্রাউনবেবি ও আবো কত নাম। ভারতীয় রাজা-মহারাজা, বড়লাট, এমন কি ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ ও সম্রাটের জন্যও বহু ফরমায়েসি বাহারি গাড়ি তৈরি হয়েছে এখান থেকে।

উনিশ শতকের কলকাতায় স্টুয়ার্ট কোম্পানির পরেই সবচেয়ে নাম-করা কোচ-মেকার্স—ভাইক্‌স এন্‌ড্ কোম্পানি। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল তৈরি হওয়ার পরে তারা ১ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট ছেড়ে উঠে আসে ১৫ ওয়াটারলু স্ট্রিটে।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দেব পরে কলকাতায় মোটরগাড়ির বেশ চল হওয়ায়, এই দুটি কোম্পানিই মোটরগাড়ির 'বডি' তৈরির কাজও শুরু করে। যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেছিল তারা।

উনিশ শতকে বিদেশি কোচ মেকার্সদের সঙ্গে কয়েকটি দিশি কোম্পানিরও নাম পাওয়া যায়:

নানাভাই ধুনজি এন্‌ড্ কোং	২১ ধর্মতলা স্ট্রিট
শেখ মকসুদ আলি	লোয়ার সার্কুলার রোড
হরিশচন্দ্র বোস	২-১ লোয়ার সার্কুলার রোড
এ সি ঘোষ এন্‌ড্ কোং	অক্রুর দত্ত লেন
ইউ এন ব্যানার্জি এন্‌ড্ কোং	তালতলা

ট্রাম কোম্পানির কারখানা

১৯০২-এ কলকাতায় ইলেকট্রিক ট্রাম চালু হওয়ার সময়ে নোনাপুকুরে একটি ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন বসানো হয়। ট্রাম কোম্পানির কারখানাও এই নোনাপুকুরেই অবস্থিত। শুরুতে এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য তিনটি বিশাল আনুভূমিক স্টিম ইঞ্জিন ও

তার সঙ্গে সংযুক্ত ডি সি জেনারেটর বসানো হয়েছিল। ৯০ আর পি এম গতিতে চালিত প্রতিটি ইঞ্জিন থেকে ৯৫০ অশ্বশক্তি পাওয়া যেত। প্রতিটি ডি সি জেনারেটর ৫০০ কিলোওয়াট উৎপাদন করতো—৫৫০ ভোল্টে। স্টিম ইঞ্জিনে বাষ্প সরবরাহ করার জন্য ছিল মোট ছ'টি 'গ্যালোয়ে' (ল্যাংকাশায়ার) বয়লার—৮ ফুট (২·৪৪ মিটার) ব্যাস ও ৩০ ফুট (প্রায় ৯·১৪ মিটার) দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। পরবর্তিকালে ট্রাম কোম্পানি নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা বন্ধ করে দিলেও নোনাপুকুর কারখানায় ট্রামের মেরামতি বা 'কোচ্-বিল্ডিং' আজও অব্যাহত রয়েছে।

ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি 'সমাচার সুধাবর্ষণ' লিখছে, 'গ্যাস কোম্পানিরা কলিকাতা রাজধানী মধ্যে কাম্পারবেন্সির কমিসানর দিগের আদেশক্রমে যে প্রকার আলো দিবেন কএক দিবসাবধি তাহার নমুনা দর্শাইতেছেন......।' এই নমুনা দর্শিয়েছিল 'দা ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি' এবং ১৮৫৭-এর জুলাই থেকে কলকাতার পথে গ্যাসের আলো জ্বলতে শুরু করে। বর্তমান মহম্মদ আলি পার্কের জায়গায় এই কোম্পানি তাদের প্রথম গ্যাস তৈরির কারখানা বসিয়েছিল। দৈনিক ৩ লক্ষ ঘন ফুট (৮৪৯৫ ঘনমিটার) গ্যাস তৈরির ব্যবস্থা ছিল তখন। পরে কারখানাটি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে স্থানান্তরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৭০ থেকে পাকাপাকি ভাবে বসে তার বর্তমান ঠিকানায়—নারকেলডাঙায় ক্যানাল ওয়েস্ট রোডে।

নারকেলডাঙা থেকে গ্যাস সরবরাহ শুরু হওয়ার পরে সুলভ সমাচার (৫ মাঘ ১২৭৭ শকাব্দ) লিখেছিল, 'কলিকাতায় একেবারে আলোর কুরকুট্টি।' গড়ের মাঠে ২১০, কেল্লায় ৩১০, রাস্তা ও গলিতে ২৭১১, গৌখানায় ১৩ ও গৃহস্থের বাড়িতে ৪৫০০-এরও বেশি গ্যাসের আলো জ্বলত সে-সময়ে। একটা আলো জ্বালালে ৪ টাকা ও দুটো জ্বালালে ৭ টাকা দিতে হত। 'নারকেলডাঙার বাতিঘরে এই ধোঁয়া করিবার জন্য প্রতিদিন প্রায় দেড় হাজার মোন পাতুরে কয়লা পোড়ান হইযা থাকে ; সেই ধোঁয়া হিরাকশ, করাতের গুঁড়া ও চুণ দিয়ে সাফ করিলেই গ্যাস হয়।'

১৯৩৭ থেকে ১৯৫১-এর মধ্যে কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের আলোর সংখ্যা সর্বোচ্চ ১৯,০০০-এ পৌঁছেছিল। মনে রাখা দরকার কলকাতার রাস্তায় কিন্তু ১৯০১ থেকে বিজলী আলো জ্বলতে শুরু করেছে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯-এর মধ্যে কলকাতার পথ থেকে যাবতীয় গ্যাসের আলো নির্মূল কবা হয।

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কারখানা

কলকাতার এখানে-সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিজলী আলো জ্বালার ব্যবস্থা ১৮৮০ থেকেই নিয়মিত ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু যাকে 'টাউন সাপ্লাই' বলে, শুরু হয় ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন স্থাপিত হওয়ার পরে। এই কোম্পানির প্রথম জেনারেটিং স্টেশন স্থাপিত হয় ইমামবাগ লেনে, প্রিন্সেপ স্ট্রিটের কাছে। ক্রম্পটন ডায়নামো ও 'উইলান্স' ইঞ্জিনের সাহায্যে ১৮৯৯-এর ১৭ এপ্রিল প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়—৪৫০ ও ২২৫ ভোল্টে ডাইরেক্ট কারেন্ট (ডি সি)। বাড়াত চাহিদার দরুণ ক্রমেই শহরের বিভিন্ন অংশে আরো জেনারেটিং স্টেশন স্থাপিত হতে থাকে—১৯০২-এ আলিপুরে (৭৫০ কিলোওয়াট). ১৯০৫-এ হাওড়ায় (১৬৫

কিলোওয়াট) এবং ১৯০৬-এ উল্টোডাঙায় (১২০০ কিলোওয়াট)।

উল্টোডাঙার কারখানা থেকে কলকাতায় প্রথম অলটারনেটিং কারেন্ট (এ সি) সরবরাহ শুরু হয় ১৯১০-এর সেপ্টেম্বরে।

কাশিমপুরের এ সি পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে ৬০০০ ভোল্টে উৎপাদন শুরু হয় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। বিভিন্ন সাব-স্টেশনে এই ৬০০০ ভোল্ট এ সি-কে ডি সি-তে রূপান্তরিত করে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হত। প্রথম তিনটি সাব-স্টেশন জ্যাকসন লেন, ওয়েলেসলি স্ট্রিট ও প্রিন্সেপ স্ট্রিটে স্থাপিত হয়। পরবর্তিকালে হাওড়া, উল্টোডাঙা ও আলিপুরের ডি সি উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে সাব-স্টেশনে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯২৬-এ সাদার্ন জেনারেটিং স্টেশন, ১৯৪০-এ মুলাজোড়, ১৯৫০-এ কাশিপুর এবং ১৯৭৯-তে টিটাগড়ের ২৪০ মেগাওয়াট জেনারেটিং স্টেশনের উদ্বোধন হয়।

ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কারখানা

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার প্রথম পয়ঃপ্রণালী নির্মাণেব পরিকল্পনা গ্রহণের সময়েই বেলেঘাটা খালের উত্তর পাড়ে কর্পোরেশনের প্রথম কারখানা স্থাপিত হয়। উইলিয়াম ক্লার্ক নিযুক্ত হন প্রথম ইঞ্জিনিয়ার। মর্টার মিল, কাঠ-চেরাই কল ইত্যাদি যন্ত্র ছিল এখানে। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে এই কারখানা উঠিয়ে আনা হয় এন্টালিতে এবং এখনও তা সেখানেই রয়েছে।

কলকাতার জলসরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নানা মেরামতি ও নির্মাণ-কার্য ছাড়াও এই কারখানায় ইঞ্জিন, বয়লার ও স্টিম রোড-রোলাব ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের কাজ হত। কারখানার অন্তর্ভুক্ত ঢালাই বিভাগটি থেকে জলের কল, গ্যাস পোস্ট ইত্যাদিও উনিশ শতকের শেষ দিকে তৈরি হতে শুরু হয়।

এন্টালির কারখানায় উনিশ শতকে নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে কাজ হত :

১. মেশিন ও ফিটিং শপ ২. কার্পেন্টার্স শপ ৩. ব্ল্যাকস্মিথস্ শপ ৪ ব্রাস্ ফাউন্ড্রি ৫. আয়রন ফাউন্ড্রি ৬. লোকোমোটিভ এনড্ ওয়াগন শেড ৭. বয়লার শেড ৮. ইঞ্জিন এনড্ বয়লার শেড।

লোকোমোটিভ এনড্ ওয়াগন-শেড বিভাগটির উৎপত্তি ১৮৬৭-তে, কর্পোরেশন যখন আবর্জনা অপসারণের জন্য প্রথম থিয়েটার রোড থেকে বাগবাজার স্ট্রিট পর্যন্ত সার্কুলার রোড দিয়ে রেল লাইন পেতে ট্রেন চলাচল শুরু করে।

স্বদেশী কারখানা

রাসায়নিক কারখানা অধ্যায়ে এইচ বোস ও বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। এবার অন্যান্য উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিববণ।

১৮৬৭-তে কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় শিবপুব আয়রন ওয়ার্কস স্থাপন করেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দেও ১১০ জন কারিগর চালিত এই কারখানাটি চালু ছিল।

১৮৯১-এ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সের সময়ে স্থাপিত ইণ্ডিয়ান ইনডাস্ট্রিয়াল এসোসিয়েশন প্রদত্ত বৃত্তির সাহায্যে বিদেশে কারিগরি বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগপ্রাপ্ত বাঙালি প্রযুক্তিবিদদের বেশ কয়েকজন কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কসের মূল স্থপতি সত্যসুন্দর দেব, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় দেশলাই কারখানার স্থপতি এ পি ঘোষ, ক্যালকাটা কেমিক্যালের কে সি দাস ও আর এন সেন এবং বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের এস এম বোসের নাম বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য।

স্বদেশী কারখানার মধ্যে সর্ব অর্থেই সার্থক ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস সম্বন্ধে দু' চাব কথা বলা প্রয়োজন। ১৯০১-এ রাজমহলের কাছে চিনামাটি আবিষ্কৃত হয় এবং কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ ও হেমচন্দ্র সেন চিনামাটির ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০৬-এ সত্যসুন্দব দেব জাপান থেকে সিরামিক বিদ্যার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ফেরার পরেই অবশ্য আধুনিক রীতিতে চিনামাটিব দ্রব্যের উৎপাদন শুরু হয়। ৪৫ ট্যাংরা রোডে আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত কারখানায় ১৯০৬ থেকেই স্বদেশী চায়ের কাপ, ডিশ ও পট তৈরি শুরু। তারপর দোয়াত, পুতুল ও ইনসুলেটর ইত্যাদিও যুক্ত হয় উৎপাদিত দ্রব্যের তালিকায়। গ্লেজ—অর্থাৎ কাচের প্রলেপ বিশিষ্ট মাটির বাসন উৎপাদনে ক্যালকাটা পটারি পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছিল।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স। উপেন্দ্রনাথ সেনের পরিচালনায় ১৯০৭-এ এখানে ২৬,০০০ স্পিণ্ডল ও ২০টি লুম চলত। বাংলাদেশের কলের কাপড় তৈরির সেরা ও প্রধান সংস্থা ছিল বঙ্গলক্ষ্মী।

খিদিরপুরের একটি পুরনো হোসিয়ারি কোম্পানি কিনে আবদুস শোভান ও এ এইচ গজনাভি ১৯০৮-এ প্রতিষ্ঠা করেন বেঙ্গল হোসিয়ারি কোম্পানি।

কলকাতায় চামড়া শিল্পের কাজে ট্যানারি প্রতিষ্ঠায় প্রথম সফল হয়েছিল ডাক্তার নীলরতন সরকারের উদ্যোগে বেলেঘাটায় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত ন্যাশনাল ট্যানারি। ডাক্তার সরকারের সহযোগী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ রায় ও চামড়া বিশেষজ্ঞ বিরাজমোহন দাস।

এই পর্বে কলকাতার সাবান তৈরির কারখানার মধ্যে ৯২ আপার সার্কুলার রোডের ন্যাশনাল সোপ ফ্যাক্টরি (ডাক্তার নীলরতন সরকার স্থাপিত), ৫৪/১ মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের বেঙ্গল সোপ কোম্পানি ও গোয়াবাগানের ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরির নাম উল্লেখযোগ্য।

দেশলাই কারখানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—৩৮ রসা রোডে রাসবিহারী ঘোষ স্থাপিত (১৯০৭) বন্দে মাতরম ম্যাচ ফ্যাক্টরি ও কোন্নগরের দ্য ওরিয়েন্টাল ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি।

বেশ কয়েকটি শস্তা সিগারেট তৈরির কারখানাও ছিল কলকাতায়—২০ ট্যাংরা রোডে গ্লোব সিগারেট কোম্পানি, ১৭ বেলেঘাটা রোডে ইস্ট ইণ্ডিয়া সিগারেট কোম্পানি এবং ৪২ শ্যামপুকুর স্ট্রিটে বেঙ্গল সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি।

এছাড়া ১৩০ বাগমারি রোডের বেঙ্গল বাটন ফ্যাক্টরি, এফ এন গুপ্তের পেন্সিলেব কারখানা, চিৎপুরে দাস এন্‌ড্‌ কোম্পানির লোহার সিন্দুকের কারখানা ও মেছুয়াবাজারের আর্য ফ্যাক্টরির কথাও স্মরণ করা উচিত।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে একটি বিবাট শিল্প-প্রদর্শনী হয়েছিল। অংশগ্রহণকারী কলকাতার কারখানাগুলিব (পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে) একটি তালিকা সন্নিবেশ করছি।

১. বেঙ্গল সিল্ক মিল্‌স, উল্টোডাঙা
২. এল এম রক্ষিত, ৮০/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র)
৩. ক্যালকাটা উইভিং কোম্পানি, ৯৮ ক্লাইভ স্ট্রিট
৪ এন কে মজুমদার এন্‌ড্‌ কোং, ২৩ হ্যারিসন রোড (হোসিয়ারি)
৫. পি সি বোস এন্‌ড্‌ কোং, ভবানীপুর (ওই)
৬. বেঙ্গল হোসিয়ারি, ভবানীপুর

৭· ইউনাইটেড বেঙ্গল হোসিয়ারি, ৫৯/৫ হ্যারিসন রোড
৮· ন্যাশনাল হোসিয়ারি, ১৯ বেলতলা স্ট্রিট
৯· ক্যালকাটা হোসিয়ারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, ২ আশুবাবু লেন
১০· ন্যাশনাল স্কুল অব উইভিং, ২০৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (বিভিন্ন ধরনের তাঁত)
১১· পল্লী শিল্পশালা, ৪ মদনমোহন চ্যাটার্জি লেন (উন্নত ধরনের তাঁত)
১২· পি এম বাগচী, ৩৮/২ মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট (কালি, মাথার তেল ইত্যাদি)
১৩· ইণ্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, ৮১/১ অখিল মিস্ত্রি লেন (ওই)
১৪· এইচ এম নাগ এনড্ কোম্পানি, সিমলা (প্রসাধন দ্রব্য)
১৫· ঘোষ ব্রাদার্স এন্ড্ কোম্পানি, ৯ রাধানাথ গোস্বামী লেন (ওই)
১৬· বীণা সোপ ফ্যাক্টরি, ২/১ কারবালা ট্যাংক লেন
১৭· দে ব্রাদার্স, ৬৭/৬৮ কলুটোলা স্ট্রিট (সাবান)
১৮· এস দত্ত এনড্ কোং, ১১ কলেজ স্ট্রিট (সুগন্ধী দ্রব্য)
১৯· পিকক কেমিক্যাল ওয়ার্কস, ওই (ওই)
২০· ইণ্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, ১৩ আপার সার্কুলার রোড (ভেষজ)
২১· অক্ষয়কুমার ধর, ১২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (স্টিলের বাক্স ইত্যাদি)
২২· কে ভট্টাচার্য এনড কোং, ২৩৮ বৌবাজার স্ট্রিট (ওই)
২৩· বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস, কলকাতা
২৪· এন ডি সরকার এনড্ কোং, ৩১ বেন্টিংক স্ট্রিট (জুতা)
২৫· এম হোসেন এনড্ সন্স, ৭২ বেন্টিংক স্ট্রিট (জুতা)
২৬· বেঙ্গল লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, ৫১ নিমতলা ঘাট স্ট্রিট (ওই)
২৭· এস বোস এনড্ কোং, কালীঘাট (চামড়ার পালিশ)
২৮· বেঙ্গল টাইল ফ্যাক্টরি (রঙিন টালি)
২৯· বেঙ্গল আর্টিফিসিয়াল স্টোর কোং (পাথরের পাত্র ও মূর্তি)
৩০ আর টি ভট্টাচার্য, ২৬৭ বৌবাজার স্ট্রিট (আসবাব)
৩১· এস সি রায় (উন্নত ধরনের কেরোসিনের আলো)
৩২· পি এন দত্ত এনড্ কোং, ২০ গুলু ওস্তাগর লেন (ওই)
৩৩· ইণ্ডিয়ান লাইমজুস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (লাইমজুস)
৩৪· কে সি বোস এনড্ কোং, ২ কালাচাঁদ সান্যাল লেন (বিস্কুট, বার্লি)
৩৫· এ ভি বোস এনড্ কোং (বিস্কুট)
৩৬· দে ব্রাদার্স, ১১ বনমালি চ্যাটার্জি স্ট্রিট (ঘন দুধ)
৩৭· জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভবানীপুর (গঙ্গামাতা দেশলাই)
৩৮· সরস্বতী লেড পেনসিল ফ্যাক্টরি
৩৯· স্বদেশী সিগারেট কোং, ২৬ গ্যালিফ স্ট্রিট

প্রথম দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্ব

স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে কলকাতা সমেত পশ্চিমবঙ্গে কল-কারখানা স্থাপন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সমস্যা হচ্ছে, স্বতন্ত্রভাবে কলকাতার কারখানা নিয়ে বিশেষ কোনো সমীক্ষা কখনও চালানো হয়নি। তথ্য যা কিছু পাওয়া যায়, সবই সামগ্রিকভাবে 'বেঙ্গল'-এর। তারই মধ্যে একটি ব্যতিক্রম ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস এসোসিয়েশনের পঁচিশতম অধিবেশন উপলক্ষে ১৯৩৮-এ প্রকাশিত স্মারক পুস্তকের খতিয়ানটি। কলকাতা

সন্নিহিত হুগলি তীরবর্তী মিল এলাকাটি ধরে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ২০টি সুতাকল, ১৬টি হোসিয়ারি ও ৯৫টি জুটকল ছিল। তাছাড়া ১৮টি দেশলাই কারখানা, ১৪টি সাবান কারখানা, ৪টি ট্যানারি, ৭টি কাচের কারখানা, ১২৯টি ধানকল, ৩৬টি তেলকল ও ১২টি গমকল ছিল। রেশম ও পশম বস্ত্র তৈরির, গ্রামোফোন রেকর্ড নির্মাণের ও বিস্কুটের কারখানা ইত্যাদিও ছিল। আদমসুমারি অনুসারে ১৯৩১-এ কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চল এবং হাওড়ায় নারী-পুরুষ মিলে নিযুক্ত শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা এবং বিভিন্ন সংস্থায় নিযুক্ত এই শ্রমিকের পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হল। এ-থেকে কল-কারখানার অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায় :

	শিল্পের শ্রেণী	শ্রমিকের সংখ্যা	শতকরা হিসাব
১.	টেক্সটাইল	৩৪,৩১৩	২৪.৬১
২.	ট্যানারি	২১১	০.১৫
৩.	কাঠ	১২,৮৬৩	৯.২২
৪.	ধাতু	৪,১০৪	২.৯৪
৫.	সেরামিক	১,৬৯২	১.২১
৬.	রাসায়নিক দ্রব্য	১,৫৩৫	১.১১
৭.	খাদ্য-দ্রব্য	৯,৪৯৫	৬.৮১
৮.	পোশাক ও প্রসাধন	৩১,৯৫১	২২.৯১
৯.	আসবাব	১,৪২৩	১.০২
১০.	গৃহনির্মাণ	১৪,০২৪	১০.০৬
১১.	পরিবহণ সংক্রান্ত	১,১৪৬	০.৮২
১২.	গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি ইত্যাদি	২,৬৬৮	১.৯২
১৩.	বিবিধ শিল্প	২৪,০০৩	১৭.২২
	মোট	১,৩৯,৪২৮	১০০

প্রসঙ্গত জানানো দরকার যে, পশ্চিমী যন্ত্রপাতি সহযোগে বাংলার প্রথম জুটকলটি ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রিষড়ায় স্থাপিত হয়। জর্জ অকল্যাণ্ড এটি স্থাপন করেন। পরবর্তিকালে সেটি ওয়েলিংটন মিল নামেই বেশি পরিচিত হয়। বাংলার দ্বিতীয় জুটকল বরানগর জুট মিল ১৮৫৭-য় স্থাপিত হয়। এর পরে গৌরীপুর জুট ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয় ১৮৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে।

আধুনিক কলকাতার কারখানা

কোনো আধুনিক শহরেরই মূল ব্যবসায়িক বা আবাসিক অঞ্চলে কারখানা স্থাপনের অনুমতি লাভ করা সম্ভব নয়। বর্তমান কলকাতার ক্ষেত্রেও সে-কথা প্রযোজ্য। কিন্তু নূতন কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র না পেলেও অপরিকল্পিত কলকাতায় প্রাচীনকালে যে-কারখানাগুলি স্থাপিত হয়েছিল, স্বয়ংমৃত্যু না ঘটলে তারা আজও যে-যার জায়গাতেই বিরাজ করছে। কলেজ স্ট্রিট-বৌবাজার অঞ্চলে ছাপাখানা ও ব্লক তৈরির ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান গৃহস্থ বাড়ির ছত্রছায়াতেই আজও প্রতিপালিত। পুরো কলকাতা জুড়েই ছড়িয়ে আছে মোটরগাড়ি মেরামতির অজস্র ছোট-বড় কারখানা।

একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে মূল কলকাতা আয়তনে স্ফীত হয়েছে। ফলে, এককালে যা ছিল শহরের উপকণ্ঠে স্থাপিত একটি কারখানা, আজ তা ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকার অন্তর্বর্তী। একটি উদাহরণ যাদবপুরের 'বেঙ্গল ল্যাম্প'।

তবে এসব সত্ত্বেও মূল কলকাতার শিল্পাঞ্চল মুখ্যত পশ্চিমে নদীপারে গার্ডেনরিচ ও হাইড রোড অঞ্চলে ও পূর্বে শিয়ালদহ স্টেশন-তান্ত্রিক রেলপথের দু'ধারে সন্নিহিত।

অধুনা বিকশিত সল্ট লেক অঞ্চলেও স্থাপিত হয়েছে কয়েকটি কারখানা যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রাজ্যের পাবলিক সেক্টর ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভলাপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (W B E I D C) ও ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত একটি বহুমুখী ইলেকট্রনিক্স সংস্থা।

১৯৬০ থেকে শুরু করে নিয়মিত ব্যবধানে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত ও রেজিস্ট্রিকৃত কারখানার নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানটি খুবই মূল্যবান :

খ্রিস্টাব্দ	১৯৬০	১৯৭০	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৮৬
কলকাতা	৫৩১	৬৫৩	৫৯৪	৭৭২	৭৮২
পশ্চিমবঙ্গ	৪০৯৩	৫৬১২	৬৪২১	৭৮৬৪	৮০৬৪
পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় কলকাতার কারখানার শতকরা অনুপাত	১৩%	১১.৬%	৯.২%	৯.৮%	৯.৭%

এই হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে কলকাতা-কেন্দ্রিক কল-কারখানা স্থাপনের প্রবণতা বর্তমানে কিঞ্চিৎ হ্রাস পেয়েছে, যা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতির সহায়ক।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে কলকাতার রেজিস্ট্রিকৃত ৭৮২টি কারখানায় (পশ্চিমবঙ্গের কারখানার ৯.৭ শতাংশ) নিযুক্ত আছেন ১,৮১,০০০ শ্রমিক (পশ্চিমবঙ্গের রেজিস্ট্রিকৃত কারখানা-শ্রমিকদের ২%)।

অবশ্য এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নয় ক্ষুদ্রাকার ও কুটির শিল্পগুলি। ১৯৮৮-এর ৩১ মার্চ অবধি কলকাতায় রেজিস্ট্রিকৃত এরূপ সংস্থার মোট সংখ্যা ৪১,৯১৮। এর মধ্যে ১৭৯০টি নূতন সংস্থা ১৯৮৭-৮৮-তে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

কলকাতার পরিবেশ ও দূষণ

অশোক মুখোপাধ্যায়

পরিবেশ শব্দটিব আভিধানিক অর্থ চারদিক, চারদিকের অবস্থা, পাবিপার্শ্বিক ইত্যাদি। তবে এখানে পরিবেশ বলতে বুঝতে হবে, এমন কিছু যা মানুষ, প্রাণী, গাছপালা প্রভৃতিকে প্রভাবিত করে। পরিবেশ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও আসে—ইকোলজি, পরিবেশনির্ভর জীববিজ্ঞান। দু'টি প্রাণীর পরস্পর সম্পর্ক বা নির্ভরতা ও প্রকৃতির উপরে তার প্রভাব, এই বিষয়টির আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাই ইকোলজির অন্যতম লক্ষ্য।

আজ পর্যন্ত মানুষ এই পৃথিবী ও মহাবিশ্বের যতটুকু খবর জানতে পেরেছে তাতে দেখা যায়, প্রাণ ও প্রাণী বলতে আমরা যা বুঝি, তা কেবলমাত্র আমাদের গ্রহেই আছে। তার কারণ প্রাণের উদ্ভব, বিকাশ ও তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে-পরিবেশগত অবস্থার একান্ত প্রয়োজন, তা কেবল পৃথিবীতেই লক্ষ্য করা যায়। তাপমাত্রার হেরফের, বাতাস, জল ও অন্যান্য মৌলিক পদার্থ ও তাদের ভারসাম্য এমনই যে, এখানে প্রাণের সৃষ্টি ও তার বিকাশ হতে পেরেছে। ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে শুরু করে বুদ্ধিমান মানুষ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণিজগতে একাকিত্বের স্থান নেই। বেঁচে থাকার পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য সে গাছ ও অন্য প্রাণীর উপরে নির্ভরশীল। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীও শারীরিক প্রক্রিয়ার অংশীদার। বর্জ্য বস্তুকে প্রাকৃতিক পরিশোধন করে পরিবেশকে বাসোপযোগী কবে তোলার পিছনে ক্ষুদ্র প্রাণীদের ভূমিকাই প্রধান।

পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখার জন্য প্রকৃতির জলচক্র, কার্বনচক্র, নাইট্রোজেন-চক্র ইত্যাদি কতগুলি প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুত মানুষ প্রকৃতিব কাছ থেকে অনেক কিছু নেয়। পরিবর্তে যা ফিরিয়ে দেয়, তাকে পরিশোধিত করতে প্রকৃতিকে অনেক মেহনত করতে হয়। এই পরিশোধনের ভার বর্তায় গাছ, সূর্যালোক ও ছোট বড নানা জাতেব প্রাণীর উপর। একজন মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে ন্যূনতম যা প্রয়োজন, তার জন্যই প্রকৃতি তথা পরিবেশের উপরে চাপ সৃষ্টি হয়। অনেক মানুষ যখন এক জায়গায় থাকে, সেখানকাব পরিবেশের বেশি ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা—ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে সে-আশঙ্কা কম। গ্রামের জল-বাতাস শহরের তুলনায় পরিষ্কার। এর উপর শহরাঞ্চলে এসে পড়ে কল-কারখানা থেকে বেরিয়ে আসা ক্ষতিকারক বস্তু—যা প্রধানত বাতাস, জল ও মাটিকে দূষিত করে। এতে মানুষ, প্রাণী, এমন-কি প্রয়োজনীয় অন্যান্য জড়বস্তুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সমস্ত মিলে যদি কোনো অঞ্চলের জল-বাতাস-মাটির অবস্থা ক্ষতিকারক ও অপকারী হয়ে দাঁড়ায়, তাকেই সাধারণভাবে বলা হয় পরিবেশ দূষণ। পৃথিবীর প্রায় সব কটি বড শহরেই জনসংখ্যার চাপ, যথেষ্ট পরিমাণ খোলা জায়গা ও গাছপালার অভাব, হাজাব হাজার মোটরগাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়া, কল-কাবখানার বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদি শহরের পরিবেশকে খারাপ করেছে—কোথাও কম, কোথাও বা বেশি। আমাদের কলকাতা শহরের পরিবেশও

ব্যতিক্রম নয়—বরং পৃথিবীর অন্যান্য অনেক শহরের তুলনায় কলকাতার দূষণ-মাত্রা যথেষ্ট বেশি। একে 'জঞ্জালনগরী' যাঁরা বলেন, তাঁদের শুধুমাত্র নিন্দুক বলে অব্যাহতি পাওয়াব উপায় আমাদের আর নেই—একথা মানতে হবে।

প্রকৃতির যে-ভারসাম্যের ফলে, জীবজন্তু, গাছপালা ইত্যাদির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, সে-ভারসাম্যকে নষ্ট করে পরিবেশ দূষিত করার জন্য দায়ী কিন্তু মানুষই—অন্য কোনো প্রাণী তা করে না। একই জঙ্গলে গাছ-লতা-পাতা, বাঘ-ভাল্লুক-হরিণ ইত্যাদি নানা প্রাণী, বহু জাতের জীবাণু, তার সঙ্গে জলা-নদী সব কিছুই থাকতে পারে। মানুষের হাত না পড়লে সেখানে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ঠিকই বজায় থাকে। গাছ থেকে পাতা ঝরে, জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তা পচে গিয়ে আবার মাটিকে সারবান করে। সেখানে রাসায়নিক সার লাগে না। জীব-জন্তুদের মধ্যে এমন একটা খাদ্য-খাদক শৃঙ্খল থাকে, যার ফলে কোনো জন্তুর সংখ্যাই অস্বাভাবিক ভাবে কমে-বেড়ে যায় না। জীবজন্তুর মৃতদেহও ছোট-ছোট জীবাণুর দ্বারা আবার মাটিতে লীন হয়ে যায়। তার দেহের উপাদানগুলি আবাব পরিবর্তিত হয়ে যায় আগের অবস্থায়। বড় রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হলে বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ বদলায় না। কিন্তু মানুষ যদি ক্রমাগত বাঘ মারতে থাকে এবং বাঘের সংখ্যা কমে যায়, তাহলে হরিণের সংখ্যা অনিবার্যভাবে বেড়ে যাবে। তখন বন ছেড়ে হরিণরা বনের বাইরের শস্যক্ষেতে দৌরাত্ম্য শুরু করবে। এ-দৃষ্টান্ত ভারতেও আছে।

মানুষই যে পরিবেশ নষ্ট কবে, আর তা ঠিক করার দায়িত্বও যে তাদেরই, এই চেতনা আজ বিশ্বব্যাপী মানুষের মনে জাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। বিশেষত বড় বড় শহর ও তার আশপাশের গাছপালা, মাটি ও জলের দূষণ-মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য নানা সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড চলছে বিশ্বজুড়ে। আমাদের দেশেও চলছে, তবে আশানুরূপ ফল, বিশেষ করে কলকাতার মত বৃহৎ ও বিচিত্র শহরে এ-চেষ্টার প্রতিফলন এখনো নজরে আসেনি।

তিনশো বছর আগে ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অগাস্ট এক বৃষ্টির দিনে জোব চার্নক সাহেবের যে-জাহাজ তখনকার কলকাতার গঙ্গাতীরে ভিড়েছিল—তা কলের জাহাজ ছিল না। বলা যায়, সে-জাহাজ থেকে খনিজ তেলের ধারা গঙ্গাকে দূষিত করেনি। এ-কথাও বলা যায়, তখন সুতানুটি, গোবিন্দপুর বা কলিকাতার আকাশ শীতের সন্ধ্যায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে দৃষ্টিসীমাকে কমাত না, এখনকার মত চোখ-জ্বালা-করা বদ্ধ বাতাসও কলকাতার বাতাসকে আচ্ছন্ন করে রাখত না। গঙ্গার জলে বিসর্জিত হত না কল কারখানার বিষাক্ত উচ্ছিষ্ট। শানবাঁধানো ফুটপাতে আবর্জনার স্তূপ ছিল না। বাতাসে প্রকৃতি যে যে উপাদান দিয়েছে তার সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাসের মিশ্রণ ঘটেনি। মোটরগাড়ির কালো ধোঁয়া কালিমা লেপে দিত না পথচারীর দেহে। ছিল না কান-ফাটানো হর্নের কর্ণবিদারী কোলাহল। গঙ্গার দু'পাশে সবুজের সমারোহ ছিল।

পরের তিনশো বছরে কলকাতার শিল্পবাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির বিকাশ যেমন তাৎপর্যময়, তেমনি উল্লেখযোগ্য এর প্রায়-পরিকল্পনাহীন নগরপত্তন, এবং প্রধানত জীবিকার সন্ধানে আগত ক্রমবর্ধমান মানুষের ভিড। আর মানুষের ভিড় মানেই পরিবেশের উপরে চাপ। কল-কারখানার অপরিকল্পিত ব্যবহার জল-বাতাসকে করে তোলে দূষিত। বাণিজ্যে, কারখানার উৎপাদনে যেমন লক্ষ্মীর ধন মানুষকে সমৃদ্ধ করে, তেমনি তার শ্রী বা সৌন্দর্যের দিকটা অবহেলিত থেকে যায়। এই দুইয়ের মধ্যে এক সমন্বয় করে নেওয়াটাই আধুনিক নগর পরিকল্পনা, শিল্পনগরী গড়ে তোলার বিশেষ বিচার্য ও প্রাধান্যের বিষয়।

দুঃখের বিষয় কলকাতা কোনোদিনই এ-বিষয়ে সুবিবেচনা পায়নি। আজও নয়।

পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে, সেই সঙ্গে পৃথিবীটাকে উত্তর পুরুষের জন্য আবর্জনার উচ্ছিষ্টে ভরিয়ে দিলে চলবে না। পৃথিবীব্যাপী এই চেতনা খুব বেশিদিনের নয়। বস্তুত ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন স্টকহোমে এক সভায় এ-বিষয়ে ব্যাপক কিছু একটা করা দরকার, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই থেকেই প্রতি বছর ৫ জুন পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। ইকোলজি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি পায় এই সেদিন—১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের পরে। জার্মানি জীববিজ্ঞানী আরনেস্ট হেকেল 'ইকোলজি' শব্দটি সৃষ্টিই করেন গত শতাব্দীর শেষের দিকে। গ্রিক শব্দ 'ওইকস'-এর অর্থ 'গৃহ বা থাকার জায়গা'। এই শব্দ থেকেই হেকেল শব্দটি তৈরি করেন। হেকেল বলেছিলেন, সুস্থ দেহে বেঁচেবর্তে থাকার জন্য শুধু নিজের কথা ভাবলেই চলবে না। হেকেলের এই ধারণা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে বিংশ শতাব্দীর মানুষের লেগেছিল প্রায় ষাট বছর।

আধুনিক ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী পরিবেশ বিজ্ঞানের চর্চা অবচীন হলেও, একটা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার চিন্তা অনেক দিনের। যদি শহরকে ভালোভাবে রাখা ও তাকে গড়ে তোলার জন্য ভেবে-চিন্তে কিছু করা হয়, তবে তার প্রভাব শহরের পরিবেশে পড়বেই। এই কলকাতা শহরে যে-দিন বিধিবদ্ধভাবে নগরসভা চালু হল, সেদিন থেকেই শহরেব পরিবেশ সুরক্ষার সূচনা হয়েছিল, এ-কথা বলা চলে। ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দকে যদি কলকাতা নগরপত্তনের বছর বলা যায়, তবে একটা আইনসম্মত নগরসভা পেতে কলকাতাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আরো সাঁইত্রিশ বছর।

১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় একটি কর্পোরেশন গঠনের 'রয়াল চার্টার' পায়। ওই কর্পোরেশন কোম্পানির নিয়োগ করা একজন মেয়র আর ন'জন অলডারম্যান নিয়ে তৈরি হয়েছিল। জমির খাজনা, আর শহরের ট্যাক্স আদায় করার এক্তিয়ার ছিল এই কর্পোরেশনের। রাস্তাঘাট এবং ড্রেন তৈরি ছিল তাদের প্রধান কাজ। এই ব্যবস্থাই চলেছিল পরবর্তী সাতষট্টি বছর।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন স্টাটিউট-এ ওই চার্টার পরিবর্তিত হল। শহরের মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্ব পেলেন গভর্নর জেনারেলের মনোনীত জাস্টিস অব পিস। তাঁরা বাড়ি ও জমির বার্ষিক প্রাপ্য ভাড়ার শতকরা ৫ ভাগ কর হিসাবে আদায়ের অধিকার পেলেন। রাস্তা মেরামতি, শহর পরিষ্কার রাখা ও জঞ্জাল অপসারণের দায়িত্বও ছিল এঁদের। দেখা যাচ্ছে শহরকে সাধারণভাবে পরিষ্কার রাখা ছাড়া, পরিবেশগত অন্য কোনো বিষয়ের দিকে কোনো নজর দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। রাস্তার ধুলো, ধোঁয়া এমন কি জলাশয় বা জলের দূষণ নিয়েও কোনো চিন্তা-ভাবনা ছিল না।

কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম দিকে এর কার্যকলাপ ও শহরের 'স্যানিটেশন' ব্যবস্থায় খুশি হতে পারেননি গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি। তিনি ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে অবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে উপায় উদ্ভাবনের জন্য এক কমিটিকে নিয়োগ করেন। শহরেব মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আরো অর্থ দরকার এবং তা তোলার জন্য তৈরি হয় একটি লটারি কমিটি। কলকাতার রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, জল সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরির খরচের অনেক টাকাই এসেছে এই লটারি থেকে।

কলকাতা কর্পোরেশনের সংগঠন ও তার কাঠামো অনেকবার বদল হয়ে এখনকার চেহারায় এসেছে। সে দীর্ঘ কাহিনীর উল্লেখ এখানে অবান্তর; তবে এই কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে যে-শহর—তার রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক তাৎপর্যই ছিল প্রধান, অন্তত প্রথম

একশো বছরে। কিন্তু একশো বছর না যেতেই কলকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চল দ্রুত চেহারা নিতে শুরু করল এক শিল্পনগরীর—যার আদল ম্যাঞ্চেস্টার শেফিল্ডের মত, যেখানে কারখানায় কয়লা পোড়ে, আকাশে গগনচুম্বী চিমনি রাতদিন ছাড়ে কালো ধোঁয়া, যেখানে রুজি-রোজগারের আশায় অনেক মানুষ জড়ো হন—শহরাঞ্চলে তৈরি হতে থাকে জনসংখ্যার চাপ। আর তখনই শুরু হয় দূষণ-ভাবনা।

জাপানি জাহাজ 'তোসামারু'-তে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে জাপানের পথে রওনা হন ২০ বৈশাখ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (৩ মে, ১৯১৬)। কলকাতা থেকে গঙ্গার পথ অনেকটা পেরিয়ে তবে সাগরে পৌঁছনো যায়। ২৭ বৈশাখ ১৩২৩ (১০ মে, ১৯১৬)-এ রবীন্দ্রনাথের লেখায় আছে, 'গঙ্গা দিয়ে যখন আমাদের জাহাজ আসছিল তখন বাণিজ্যশ্রীর নির্লজ্জ নির্দয়তা নদীর দুই ধারে দেখতে দেখতে এসেছি।..... যখন থেকে কল হল বাণিজ্যের বাহন তখন থেকে বাণিজ্য হল শ্রীহীন। প্রাচীন ভেনিসের সঙ্গে আধুনিক ম্যাঞ্চেস্টারের তুলনা করলেই তফাতটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। ভেনিসে সৌন্দর্যে এবং ঐশ্বর্যে মানুষ আপনারই পরিচয় দিয়েছে, ম্যাঞ্চেস্টারে মানুষ সব দিকে আপনাকে খর্ব করে আপনার কলের পরিচয় দিয়েছে। এই জন্য কল-বাহন বাণিজ্য যেখানেই গেছে সেখানেই আপনার কালিমায় কদর্যতায় নির্মমতায় একটা লোলুপতার মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে।'[১] রবীন্দ্রনাথ আজ থেকে চুয়াত্তর বছর আগে যা দেখেছিলেন এবং যে-আশঙ্কা তাঁর মনে ছিল, তার কোনো প্রতিকারের উপায় কলকাতার অভিভাবকেরা ভেবেছেন, এমন প্রমাণ নেই। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকেই মাত্র তিনশো বছর বয়সের এই কলকাতায় যে-কদর্যতার চিহ্ন বাতাসে, মাটিতে, জলে প্রতিবেশে প্রকাশমান তার সত্যিকারের কারণটা হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে।

যে-বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হিসাবে দেখা দিয়েছিল, নিজের চৌহদ্দির বাইরে তাঁদের শহরটা কী ভাবে গড়ে উঠবে তার দিকে সেই রাজাদের কোনো দৃষ্টিই ছিল না। বাণিজ্য ও মুনাফার লোভে যে-লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছে, তাদেরও মূল উদ্দেশ্য ছিল ওই মুনাফা। আবার উল্টো দিকে এই শহরেই হয়েছে শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, স্বাদেশিকতার নব জাগরণ।

কলকাতা শহরের পরিবেশ সম্পর্কে, বিশেষ করে বায়ুদূষণ বিষয়ে, প্রথম সরকারি সচেতনতার লক্ষণ দেখা যায় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে, যখন কল-কারখানা ও গৃহস্থের উনুনের ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন হল 'স্মোক নুইসান্স অ্যাক্ট'; স্থাপিত হল 'স্মোক নুইসান্স ডাইরেকটরেট'। শোনা যায়, বাতাসে ধোঁয়া ও বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর সাদা পাথরকে নষ্ট করে দিতে পারে—এই আশঙ্কা থেকেই ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের আইন সৃষ্টি। ১৯০৬-এর এই আইন সত্যি সত্যিই শহরটাকে কতটুকু ধোঁয়ামুক্ত করেছে—তা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু আজ থেকে চুরাশি বছর আগে পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনের প্রচলন অবশ্যই একটি বিশেষ ঘটনা এবং তা হয়েছিল কলকাতাতেই।

এর পরের দীর্ঘ আটষট্টি বছর নতুন কোনো বিধি হয়নি। কলকাতা সহ ভারতবর্ষের প্রায় সব বড় শহরেই এর মধ্যে কল-কারখানা, জনসংখ্যার চাপ বেড়েছে। তাছাড়া দেশ বিভাগের সময় কলকাতায় এল বাড়তি চাপ। সে-সময় থেকেই নগরের হাল খারাপ হতে আরম্ভ করে। সে-চাপের সঙ্গে যোগ হয় আশেপাশের রাজ্য থেকে আসা জীবিকাসন্ধানীদের

---

১. জাপানযাত্রী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র-রচনাবলী (উনবিংশ খণ্ড)। বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫২।

চাপ। কলকাতা তা সামলাতে পারেনি।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রচলিত হল জলদূষণ নিবারণ আইন এবং চালু হল জলদূষণ নিবারণ-এর কেন্দ্রীয় বোর্ড। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে হল পরিবেশ সংরক্ষণ আইন। ১৯৮১-তে বাতাসের দূষণ নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ হল। এর পরের বছর, ১৯৮২-তে পশ্চিমবঙ্গের আলাদা পরিবেশ বিভাগ হল। তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হলেন একজন মন্ত্রী। রাজ্য পর্যায়ে দূষণ নিবারণ বোর্ড স্থাপিত হল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পরিবেশ দূষণের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ এবং তার নিবারণের চেষ্টা কলকাতার তিনশো বছরের ইতিহাসের মধ্যে কেবল সাম্প্রতিককালেই শুরু হয়েছে। এ-বিষয়ে যা কিছু আলোচনা, তথ্য সংগ্রহ—তাও বেশিদিনের নয়।

আজ কলকাতার পরিবেশ বলতে কেবল তার বাতাসে কত ধুলো, কত হাইড্রোজেন সালফাইট, মোট কত নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইড আছে, বা জলেব বি ও ডি (বায়ো-কেমিক্যাল অকসিজেন ডিমাণ্ড) লোড় কত তা মাপলেই যথেষ্ট হবে না। এসব অনাবশ্যক দূষিত জিনিস মানুষের শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সন্দেহ নেই। এসবের মাপজোখ হয়েছে, দূষণ-মাত্রার হিসাব-নিকেশ হয়েছে, সে-বিবরণে পরে আসছি। বর্তমানে কেন মানুষের মন অস্থির, বিরক্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাকে রাগিয়ে দেয় তার কারণও খুঁজতে হবে। এসবের জন্য মন ও শরীরে যে-চাপ পড়ে তাকেও ধরতে হবে। রাস্তাঘাটে দুঃসহ অবস্থায় লোকে চলাফেরা করে, যানবাহনের জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠার স্বীকার হয়। যানবাহনের মধ্যে দম আটকানো পরিবেশে যানজটে আটকে কলকাতার মানুষ যন্ত্রণা ভোগ করে। তাকে পূতিগন্ধময় ফুটপাতের গর্ত-গাড্ডা এড়িয়ে চলতে হয। এসব বাদ দিয়ে কলকাতার পরিবেশের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। অর্থাৎ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত দিক—সব একসঙ্গে মিশে এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। গত তিনশো বছরে এ-জটিলতা কমানো যাযনি, বরং প্রতিদিনই তা বেড়ে চলেছে।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যধান ছাড়া এই শহরে যাঁরা থাকেন, কাজকর্ম করতে আসেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই শরীরে ঢোকে বেশ কিছু পরিমাণ ধুলো ও অপরিষ্কার বাতাস, কানে যায় অসহ্য আওয়াজ, চোখে অনবরত পড়ছে নানা কদর্যতা, মনে জমা হচ্ছে ক্রমাগত বিরক্তি। এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে নানা উপসর্গ : গ্যাস পাওয়া যায় না, কেরোসিন তেল নেই, চিকিৎসার সুযোগের অভাব।

এইসব মিলিয়েই কলকাতার পরিবেশ।

তবে কলকাতা বলতে কোন কলকাতা বোঝানো হচ্ছে? ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বা আগেকার কলকাতা কর্পোরেশনের যে-কলকাতা, তাতে বরাহনগর, দমদম, বেহালা ইত্যাদি বহু জায়গাই ছিল না। ওই কর্পোরেশন এলাকার আয়তন ১০৪ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা প্রায় ৩৩ লক্ষ। অর্থাৎ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোক বসতি ৩১ হাজারের উপর। এর সঙ্গে বেহালা, গার্ডেনরিচ, দমদম, বরানগর,, যাদবপুর ও সল্ট লেক ধরলে লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। এছাড়া এই শহরে প্রায় ৬০ হাজার ফুটপাতবাসী আছেন। কেবল কলকাতায় শতকরা ৫২ জন বস্তিবাসী। আর বস্তি অঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করেন ১·৫ লক্ষ থেকে ১·৮ লক্ষ লোক।

বৃহত্তর কলকাতার আর একটি চিহ্নিত এলাকা আছে—ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডিস্ট্রিক্ট বা সি এম ডি। গঙ্গার দু'পাশে যার বিস্তার—উত্তরে কল্যাণী, বাঁশবেড়িয়া থেকে দক্ষিণে

উল্যবেড়িয়া, বারুইপুর পর্যন্ত। মোট এলাকার মাপ ১৩৫০ বর্গ কিলোমিটার। ছোট-বড় মিলিয়ে ৮৮টি শহর আছে এর মধ্যে। সি এম ডি অঞ্চলে লোকসংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ, অর্থাৎ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৮০০০ জন। এই অঞ্চলের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ লোক বস্তিবাসী। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩০ হাজার লোক, প্রায় ৫০ হাজার ফুটপাতবাসী, সেই সঙ্গে প্রতিদিন ট্রেনে ও বাসে বাইবে-থেকে কাজ-করতে-আসা প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের চাপ সহ্য করতে হয় এই শহরকে। আরো একটি তথ্য হয়ত তেমনভাবে জনসমক্ষে আসেনি। তা হল এই কলকাতা শহরে ১ লক্ষ ৪০ হাজারের মত গরু-মোষ আছে। এছাড়া শুয়োর, রাস্তার কুকুর এদের হিসাব নেই। সর্বোপরি এই জনসংখ্যাব শতকরা ৫০ ভাগই অর্থনৈতিকভাবে দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন এবং অধিকাংশই অশিক্ষিত। শহবে খোলা জায়গার এতই অভাব যে জন প্রতি জায়গার মাপ মাত্র ১·৫ বর্গমিটারেব কাছাকাছি।

কলকাতা শহরেব মোট জমির মাত্র ৬·৫ শতাংশ বাস্তা। আবার তাব অধিকাংশই যথেষ্ট চওড়া নয়। এতেই চলে সরকারি-বেসরকারি মিলে প্রায় ৩০০০টি বাস, ৩৫০টি ট্রাম, ১৫০০ থেকে ২০০০ মিনিবাস-অটোরিকশা। এছাড়া প্রায় ৩ লক্ষ অন্যান্য যানবাহন। এর সঙ্গে ঠেলা, হাতে-টানা রিকশা, সাইকেল রিকশা। প্রতিটি রাস্তা ও ফুটপাত হকারে-দোকানে ভর্তি। এইসব একত্রে চিন্তা করলে কোনো হিসাব না করেই বলা যায় যে, কলকাতার পরিবেশ মানুষের শরীর ও মনের স্বাভাবিক সুস্থতা বজায় রাখার পক্ষে অনুকূল হওয়া অসম্ভব।

কলকাতার আরো কতকগুলি বৈশিষ্ট্য শহরটাকে ঠিকঠাক রাখার পরিপন্থী। এই শহরে খুব বেশি কল-কারখানা নেই। এদের অধিকাংশই উত্তরাঞ্চলে গঙ্গার দুই পাড় ধরে গড়ে উঠেছে। শহরের দক্ষিণাঞ্চলে তারাতলা এলাকায় কিছু কল-কারখানা আছে। তিনটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবশ্য আছে শহরের মধ্যে। তাই বলে হাজার হাজার চিমনির ধোঁয়া আকাশকে কালো কবে দিচ্ছে, তা কিন্তু নয়। আবার অন্যদিকে, বিশেষ কবে শহরের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ছোট ছোট অনেক তথাকথিত বস্তির মধ্যেও আছে ছোট ছোট বিস্তর কারখানা। কেউ অ্যাসিড বানায়, আবার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক রাসায়নিক নিয়ে অনেকেব কারবার। এছাড়া আছে প্লাস্টিক, রবার এবং অন্যান্য রাসায়নিকের কারখানা। ছোট ছোট গলির বাতাস এখানে চলাচল করতে পারে কম। এইসব গলিব বীভৎস বাতাস সত্যিই বিষে ভর্তি। এই সব ছোট কারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্বাস্থ্যকর রাসায়নিক পরিবেশে মিশছে। তার পরিমাণ যে সত্যিই কতটুকু তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

আধুনিক শহরগুলিতে দূষণ-মাত্রা মাপার জন্য কিছু ব্যবস্থা থাকে। আবহাওয়ায় কোন রাসায়নিক কত মাত্রা পর্যন্ত থাকতে পারে, তার সর্বোচ্চ সীমাও নির্ধারিত আছে। এসব ব্যবস্থা আমাদের দেশেও প্রচলিত, সেই সঙ্গে আছে এই সংক্রান্ত আইন-কানুনও। কিন্তু আমাদের দেশে, বিশেষ করে কলকাতার মত শহরে, সেসব আইন-কানুন যে চলে না, তার কারণ এই দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি। শহরটা বাসযোগ্য রাখতে গেলে প্রথমেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় যেসব জিনিস, তার মূলে আছে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, জীবন ধারণের উপায়াভাব। তাই কলকাতার পরিবেশ শুধুমাত্র প্রযুক্তিবিদদের বা বৈজ্ঞানিকদের আলোচনার বিষয় নয়, শুধুমাত্র কারিগরি প্রয়োগে এর সমাধান হবে না।

শহরটার বড় সমস্যা হাজার হাজার টন জঞ্জাল। এই বিষয়ে কাউকে বিশেষ করে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, যত কম পরিমাণেই হোক, কলকাতা কর্পোরেশন শহরকে জঞ্জালমুক্ত করার জন্য নানা রকম চেষ্টা করেছেন। জঞ্জাল ফেলার

নির্দিষ্ট জায়গা বানিয়েছেন, কোনো কোনো জায়গায় পাত্র বসিয়েছেন, জঞ্জালকে লরিতে তোলার জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা করেছেন। জঞ্জালের লরিতে হাইড্রলিক সিস্টেম লাগানো হয়েছে। কিন্তু শহরটাকে পূতিগন্ধ ও কুদৃশ্য থেকে মুক্ত করা যায়নি। কেন যাবে না তার কারণ খুব স্পষ্ট : যে-শহরের বেশির ভাগ লোক বস্তিবাসী, যে-শহরের যে-কোনো জায়গায় যে-কেউ ঝুপড়ি বানিয়ে বাস করতে পারে, রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া চলতে পারে অবাধে, যে-শহরে যেখানে সেখানে ময়লা ফেললে হাজতবাস করতে হয় না, যে-কোনো জায়গায় দোকান বসিয়ে দেওয়া যায়, সেখানে শহরকে জঞ্জালমুক্ত রাখা সম্ভব নয়। এমন কোনো বৈজ্ঞানিক পন্থা অন্তত এখনো বেরোয়নি। কেউ কেউ খতিয়ে দেখেছেন, শহরের ডাস্টবিনগুলোতে যা জমা হয়, তাতে প্রধানত কী কী থাকে। শতকরা ৫০ ভাগই হল ছাই, মাটি, ভাঙা কাঁচ, পোর্সেলিন। বাকি অংশ হল তরি-তরকারির খোসা, ডিমের খোলা, শুকনো ফুল, গাছপালা, প্লাস্টিক ও কাগজের ঠোঙা বা কাগজ, চামড়ার জুতো, চটি, রবারের চটি, কাপড়-চোপড়ের ছেঁড়া অংশ। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় 'কাঁঠালের ভূতি, মাছের কান্‌কা, মরা বেড়ালের ছানা, ছাইপাঁশ আরো কত কী যে'।[১]

পৃথিবীর অন্য অনেক বড় শহরের মত রান্নাবান্নাটা যদি গ্যাস বা বিদ্যুতের সাহায্যে করা যেত, তাহলে জঞ্জাল-স্তূপের অর্ধেকটাই প্রায় কমে যেত। এছাড়া আমাদের জঞ্জাল-স্তূপগুলোর অন্য কিছু বৈশিষ্ট্য আছে—তা হল কুড়িয়ের দল। এদের তৎপরতায় জঞ্জাল মাটিতে পড়া-মাত্র তা আর ডাস্টবিনে আবদ্ধ থাকে না—ছড়িয়ে পড়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে। ফলে তৈরি হয় একটা জঞ্জাল-অঞ্চল, চেহারা হয়ে ওঠে আরো ভয়াবহ ও মারাত্মক। এই জঞ্জাল নিয়ে, অর্থাৎ 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেণ্ট' নিয়ে, অনেক আলোচনা হয়েছে, বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন কিন্তু বাস্তব অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। উন্নতি না হওয়ার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, প্রথমত এই জঞ্জালের পরিমাণ কমানো যাবে না। দ্বিতীয়ত, যতদিন পর্যন্ত ছেঁড়া-জুতো, ছেঁড়া-প্লাসটিক ইত্যাদি আলাদাভাবে বিক্রয়যোগ্য বস্তু থাকবে, ততদিন জঞ্জাল ঘাঁটাঘাঁটি বন্ধ করা সম্ভব নয়। লোকে বাড়িতে খবরের কাগজ জমায় তা বিক্রি হয় বলে। শিশি-বোতলও তাই। লক্ষণীয়, আস্ত খবরের কাগজ বা গোটা শিশি-বোতল জঞ্জাল সৃষ্টি করে না। কেননা তার দাম মোটামুটি ভাল, বিক্রি করতে মধ্যবিত্ত বাঙালি অসম্মান বোধ করেন না। কিন্তু দুধের শিশির আলুমিনিয়াম ঢাকনি, সিগারেটের বাংতা, প্লাসটিক ব্যাগ-এর দাম এতই কম যে এক বাড়ির সামান্য সংগ্রহের কোনো বিশেষ মূল্য নেই—তাই সকলে ফেলে দেন।

জঞ্জাল বিশারদদের মাথায় নানা রকম চিন্তা-ভাবনা যে আসে না তা নয়। কলকাতার জঞ্জালের একটা বড় অংশ জৈব-রাসায়নিক। ফলে এর অনেকটাই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিনষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ, সোজা কথায় পচনশীল। এই পচনশীল অংশ থেকে প্রচুর সার উৎপন্ন হতে পরে—ধাপার মাঠের উৎকৃষ্ট শাকসবজির উৎপাদনই তার প্রমাণ। নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় এই জঞ্জালকে পচালে, তা থেকে জ্বালানি গ্যাস পাওয়া যেতে পারে এবং সেই জ্বালানি গ্যাস অনেক কাজে লাগানো যায়—এমনকি বিদ্যুৎ উৎপাদনেও। এই ধরনের গ্যাস প্ল্যাণ্টের বর্জ্য বস্তুও উত্তম সার হিসাবে ব্যবহার করা চলে। এ তো গেল তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের বিষয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে যা করা যায়, তা প্রযুক্তিগত ভাবে কতটা সম্ভব, অর্থাৎ এর আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য হয় কিনা দেখা দরকার। যদি এমন হত যে, রাস্তার জঞ্জাল থেকে যে-গ্যাস হয়, তা রাস্তা থেকে জঞ্জাল তুলে নেওয়ার খরচ বহন করার পরেও যথেষ্ট লাভে

---

১. বাঁশি (পুনশ্চ): রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র-রচনাবলী (ষোড়শ খণ্ড)। বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫০।

বিক্রি করা যায়, তবে রাস্তায় কোনো জঞ্জালই আর পড়ে থাকত না। যেমন থাকে না জঞ্জালের প্লাস্টিক, রবার, ধাতু, কাচ ইত্যাদি, যেগুলোকে আবার বিক্রি করা চলে।

বিদেশে প্রতি বাড়ির জঞ্জাল এমনি না ফেলে তাকে প্লাস্টিকের ব্যাগে পুরে রাস্তায় জমা করা হয়। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি এসে তা নিয়ে যায় দিনে দু'বার। সুতরাং রাস্তা নোংরা হয় না। আমাদের এখানে এ-নিয়ম চালু করলে বেশ কিছু বাড়ির আবর্জনা বস্তাবন্দী হবে সন্দেহ নেই—তবে ব্যবস্থাটা কাজ করবে না। কারণ অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিস্থিতি। রাস্তায় পড়া-মাত্র ওই প্লাস্টিকের ব্যাগ খোলা হবে, ময়লা পড়ে থাকবে রাস্তায়। কারণ ওই প্লাস্টিকের ব্যাগটার একটা বাজার আছে এখানে। ঝোপড়ির ছাউনি, ফুটপাতের দোকানের ছাউনি, এছাড়া আরো অনেক কাজেই লেগে যায় ওই বস্তু। আসলে কলকাতার দূষণ-সমস্যার সঙ্গে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা এমনভাবে জড়িত যে, বিদেশের প্রযুক্তির কোনো মডেল এখানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং সব দিক মিলে 'সলিড ওয়েস্ট ডিসপোজাল'-এর নিজস্ব মডেল হয়ে গেছে কলকাতার। রাস্তায় ডাঁই-করা ময়লাকে সহ্য করার অভ্যাস তার মধ্যে একটি। মাঝে মাঝে গাড়ি এসে তা আংশিক সাফাই করবে। কুড়ুনেরা তাকে তন্ন তন্ন করে ঘাঁটবে—তারপর পরিণতি সেই একই। তবে বর্তমান পরিকাঠামোতেও শহরটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য যা করা সম্ভব, এখন তার শতকরা ১০ ভাগও করা হয় না। দোতলা বা তেতলা থেকে নোংরা আবর্জনা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া কলকাতার একটা পুরনো প্রথা। এটা চলতে দেওয়া যায় না, তা-ও সবাই জানেন। কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো নিয়ম-কানুন নেই। তিনতলা থেকে রাস্তায় ময়লা ছুঁড়ে ফেললে যে হাজতবাস করতে হতে পারে—এমন কোনো সম্ভাবনা নেই এখানে। সত্যি কথা বলতে কি, একটা বড় শহরের পরিবেশকে বাসযোগ্য রাখতে গেলে নগরসংস্থা, নাগরিক ও সরকারের তরফে যে-সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তার কোনোটাই নেই কলকাতায়। খাতায়-কলমে কিছু থাকলেও সে-অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এ-রকম শোনা যায় না।

একটা বড় শহরে থাকতে গেলে কিছু সুবিধা আছে, তেমনি আছে অনেক অসুবিধাও। যেমন, রাস্তার যেখান-সেখান দিয়ে হাঁটা যায় না, কিংবা রাস্তা পার হওয়া যায় না। গাড়ি বা বাস যেখানে খুশি দাঁড় করানো চলে না। এগুলির জন্য নিয়ম আছে, নিয়ম মানার জন্য কর্তৃপক্ষ জনগণের কাছে 'সহযোগিতা' চান না। বিদেশের বড় বড় শহরে লোকেরা যে রাস্তাঘাটে এইসব নিয়ম পালন করেন, তার কারণ এই নয় যে, সে-দেশের লোকেরা সবাই অন্যরকম। কারণ একটাই : অমান্যকারীদের অব্যাহতি নেই পুলিশের হাতে। ভুল জায়গা দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার জন্য শাস্তি পেয়েছেন, এমন একজনও কি আছেন এ-শহরে ?

প্রশ্ন উঠতেই পারে, পরিবেশের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক ? বস্তুত পরিচ্ছন্নতা ও তার বোধ, শৃঙ্খলা ও তার পালন এবং নাগরিক নিয়ম-কানুনকে কঠোরভাবে পালন-করা ছাড়া কোনো শহরের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা যায় না।

সামান্য বৃষ্টিতেই কলকাতা ডোবে, এই অভিযোগ অনেকদিনের, এবং এ-বিষয়ে ভুক্তভোগী আমরা সবাই। গত দশ-পনেরো বছরে বিস্তর খোঁড়াখুড়ি ও মাটির নীচে বহু পাইপ চালান-করা হলেও প্রকৃত অবস্থার যে কোনো উন্নতি হয়নি, এ-বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। বর্ষার কলকাতায় যে-পরিমাণ বৃষ্টির জল পড়ে ও সরবরাহ-করা জলের যে-অবশিষ্টাংশ (কলকাতার মূল এলাকায় এর পরিমাণ দিনে ৬ লক্ষ কিলোলিটার) তা বহন করার জন্য পৃথক পাইপ লাইন নেই বেশির ভাগ জায়গাতেই। কলকাতার এই জল

গঙ্গানদীতে ফেলা হয় না। পূর্ব কলকাতার জলনিকাশি ব্যবস্থার মাধ্যমে তা খালে গিয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য, এই নিকাশি ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। কিছুদিন আগে পর্যন্তও শহরের ঢালের দিকে, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অনেক নীচু জলাজমি ছিল। এখন সে-সবই ভরাট হয়ে গেছে—বাড়ি-ঘর উঠেছে সেখানে। শহরের বাড়তি জল যে গড়িয়ে গিয়ে অপেক্ষাকৃত নীচু জায়গায় আশ্রয় নেবে, সে-উপায়ও নেই আজকাল। আর থাকলেও তা কমে গেছে অনেক। এই অবস্থায় শহরে অনেক কম বৃষ্টিতেই যে অনেক বেশি জল দাঁড়াবে, আর তা বেশ কিছুক্ষণ জমে থাকবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

এ-কথা অনেকবার শোনা গেছে যে, ঘণ্টায় ১৫ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হলে শহরের বর্তমান জলনিকাশি ব্যবস্থা সেই জল টেনে নিতে পারে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এর চেয়ে বেশি হলে জল জমবেই। প্রশ্ন উঠতেই পারে, ওটা ঘণ্টায় ১৫ মিলিমিটার ধরে করা হল কেন ? কারণ কলকাতায় বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বর্ষাকালে একাধিক দিনই ওই মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়। এর সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। ১৯৭৮, ১৯৮৪ এবং ১৯৮৬-এব বৃষ্টিতে কলকাতা জলাশয়ে পরিণত হয়েছিল। কোনো কোনো সদর রাস্তায় প্রায় ২ ফুট বা ৬০-৭০ সেণ্টিমিটার জল। এই অবস্থায় অনেক ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে দেওয়া হয় অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্যে। তখন দেখা গেছে, এইরকম ঢাকনা-খোলা ম্যানহোল দিয়ে তীব্র গতিতে জল রাস্তার নীচের ড্রেনে যাচ্ছে। এ-থেকে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয়, অন্তত সেই অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলনিকাশি ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত ভর্তি নয়। আরো অনেক জল সেখানে যেতে পারে। এ-থেকে এটাও বোঝা যায় যে, উপরের রাস্তা জলে পরিপূর্ণ হলেও নীচের ড্রেনে তখনও জলধারণ ক্ষমতা থাকছে। অর্থাৎ রাস্তার উপরের জলকে রাস্তার নীচে চালান করার বন্দোবস্তই অপ্রতুল।

কলকাতা অঞ্চলে ছাদ তৈরি করতে গেলে প্রতি ১০০ বর্গফুট (৯·২৯ বর্গমিটার) ছাদের জন্য প্রায় ৪ ইঞ্চি (প্রায় ১০ সেণ্টিমিটার) ব্যাসের জল নামানোর পাইপ লাগানোর রেওয়াজ আছে। অর্থাৎ ছাদ যদি হয় ১০০০ বর্গফুট (৯২·৯ বর্গমিটার), তাতে অন্তত দশটা ৪ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ লাগানো দরকার। এতে যত জোরেই বৃষ্টি হোক না কেন ছাদে জল জমে না। কলকাতার মত শহরে বৃষ্টির সময় এই জল বাঁধানো রাস্তায় নামে। সেখানে মাটি একবিন্দু জলও শুষে নিতে পারে না। এর উপর রাস্তায় যে-বৃষ্টির জল পড়ে তা-ও আছে। এখন যদি এই পরিমাণ জল মাটির নীচেব ড্রেনে পাচার করতে হয়, তাহলে বাঁধানো রাস্তা থেকে তলার ড্রেনের সংযোগকারী নালিগুলোর প্রস্থচ্ছেদ প্রতি ১০০ বর্গফুট (৯·২৯ বর্গমিটার) রাস্তায় ১৩ বর্গইঞ্চির (প্রায় ৮৪ বর্গ সেণ্টিমিটার) অনেক বেশি হওয়া দরকার। তা কি সত্যিই আছে ? যে-কয়েকটা রাস্তায় মেপে দেখা গেছে, তাতে এই মাপ অনেক কম। তাছাড়া জলনিকাশের এই পথগুলো প্রায়ই আবর্জনায় বন্ধ হয়ে থাকে, ফলে জল যাওয়ার পথ আরো কমে যায়।

এছাড়া এ-কথাও শোনা যায়, কলকাতার মাটির নীচের ড্রেন স্লাজ বা পলিতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অথচ এর প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা নেই। যেমন, ধরা যাক গরুর খাটালগুলোর কথা। প্রতিদিন কত আবর্জনা যে এ-থেকে বেরিয়ে ড্রেন বন্ধ কবতে সাহায্য করে তার সত্যিই কোনো হিসাব নেই। অথচ যে-শহরে লোকের ভিড বেশি এবং ভূগর্ভস্থ ড্রেন থাকে সেখানে গরু পোষা চলে না। এটা জানা সত্ত্বেও তাকে বাস্তবায়িত করা যায় না কলকাতায়। কোনো বহুতল বাড়ি তৈরির সময় তার মাটির তলার বেসমেণ্ট বানানোর জন্য গর্ত্ত খোঁড়া হয় বিশাল। বর্ষায় মাঝে মধ্যেই তা জলে ভর্তি হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তখন তা পাম্প

করে বের করা হয়। জল বের করার সময় সাধারণত নিকাশি পাইপটা গুঁজে দেওয়া হয় কাছাকাছি রাস্তার ঝাঁঝরিতে। এই জলে শতকরা ২৫-৩০ ভাগই থাকে কাদা বা 'সলিড ওয়েস্ট'। ফলে নিঃসন্দেহে তা জমা হয় নীচের ড্রেনে। এতে ড্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এইভাবে ওইরকম একটি বাড়ি থেকেই গড়ে অন্তত ২০ টন কাদা ফেলা হয় ড্রেনে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর অন্য দেশে মিউনিসিপ্যাল ড্রেনকে এই অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য আইন ও তার প্রয়োগ আছে। সেখানে ওইরকম নোংরা কাদা-জল ট্যাংকারে ভরে শহরের বাইরে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে আসতে হত। নইলে ঠিকাদার ও মালিকের হাজতবাস হত অনিবার্য।

কলকাতা শহর যেন অভিভাবকহীন অত্যাচার সহ এক শহর। সারা শহর দোকানে-হকারে ভর্তি। এখানে ফুটপাতে অনায়াসে সপরিবারে বাস করা যায়। ফুটপাতে বা রাস্তায় উনুন জ্বালিয়ে রান্না করা চলে। ইলেকট্রিকের পোস্টে ফুটপাতের এ-মাথা থেকে ও-মাথা মেলে দেওয়া চলে জামা-কাঁপড়-ধুতি-শাড়ি। দোকানঘরের বাইরের ফুটপাত এবং অনেক সময় রাস্তাটাও, যেন দোকানেরই অংশ। অবাধে চলে সারাই-এর কাজকর্ম। যেমন, লোহা কাটাই, ওয়েল্ডিং, ছুতোরের কাজ, স্প্রে-পেইন্টিং ইত্যাদি। কোনো বাধা নেই মোটরগাড়ি, সাইকেল সারাইয়ে। বাধা নেই যে-কোনো দেওয়ালে খুশিমতো পোস্টার সাঁটানোয়, দেওয়ালে লেখার, এবং সর্বোপরি শরীরের বর্জ্য তরল পদার্থকে যত্রতত্র ঢেলে দেওয়ার। এ-শহরে তাই প্রতিনিয়ত বিরক্ত হচ্ছে আমাদের মন, আহত হচ্ছে সৌন্দর্যবোধ। চোখ, নাক, শরীর ক্রমাগত পীড়িত হচ্ছে। সৌন্দর্য বা পরিচ্ছন্নতাকে যে-শহরে একেবারে শেষ সাবিতে পাঠানো হয়েছে, সেখানে জল, হাওয়া ও শব্দের দূষণ-মাত্রা কতটা তা বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাপা হয়েছে অনেকবার। হয়ত এখনও হচ্ছে এখানে-ওখানে। এই সব সমীক্ষায় কী পাওয়া যায়, দেখা যাক।

সত্তরের দশকের গোড়া থেকেই ন্যাশনাল এনভায়রনমেণ্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইন্‌সটিটিউট (মূল কেন্দ্র নাগপুর) কলকাতার কয়েকটি অঞ্চল ও আশপাশের কয়েকটি শিল্পপ্রধান এলাকায় বাতাসের অবস্থা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে আসছেন ও বায়ু-দূষণের প্রধান উপাদানগুলির মাত্রা নির্ধারণের কাজ করছেন। এর মধ্যে তিনটি পরীক্ষাকেন্দ্রকে—একটি প্রধানত শিল্পাঞ্চলে, অন্যটি বসতি এলাকায এবং তৃতীয়টি বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলে—বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (ওয়ার্লড হেল্‌থ অরগানাইজেশন) গ্লোবাল এনভায়রনমেণ্টাল মনিটরিং সিস্টেম-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই সমীক্ষায় মাটির ৪ থেকে ১০ মিটার উঁচুতে যন্ত্র বসিয়ে যা পাওয়া যায় তা নীচে দেখানো হল। এই সারণিতে প্রধানত তিনটি দূষণকারীর পরিমাণ দেখানো হয়েছে। ১. বাতাসে ভাসমান ধূলি ও বস্তুকণা ২. সালফার ডাই-অকসাইড গ্যাস (SO_2) ৩. নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইড (NO_2) গ্যাস। বাতাসে যে-ধুলো কিংবা অন্য বস্তুকণা থাকে বা মেশে, তাদের দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করা চলে : পার্টিকুলেট ম্যাটার বা অপেক্ষাকৃত বড বা ভারি বস্তুকণা। এরা বেশিক্ষণ বাতাসে ভেসে থাকে না, নিজের ওজনেই মাটিতে পড়ে যায়। অন্যটি হল, সাসপেণ্ডেড ম্যাটার বা ভাসমান বস্তুকণা। এরা বাতাসে ভেসে বেড়ায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মানুষ বা প্রাণীদেহে ঢুকে পড়তে পারে। প্রথম সারণিতে ন্যাশনাল এনভায়রনমেণ্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইন্‌সটিটিউট-এর ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কিছু তথ্য দেওয়া হল।

কলকাতার অঞ্চলের নাম	দূষণকারীর দৈনিক পরিমাণ					
	ভাসমান বস্তুকণা (মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার)		সালফার ডাই-অকসাইড (মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার)		নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইড (মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার)	
১৯৭৮	বার্ষিক গড়	মাসে সর্বোচ্চ	বার্ষিক গড়	মাসে সর্বোচ্চ	বার্ষিক গড়	মাসে সর্বোচ্চ
ভবানীপুর	২৯২	৫৪৬	২০	৫১	১৭	৩২
ডালহৌসি	৩৯৩	৬৯২	২৩	৭৫	২১	৪৫
কাশীপুর	৩৫৩	৫৯১	৫৪	১৩৬	২০	৩৭
মানিকতলা	৪০৫	৭৪১	৩২	১৩৪	১৭	৩১
হাওড়া	৪১৫	৭২২	৪৮	১২৭	২০	৩০
টালিগঞ্জ	৫০৬	৯৮১	৩৬	১৯৪	১৫	৩৩
১৯৭৯						
ভবানীপুর	৪৪০	১১১১	২৮	৭৯	—	৭৮
ডালহৌসি	৪৮৩	৯১৭	৫০	১১২	—	৫৫
কাশীপুর	৪১৩	৮৯৭	৪৮	১৪৬	—	৪৩
মানিকতলা	৫১৯	১৫২৫	৪২	১২২	—	৫৮
হাওড়া	৫৭৮	১০৯০	৮৫	৩১০	—	৬২
টালিগঞ্জ	৫৫৮	১৪৮৪	৫৩	১২৪	—	৫৮

উপরের তালিকার বার্ষিক গড় হল প্রতি ২৪ ঘণ্টায় বাতাসে যে-পরিমাণ ভাসমান বস্তুকণা বা গ্যাসগুলি ছিল তার বার্ষিক গড়। আর প্রতি মাসের কোনো চব্বিশ ঘণ্টায় সব চাইতে বেশি যে-পারিমাণ পাওয়া গিয়েছিল তাই হল মাসে সর্বোচ্চ। লক্ষণীয়, ভাসমান বস্তুকণা এক বছরেই কলকাতার বিভিন্ন জায়গাতে কী পরিমাণ বেড়েছে। বাতাসে ভাসমান বস্তুকণা কিংবা নাইট্রোজেন বা সালফার ডাই-অকসাইড ইত্যাদি সর্বোচ্চ পরিমাণে কতটা থাকতে পারবে, তার কতগুলি মান আছে। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় দূষণ নিবারণ বোর্ড ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে যে-সর্বোচ্চ মান স্থির করে দিয়েছে তা নীচে দেওয়া হল।

প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ মান	বসতি এলাকা	শিল্পাঞ্চল
ভাসমান বস্তুকণা	২০০	৫০০
সালফার ডাই-অকসাইড	৮০	১২০
নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইড	৮০	১২০

এই মানের সঙ্গে তালিকাটি মেলালেই দেখা যাবে যে, ভাসমান বস্তুকণা কলকাতার বাতাসে মারাত্মক রকম বেশি, যদিও আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় দূষণ নিবারণ বোর্ডের নির্ধারিত মান কিন্তু যথেষ্ট কঠোর নয়। ইউনাইটেড নেশন্‌স এনভায়রনমেন্টাল প্রোগ্রাম নির্ধারিত মান

আরো কঠোর। সেখানে বস্তুকণার বার্ষিক গড়ের সর্বোচ্চ সীমা প্রতি ঘন মিটারে ৮০ মাইক্রোগ্রাম। আর সালফার ও নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইড গ্যাসের সর্বোচ্চ সীমা প্রতি ঘন মিটারে ৬০ মাইক্রোগ্রাম। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ মানের তুলনায় কলকাতার বাতাসে নাইট্রোজেন এবং সালফার ডাই-অকসাইডের পরিমাণ মারাত্মক রকম বেশি নয়। তবে লক্ষণীয়, যে-সব অঞ্চলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কল-কারখানা ইত্যাদি বেশি, সেখানকার বাতাসে এই দুটি গ্যাসের পরিমাণ, বিশেষ করে সালফার ডাই-অকসাইডের পরিমাণ, বেশি। তালিকার কাশীপুর, হাওড়া ও মানিকতলা অঞ্চলেব পরিমাণগুলি দেখলেই এটা বোঝা যাবে।

ভাসমান বস্তুকণা সম্পর্কে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সত্তরের দশকে কলকাতায় যে-সমীক্ষা চালিয়েছিলেন তার তথ্যগুলি দেখা যাক।

বার্ষিক গড় (মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার)								
খ্রিস্টাব্দ	১৯৭৩	১৯৭৪	১৯৭৫	১৯৭৬	১৯৭৭	১৯৭৮	১৯৭৯	১৯৮০
শহরের মধ্যে বাণিজ্যিক এলাকা	৩৬৫	৫১৯	৫৪৭	৩৫৬	৪১৯	৩৯৩	৪৩৯	৪৬২
শহরতলীর শিল্পাঞ্চল	৩৩০	৪৫৪	৫৩০	৩৮০	৩৭৩	৩৫৩	৪১৩	৩৫৬
শহরতলীর বসতি অঞ্চল	৩০০	৩৬৫	৩৯৫	৩২৬	৩৫৪	২৯২	৪৯৮	৩৯৪

এই তালিকা থেকে এটা পরিষ্কার যে, শিল্পাঞ্চলে ভাসমান বস্তুকণা কখনো কখনো জাতীয় সর্বোচ্চ মানের নীচে থাকলেও বসতি অঞ্চলে ও বাণিজ্য এলাকায় তা সর্বদাই উচ্চ-সীমার উপরে থেকেছে।

এতক্ষণ যে-সমীক্ষাগুলির কথা বলা হল তাতে মাপার যন্ত্র ছিল ৪ থেকে ১০ মিটার উপরে। কিন্তু কলকাতার রাস্তার বাতাসের কী হাল? মাটি থেকে ১·৫-২ মিটার উপরে, যেখানে রাস্তার পথ-চলতি হাজার হাজার নাগরিক, বহু অফিসের লোক, দোকান বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করেন?

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার পাঁচটা কর্মব্যস্ত মোড়ে যে-সমীক্ষা চালানো হয়, তাতে মাপার যন্ত্র রাখা হয়েছিল রাস্তা থেকে ১·৫-২ মিটার উপরে। যানবাহনের, বিশেষ করে মোটরগাড়ির, ইঞ্জিন-নিঃসৃত ধোঁয়া এই উচ্চতাতেই সর্বাধিক। এই সমীক্ষার ফলাফল কলকাতার বাতাসের এক ভয়াবহ ছবি তুলে ধরে। পরের তালিকায় তা দেখানো হল।

এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, দূষণের এই উপাদানগুলির নির্ধারিত উচ্চসীমা যথাক্রমে ২০০, ৮০ এবং ৮০। ওইসব রাস্তার কার্বন মনোকসাইড গ্যাসের পরিমাণ ছিল ১ থেকে ১৫ পি পি এম (পার্টস পার মিলিয়ন)-এর মধ্যে। অন্য একটা সমীক্ষায় জানা গেছে যে, কলকাতা শহরে প্রতিদিন ১৩০০ টন দূষণের উপাদান ছড়ায় এবং তার শতকরা ৩৫ ভাগ হল কার্বন মনোকসাইড।

এছাড়া জেনারেটরের ডিজেল ইঞ্জিন থেকে নির্গত দূষিত বর্জ্য গ্যাস দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রায় অন্ধকূপ হত্যার চেষ্টা বোধহয় একমাত্র কলকাতাতেই চালানো হয় প্রতিদিন। শহরের অনেক জায়গাতেই নিশ্চয়ই এইরকম ঘটে। শুধু একটি জায়গার বিশেষ উল্লেখ

কলকাতার অঞ্চলের নাম	দূষণকারীর দৈনিক পরিমাণ (মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার)					
	ভাসমান বস্তুকণা		সালফার ডাই-অকসাইড		নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইড	
	বার্ষিক গড়	মাসে সর্বোচ্চ	বার্ষিক গড	মাসে সর্বোচ্চ	বার্ষিক গড়	মাসে সর্বোচ্চ
গড়িয়াহাট	১৮৯৩	২৫৮৫	১৮০	২৪১	১৪২	১৫৪
শ্যামবাজার	২৯৮০	৩৮৬২	১৬৯	২৯৪	১৫৯	২৯০
ডালহৌসি	২৮৭০	৩৬২৮	৯৬	১২৯	২৯৪	৫০০
এসপ্লানেড	৩৩২০	৩৫৪৬	৯৬	১১৫	১৩৮	২০৫
পার্ক স্ট্রিট-চৌরঙ্গি	২৭২৯	৩০৭১	২৩২	৩৮৪	১৮৭	২২৫

করছি। গড়িয়াহাটার মোড়ের সন্ধ্যাবেলার ট্রাফিক জ্যাম বিখ্যাত। গাদাগাদি ভিড়ের বাস-মিনিবাস ঠায় দাঁড়িয়ে। দশ-পনেরো-বিশ মিনিট একই জায়গায়। গরমের দিন। সবাই ঘেমে অস্থির। এদিকে রাস্তার ধারে সারি সারি ডিজেল জেনারেটার—ফুটপাতের হকার্স-স্টলে আলোর বন্দোবস্ত। ইঞ্জিনগুলোর নির্গম নল থেকে গরম দূষিত কালো ধোঁয়া সোজা ঢুকছে দাঁড়িয়ে-থাকা বাস-মিনিবাসে। আমাদের দেশে হাওয়া আইন, জল-আইন এবং দূষণ নিবারণ বোর্ড থাকা সত্ত্বেও এই জিনিস শহরে ঘটছে দিনের পর দিন।

মাত্রাতিরিক্ত যে-ভাসমান বস্তুকণা আছে কলকাতার বাতাসে তাতে কী পাওয়া যায়? কতরকম ক্ষতিকারক জিনিস? এক কথায় বলা যায়, যত রকম জিনিস মানব দেহের ক্ষতি করতে পারে, তার সবই আছে কলকাতার বাতাসে। এইসব ভাসমান বস্তুকণা নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে।

শীতকালের সকাল-বিকেলে কলকাতার বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। বাতাসের গতিবেগ থাকে অতি সামান্য। হাজার হাজার গাড়ি আর উনুনের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে। সামান্য দূরের জিনিসও দেখা যায় না। ঘন ঘন ট্রাফিক জ্যামে একই জায়গায় অনেক গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে ইঞ্জিনের ধোঁয়ার প্রকোপটাও বেড়ে যায়। ঠিক এইরকম অবস্থার জন্য কলকাতার বাতাসের ভাসমান বস্তুকণার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পলিঅ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এবং ভারি ধাতু থাকে। পলিঅ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (পি এ এইচ) সাধারণভাবে বিষাক্ত। এর কোনো কোনো যৌগ ক্যানসার রোগের কারণও বটে। কলকাতা শহরের বাতাসে ভাসমান বস্তুকণার পরিমাণ পৃথিবীর যে-কোনো শহরের চেয়ে বেশি। তাই এই শহরের লোকেদের মধ্যে ফুসফুসের ক্রনিক রোগের প্রকোপও বেশি। পি এ এইচ ছাড়া বাতাসের অন্যান্য ভারি ধাতুও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। অনেক সমীক্ষাতেই দেখা গেছে যে, শহরের ছেলেমেয়েদের রক্তে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এমন ধাতু বা ধাতুজ যৌগের ভাগ কলকাতার ভাসমান বস্তুকণায় যথেষ্ট বেশি।

কলকাতার পাঁচটি রাস্তার মোড়ে বায়ু-দূষণের সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। সেই জায়গাগুলিতে পি এ এইচ ও অন্যান্য ভারি ধাতুর হদিশ মিলেছে বাতাসে। পি এ এইচ

সবচেয়ে বেশি ছিল শ্যামবাজারে—যার পরিমাণ অন্য জায়গাগুলির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। শ্যামবাজার ছাড়া বাকি চারটি জায়গাতে পি এ এইচ-এর পরিমাণ প্রায় সমান।

কলকাতার বাতাসে যথেষ্ট পরিমাণে ভারি ধাতু, যেমন সিসে, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি পাওয়া গেছে। মানুষের শরীরে ধাতুর কুপ্রভাব ধীরে ধীরে বেড়ে যেতে থাকে। অনেক রকম ভাবেই এইসব ধাতু শরীরে ঢুকে পড়তে পারে—বাতাসের ধাতব যৌগ থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে, বাড়ি অথবা রাস্তার ধুলো খাবারের সঙ্গে মিশে গিয়ে, কিংবা ছোটদের ক্ষেত্রে ধুলো-লাগা হাত চাটলে। এছাড়া আরো অন্যান্য উপায়েও সম্ভব। কলকাতার বাতাসে পাওয়া কিছু ভারি ধাতু ও কয়েকটি অধাতুর তালিকা এখানে দেওয়া হল। মনে রাখা দরকার, প্রাপ্তব্য বলতে সেইসব যৌগকেই বোঝানো হচ্ছে যা আমাদের পাকস্থলীর মধ্যে থাকা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয়ে রক্তস্রোতে মিশতে পারে।

ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্য কয়েকটি শহরের বাতাসে এইসব জিনিস কী পরিমাণে আছে বা পাওয়া গেছে তার একটা তুলনামূলক সারণি তৈরি করা যেতে পারে। কলকাতা ছাড়া এই সারণিতে থাকছে পশ্চিম জার্মানির বার্লিন, বেলজিয়ামের ব্রাসেল্‌স্‌, ভারতের কানপুর ও বোম্বাই।

কলকাতা ও শহরতলীতে কলের জল সরবরাহ ব্যবস্থা আছে। একে বলা যায় 'অরগানাইজড' ওয়াটার সাপ্লাই। কেবলমাত্র কলকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকাতেই প্রতিদিন ৭,৫০,০০০ কিলোলিটার জল সরবরাহ করা হয়। অঙ্কটা প্রায় বারো বছর আগের, সম্প্রতি আরো অনেক বেড়েছে। এর সঙ্গে শহরতলীর এলাকা ধরলে পরিমাণটা আরো অনেক বাড়বে সন্দেহ নেই। সি এম ডি অঞ্চলে জলের দৈনিক চাহিদা ১৭ লক্ষ কিলোলিটারেরও বেশি। এই জল প্রধানত আসে দুটো উৎস থেকে—পাম্প করে তোলা গঙ্গার জল ও ভূগর্ভস্থ জল। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে প্রতিদিন ১৫ লক্ষ কিলোলিটার জল মাটির নীচ থেকে তোলা হয়। এছাড়া বড় বড় হাউসিং এস্টেট এবং প্রায় সমস্ত কল-কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় জলের উৎসও ভূগর্ভস্থ জল। সাধারণ লোকের ব্যবহারের জন্য কলকাতা শহরের মধ্যেও অসংখ্য টিউবওয়েল আছে। সারা বছরে মাটির নীচ থেকে যে-পরিমাণ জল তুলে ফেলা হয়, তত পরিমাণ জল সেখানে ফিরে যায় না। এখানকার ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ী, মাটির নীচে জল প্রবেশ করতে পারে প্রধানত সি এম ডি অঞ্চলের উত্তর দিক থেকে। কিন্তু তার গতিও অতি ধীর। ফলে মাটির নীচের জল তুলে নেওয়ার জন্য যে-শূন্যস্থান সেখানে তৈরি হয় এবং ভূমির চাপের পরিবর্তন ঘটে, তাতে কলকাতার বেশ কিছু অঞ্চলের, বিশেষ করে শহরের মধ্য-দক্ষিণ অঞ্চলের, জমি বসে যেতে পারে। এই বিপদ এখন আমাদের মাথার উপরে ঝুলছে। এ-বিষয়ে অবশ্য বড় সি এম ডি অঞ্চলকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১· যেখানে নূতন নলকূপ হবে না এবং বর্তমান নলকূপগুলির ব্যবহার কমাতে হবে : পার্ক সার্কাস থেকে শ্যামবাজার, আর বি বা দী বাগ থেকে শিয়ালদহ।

২· যে-অঞ্চলে বর্তমান হারে জল তোলা ও নূতন নলকূপ বানানো চলতে পারে : কলকাতার পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণদিকে আলিপুর, টালিগঞ্জ থেকে প্রায় বজবজ পর্যন্ত।

৩· পৌরসভার প্রয়োজন মেটানোর জন্য যেসব অঞ্চলে নূতন নলকূপ বসানো সম্ভব : বরানগর, দমদম থেকে গঙ্গার দু'পাড় জুড়ে উত্তরদিকে প্রসারিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

মৌল	যে-অঞ্চলে পাওয়া গেছে				
	ডালহৌসি	পার্ক স্ট্রিট	গড়িয়াহাট	এসপ্লানেড	শ্যামবাজার
সোডিয়াম	√	√	√	√	√
ম্যাগনেশিয়াম	√	√	√	√	√
অ্যালুমিনিয়াম	√	√	√	√	√
সিলিকন	√	√	√	√	√
ফসফরাস	√	√	√	√	√
গন্ধক	√	√	√	√	√
ক্লোরিন	√	√	√	√	√
ক্যালসিয়াম	√	√	√	√	√
পটাশিয়াম	×	√	√	√	√
টাইটানিয়াম	√	√	√	√	√
ক্রোমিয়াম	√	√	√	√	√
নিকেল	√	×	×	×	√
ম্যাঙ্গানিজ	√	√	×	√	√
লোহা	√	√	√	√	√
তামা	√	√	√	√	√
দস্তা	√	√	√	√	√
বেরিয়াম	√	×	×	√	×
সিসে	√	√	√	√	√

৪· যে-অঞ্চল থেকে জল তোলা যাবে এবং সেই জল অন্য জায়গায় সরবরাহ করা চলতে পারে : বারাসত, জাগুলিয়া ইত্যাদি অঞ্চল।

৫· যে-অঞ্চলের জল মানুষের পক্ষে উপযোগী নয়, কারণ সেই জলে ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রবীভূত রয়েছে। এই ধরনের এলাকা বিচ্ছিন্নভাবে গঙ্গার দু' ধারেই ছড়িয়ে আছে : শিয়ালদহের কিছু অঞ্চল, বরানগর, সল্ট লেক, যাদবপুর, ঠাকুরপুকুর, বজবজ, শিবপুর প্রভৃতি কিছু জায়গার জলের এই অসুবিধা আছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, মধ্য ও উত্তর-মধ্য কলকাতা ছাড়া কলকাতার

বিভিন্ন শহরে ধাতুর পরিমাণ*
(মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার)

মৌল	কলকাতা	বার্লিন	ব্রাসেল্‌স্	কানপুর	বোম্বাই
গন্ধক	১৯.৯৩	—	—	৮.৪১	—
ক্লোরিন	১০.২৮	—	—	—	—
পটাশিয়াম	১১.৬৫	—	—	—	—
ক্যালসিয়াম	৪৩·০৬	—	—	—	—
টাইটানিযাম	২.৬	—	—	—	—
ভ্যানাডিয়াম	০.১৮	০.১০১	০.১৬৯	—	—
ক্রোমিয়াম	০.১১	০.০৯৮	০.০৭৭	০.০৯১	—
ম্যাঙ্গানিজ	০.৪৩	০.২৮৬	০.৩৮৫	—	—
লোহা	২৬·৪	৯.৬৬০	১৬.১৭৪	৭.১০	১৩·৯৭
তামা	১.১২	০.৯৩২	০.১৩০	২.৬০	০·৫৫
দস্তা	৩.০৪	৪.৩৪০	২.৩২৬	১.২১	০·৯৭
আর্সেনিক	০.২৬	০.০৬৭	—	—	—
স্ট্রনসিয়াম	০.১৭	—	—	—	—
সিসে	৬.৬৩	১.৪০	৪.৩২	৫.৩৫	০ ৪৬৩

ভূগর্ভস্থ জলস্তর খুব খারাপ অবস্থায় নেই, এবং সি এম ডি এলাকার উত্তরদিকে জলের মজুত ভাণ্ডার বেশ ভাল।

কলকাতার জল সরবরাহের একটা বৃহৎ অংশ আসে পলতা থেকে। সেখানে প্রধানত গঙ্গার জলকে পরিশোধিত করে নেওয়া হয়। সেই জল দীর্ঘপথ বেয়ে কলকাতায় পৌঁছোয়। কলকাতার বাড়িতে বাড়িতে যে-জল পৌঁছোয় তার মান বা বিশুদ্ধতা নানা রকম। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে 'কলের জলে সাপ' সংবাদ ও তার ছবি দেখা—সে-প্রসঙ্গ ছেড়েই দেওয়া গেল। এ-কথা বিশ্বাস করার কারণ আছে, যে-শোধনালয় থেকে জল ছাড়া হয়, তা মানুষের ব্যবহারের উপযোগী। কিন্তু কলকাতার মাটিব নীচে পাইপে অসংখ্য ছিদ্র ও ফাঁক রয়েছে। বলা বাহুল্য, দীর্ঘপথ অতিক্রম করার সময় এইসব ছিদ্র ও ফাঁক দিয়ে দূষিত পদার্থ ক্রমাগত খাওয়ার জলে মিশে যায়। কলকাতার অনেক বাড়িতে ও অফিসে মিউনিসিপ্যালিটির জল ধরে রাখার জন্য মাটির নীচে ছোট-বড় চৌবাচ্চা করা হয়, পরে নিজেদের পাম্প দিয়ে তা ছাদের ট্যাংকে তোলার ব্যবস্থা থাকে। অধিকাংশ বাড়ির এই চৌবাচ্চা ও ট্যাংক এতই অপরিষ্কার যে তা জল-দূষণের উৎস। ফলে কলকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে পাওয়া জলের গুণাগুণ বিষয়ে সব দোষটাই সরবরাহকারী সংস্থার উপরে চাপানো চলে না।

তবে কলকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতম দিক জলের মান নয়, পরিমাণও নয়—তার অপচয়। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই, কারণ সকলেই এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। সরবরাহ করা পরিশ্রুত জলের শতকরা কুড়ি থেকে পঁচিশ ভাগ নষ্ট

* দ্রষ্টব্য : '—' চিহ্নের অর্থ বাতাসে নেই কিংবা এতই কম যে পরিমাপযোগ্য নয়।

হয়। এখনও পর্যন্ত এমন কোনো ব্যবস্থা করা যায়নি যাতে অপ্রয়োজনে রাস্তাব কল বন্ধ করে রাখা যায়।

কলকাতাকে ঘিরে খাল আছে—শ্যামবাজারের খাল, উল্টোডাঙা দিয়ে শহরকে উত্তর-পূর্বে ঘিরেছে। দক্ষিণে আদিগঙ্গা ঘিরেছে দক্ষিণ অঞ্চল। খালগুলি গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত। ভাদ্র মাসের ভরা-কটালে টালিগঞ্জ-গড়িয়ার রাস্তা ডুবে যায় গঙ্গার জলে। বস্তুত ইউরোপের অনেক জায়গাতেই এই মাপের জলপথকে নদী বলা হয়। এই খালগুলিতে টলটলে জল, এবং চারপাশের মনোরম এক পরিবেশে সরু, লম্বা যাত্রীবাহী লঞ্চে যাতায়াত, কল্পনাটা যে খুব অবাস্তব, তা নয়! অথচ আজকের পৃথিবীর দূষিততম জল সম্ভবত পাওয়া যাবে কলকাতার এই খাল দুটিতে। কলকাতা শহরের ভূগর্ভের ড্রেনের জল সোজাসুজি গঙ্গায় ফেলা হয না বটে, কিন্তু গড়িয়া, টালিগঞ্জের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ড্রেনের ময়লা জল এসে পড়ে এই খালে। পূর্ব কলকাতাবও প্রচুর নোংরা জল ওখানকার খাল দূষিত করছে। শিয়ালদহের পূর্বে দুটি রাস্তা আছে বেলেঘাটা অঞ্চলে : ক্যানেল ইস্ট রোড, ক্যানেল ওয়েস্ট রোড। এই দুটি রাস্তাই হতে পারত ওই অঞ্চলের দুটি মনোরম পথ। তাব কী চেহাবা আমরা সবাই জানি। এই খালগুলির দু'ধারে অবিচ্ছিন্নভাবে চলেছে ঝুপড়িব সারি, তাতে বাস করেন অজস্র লোক। মানবদেহের যাবতীয় বর্জ্য বহন করে এই জলপথ দুটি এখন দুর্গন্ধেব আকর। অথচ এরই একটির ধারে কলকাতার মহাতীর্থ কালীঘাট, সেখান থেকে পবিত্র জল নিয়ে যান অনেকে।

কলকাতা শহর পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপের একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত। এর কিছু দক্ষিণেই গঙ্গানদীর মোহনা শুরু। গঙ্গাব মূল স্রোত অসংখ্য ধারায় ভেঙে গেছে মোহনা অঞ্চলে। এই গঙ্গাব ধাব দিয়েই রয়েছে কলকাতার প্রধান শিল্পাঞ্চল। গঙ্গা থেকে দেখা শিল্পাঞ্চলের যে-শ্রীহীনতায় বেদনার্ত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে, আজকেব অবস্থা তাঁর কল্পনায় এসেছিল কিনা কে জানে। তবে যে-শ্রীহীনতাব কথা তিনি বলেছেন, তা কেবল গঙ্গাতীরেব স্বাভাবিক শ্যামল-শোভাব মধ্যে কুশ্রী কল-কারখানা দেখে। তা থেকে কোন কোন বর্জ্য পদার্থ কলকাতাব গঙ্গাকে কতটা বিষাক্ত করছে তার হিসাব তিনি করেননি।

এ-অঙ্কটা কষা হয়েছে অনেক পরে। কলকাতার উত্তরে ও দক্ষিণে বহু কারখানার দূষিত জল সোজাসুজি গঙ্গায় ফেলা হয়। গঙ্গা তীরের অনেক শহরের ময়লা জলও এই নদীতেই পড়ে। হুগলি নদীব দু'পাশে সি এম ডি এলাকাতে আছে ছোট-বড় ৪২টি শিল্প-নগরী। হাওড়া ও কলকাতাতেই অবশ্য এদের সংখ্যা বেশি। অবস্থানগত কারণে এইসব কারখানার এবং শহরগুলির দূষিত জল এসে পড়ে গঙ্গায়। এর পরিমাণ দিনে কমপক্ষে ২২,২৩,০০০ কিলোলিটার। এর মধ্যে আনুমানিক ৮ লক্ষ কিলোলিটার শহবের নোংরা জল, বাকিটা কারখানার।

এই জল থেকে নদী কতটা দূষিত হয় তা বেশ কয়েকটি জিনিসের উপরে নির্ভর কবে। এর বিচারের জন্য শহর-জনিত দূষণ ও কারখানা-জনিত দূষণ দুটিকে পৃথকভাবে বিচার করা যেতে পারে।

শহরের জন্য যে-দূষণ তা দূষিত বস্তুর জৈব অথবা অজৈব উৎসের উপরে নির্ভরশীল। এর মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের জৈব-বর্জ্য (যার অনেকগুলি হয়ত রোগ-জীবাণু বহনকারী অথবা নিজেরাই রোগ-জীবাণুময়) এবং ধাতব-অধাতব যৌগ। এরা জলের সঙ্গে ভেসে-থাকা বস্তুকণার পরিমাণ বাড়িয়ে জলকে ঘোলা কবতে পারে, বায়ো-কেমিক্যাল

অকসিজেন ডিমাণ্ড (বি ও ডি), কেমিক্যাল অকসিজেন ডিমাণ্ড (সি ও ডি) বাড়াতে পারে, রোগ-জীবাণু ইত্যাদির পরিমাণ বাড়িয়ে জলকে ব্যবহারের অযোগ্য করে তোলে।

জলের মধ্যে কোনো জৈব-রাসায়নিক পদার্থ পড়লে তাতে নানা রকম জৈব-রাসায়নিক জারণ বিক্রিয়া শুরু হয়। এতে জল প্রকৃতপক্ষে পরিশোধিতই হয়। কিন্তু এই জারণ বিক্রিয়ার জন্য যে-পরিমাণ অকসিজেন প্রয়োজন হয় (বি ও ডি) তা জলের উপরের বাতাস থেকে বা জলের মধ্যে দ্রবীভূত অকসিজেন থেকে নিতে হয়। জৈব-রাসায়নিক দূষিত পদার্থ জলে বেশি পড়লে বি ও ডি-এর পরিমাণও লাগে বেশি। এতে জলের অকসিজেনে টান পড়তে পারে। ফলে যেসব প্রাণী বা গাছ জলের অকসিজেনের উপরে নির্ভরশীল তাদের ক্ষতি হয়। তাই বি ও ডি-কে জলদূষণ-মাত্রার এক ধরনের একক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আবার জলের মধ্যে এমন কিছু পড়ল যার জারণে জলের অকসিজেন লাগল ঠিকই, কিন্তু জারণ বিক্রিয়াটি জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া নয়। এইরকম ক্ষেত্রে বলা হয় কেমিক্যাল অকসিজেন ডিমাণ্ড। এর আধিক্যও জলের দূষণ-মাত্রা অনুমান করার কাজে লাগে।

শহর থেকে যে-অপরিষ্কার জল নদীতে পড়ে তাতে মানুষের দেহের বর্জ্য বস্তু, গৃহপালিত পশুর বর্জ্য বস্তু, রাস্তাঘাটের ময়লা, গাছপালার অংশ, খাবারের উচ্ছিষ্ট প্রভৃতি হাজারো জিনিস থাকে। এর অধিকাংশই বি ও ডি-এর ভারকে বাড়িয়ে তোলে।

অন্যদিকে শিল্পাঞ্চল থেকে যে-জল এসে পড়ে নদীতে তাতে প্রভূত পরিমাণে জৈব এবং অজৈব দূষণ সৃষ্টিকারী বস্তু থাকে। ধাতব যৌগের মধ্যে সীসা, আর্সেনিক, পারদ, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সিলিনিয়াম হামেশাই পাওয়া যায়। অধাতব যৌগের মধ্যে সায়ানাইড, নানা ধরনের পেট্রো-কেমিক্যাল, রঙ, পোড়া খনিজ তেল প্রভৃতি পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। এছাড়া কৃষিক্ষেত্রের রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদীতে এসে পড়ে।

কলকাতার উত্তরে ও দক্ষিণে চারটি জায়গায় গঙ্গার জল পরীক্ষা করে যে-ফলাফল পাওয়া গেছে তার একটি তালিকা পরে দেওয়া হল। (সূত্র : পশ্চিমবঙ্গ জলদূষণ নিবারণ পর্ষদ : ১৯৮০-৮১)।

এখানে 'কলিফর্ম' বিষয়টি একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এটি এক শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়ার সাধারণ নাম। এদের মধ্যে 'ইসকিরিচিয়া' শ্রেণী কেবলমাত্র 'উষ্ণ রক্তের' প্রাণীর অন্ত্রে পাওয়া যায়। সুতরাং জলে এই কলিফর্ম পাওয়া গেলে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, তাতে এই শ্রেণীর প্রাণীর (যার মধ্যে মানুষও আছে) মল মিশেছে। কলিফর্মের অন্য একটি শ্রেণী 'এরোজিনাস'। এ যেমন প্রাণীদেহে পাওয়া যায়, তেমনি মাটি বা অন্য জায়গাতেও। জল পরীক্ষার সময় কলিফর্মের পরিমাণ নির্ধারণ করার সময় এই দুই শ্রেণীকে আলাদাভাবে মাপা হয় না। সুতরাং মোট কলিফর্মের মধ্যে কোন শ্রেণীর কলিফর্ম কী পরিমাণে আছে তার হিসাবটা থাকে না। তাই জলে কলিফর্মের উপস্থিতি জলের সঙ্গে মলের মিশ্রণের ইঙ্গিতবাহী, তবে নিশ্চিত প্রমাণ নয়। কিন্তু আমাদের দেশে যে-ভাবে মাঠে-ঘাটে মলত্যাগের প্রথা প্রচলিত, তাতে নদীর জলে 'ইসকিরিচিয়া' শ্রেণীর কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়া থাকে যথেষ্ট পরিমাণে এবং এই শ্রেণীর জীবাণু থেকে আন্ত্রিক রোগ, টাইফয়েড, কলেরা, হেপাটাইটিস প্রভৃতি রোগ ছড়ায়।

আর একটি হিসাব এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। গোটা সি এম ডি এলাকায় প্রতিদিন যে-পরিমাণ আবর্জনা তৈরি হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় বি ও ডি দিনে প্রায় ৩,৯৭,০০০ কিলোগ্রাম। এর মধ্যে বেশির ভাগই কিন্তু শহরের আবর্জনার জন্য—প্রায়

	১৯৮০								১৯৮১			
	মে	জুন	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই
দ্রবীভূত অকসিজেন (মিলিগ্রাম/লিটার)												
কল্যাণী	৬ ৫	৫ ৪	৫ ৬	৭ ০	—	৮ ৮	৮ ০	৭.২	৭ ০	৭ ১	৭ ২	৫.৮
পলতা	৫ ৭	৪ ০	৫ ৬	৭.২	৮ ৮	৮ ৪	৮.২	৭ ৪	৭.০	—	৬.০	৬.২
উলুবেড়িয়া	৪.৮	৪ ০	৫.৬	৭ ৮	৮.০	৭.৮	৭.১	৬.৩	৬.০	৬.০	৫.৪	৬.২
ডায়মন্ডহারবার	৫ ৩	৫.১	৫.৮	৬ ৬	৭.৪	৮ ০	৭ ৮	৭.৪	৬.৪	৬.৬	৬.৮	৬.০
বি ও ডি (মিলিগ্রাম/লিটার)												
কল্যাণী	০.৯	১ ০	৩ ৩	০ ৪	—	৪ ৪	৩.৩	১৩.৫	১ ৬	১.৩	১ ২	০.৪
পলতা	০.৪	০.৪	০ ৪	০ ৬	১.২	০ ৮	১ ০	০ ৬	০.৬	১.৮	২.৪	১.০
উলুবেড়িয়া	০.৪	০.৩	০.৫	০ ৮	১ ৫	২ ৪	১.৪	৩.৫	১.২	২.০	০.৮	১.২
ডায়মন্ডহারবার	১৪.০	২৮ ৪	০ ৮	১ ১	০.৪	২ ০	১.৬	১৫.০	৩০.০	২৪ ৫	১.২	০.৬
মোট কলিফর্মের সংখ্যা (কাছাকাছি সংখ্যা × ১০০০/ ১০০ মিলিলিটার)												
কল্যাণী	১১	২৪	২৪	২৪	—	১১	৪৬	২৪০	২৪০	২৪০	৪৬	২৪০
পলতা	৪.৬	২৪	২৪	২৪	১১০	৪৬	৪৬০	২৪০	—	২৪০	২৪০	৯.৩
উলুবেড়িয়া	২৪	২৪	১১	১১	১১	২৫০	২১০	৪৬০	২১০	২৪০	২৪০	২৪০
ডায়মন্ডহারবার	৪.৬	১.৫	২৫	২৪	৪.৬	০ ৯	২৪	৪.৬	২১	১.৫	৪.৬	৯.৩
সি ও ডি (মিলিগ্রাম/লিটার)												
কল্যাণী	১০ ৮	১০.৮	২৮.৮	১০ ৮	—	১৮.০	৪৩.২	১৪৪.০	১৮.০	১৮.০	১৪.৪	১০.৮
পলতা	১০.৮	৭.২	৪৩ ২	১০ ৮	১০ ৮	১০ ৮	১৪.৪	১৪.৪	৪৬.৮	২৮.৮	৩২.৪	২৮.৮
উলুবেড়িয়া	১০ ৮	১০.৮	১৪.৪	৭ ২	২১.৬	১৮ ০	১৮ ০	৬৪.৮	২৮.৮	৩৬.০	১৮.০	১৮.০
ডায়মন্ডহারবার	২২৩.০	১০৮ ০	১৪ ৪	১৮ ০	১০.৮	৩২.৪	২৮.৮	১১৮.৮	৫৫৮.৮	২৪১.২	২১.৬	১০.৮

২,৮০,০০০ কিলোগ্রাম, বাকিটা কল-কারখানা থেকে আসা। এ-থেকে বোঝা যায়, এই অঞ্চলে লোকসংখ্যার চাপ ও পরিবেশে তার প্রভাব কতখানি।

কলকাতা আরো একটি বিষয়ে পৃথিবীর অন্য যে-কোনো শহরকে বোধহয় টেক্কা দিতে পারে—তা হল গোলমাল বা আওয়াজ। পরিভাষায় বলতে গেলে শব্দদূষণ। রাস্তার এই রকম প্রচণ্ড কোলাহল আর কোনো শহরে নেই। গাড়ির আওয়াজ (সম্প্রতি মোটর সাইকেল ও স্কুটার-এর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় গোটা ব্যাপারটা তীব্রতর হয়েছে) তো আছেই—তার সঙ্গে আছে গাড়ির হর্ন : ইলেকট্রিক হর্ন ও কান-ফাটানো এয়ার হর্ন। কলকাতার গাড়ি চালিয়েদের বিনা কারণে হর্ন বাজানো একটা বদভ্যাস। পৃথিবীর অন্য কোনো বড় শহরে 'হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ'—এইরকম একটা অলিখিত আইনই যেন জারি থাকে। এর সঙ্গে আছে যখন-তখন লাউড স্পিকার চালানো ও বাজি-পটকা ফাটানোর স্বাধীনতা। কারো বাড়ি বিয়ে বা অন্নপ্রাশন লাগল তো সারাদিন, সারারাত লাউড স্পিকারের অত্যাচার। বছরের যে-কোনো দিন, দিনে-রাতে যে-কোনো সময়ে, ফাটানো চলে বোমা কিংবা পটকা। রেডিও, ক্যাসেট-এর দোকানে চব্বিশ ঘণ্টা চলেছে গান। অথচ শব্দ জিনিসটা যে মারাত্মক ক্ষতিকর সে-বোধ এত বড় শহরের এত লোকের মধ্যে নেই। অতিরিক্ত শব্দ মানুষের কানকে নষ্ট করে। অর্থাৎ তার শ্রবণক্ষমতা কমে যায়। হঠাৎ জোরে শব্দ মানুষের কান ছাড়াও হৃৎপিণ্ডের ও মস্তিষ্কের ক্ষতি করে। হৃদ্‌রোগীদের ক্ষেত্রে হঠাৎ শব্দের ফল মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু অভিভাবকহীন এ-শহরে শব্দ নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা নেই, অথবা থাকলেও তার কোনো প্রয়োগ নেই। সর্বক্ষণ অতিরিক্ত শব্দের মধ্যে থাকলে মানুষের মেজাজ খিটখিটে হতে বাধ্য। কলকাতা শহরে যে গোলমালের মাত্রা অতিরিক্ত, তা বোঝার জন্য কোনো মাপার যন্ত্র লাগে না। তবে তাও মাপা হয়েছে অনেক জায়গাতেই। যা মাপা হয়েছে, তা স্বাভাবিক ট্রাফিক চলাচল ও লোকজন যাতায়াতের শব্দ।

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শহরের চারটি প্রধান রাস্তার মোড়ে পরিমাপ করা গোলমালের গড় নীচে দেওয়া হল :

স্থান	তারিখ	সময়	গড় গোলমাল ডি বি-এ[১]
ডালহৌসি স্কোয়ার	২-২-৮৪	সকাল ১০-৩০	৮৪.৪
		সন্ধে ৬-১৫	৮০.৪
এসপ্লানেড	৩-২-৮৪	সকাল ১০-৪০-১১-৪০	৮২.১
		বিকেল ৫-১৫-৬-১৫	৭৫.০
পার্ক স্ট্রিট-চৌরঙ্গি	৬-২-৮৪	সকাল ১১-২৫-১২টা	৭৮.৮
		সন্ধে ৬-৫০	৭৭.৬
গড়িয়াহাট মোড়	৯-২-৮৪	বিকেল ৫-৪০	৮০.১
		সন্ধে ৬-১৫-৬-৩০	৮১.২

১ মানুষের শ্রবণক্ষমতার মাত্রায় শব্দের তীব্রতার একক ডেসিবেল বা ডি বি। এরই পরিবর্তিত রূপ ডি বি-এ।

এগুলি সবই ৩১·৫ থেকে ১৬ হাজার কম্পাঙ্কের শব্দের তীব্রতার গড় মান। উল্লেখযোগ্য, শব্দের তীব্রতা কুড়ি ডেসিবেলের কম হলে, তা মানুষের কানের শ্রবণযন্ত্রে সাড়া জাগাতে পারে না, অর্থাৎ তা আমরা শুনতে পাই না। আবার তীব্রতা ৭০ ডেসিবেলের বেশি হলে তা মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে পীড়িত করে। তালিকাটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রাস্তায় বেরোলেই যে-আওয়াজ শোনা যায় তা সর্বদাই মানুষের সহ্যসীমার বাইরে ও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক।

পরিবেশ নিয়ে যাঁরা চিন্তা-ভাবনা করেন, তাঁরা পরিবেশের বিশেষ কতকগুলি বিষয়েই শুধু জোর দেন। জল, বাতাস, মাটি ও শব্দ—তাঁদের বিচারে এগুলিই প্রাধান্য পায়। যে-কথাটা বিজ্ঞানীরা সব থেকে কম আলোচনা করেন, তা হল চোখের সামনের দৃশ্যগুলি ও তার থেকে মানুষের মনে কী প্রভাব হচ্ছে অর্থাৎ সাইট পলিউশন। কেন জানি না এই বিষয়ে কলকাতার কোনো মনোযোগ নেই। ময়দান, লেকের কিছু অংশ ও অধুনা সল্ট লেকের কয়েকটি জায়গা বাদ দিলে কলকাতায় আজ আর এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে মানুষের চোখ একটু স্বস্তি ও আরাম পায়। শহরের মধ্যে যে-দু' দশটা পার্ক ছিল, তাতে এখন সবুজ নেই। আর থাকলেও তা দেখা যায় না, কারণ তার চারধার দিয়ে গজিয়ে উঠেছে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হকার স্টল। গোলদীঘি, পদ্মপুকুর, হেদুয়া এমন কি ঢাকুরিয়া লেকও আজ মানুষের স্নান, কাপড়কাচা আর গরু-বাছুর স্নান করানোর কাজে ব্যবহার হচ্ছে। শহরের কোনো বাড়ির সৌন্দর্য আজ আর দেখা যায় না। কেন জানি না, বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, তাকে নিয়মিত রং-মেরামতি করা কলকাতার শহরের কালচারে নেই। সব বাড়ির মালিকই টাকার অভাবে বাড়ি-ঘরদোর সারাতে বা রঙ করতে পারে না। এ-তত্ত্ব কি বিশ্বাসযোগ্য? শহরের জরাজীর্ণ এই চেহারাটা আজকাল সর্বত্র—ধর্মতলায়, বৌবাজারে, শ্যামবাজারে, চিৎপুরে, এমন কী খোদ চৌরঙ্গিতেও। এরপর আছে পোস্টার। কোনো দেওয়াল ফাঁকা নেই—বিজ্ঞাপন, রাজনৈতিক পোস্টার, গভঃ রেজিস্টার্ড ওষুধের বিজ্ঞাপন, সিনেমার হোর্ডিং ও পোস্টার। দৈনিক কত টন কাগজ বা রঙ কলকাতার দেওয়ালে লোকচক্ষুর পীড়ার কারণ হিসাবে লাগানো হচ্ছে তার হিসাব নেই। সরকারি অফিস কাছারিতে কোনো দেওয়ালে খালি জায়গা নেই এতটুকু। এইরকম চারদিক থেকে দম-বন্ধ করা অসহায় অবস্থায় ক্রমাগত চাপের মধ্যে থাকলে মানুষের দেহ-মনে বিকার হবেই। কলকাতার প্রতিটি মানুষই বর্তমানে এই অবস্থার শিকার।

অন্য দিক থেকে বিচার করলে এখানকার পরিবেশগত অবস্থা আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাইরে চলে গেছে—কলকাতা শহর বিষয়ে এ-কথা সত্য নয়। যেমন, বাতাসে গ্যাসের পরিমাণ কিছু মাত্রাতিরিক্ত বেশি নয় আজও। কিন্তু ধুলোর পরিমাণ অস্বাভাবিক বেশি। কলকাতার ভূগর্ভ ড্রেনের পলি ধাপায় উত্তম সারের কাজ করে এবং ড্রেনের নোংরা জলে খুব ভাল মাছ চাষ হয় পূর্ব কলকাতার ভেড়িগুলিতে। এই জলে এবং পলিতে যথেষ্ট পরিমাণে ভারি ধাতু পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু পৃথিবীর অন্য অনেক বড় শহরের তুলনায় তা পরিমাণে কম। তবে বছরের পর বছর ধরে জমতে জমতে অবস্থাটা ক্রমশ যে খারাপ হবে তা বলা চলে। কলকাতা শহরের সব চাইতে বড় অসুবিধা, এখানে প্রয়োজন অনুযায়ী কোনো কিছু করে ওঠা যায় না। গত প্রায় বিশ বছর ধরে শহরে 'ধুলো বেশি' রব শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তাকে কমানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা হয়নি, চিন্তা-ভাবনাও নয়।

শহর বলতে যে-জিনিসটি আমরা বুঝি তা একটি কৃত্রিম ব্যাপার এবং এর ইকোলজিকাল ভারসাম্য বজায় রাখতে গেলে তা কৃত্রিম উপায়েই রাখতে হবে। বনের গাছের ঝরাপাতা

মাটিতে পড়ে সেখানেই পচে। শান-বাঁধানো রাস্তায় কাঁটালের ভূতির এই বায়োডিগ্রেডেশন অত সহজে সম্ভব নয়। তাকে সরাতে হয় কৃত্রিম উপায়ে। শহরের ইকো-সিস্টেম মূলত কিছু কাজের সংস্থার উপর নির্ভর করে। এইগুলির সঙ্গে আবার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা জড়িত আছে। আছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। সবার সঙ্গে সবার সমন্বয়ই একটা শহরকে শহর রাখতে পারে। কলকাতার দুর্ভাগ্য—এখানে আছে সবই—কিন্তু কোনো সমন্বয় নেই, নেই সমন্বয়ের স্বার্থে কোনো আন্দোলন। অথচ এই মুহূর্তে এটারই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

কৃতজ্ঞতা ডঃ নিলয় চৌধুরি ডঃ অজিতকুমার সাহা, বুদ্ধদেব ঘোষ

কলকাতার গবেষণাগার

অরূপরতন ভট্টাচার্য

গঙ্গানদীর পূর্বতটে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উত্তরে কলকাতা শহরের বুকে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ইতিহাস সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশেরই শিক্ষাবিস্তার এবং গবেষণার ইতিহাস। বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রেও এ-কথা বিশেষভাবে সত্য।

আজ থেকে দু'শো বছরেরও আগে সার উইলিয়াম জোন্স এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করার পরে বাঙালি মনীষা এবং ইংরাজ ব্যক্তিত্বের উদ্যোগে কলকাতা শহর ও সন্নিহিত অঞ্চল শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক পীঠস্থান হিসাবে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। এ-ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অপরিহার্য ভূমিকার কথা অনস্বীকার্য এবং সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে তার অনুশীলনের ব্যবস্থাও ছিল। শুধু ব্রিটিশ-ভারতে নয়, কলকাতা শহরকে এখনও জ্ঞানচর্চাব কেন্দ্রস্থল হিসাবে গণ্য করা যায়।

চার্নকের সময়ের কলকাতা থেকে শুরু করে ব্রিটিশ রাজত্বকালে এই শহরে জ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চা মূলত প্রয়োজনভিত্তিক। সরলীকরণ বা সুযোগ আহরণের উদ্দেশ্যে তার চর্চা। সত্যি কথা বলতে কি, বিজ্ঞানচর্চা এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানের পরিধি যুগের প্রয়োজনে আপন স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিস্তৃত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ক্ষেত্রে দুটি বিশ্বযুদ্ধ এর দৃষ্টান্তস্বরূপ। সভ্যতার বিবর্তনে তারা যুগান্তর ঘটিয়েছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে বা ব্রিটিশ রাজত্বকালে কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যেসব বিজ্ঞান-সংস্থা এবং গবেষণাগার স্থাপিত হল, জ্ঞানচর্চা এবং জ্ঞানোন্মেষের দিকে তাদের ততটা দৃষ্টি ছিল না, যতটা আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তাদেব তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।

সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, ন্যাশনাল ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট্‌স লিমিটেড, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার মত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার পিছনে ইউরোপীয়দের এই উদ্দেশ্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব আদায় করা প্রয়োজন। সেইজন্যে জমির পরিমাপ করা দরকার এবং জমির পরিমাপ অর্থ জরিপের কাজ। প্রতিষ্ঠা হল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার। কিন্তু জরিপ-কার্যে যেসব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, তা অব্যবহার্য হয়ে পড়লে কি হবে ? সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত করা হবে কেমন করে ? জরিপ-কার্য সময়মতো করার জন্যে যন্ত্রপাতি মেরামত এ-দেশেই করা সমীচীন। স্থাপিত হল ন্যাশনাল ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট্‌স লিমিটেড। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাও সেদিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। যোগাযোগের জন্যে রেলপথ স্থাপন দরকার, কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালানোর জন্যে কয়লা ছিল অপরিহার্য।

এইভাবে প্রথমদিকে বিজ্ঞান-গবেষণাগার স্থাপনের পিছনে ইউরোপীয় উদ্দেশ্য থাকলেও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মনীষার আগ্রহও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

এলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। মহেন্দ্রলাল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অত্যন্ত উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরিবেশও তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল এশিয়াটিক সোসাইটি। শিক্ষাবিস্তারে স্থাপিত হল প্রেসিডেন্সি কলেজ (প্রথম নাম হিন্দু কলেজ : প্রতিষ্ঠা ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ, ১৮৫৫-এ নামকরণ প্রেসিডেন্সি কলেজ।)। শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী তখন সারস্বত সাধনায় উজ্জীবিত। বস্তুত হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত। অবশ্য বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার সূত্রপাতে শ্রীরামপুর মিশন এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তিকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। এছাড়া ১৮৭৬-এ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্সের প্রতিষ্ঠা আমাদেব দেশে এক দিক্‌চিহ্নস্বরূপ।

পরবর্তিকালে বিংশ শতাব্দীতে প্রাক্‌-স্বাধীন ভারতবর্ষে কলকাতা শহরে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌সটিটিউট, ইণ্ডিয়ান ইন্‌সটিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি, রিজিওন্যাল মিটিওরলজিক্যাল সেন্টার উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং রিজিওন্যাল মিটিওরলজিক্যাল সেন্টার ছাড়া অন্যত্র বাঙালি উদ্যোগ লক্ষণীয়। বসু বিজ্ঞান মন্দির জগদীশচন্দ্র বসু নামাঙ্কিত এবং তাঁর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং ইণ্ডিয়ান ইন্‌সটিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি প্রতিষ্ঠার মূলে ডঃ জে সি রায়ের নেতৃত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর ভাবতবর্ষে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক পরেই কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তার পটভূমি তৈরির কাজ চলে অনেক আগে থেকে। এ-রকম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেন্ট্রাল গ্লাস এন্ড্‌ সিরামিক রিসার্চ ইনসটিটিউট, সাহা ইন্‌সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বা প্রাক্‌-স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বদেশের বিজ্ঞানীদের জ্ঞানচর্চাব ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য দেশে কোনো কোনো বিষয়েব প্রাথমিক সূচনা পর্বে এখানকার বিজ্ঞানীরা সেই সব বিষয়ে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা অনুধাবন করেন এবং আমাদের এখানেও বিষয়গুলি সম্পর্কে গবেষণায় উদ্যোগী হন। এইভাবে বিদেশে কোনো কোনো বিষয়চর্চার অঙ্কুর অবস্থাতেই এই কলকাতা শহরেই সেই বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই সব উদ্যোগ বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জহরলাল নেহরুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

সার্ভে অব ইণ্ডিয়া

সমুদ্র-পথে যেসব বিদেশি পর্যটক এবং ধর্ম-প্রচারক আমাদের দেশে এসে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতেন, তাঁরা অনেকেই সেই সব নির্দিষ্ট স্থানের একটা রেখচিত্র তৈরি করে রাখতেন। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে প্লাসটেড নামে এক ভদ্রলোক তৎকালীন বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত চট্টগ্রামের তটভূমি জরিপ করেন। ওই বছরেই ২৪ পরগনা জরিপ করেন ক্যামেরন সাহেব।

অবশ্য ভারতের প্রথম প্রামাণিক মানচিত্র প্রকাশিত হয় পলাশির যুদ্ধের ৫ বছর আগে ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশ করেন ফরাসি ভৌগোলিক ডি অ্যানভিল। বিভিন্ন ভূ-পর্যটক এবং ধর্ম-প্রচারকদের স্থূল রেখাঙ্কনের সাহায্য নিয়েই তিনি প্রথম ভারতের মানচিত্র তৈরি করেন।

এ-দেশে ব্রিটিশ রাজত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জরিপের ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশ হতে থাকে। অধিকৃত জমি পরিমাপ করার জন্যেই জরিপের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। জমির পরিমাপ নিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব নির্ধারণেরও প্রয়োজন আছে। সেই সঙ্গে নিজেদের সুরক্ষার দিকটিও দেখতে হবে। স্থলপথে বা নদীপথে যাতায়াত সুগম করাও বিশেষ জরুরি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাথমিক প্রাধান্য ছিল বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে। সেইজন্যে স্বভাবতই ওই তিনটি জায়গায় জরিপের কাজ প্রাধান্য পায়। অবশ্য এই তিনটি অঞ্চলেব মধ্যে বাংলায় রাজনৈতিক পরিবেশ অনুকূল হওয়ার জন্যে প্রথমে সেখানেই জরিপের কাজ সম্পন্ন করা সহজ হয়। জেম্‌স রেনেল ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে এই কাজ করার দায়িত্ব পান। রেনেল ছিলেন গোলন্দাজ বাহিনীর এক ক্যাপটেনের পুত্র এবং ১৭৪২-এ তাঁর জন্ম। রেনেল প্রথমে নৌ-বাহিনীতে ছিলেন এবং পণ্ডিচেরি অধিকারের ব্যাপারে অংশগ্রহণ কবেন। তারপর তিনি ক্লাইভের অধীনস্থ পদাতিক বাহিনীতে যোগ দেন এবং মেজর পদে উন্নীত হন।

১৭৬৭-এ বাংলায় সার্ভে অফিস প্রতিষ্ঠিত হলে লর্ড ক্লাইভ সার্ভেয়ার জেনারেল হিসাবে এই রেনেলকেই মনোনীত করেন। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দই সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাবর্ষ হিসাবে স্বীকৃত।

কার্যভার গ্রহণ করেই রেনেল বাংলা ও বিহারের জেলাগুলির মানচিত্র তৈরি করান। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ওইগুলি মিলিতভাবে বেঙ্গল অ্যাটলাস নামে প্রকাশিত হয়। জেম্‌স রেনেল ভারতীয় ভৌগোলিকদের জনক হিসাবে অভিহিত।

রেনেলের পরে টমাস কল (১৭৭৭-৮৬), মার্ক উড (১৭৮৬-৮৮), আলেকজাণ্ডার কিড (১৭৮৮-৯৪), রবার্ট হাইট কোলব্রুক (১৭৯৪-১৮০৮), জন গার্স্টিন (১৮০৮-১৩), চার্লস ক্রফোর্ড (১৮১৩-১৫) সকলেই ক্রমান্বয়ে বাংলার সার্ভেয়াব-জেনারেলের পদে মনোনীত হন।

ক্রফোর্ডের কার্যকালের পরে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজেব আঞ্চলিক অফিসগুলি পুনর্গঠন করে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয় জরিপ বিভাগের গোড়াপত্তন হয়। তখন কলকাতাতেই এর মুখ্য দপ্তরটি প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ কলিন ম্যাকেঞ্জিকে সার্ভেয়ার জেনারেল অব ইণ্ডিয়া, অর্থাৎ ভারতের সার্ভেয়ার-জেনারেল, পদে নিয়োগ করা হয়। অবশ্য উনি অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় ১৮১৭-তে উক্ত পদ গ্রহণ করেন। ওই দু' বছরের জন্যে ক্রফোর্ডই কাজ চালান।

সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কলিকাতাস্থ মূল দপ্তর তখন পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল ১· সার্ভেয়ার জেনারেলের অফিস ২· লিথোগ্রাফিক অফিস ৩· ফোটোগ্রাফিক অফিস ৪· ম্যাথমেটিক্যাল ইন্‌সট্রুমেন্ট্‌স্‌ অফিস এবং ৫· রেভিনিউ সার্ভে অফিস।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে কুইন এলিজাবেথের ফোটো সম্বলিত আধ আনা, এক আনা ও চার আনার (১৬ আনায় এক টাকা) ডাকটিকিট সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কলিকাতা অফিসেই মুদ্রিত হয়। শোনা যায়, সাধারণভাবে এই ডাকটিকিটগুলিতে

রাণীর মুখ টিকিটের বাঁ দিকে থাকার কথা হলেও প্রথম কয়েকটিতে তা অনবধানবশত ডানদিকে মুখযুক্ত অবস্থায় মুদ্রিত হয়। এই ধরনের ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের কাছে অমূল্য।

প্রথম ভারতীয় ডাকটিকিট মুদ্রণের সময়ে ক্যাপটেন ওয়াটার হাউস আমাদের দেশে এবং সর্বপ্রথম কলকাতা শহরে সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার মুদ্রণ অফিসেই ফোটোগ্রাফির ব্যবহার প্রবর্তন করেন, যা মুদ্রণের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করে।

সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার প্রথম যুগে সংস্থার অফিস ছিল বিচ্ছিন্নভাবে চৌরঙ্গি, পার্ক স্ট্রিট এবং ফোর্ট উইলিয়াম প্রভৃতি এলাকায়। এইসব অফিসকে একত্রিত করার জন্যে জমি কেনা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৮২ থেকে ১৮৮৯-এর মধ্যে ১৩, ১৪ এবং ১৫ উড স্ট্রিটে সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অফিস তৈরি হয়।

পরবর্তিকালে সার্ভেয়ার জেনারেলের মূল দপ্তর ক্রমান্বয়ে কলকাতা থেকে দিল্লী, মুসৌরি হয়ে বর্তমানে দেরাদুনে স্থানান্তরিত। কলকাতার অফিস পূর্বাঞ্চলীয় মূল অফিস। এই অফিস ১৯৪৭-এর ১ মার্চ শিলং থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয় ১৩ উড স্ট্রিটে। ওই তারিখে মানচিত্র প্রকাশন বিভাগেরও কলকাতা থেকে দেরাদুনে স্থানান্তর ঘটে।

বর্তমানে আঞ্চলিক অফিস আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে মানচিত্র অঙ্কন এবং সেই সংক্রান্ত নানা ধরনের কাজকর্মের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এই সংস্থার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

ন্যাশনাল ইন্‌সট্রুমেণ্ট্‌স লিমিটেড

ভারতে প্রথম শিল্প বিপ্লবের ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে আজও যে-প্রতিষ্ঠানটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, তার নাম ন্যাশনাল ইন্‌সট্রুমেণ্ট্‌স লিমিটেড।

আজ থেকে দেড়শো বছরেরও আগে এ-দেশের মাটিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে এই সংস্থাটির জন্ম হয়। ব্রিটিশ-রাজ ভারতে তার শাসন প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে এ-দেশে ভূমি জরিপের কাজ শুরু হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত হয় সার্ভে অব ইণ্ডিয়া। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জর্জ এভারেস্ট সার্ভেয়ার জেনারেল থাকার সময়ে রাধানাথ শিকদার 'কমপিউটার' হিসাবে তাঁর অধীনে কাজ করতেন।

এ-দেশে জরিপের কাজ করতে গিয়ে এভারেস্ট বুঝেছিলেন যে, তিনি এখানে যেসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করছেন, তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির কাজ এ-দেশেই করতে হবে। না হলে জরিপের ক্ষেত্রে প্রচুর সময় নষ্ট হবে এবং সমস্ত উদ্যোগ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে যন্ত্রপাতিগুলি ব্যবহারোপযোগী এবং ঠিকমতো কার্যকরী রাখার জন্যে একজন কুশলী কারিগর দরকার। অন্যথা এ-দেশে জরিপের কাজ যথাযথভাবে করা সম্ভব হবে না।

জরিপের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে একজন দক্ষ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্যে এভারেস্ট ইংল্যাণ্ডের রয়েল অবসারভেটরির উইলিয়াম রিচার্ডসনকে অনুরোধ করেন। রিচার্ডসন তখন এভারেস্টকে জরিপের কাজে সহযোগিতা করছিলেন। রিচার্ডসন এভারেস্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিস্টার বারো-এর। বারো তখন মাসিক ৫০০ টাকা মাইনেতে নির্দিষ্ট কাজের জন্যে নিযুক্ত হলেন। এছাড়া বাড়ি ভাড়া এবং কারখানার জন্যে তিনি পাবেন মাসিক আরো ২০০ টাকা। তাঁর পদের নাম হল 'ম্যাথ্‌মেটিক্যাল ইন্‌সট্রুমেণ্ট্‌ মেকার'—অর্থাৎ, গাণিতিক যন্ত্রপাতি নির্মাতা।

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ১ ডিসেম্বর কারখানা এবং মিস্টার বারোর বাসস্থানের জন্যে মাসিক ১৭৫ টাকায় ৭/১৬ থিয়েটার স্ট্রিট তিন বছরের লিজ নেওয়া হল। এই থিয়েটার স্ট্রিট কিন্তু থিয়েটার রোড বা সন্নিহিত কোনো অঞ্চল নয়। এটি বর্তমান লায়ন্স্ রেঞ্জ এবং এসপ্লানেড ইস্টের উত্তরের কোনো রাস্তা হয়ে থাকবে। বাড়িটির মালিক ছিলেন বাবু শিবপ্রসাদ ঘোষ।

এ-দেশে জরিপের কাজে সাহায্য করার জন্যে সার্ভেয়ার জেনারেলের অধীনে একটা স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে এই মেরামতি বিভাগটি স্থাপিত হয়। এইভাবেই ন্যাশনাল ইন্সট্রুমেন্ট্স সংস্থাটির গোড়াপত্তন হয় আজ থেকে একশো ষাট বছর আগে। প্রথমে এর নাম ছিল ম্যাথ্মেটিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট্স অফিস।

ছোট সংস্থা—এর শৈশব অবস্থায় বারোকে তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্যে দেওয়া হয় একজন আরমার, একজন টারনার, একজন কাঠের মিস্ত্রি, সেই সঙ্গে পিওন, দারোয়ান ও ঝাড়ুদারও একজন করে।

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস নাগাদ বারো লাউডন স্ট্রিট, চৌরঙ্গি এলাকায় উঠে আসেন। অবশ্য প্রথম বাড়িটি ১৮৩৮ পর্যন্ত কারখানা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

সংস্থাটির বিকাশের ক্ষেত্রে একজন ভারতীয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ইনি হলেন সৈয়দ মীর মহসিন হোসেন। মহসিন হোসেন ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে সার্ভেয়ার-জেনারেলের অফিসে যন্ত্রপাতি মেরামতির কাজে নিযুক্ত হন। কিন্তু কর্মদক্ষতায় তাঁর উন্নতি হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের ২৬ তারিখে ম্যাথ্মেটিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট্ মেকার হিসাবে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে। বলা বাহুল্য, এই পদটি সৃষ্টি হয়েছিল বারো সাহেবের জন্যে। মহসিন হোসেন এই পদের জন্যে নির্বাচিত প্রথম ভারতীয়।

মহসিন হোসেনের সাফল্যে এই সংস্থা উন্নতির সোপান বেয়ে দ্রুত এগিয়ে চলে। ফলে প্রতিষ্ঠানটির পরবর্তিকালের ইতিহাস—ক্রমবর্ধমান শিল্প নৈপুণ্যের ইতিহাস।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই সংস্থার শিল্পনৈপুণ্য ভারত সরকার অন্যান্য বিভাগে কাজে লাগান। তখন সামরিক বিভাগের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং সেই সঙ্গে অপটিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট সারানোর কাজ পূর্ণমাত্রায় করা হয়। তাছাড়া সামরিক বিভাগের জন্যে কম্পাস, হেলিওগ্রাফ, বাইনোকুলার, সিগন্যালিং টেলিস্কোপ তৈরি করাও শুরু হল। এরই সঙ্গে অপটিক্যাল লেন্সও তৈরি আরম্ভ করা হয়—এ-দেশে এই প্রথম।

যে-কোনো যুদ্ধের ভিতর দিয়েই এ-ধরনের সংস্থার বিকাশ এবং পরিণতি স্বাভাবিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই সংস্থা বিশেষ সামরিক সম্ভার এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে নিয়োজিত হয় এবং দেশের প্রয়োজনে উৎপাদনের হার ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। তখন এর কর্তৃত্ব ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের উপরে সাময়িকভাবে ন্যস্ত হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট, সানি পার্ক, পার্ক লেন এবং ১৩ ও ১৫ নম্বর উড স্ট্রিটে আরো কয়েকটি ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করা হয় এরই শাখা হিসাবে। এর মধ্যে ১৫ নম্বর উড স্ট্রিটে সংস্থাটির কার্যালয় ছিল ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই সংস্থায় প্রিজমেটিক বাইনোকুলার, টেলিস্কোপ, প্রিজমেটিক ও লিকুইড কম্পাস, তাছাড়া চৌম্বক কম্পাস, সূর্য কম্পাস এবং গ্রেনেডের অ্যামপিউল তৈরি করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে অপটিক্যাল যন্ত্রপাতি তৈরি ও সামরিক বিমানের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সারানোর কাজ সমানে চলেছিল। ১৯৪৬-এ সংস্থাটির নাম পরিবর্তিত হয়ে হল ন্যাশনাল ইন্সট্রুমেন্ট্স ফ্যাক্টরি।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরেই ১৯৪৭-এর ১ সেপ্টেম্বর এই সংস্থা ভারত সরকারের

শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রকের অধীনে আসে এবং ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন একটি সরকারি শিল্পোদ্যোগ হিসাবে নব কলেবর ধারণ করে। সেই সময় থেকে এই সংস্থাটি ন্যাশনাল ইন্‌সট্রুমেন্টস লিমিটেড নামে পরিচিত। যাদবপুরে বর্তমান কার্যালয়ে সংস্থাটি স্থানান্তরিত হয় এর আগের বছর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে।

সংস্থাটির বিকাশের ক্ষেত্রে বর্তমানে যেসব যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা হচ্ছে, তার মধ্যে দু' একটির কথা বলা যাক। জরিপের কাজে আজকাল ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে দূরত্ব পরিমাপ করা হচ্ছে অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে। যেখানকার দূরত্ব পরিমাপ করা হয়, সেখানে একটি বিশেষ ধরনের প্রিজম রাখা হয়। সেই প্রিজম থেকে অবলোহিত রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে মূল প্রিজমে ফিরে আসে এবং ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দূরত্ব এবং আনুষঙ্গিক তথ্য নির্ণীত হয়ে যায়। জরিপের কাজে এটি আধুনিকতম যন্ত্র। এটির নাম সাইটেশান।

এ-ধরনের যন্ত্রপাতি বর্তমান বিশ্বে জরিপের আধুনিক যন্ত্রপাতির সঙ্গে তাল রেখেই তৈরি।

কার্টোমিটার ম্যাপ বিশ্লেষণের একটি অতি আধুনিক যন্ত্র। কোনো ম্যাপের কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ক্ষেত্রের পরিমাপ বা কোনো বিশেষ বস্তুর অবস্থান বা দূরত্ব সহজেই নির্ণয় করা যায় কমপিউটারের সাহায্যে।

এককালে জরিপের প্রচলিত যন্ত্র ছিল ৬ ফুট (প্রায় ২ মিটারের মত) উঁচু, মাটির উপর চেন টেনে জরিপের কাজ করা হত। আজ সে-অবস্থার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে ব্যবহৃত জরিপের যন্ত্রপাতি আকারে অনেক ছোট হয়ে এসেছে—তা ব্যবহার করা সহজ, তার প্রয়োগ কৌশলও উন্নত এবং সময় সংক্ষেপনও লক্ষ্য করার মত।

সংস্থার উৎপাদনকে সাধারণভাবে ছটি ভাগে ভাগ করা চলতে পারে :

১· জরিপ কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ২· প্রেসার এবং ভ্যাকুয়াম গেজ ৩· থার্মোমিটার এবং হাইগ্রোমিটার ৪· সৌর শক্তি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ৫· নাইট ভিশন অথবা অন্ধকারে দেখার জন্য যন্ত্রপাতি ৬· ক্যামেরা।

বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মধ্যে সামরিক বিভাগে সরবরাহের ক্ষেত্রে এই সংস্থার একটা উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা বড় কথা, সংস্থা অনেক ক্ষেত্রেই পুরোপুরি স্বনির্ভর। মাত্র কোথাও কোথাও অংশত বিদেশি মালের উপরে তার নির্ভরতা। অত্যন্ত কুশলী কারিগর এবং উন্নত মস্তিষ্ক প্রতিষ্ঠানটির বিকাশের ক্ষেত্রে যেভাবে একসঙ্গে কাজ করে চলেছেন যুগের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে, তা যথার্থ লক্ষ্য করার মত। বর্তমানে এই সংস্থার উপরে অনেক ছোট শিল্পের অস্তিত্ব এবং ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসের ৪ তারিখে একজন আইরিশ অধ্যাপক সার টমাস ওল্ডহ্যাম কলকাতায় আসেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জিওলজিক্যাল সার্ভেয়ার হিসাবে পাঁচ বছর মেয়াদের একটি চুক্তিপত্রের ভিত্তিতে তাঁর কলকাতায় আগমন। তাঁর কাজের জন্যে তিনি পেলেন একজন করণিক এবং একজন পিওন। এইভাবেই আমাদের দেশে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কাজের সূচনা।

কিন্তু সরকারি বিভাগ হিসাবে এর প্রতিষ্ঠা বছর ছয়েক পরে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে। প্রথমে মিউজিয়াম সমেত সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি ছিল ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলে, ১

হেস্টিংস স্ট্রিটে। তারপর ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তা স্থানান্তরিত হয় চৌরঙ্গি রোডে। চৌরঙ্গি রোডের উপরে যে বাড়িটি জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বাড়ি হিসাবে এখন নজরে আসে, তা আসলে একটা ক্লাব হাউস। প্রতিষ্ঠানটির একটি অংশ এই বাড়িতে উঠে আসে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্ম দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু মুখ্যালয় রয়ে যায় কলকাতাতেই। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা বিল্ডিং তৈরি হয়েছে চৌরঙ্গি অঞ্চলেই। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধিকর্তা হিসাবে ওল্ডহ্যাম এটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ১৮৫১ থেকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

অবশ্য ওল্ডহ্যাম এদেশে পদার্পণের আগে ভূ-তাত্ত্বিক কাজের কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ-দেশে ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্যে নিয়োগ শুরু হয়। ১৮১৭ থেকে ১৮২১ এই চার বছরের জন্যে বাংলার গভর্নর কুমায়ুন অঞ্চলে জরিপের জন্যে সার্ভেয়ার হিসাবে নিয়োগ করেন মিস্টার লেড্‌ল-কে। লেড্‌ল নিযুক্ত হবার এক বছরের মধ্যে এলেন ডাক্তার এইচ ডবলিউ ভয়জি। জীবিকায় ইনি ছিলেন একজন শল্যবিদ্। কিন্তু ১৮১৮ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত তিনি 'গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'তে যোগ দেন। ডাক্তার ভয়জি ভারতীয় ভূ-তত্ত্বের জনক হিসাবে অভিহিত। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ভয়জি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকবর্গের কাছে এ-দেশের একটি আংশিক ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র পেশ করেন। এটিই প্রথম ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র। যাই হোক, এই রকম বিক্ষিপ্ত কাজের ভিতর দিয়ে আমাদের দেশে ভূ-তাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজ এগিয়ে চলে। এইসব কাজের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা কেউ সামরিক বিভাগের লোক, কেউ আবার সরকারি কর্মচারি, কিন্তু কেউই প্রকৃত অর্থে ভূ-তত্ত্ববিদ্ নন। বস্তুত ভারতে ভূ-তাত্ত্বিক কাজের জন্যে প্রথম ভূ-তত্ত্ববিদ্ হিসাবে এলেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অব গ্রেট ব্রিটেনের ডি এইচ উইলিয়াম্‌স। তিনি নিযুক্ত হলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম জিওলজিক্যাল সার্ভেয়ার। কলকাতায় তিনি আসেন ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখে এবং পরের দিনই কাজে যোগ দেন। শক্তির অনুসন্ধানে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে কয়লার উৎসের মূল্যায়নই ছিল তাঁর কাজ। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল ভারতে ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে পারেননি। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে জরিপের কাজ করার সময়ে হাতির পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ে এক দুর্ঘটনায় তিনি জখম হন এবং কয়েকদিন রোগ ভোগের পরে মারা যান। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার প্রথম অধিকর্তা ওল্ডহ্যাম কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি সিসিল বিডনকে প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য এবং কার্যপ্রণালী কী হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করে একটি পত্র লেখেন।

তিনি যে সব প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তার মধ্যে নূতন কর্মীদের প্রশিক্ষণের কথা ছিল। সেই সঙ্গে ভারতীয় ভূ-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করা দরকার বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া ভূ-তত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণার কাজ ঠিকমতো চালানোর জন্যে ভূ-তাত্ত্বিকদের কাছে ভূ-সংস্থান সংক্রান্ত মানচিত্র থাকা আবশ্যক বলে তাঁর প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।

ভূ-বিজ্ঞান চর্চায় ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র অপরিহার্য। খনিজের আকরের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে প্রাথমিক কাজ হল ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র নির্ণয় করা এবং সংস্থায় প্রথম সেইদিকে জোর দেওয়া হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ম্যাপের কাজ যাঁরা করেন, জীবিকার দিক দিয়ে তাঁদের কারোর সঙ্গেই বিষয়টির কোনো যোগ ছিল না। ১৮২০

খ্রিস্টাব্দে ভয়জি প্রথম মানচিত্রটি পেশ করার পরে ১৮২১-এ বোম্বাই দেশীয় পদাতিক বাহিনীর ক্যাপটেন এফ ডাঙ্গারফিল্ড হায়দ্রাবাদ এবং সন্নিহিত আঞ্চলিক রাজ্যগুলির আর একটি মানচিত্র পেশ করেন। কিন্তু আমাদের দেশের প্রথম ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্রটি প্রকাশিত হয় সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক দুই দশক পরে। এই মানচিত্রে যে স্কেল ব্যবহার করা হয় তাতে ৬৪ মাইল দূরত্বকে ১ ইঞ্চির মাপে প্রকাশ করা হয়েছিল। আজ অবশ্য বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক উন্নত স্কেলে মানচিত্র অঙ্কন এবং পুরাতন মানচিত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমার্জন চলেছে।

প্রাথমিক পর্বে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বিকাশ ঘটেছিল অনেক ধীর গতিতে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবনের কালে একদল একনিষ্ঠ কর্মী ভূ-তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ জরিপ করে ফেললেন। তাছাড়া সেই সময়েব বিভিন্ন খনিজ নিয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান কার্যও সম্পন্ন হল। এসবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি এ-দেশের ছাত্রদের ভূতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভাবে দায়িত্ব নিল।

অবশ্য বিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার পরে দুটি বিশ্বযুদ্ধ প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতির ধারা রীতিমতো ব্যাহত করে।

স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠানটির কাজের আঙ্গিক বদলে যায়। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক কর্তব্য ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র চিত্রণের জন্যে জরিপের কাজ দ্রুত করার পদ্ধতি কিছু কিছু চালু হয়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফোটোজিওলজি, অর্থাৎ আকাশ থেকে তোলা ফোটোর সাহায্যে ভূ-তাত্ত্বিক কাজ এবং রিমোট সেনসিং জিওলজি বা দূরানুভব পদ্ধতি অবলম্বনে ভূ-তাত্ত্বিক কাজ।

ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্রের প্রায়োগিক দিক প্রয়োজনীয় খনিজের অনুসন্ধান। কোন জাতেব শিলায় কী ধরনের খনিজ পাওয়া সম্ভব—এর ভিত্তিতে অনেক প্রয়োজনীয় খনিজের সন্ধানই আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। উদাহরণস্বরূপ, নিম্ন গণ্ডোয়ানা যুগের শিলার কথা বলা চলে। নিম্ন গণ্ডোয়ানা যুগের শিলা কোথাও পাওয়া গেলে সেখানে কয়লা আছে বলে একটা প্রাথমিক অনুমান করা যায়। এর পরের পর্যায়ে খননকার্যের মাধ্যমে অনুসন্ধানের কাজ চালানোর পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কিন্তু বর্তমানে অন্ধকারে অনুমান করার ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়া অনেকটা এড়িয়ে চলা যায়। ফলে অনুসন্ধানের কাজে সাফল্যের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। ড্রিলিং ছাড়া ট্রেঞ্চিং বা পিটিং পদ্ধতিগুলি সরাসরি খুঁড়ে দেখারই পদ্ধতি। ভারতীয় ভূ-তত্ত্ব সমীক্ষার কাজে বর্তমানে এসব পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হচ্ছে।

ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরির সঙ্গে সঙ্গে ভূ-তাত্ত্বিক বিষয়ে কিছু বিশুদ্ধ গবেষণারও প্রয়োজন আছে। পাথর বা শিলার বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন শিলাবিদ্যা বা পেট্রোলজি সংক্রান্ত গবেষণা। সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও একাজে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার যাবতীয় সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ এক্স-রে, স্পেকট্রোস্কোপি, ডিফারেন্সিয়াল থার্মাল অ্যানালিসিস এবং বিশদ রাসায়নিক পরীক্ষার বিভিন্ন রকমের প্রয়োগ এখানে লক্ষণীয়।

ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণার আর একটি বড় দিক ভূ-স্তর সংক্রান্ত গবেষণা। এই গবেষণায় ভূস্তরের বয়স নির্ণয় করা আবশ্যক এবং এজন্য পুরাজীবাবিদ্যার সাহায্য প্রয়োজন। এ-কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির মধ্যে স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ একটি নূতন

সংযোজন। ভূস্তরের বা পাথরের বয়স নির্দেশের জন্যে পুরাজীববিদ্যার সাহায্য ছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতি আছে। আইসোটোপের সাহায্য নিয়েও বয়স নির্ণয় করা যায়। এসব কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে এক আধুনিক গবেষণাগার—জিওক্রোনোলজিক্যাল গবেষণাগার।

ভূতত্ত্ব সমীক্ষার কাজ বর্তমানে আর শুধু স্থলভাগে সীমাবদ্ধ নেই। আমাদের দেশের উপকূলের সীমারেখা ছাড়িয়ে Exclusive Economic Zone অর্থাৎ EEZ – এর মধ্যে বিশেষ জলযানে করে সমীক্ষা ও গবেষণা চালানো হচ্ছে এবং এ-জন্যে রয়েছে 'সমুদ্র-মন্থন'-এর মত বিশেষ বৈজ্ঞানিক জাহাজ। আবার আকাশ থেকে সমীক্ষা করার জন্যেও ব্যবহার করা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সমেত টুইন অটারএয়ারক্রাফট (Twin Otter Aircraft) উড়োজাহাজ। এসব নূতন ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োগের ফলে ভূ-তাত্ত্বিক কাজ যে শুধু দ্রুত করা সম্ভব হচ্ছে, তা নয়, সমীক্ষার কাজ ক্রমশই নিখুঁত ও বিশদভাবে করা সহজ হয়ে উঠছে।

প্রতিষ্ঠানটির মুখ্যালয় কলকাতাতে হলেও সমগ্র দেশে কার্যনির্বাহের জন্যে এর বিভিন্ন শাখা ছড়িয়ে আছে।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স

পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভের প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে এককভাবে ভারতীয়দের নিজস্ব, বিজ্ঞানচর্চার উপযোগী একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চিন্তা দুঃসাহসিকতার পরিচয় বহন করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মনীষীদেব মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন অগ্রগণ্য। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহেন্দ্রলাল ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট সংখ্যার ক্যালকাটা জার্নাল অব-মেডিসিন-এ একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের বিজ্ঞানচর্চার জন্যে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি ব্যক্ত করেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম : 'On the desirability of a National Institution for the Cultivation of Sciences by the Natives of India'. প্রবন্ধটি বিদগ্ধ-সমাজে রীতিমতো আলোড়ন তোলে এবং এ-রকম একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনেব গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ভাবতীয় জনসমাজকে বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা সেই যুগে খুব সহজ কাজ ছিল না। এ-জন্যে যে-মানসিকতা এবং শিক্ষাব দরকার মহেন্দ্রলালের মধ্যে তা পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। তিনি অনুধাবন করেছিলেন, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্যে ভারতীয়দের বিজ্ঞান সাধনা করতে হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল নব নব চিন্তা-ভাবনার উন্মেষের কাল। শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহনের সমাজ-সংস্কার আমাদের দেশে যে-নবজাগরণের সূচনা করে, তা পরবর্তী কালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রেভারেণ্ড ফাদার লা ফোঁ-এর মত বিভিন্ন মনীষীর মাধ্যমে নানা দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী চিন্তার প্লাবন লক্ষ্য করা যায়। এ এক নব অভ্যুত্থানের কাল বলা চলে। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন এরই ফলস্বরূপ। বিজ্ঞানচর্চা এবং বিজ্ঞান-নির্ভরতার মাধ্যমে আমাদের সমাজ ও চিন্তার আধুনিকীকরণ এই আন্দোলনের একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

ডাক্তার সরকার যখন বিজ্ঞানচর্চার জন্যে ভারতীয়দের একান্ত নিজস্ব একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা চিন্তা করেন তখন তিনি ছত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক মানুষ মাত্র। পেশায় চিকিৎসক, সমাজ সংস্কারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন রেনেসাঁসে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর জীবিকার পাশাপাশি এ-দেশে তিনি বিজ্ঞানের উন্নতি এবং বিজ্ঞান মানসিকতা গঠনের কাজে ব্রতী হন এবং এ-সম্পর্কে তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। আধুনিক বিশ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বিজ্ঞান সাধনা বিশেষ আবশ্যক—মহেন্দ্রলাল আপন দূরদৃষ্টি বলে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই এ-সত্য উপলব্ধি করেছিলেন।

ভারতের মাটিতে সেই সময়ে এই বৈপ্লবিক ভাবনা কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া তোলে।

এতে উৎসাহিত হয়ে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি সংখ্যায় হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় বিজ্ঞানের বিকাশের জন্যে তিনি রেজিস্টার্ড সোসাইটির একটি প্রসপেকটাস প্রকাশ করেন এবং সাধারণের কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন জানান। প্রতিষ্ঠানটির প্রস্তাবিত নাম ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশান অফ সায়েন্স (Indian Association for the Cultivation of Science) বা সংক্ষেপে (IACS)। তৎকালীন অনেক নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন এবং সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ৮০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। ওই বছর এবং পরবর্তী বছরেও সোসাইটির উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং বিবিধ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সদস্যেরা বার কয়েক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে মিলিত হন। শেষ পর্যন্ত ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১৫ জানুয়ারি বাংলার গভর্নর লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল সার রিচার্ড টেম্পলের সভাপতিত্বে এবং কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের উপস্থিতিতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার স্থিরীকৃত নামেই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা হয়। এটি ভারতবাসী পরিচালিত প্রথম ভারতীয় গবেষণাগার। প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য : ভারতীয় নাগরিকদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে মৌল গবেষণার সুযোগ দেওয়া এবং বাস্তবে সেই গবেষণালব্ধ ফলের নানাবিধ প্রয়োগে জীবনকে স্বচ্ছন্দ করে তোলা। মৌল গবেষণার ক্ষেত্রে সংস্থার প্রাথমিক উদ্দেশ্য সাধারণভাবে আজও বজায় রয়েছে।

ওই বছরই ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন বাংলা সরকার মধ্য কলকাতায় ২১০ বৌবাজার স্ট্রিটে সংস্থার কাজকর্ম নির্বাহের জন্যে সংস্থাটিকে শর্তসাপেক্ষে বিনামূল্যে একটি বাড়ি দেন। বলা হয়, সংস্থা দান হিসাবে যে-অর্থ সংগ্রহ করবে তা থেকে কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা সরকারি খাতে বিনিয়োগ করতে হবে। তাছাড়া সংস্থার জার্নাল থেকে মাসে ১০০ টাকা আয় সুস্পষ্টভাবে দেখাতে হবে। নতুন বাড়িতে সংস্থাটির দ্বারোদ্ঘাটন হয় ওই বছর জুলাই মাসের ২৯ তারিখে এবং বলতে গেলে ওইদিন থেকেই সংস্থার কাজকর্মের সূত্রপাত। জনসাধারণের দানে একটি মৌলিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার ঘটনা বিশ্বে সম্ভবত এই প্রথম।

চার বছর বাদে সংস্থাটি বাড়ি সমেত সন্নিহিত জমিটি সরকারের কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকায় কিনে নেয়।

প্রতিষ্ঠার পরে ডাক্তার সরকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হিসাবে পরবর্তী আঠাশ বছর সংস্থাটিকে একটি আদর্শ রূপ দেওয়ার জন্যে নিরলস কাজ করে যান। নানা সূত্রে সাহায্য সংগৃহীত হতে থাকে। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর গবেষণাগারের উন্নয়নের জন্য ২৫ হাজার টাকা অর্থ

সাহায্য দেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি অভিজাত লেকচার থিয়েটার নির্মিত হয়। এর জন্যে যে-অর্থ ব্যয় হয়, তা সংগ্রহে এসোসিয়েশনের সদস্যেরা নিজেরা সাহায্য করেন। এর মধ্যে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা, বিজনির রাজা কুমুদ নারায়ণ ভুপ, কুমার ইন্দর চন্দর সিং এবং বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রত্যেকে সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা করে দেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে মার্চের ১২ তারিখে তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় লর্ড রিপন এটির উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি সমেত মোট সাতশো জন উপস্থিত ছিলেন।

২১০ বৌবাজার স্ট্রিটের সংস্থার বাড়িটি ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে আরও জীর্ণ অবস্থায় এসে পৌঁছোয়। বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ সত্ত্বেও এর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, বাড়িটিকে ভেঙে-গড়ে একেবারে একটা নতুন বাড়ি হিসাবে চেহারা বদলে দেওয়া অসম্ভব মনে হয়। ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা প্রথমে উদাব হস্তে ২৫ হাজার টাকা দেন, পরে সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে ৫০ হাজার করেন। এর ফলে সংস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গবেষণা সংক্রান্ত ল্যাবোরেটারিটি তৈরি করতে পারলেন। দাতার নামেই এটির নামকরণ করা হল ভিজিয়ানাগ্রাম ল্যাবোরেটারি। এটি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। এ-দেশে এটিই প্রাকৃতিক গবেষণার প্রথম প্রকৃষ্ট স্থান হিসাবে অভিহিত।

প্রথমদিকে সংস্থার কাজকর্ম সাধারণভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাস নেওয়ার মধ্যে সীমিত ছিল। অবশ্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ নীলরতন সরকার এবং আচার্য পি সি রায়ের মত পণ্ডিতেরা এই প্রতিষ্ঠানে পড়ানোব ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেন।

মহেন্দ্রলাল এ-কথা অনুধাবন করেছিলেন যে, বিজ্ঞানশিক্ষার জন্যে উপযুক্ত বিজ্ঞানশিক্ষকেরও প্রয়োজন। সেই সঙ্গে গবেষণাগারে পূর্ণ সময়ের গবেষক-অধ্যাপকদের গবেষণার কাজেও নিয়োজিত থাকতে হবে। এইদিকে তাকিয়ে মহেন্দ্রলাল তাঁর মূল পরিকল্পনায় পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব বাখেন। সেইজন্যে সংস্থাটি উদ্বোধনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে অগাস্ট মাসে প্রশিক্ষণ-কার্যক্রম শুরু হয়। চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল স্বয়ং পদার্থবিদ্যা পড়াতেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কেমব্রিজ থেকে ফিরেই পদার্থবিদায় প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নেওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ পান। এর বছর দুই বাদে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যোগ দেন। বিশুদ্ধ এবং ফলিত গণিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করে তিনি পদার্থবিদ্যার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রকে আরও উজ্জীবিত করে তোলেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ডাক্তার নীলরতন সরকার শারীরবিজ্ঞান সংক্রান্ত রসায়নশাস্ত্রের ক্লাস নেন। এইভাবে এ-দেশের বিদ্বদ্‌সমাজ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি সম্যক রূপ দেবার চেষ্টা করতে থাকেন।

বিজ্ঞান ক্লাসের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় বিভিন্ন লেকচারে উপস্থিতিব হার ক্রমশ বেড়ে যায়। গোড়ায় ১০ বা ১৫ জনের বেশি লেকচারে উপস্থিত থাকতেন না। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে উপস্থিতির সংখ্যা প্রায় ২০০ জনে উন্নীত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ, লা মার্টিনিয়ার এবং অন্যান্য কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রী এই সব লেকচারে উপস্থিত হতেন। সেই সময়ের কলেজগুলিতে বিজ্ঞানশিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবই এসোসিয়েশনের বিভিন্ন লেকচারে উপস্থিতির হাব বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ। এখানে উল্লেখ করা চলে,

১৮৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই লেকচারে উপস্থিত থাকতেন।

ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বৃত্তি এবং বিভিন্ন পদকের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর সার জন উডবার্ন ভৌতবিজ্ঞানের যে কোনো শাখায় মৌলিক গবেষণার জন্যে কোনো ভারতীয় গবেষক একটি স্বর্ণপদক পাবেন, এই মর্মে অর্থসাহায্য করেন।

কিন্তু এই ধরনের পদক বা বৃত্তির ব্যবস্থা করাই এসোসিয়েশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। মূল পরিকল্পনায় এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে পূর্ণ সময়ের জন্যে শিক্ষক নিয়োগ এবং গবেষণা-কর্মীর কথা বলা হয়েছে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ নভেম্বর এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে মহেন্দ্রলাল উপস্থিত সদস্যদের বলেন, 'I have no faith in unremunerated workers. We must not forget men have stomachs as well as minds. The mind must have leisure to think that it may think with any advantage, and this can only be secured by providing for the demands of the stomach.'[১]

বিভিন্ন অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার চেষ্টা করতে থাকেন। নতুন লেকচার থিয়েটার তৈরি হওয়ার পরে তার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের সভাপতি ভাইসরয় লর্ড রিপনের সামনে মহেন্দ্রলাল তাঁর নামযুক্ত একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির প্রস্তাব দেন। আশা ছিল, তাঁর নামে প্রস্তাবিত অধ্যাপক পদের জন্যে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হবে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ১৭,০৫০ টাকা পাওয়া গেল। এর মধ্যে লর্ড রিপন নিজেই দিলেন ১০০০ টাকা, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ১০ হাজার টাকা এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম ৩০০০ টাকা; কিন্তু এরপরে আর তেমন কোনো অর্থসাহায্য পাওয়া যায়নি।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজা একটি অধ্যাপক-পদ সৃষ্টির জন্যে মাসিক ১০০ টাকা সাহায্যের একটি প্রস্তাব দেন। কিন্তু এই অর্থসাহায্য একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। শতাব্দীর শেষের দিকে ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে হেয়ার অধ্যাপক পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ভিক্টোরিয়া অধ্যাপক পদ সৃষ্টির প্রচেষ্টাও একই কারণে ব্যর্থ হয়। অর্থের অভাবে উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার জন্যে মহেন্দ্রলাল হতোদ্যম হয়ে পড়লেন। জীবনের শেষ দিকে এসোসিয়েশনের প্রত্যেকটি বার্ষিক সভায় পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক নিয়োগে তাঁর অক্ষমতার কথা তিনি ক্ষোভের সঙ্গে ব্যক্ত করেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় এইরকম সংস্থা প্রতিষ্ঠার সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, '....I do not know how to account for the apathy of our people towards the cultivation of science....If I had vigorously applied myself to the practice of my profession, though homoeopathic, I am sure I could have left as a legacy an amount of money equal to that I have succeeded in collecting in over thirty years.'[২]

প্রতিষ্ঠানটির পরবর্তিকালের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে একটা কথা সুস্পষ্ট যে, মহেন্দ্রলাল জীবদ্দশায় ভগ্নমনোরথ হলেও তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি।

---

১ Hundred years of Indian Association for the Cultivation of Science (1876-1976)
২ Hundred years of Indian Association for the Cultivation of Science (1876-1976)

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে মহেন্দ্রলাল সরকারের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র ডাক্তার অমৃতলাল সরকার প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর সময়কালেই প্রতিষ্ঠানটি গবেষণার ক্ষেত্রে নূতন মোড় নেয়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি ছিলেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র, পদার্থবিদ্যায় এম এস সি পাশ করার পরে ইণ্ডিয়ান ফাইনান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতায় অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল্‌স অফিসে নিযুক্ত হন। সায়েন্স এসোসিয়েশন নামে অধিকতর পরিচিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্সের কথা এবং ভিজিয়ানাগ্রাম গবেষণাগার সম্পর্কে রামন শুনে থাকবেন। তিনি মনস্থির করেন, অবসর সময়ে এই গবেষণাগারে তিনি সময় কাটাবেন। প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগেই রামনের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। যোগ দেওয়ার অল্প কয়েক মাস পরেই 'নেচার' পত্রিকায় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অক্টোবর তাঁর আলোক-সংক্রান্ত একটি গবেষণাপত্রের প্রকাশ তাঁর যোগ্যতা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করে।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় ডাক্তার অমৃতলাল সরকার আনন্দের সঙ্গে বলেন, '**We have already got a young student with fine intellect who has been doing research in our laboratory on Physical Optics and a side issue of his work has been published in the Nature of the 24th October, 1907....**'[১]

ডাক্তার সরকার তাঁর পিতৃদেবের কথা উল্লেখ করে বলেন. সেই মহান মানুষটির ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হতে চলেছে এবং ঘটনাচক্র যদি প্রতিকূলে না যায়, মিঃ রামন এই প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বলতম রত্ন হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করবেন।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এই গবেষণাগারে বিখ্যাত রামন এফেক্ট আবিষ্কার এবং ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রামনের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত করে। ওই কাজে রামনের সঙ্গে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ডঃ কে এস কৃষ্ণান বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন।

সি ভি রামন এখানে যোগ দেওয়ার পরে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেধাবী ছাত্রেরা গবেষণার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্বের কথা শুনে আকৃষ্ট হন। কয়েক বছরেব মধ্যে পদার্থবিদ্যায় গবেষণার একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটি গড়ে ওঠে।

অধ্যাপক রামন ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ছেড়ে বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইন্‌সটিটিউট অব সায়েন্সের প্রথম ভারতীয় অধিকর্তা হিসাবে যোগ দেন। এদিকে প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিকল্পে বিহারীলাল মিত্র ১ লক্ষ টাকা দান করেন। এই দান এবং মহেন্দ্রলাল সবকার স্মৃতি তহবিল ও সাধারণ তহবিল থেকে অর্থের সাহায্যে মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। এই পদে যোগ দেন রামনেরই ছাত্র ডঃ কে এস কৃষ্ণান। 'মহেন্দ্রলাল সরকার' অধ্যাপকই কার্যত তৎকালীন কালটিভেশান অব সায়েন্সের কর্ণধার ছিলেন। এই পদে যোগ দেওয়ার সময়ে ডঃ কৃষ্ণান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার রিডার। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ডঃ কৃষ্ণান ওই পদে যোগ দেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে এসোসিয়েশন নূতন পর্বে উন্নীত হয়। অগ্রণী বিজ্ঞানী এবং বিশিষ্ট সংগঠক মেঘনাদ সাহা তখন এর নেতৃত্ব দেন। মেঘনাদ সাহা ছিলেন অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে বিশেষ ভূমিকা আছে, এ-কথা ডঃ সাহা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক উন্নতিকল্পে তিনি বিভিন্ন প্রকল্প তৈরি

১. **Hundred years of Indian Association for the Cultivation of Science (1876-1976)**

করেন। প্রকল্প বাস্তবে রূপায়ণের জন্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সরকারি সাহায্যও সংগৃহীত হল। বিপুল কর্মকাণ্ডের পক্ষে ২১০ বৌবাজার স্ট্রিট যথেষ্ট পরিসরযুক্ত ছিল না। এসোসিয়েশন যাদবপুরে তার নতুন ক্যাম্পাসে ধীরে ধীরে উঠে আসে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ২৬ সেপ্টেম্বরে নূতন গবেষণাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এবং ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠানটি যাদবপুরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত নূতন ভবনে কাজ করার মত একটা উপযুক্ত অবস্থায় এসে যায়।

পরিতাপের বিষয়, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স বৌবাজার স্ট্রিট থেকে দক্ষিণ কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার পরে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এ-রকম একটি ঐতিহ্যপূর্ণ গবেষণাগারের বৌবাজারস্থিত প্রথম ভবনটি সংরক্ষণের কথা চিন্তা করা হয়নি। বরং সেই বাড়িটি ভেঙে ফেলে তার সমস্ত অস্তিত্ব ধূলিসাৎ করে সেখানে গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্সের আধুনিক বাড়িটি নির্মিত হল।

মৌলিক গবেষণার জন্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্রে গবেষণার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত। এখানে কাজ চলেছে থিয়োরেটিক্যাল ফিজিক্স, সলিড স্টেট ফিজিক্স, মেটিরিয়াল সায়েন্স, অতি পরিবাহী বস্তু প্রভৃতি বিষয় নিয়ে। তাছাড়া স্পেকট্রোস্কোপি বিভাগে স্পেকট্রোস্কোপ সংক্রান্ত নানাবিধ গবেষণার সঙ্গে আজও রামন স্পেকট্রোস্কোপের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ হচ্ছে। এনার্জি রিসার্চ ইউনিট প্রতিষ্ঠানটির একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ। এছাড়া জৈব-রসায়নশাস্ত্র বিভাগ সহ প্রতিষ্ঠানে অজৈব এবং ভৌত রসায়ন নিয়ে রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ আছে। গবেষণার ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় পলিমার রিসার্চ ইউনিটের।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্সকে আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে ভিত্তিভূমি হিসাবে অভিহিত করা যায়। অবশ্য পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্রের কোনো কোনো ক্ষেত্রের গবেষণা প্রধানত প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারগুলিতে ইতিপূর্বে শুরু হয়েছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলতে যা বোঝায়, ভারতের বুকে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের গবেষণাগারেই তার প্রথম অঙ্কুরোদ্গম। ভারতে বিজ্ঞান-গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠান একটি দিক্‌চিহ্ন-স্বরূপ।

বসু বিজ্ঞান মন্দির

বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর, প্রতিষ্ঠা করেন জগদীশচন্দ্র বসু। প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র নিজে বলেছেন, 'The advancement of science is the principal object of the Institute and also the diffusion of knowledge.' অর্থাৎ মুখ্য উদ্দেশ্য, বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং জ্ঞানের প্রসার।

প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বে প্রথম কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একটি, যেখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের পরস্পর নিরপেক্ষ গবেষণার সঙ্গে বায়ো-ফিজিক্স অর্থাৎ বায়োলজি এবং ফিজিক্সের মত একের সঙ্গে অন্যের স্থাপিত সম্পর্কের ভিত্তিতে গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-জীবন শুরু হয় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে আর গবেষণাগার গড়ে তোলার

কথা তাঁর প্রথম মনে হয় ১৮৯৭-এর জানুয়ারি মাসে তাঁর প্রথম রয়্যাল সোসাইটির বক্তৃতার পরে। এ-তথ্য জানা যায় আচার্য পত্নী অবলা বসুর বর্ণনায়। তাঁর ডায়ারিতে জগদীশচন্দ্রের প্রথম রয়্যাল সোসাইটির বক্তৃতার বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, 'সভাপতির পার্শ্বে আমি বসিলাম, যে স্থানে ডেভি ও ফ্যারাডে বক্তৃতা দিতেন, সেই হলে ও সেই টেবিলে যখন এই তরুণ বাঙালি বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলেন তখন আনন্দে আমার জীবন সার্থক মনে হইল। ভারতের জয় পতাকা আবার নতুন করিয়া বিশ্বের সম্মুখে তোলা হইল, মনে করিলাম।..... এই রয়্যাল ইনসটিটিউসনের কার্যপদ্ধতি দেখিয়া তখন হইতেই আমাদের দেশে এরূপ কোনো স্থান করিবার বাসনা আমার মনেও উদয় হইল এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সূচনা এবং কল্পনা তখন হইতেই আরম্ভ হইল।'

কিন্তু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ তখন নানা কারণে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নিলেন। তবে তা সম্পূর্ণ অবসর বলা যায় না। এমেরিটাস অধ্যাপক হিসাবে তাঁর কার্যকাল পাঁচ বছর বাড়ানো হল। এইবার জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর নিজের জন্মদিনে বিজ্ঞান মন্দিরের সদ্য নির্মিত বক্তৃতাশালায় বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তৃতা-মঞ্চের নীচে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হল রবীন্দ্রনাথ বিরচিত বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য সঙ্গীতটি।

"মাতৃ মন্দির পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজ হে।..."

জগদীশচন্দ্র তাঁর ভাষণে বললেন, '.....আমি এই গবেষণাগার দান করিলাম যাহা শুধু গবেষণাগার নহে, একটি বিজ্ঞান মন্দির।'.... জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করেই একটি তত্ত্বাবধায়ক সমিতি গঠন করেন। সমিতির সদস্য হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, নীলরতন সরকার, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সুধাংশুমোহন বসু, সতীশরঞ্জন দাশ, অবলা বসু ও জগদীশচন্দ্র নিজে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ নভেম্বর জগদীশচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তখন জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু কার্যভার গ্রহণ করে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কর্ণধার ছিলেন।

বসু বিজ্ঞান মন্দির উত্তর কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজ সন্নিহিত, নক্‌শার দিক দিয়ে মন্দির-সদৃশ একটি স্থাপত্য-শিল্প। বর্তমানে এটির আর একটি শাখা স্থাপিত হয়েছে বিধাননগর অঞ্চলে। প্রতিষ্ঠানে এখন যেসব বিষয়ে গবেষণা চলেছে, তার মধ্যে আছে জীববিদ্যা, এন্টিবায়োটিক্‌স, ভৌত রসায়ন, জৈব রসায়ন, সলিড স্টেট ফিজিক্‌স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌স, বায়ো-ফিজিক্‌সের মত বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনে প্রতিষ্ঠানটিতে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে একটি আঞ্চলিক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি কেন্দ্র রিজিওন্যাল সফিসটিকেটেড ইন্‌সট্রুমেন্টেশন সেন্টার (Regional Sophisticated Instrumentation Centre) বা সংক্ষেপে RSIC স্থাপিত হয়। পূর্বাঞ্চলের গবেষণা-কর্মীদের এবং শিল্প সংস্থাগুলিকে আধুনিক যন্ত্রপাতির সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ জগদীশচন্দ্রের সংগ্রহশালা। এটি একটি ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা। তাঁর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির অধিকাংশ তাঁর ওয়ার্কশপে দেশজ সংগ্রহ অবলম্বনেই প্রস্তুত। জগদীশচন্দ্র তাঁর জীবদ্দশায় একশোরও বেশি যন্ত্রপাতি তৈরি করেন। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যে সবই পরবর্তিকালে পাওয়া গেছে তা নয়, এর মধ্যে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি

জগদীশচন্দ্র প্রয়োজন মত ভেঙে বা খুলে ফেলে আবার নূতন যন্ত্র নির্মাণে ব্যবহার করেন। সেইজন্যে একসঙ্গে তাঁর সব যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার কথা ওঠে না। জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁর দুই সহকারী বিনয়কৃষ্ণ দত্ত এবং আশুতোষ গুহ ঠাকুরতা তাঁর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন এবং একই সঙ্গে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণও করতে থাকেন।

প্রসঙ্গত বলা যায়, জগদীশচন্দ্রের নানাবিধ যন্ত্রপাতি তৈবি এবং বক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্মলগ্ন থেকেই ওয়ার্কশপ তৈরি হয়। পরবর্তিকালেও জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু গবেষণার কাজ হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত এইসব যন্ত্রপাতি এতকাল বক্ষণাবেক্ষণ করা হলেও সেগুলির সাহায্যে কোনো সংগ্রহশালা গঠিত হয়নি।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে একটি সংগ্রহশালার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করে। উদ্দেশ্য : বিভিন্ন পুরনো যন্ত্রপাতি পুনরুদ্ধার এবং অচল যন্ত্রপাতিগুলি আবাব চালু করা। সেইসঙ্গে ওইসব যন্ত্রপাতির নকল তৈরির পবিকল্পনাও গ্রহণ কবা হয়। তাছাড়া জগদীশচন্দ্রের বিভিন্ন চিঠিপত্র, মানপত্র এবং পাণ্ডুলিপিও উদ্ধার করে এই সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হবে ঠিক হয়।

বর্তমানে সংগ্রহশালায় পুনরুদ্ধার করা যন্ত্রের সংখ্যা ১৮। পাণ্ডুলিপির সংখ্যা প্রায় ৫০।

ক্যালকাটা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে সার লিওনার্দ রজার্স নামের এক চিকিৎসাবিজ্ঞানী ভারতবর্ষে আসেন। উদ্দেশ্য, এ-দেশে ট্রপিক্যাল রোগ সংক্রান্ত গবেষণায় আত্মনিয়োগ। একটানা চোদ্দ বছর কাজ করার পরে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'Fever in the Tropics' নামে বিখ্যাত বইটি লেখেন। ওই বছরই ইংল্যাণ্ডে বয়্যাল আর্মি মেডিক্যাল কলেজে তাঁকে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু কলকাতায় কলেরা এবং আমাশয় সম্পর্কে গবেষণায় তাঁর আন্তরিক আগ্রহের জন্যে তিনি ওই পদ গ্রহণ করেননি। কয়েক বছর পরে তিনি কলকাতায় একটি স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন প্রতিষ্ঠার জন্যে আগ্রহী হন। এ-বিষয়ে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন ইংলিশম্যান পত্রিকায় এবং ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে। শেষ পর্যন্ত তাঁর উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল স্কুলটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ট্রপিক্যাল রোগের কারমাইকেল হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এর ঠিক দু' বছর পরে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ২৫ ফেব্রুয়ারি।

স্কুলটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব বিষয়ে একটি মূল্যবান ভাষণ দেন। স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পিছনে ভারত সরকার ও বাংলা সরকারের সাহায্য তো ছিলই, কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংস্থার দানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। এঁদের মধ্যে কৈলাশচন্দ্র বসু দু' লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে দেন। তা ছাড়া দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, হাতোয়ার মহারাণী, সার দোরাব টাটা, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছাড়াও স্মিথ স্টেনস্ট্রিট এন্ড্ কোম্পানি ও অন্যান্য চা, পাট কোম্পানিও ছিল।

স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন প্রথমে অবশ্য আজকের নামে পরিচিত ছিল না। গোড়ায় এটির নামকরণ করা হয় 'ক্যালকাটা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন এন্ড হাইজিন'। স্কুলের

প্রথম অধিকর্তা লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল জে ডবলিউ ডি মেগ'।, আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই স্কুলে শিক্ষাদানের কাজ এবং গবেষণা-কর্ম শুরু হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে। প্রথম ব্যাচের ছাত্রেরা 'ট্রপিক্যাল মেডিসিন এন্‌ড্‌ হাইজিন'-এ ডিপ্লোমা পায় ১৯২২-এ। এই ছাত্রের দল ভারতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রথম ছাত্রের দল।

সার রজার্স অবশ্য স্কুলের কাজ শুরু হওয়ার আগে স্বাস্থ্যের কারণে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ ফেব্রুয়ারি ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হন।

বর্তমান স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ট্রপিক্যাল রোগ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর মধ্যে কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কলেরা এবং আমাশয় সংক্রান্ত গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌সটিটিউট

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ শিক্ষান্তে কেমব্রিজ থেকে দেশে ফিরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন।

কেমব্রিজ ছেড়ে আসার সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হল এবং দেশে ফিরতে প্রশান্তচন্দ্রের কিছু বিলম্ব ঘটে। এই সময়টা তিনি কিংস কলেজ লাইব্রেরিতে কাটান। একদিন তাঁর শিক্ষক ম্যাককাউলে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত গবেষণার একটি বিখ্যাত জার্নাল **Biometrika**-এর কয়েকটি খণ্ডের দিকে প্রশান্তচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জার্নালটির সম্পাদক কার্ল পিয়ারসন এটি কিংস কলেজ গ্রন্থাগারে উপহার দেন। মহলানবিশ বিষয়টিতে এতই আগ্রহী হন যে, তিনি জার্নালটির সব কটি খণ্ডই সংগ্রহ করেন। দেশে ফেরার পথে জার্নালের বিভিন্ন খণ্ড পড়তে পড়তে তিনি বুঝতে পারলেন যে, পরিসংখ্যান একটি সম্ভাবনাময় বিজ্ঞান এবং এটির ব্যাপক প্রয়োগের উপযোগিতা আছে। এইভাবে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই নতুন অর্জিত শিক্ষাব ভিত্তিতে তিনি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত সমস্যার খোঁজ আরম্ভ করলেন। প্রথম দিকে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'Statistical analysis of the stature of Anglo-Indians.'

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করার সময়ে প্রশান্তচন্দ্র একদল তরুণ গবেষককে নিয়ে স্ট্যাটিসটিক্যাল ল্যাবোরেটরি নামে একটি ছোট সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। পদার্থবিদ্যার গবেষণাগারের একাংশেই এর কাজ শুরু হয়। এই সংস্থাই অনতিবিলম্বেই ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌সটিটিউটে রূপান্তরিত হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, নিখিলরঞ্জন সেন ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আহূত এবং শিল্পপতি সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌সটিটিউট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইন্‌সটিটিউটের প্রথম সভাপতি এবং প্রশান্তচন্দ্র প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠানটি রেজিস্ট্রি করা হয়।

সূচনাকাল থেকেই এই প্রতিষ্ঠান দেশের আর্থিক এবং সামাজিক নানা বিষয়ের উপরে সমীক্ষা-কার্য পরিচালনা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সমীক্ষা-কার্যের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান বিজ্ঞান এই প্রতিষ্ঠানেই উদ্ভাবিত। ক্রমশ নমুনা সমীক্ষার বিষয়বস্তু সম্প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নমুনা-সমীক্ষা ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হল স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে। ফলে পঞ্চাশের দশকের সূচনায়

'ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে' নামক সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা। সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা একটি অভিনব সিদ্ধান্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অবশ্য সংস্থাটির সমীক্ষার পদ্ধতি, প্রশ্নাবলী রচনা ও ফলাফল বিশ্লেষণের দায়িত্ব ইন্‌সটিটিউটকে দেওয়া হয়।

স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় তিরিশ বছর পরে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে এটিকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ওই বছর ১৪ ডিসেম্বর জহরলাল নেহরু স্বয়ং লোকসভায় দ্য ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌সটিটিউট অ্যাক্ট পেশ করেন এবং প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসাবে ঘোষিত হয়। ১৯৬০-এর এপ্রিল থেকে এই বিল কার্যকর হয় এবং প্রতিষ্ঠানটি পরিসংখ্যান বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রি দানের অধিকার লাভ করে।

জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে ইন্‌সটিটিউটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খসড়া কাঠামো অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতাতেই তৈরি হয়।

প্রতিষ্ঠানের সূচনাকাল থেকেই সরকারি কর্মচারীরা পরিসংখ্যান বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্যে এই সংস্থায় আসতেন। তারপর থেকে ইন্‌সটিটিউটে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এ-পর্যন্ত বহু বিশিষ্ট বিদেশি বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানটির আমন্ত্রণে এখানে এসেছেন।

প্রতিষ্ঠানটি কয়েকটি শাখায় বিভক্ত, যেমন, সমাজবিজ্ঞান, জৈববিজ্ঞান, পরিসংখ্যান ও গণিত, ভৌত ও ভূ-বিজ্ঞান, অ্যাপ্লায়েড স্ট্যাটিসটিক্স, সার্ভে এন্‌ড্ কমপিউটিং এবং স্ট্যাটিসটিক্যাল কোয়ালিটি কনট্রোল এন্‌ড্ অপারেশনাল রিসার্চ।

উত্তর কলকাতায় বি টি রোডের ধারে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইন্‌সটিটিউট বর্তমানে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কেন্দ্র, এ-কথা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করা চলে। এই প্রতিষ্ঠানের বিকাশে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, চিন্তামণি দেশমুখ, শুভেন্দুশেখর বসু, রাজচন্দ্র বসু, সমর রায় এবং সি আর রাওয়ের মত ব্যক্তিদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানটির আজকের বিশ্বখ্যাতির মূলে অধ্যাপক মহলানবিশের দূরদৃষ্টি এবং প্রেরণা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

ইণ্ডিয়ান ইন্‌সটিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি

সর্বভারতীয় সংস্থা হিসাবে এই গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। ধর্মতলা স্ট্রিটের একটি বাড়িতে প্রথমে এর কাজ শুরু কিন্তু শুরু হওয়ার কিছুদিন বাদে পি-২৭ প্রিনসেপ স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে উঠে যায় ১৯৩৮-এ। প্রতিষ্ঠাকালে সংস্থাটির নাম ছিল ইণ্ডিয়ান ইন্‌সটিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, সার সি ভি রামন, নীলরতন সরকার এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত মনীষীদের আশীর্বাদ এবং সহযোগিতা অবলম্বন করেই এই সংস্থার কর্মময় জীবনের সূচনা। প্রথম অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে অর্থসাহায্যের একটি আবেদনে এঁরা সকলেই সাক্ষর করেন। এটি জাতীয় প্রচেষ্টার প্রতীকস্বরূপ একটি বেসরকারি সংস্থা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর জাতীয় নেতৃবৃন্দ সংস্থাটি পরিদর্শন করতে আসেন। এঁদের মধ্যে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তখন উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী। এই পরিদর্শন আরো স্মরণীয় কারণ এঁদের সঙ্গে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র স্বহস্তে বিভিন্ন জনের সাক্ষরের

তলায় তাঁদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন।

বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্য প্রথমাবধি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই প্রতিষ্ঠানটি জৈব-চিকিৎসাবিজ্ঞানেব সঙ্গে সম্পর্ক আছে আমাদের দেশের এমন সব সমস্যা নিয়ে প্রথম থেকেই মনোনিবেশ করে।

সংস্থাটির গোড়াপত্তনের সময়ে বিজ্ঞানী ডঃ জে সি রায়ের নেতৃত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তাঁরই কার্য-পরিচালনার গুণে সংস্থাটি অল্প সময়েই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। ডঃ বি সি গুহ এবং ডঃ বি এন ঘোষের মত একদল তরুণ বিজ্ঞানী শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরাই প্রতিষ্ঠানটিকে ক্রমে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। বস্তুত প্রতিষ্ঠার মাত্র দু' বছর পরে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে পরাধীন ভারতে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এটি দেখতে এসে এত অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি কথা দিয়েছিলেন, স্বাধীন হলে প্রতিষ্ঠানটিকে দেশ সর্বতোভাবে উৎসাহ দেবে। জহরলাল তাঁর কথা রেখেছিলেন এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসের ২ তারিখে এটি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদ অর্থাৎ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড্ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর **(Council of Scientific and Industrial Research)** বা সংক্ষেপে **CSIR** অন্তর্গত জৈববিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে একটি জাতীয় গবেষণাগার হিসাবে ঘোষিত হয়। তখন এর নামকরণ করা হয় 'ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড্ এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন'।

অথচ প্রতিষ্ঠানটি গোড়ায় সামান্য আর্থিক সঙ্গতি নিয়েই কাজ শুরু করেছিল। তবে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা সে-বাধা অতিক্রম করে যান তাঁদের অসীম উৎসাহে এবং মহৎ কিছু সৃষ্টির প্রেরণায়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডঃ এইচ এন ঘোষ, ডঃ এ সি উকিল এবং ডঃ নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা স্বেচ্ছায় এঁদের পাস্তুর ক্লিনিক্যাল ল্যাবোরেটরিকে ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চ-এর সঙ্গে একীভূত করে একটি সংস্থায় রূপান্তরিত করেন। ডঃ ঘোষ প্রতিষ্ঠানটির প্রথম অধিকর্তা। এটির অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। অবশ্য মাস দশেক পরে এই সংস্থা ছেড়ে তিনি স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় থেকে ১৯৬৪-তে অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত ডঃ জে সি রায় এই সংস্থা পরিচালনা করেন।

প্রথমদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সস্নেহ সহযোগিতা এই প্রতিষ্ঠানকে গরিমাময় করে রাখে। অত্যন্ত দুঃসময়ে তিনি ৫০০০ টাকা অর্থসাহায্য করেন। এই অর্থসাহায্য কর্মীদের মনে নতুন আশার আলো সঞ্চার করে। প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে প্রতিষ্ঠানের ঋণ অপরিশোধ্য।

প্রতিষ্ঠার একুশ বছর পরে জাতীয় গবেষণাগার হিসাবে ঘোষিত হওয়ার সময় থেকে এটি দ্রুত আধুনিকীকরণের পথে এগোতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে এর বিস্তারও শুরু হয়। গবেষণাকর্মের নব নব দিগন্ত উন্মোচনের কাজ চলে। ওই সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের কাজ চলছিল ভাড়া বাড়িতে। কিন্তু পুরনো পরিসরে ক্রমবর্ধমান সংস্থাটির স্থান সংকুলান করা সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীত পার্শ্বে নবনির্বাচিত স্থানে প্রতিষ্ঠানটি নিজের বাড়িতে উঠে আসে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। স্থানান্তরের পরে এটির আবার নতুন নামকরণ হল 'ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন'। কিন্তু এই-ই শেষ নয়। পরবর্তিকালে ১৯৮১-এর এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠানটির নাম আবার পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি'। বলা যায়, এই নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানে নূতন পর্যায়ের কাজের সূচনা। অবশ্য বিভিন্ন পর্যায়ে নামের

পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে কাজের ধারাটিও অনুমান করা চলে।

•প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক কাজের মধ্যে ডঃ জে সি রায়ের কালাজ্বরের উপরে গবেষণা এবং ডঃ শচীমোহন মুখোপাধ্যায়ের কলেরা সংক্রান্ত গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি তার উদ্দেশ্য বজায় রেখে দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির জন্যে জীববিজ্ঞান এবং সন্নিহিত বিষয়গুলিতে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আছে মলিকিউলার বায়োলজি, নিউরো-বায়োলজি, কেমিস্ট্রি অব বায়োঅ্যাকটিভ সাবস্ট্যান্সেস, প্রোটিন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইমিউনোলজি এবং ইমিউনোবায়োলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যাথমেটিক্যাল মডেল। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে শতাধিক বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক যুক্ত আছেন। এঁরাই প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন।

রিজিওন্যাল মিটিওরলজিক্যাল সেণ্টার

ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আগে এ-দেশে বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহানি ঘটিয়েছে এবং সেই সঙ্গে সম্পত্তিহানিও। কিন্তু আবহ-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সম্যক পরিচিতি না থাকার জন্যে এই দুর্যোগ বিধাতার অভিশাপ হিসাবে মেনে নেওয়া ছাড়া এক সময়ে আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না। ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরে কলকাতা যখন রাজধানী হল, তখন হুগলি নদী ও বঙ্গোপসাগরে জাহাজ চলাচল বহুলাংশে বেড়ে যায়।

ইংরাজ নাবিক জাতি। তখনকার ইংরাজ সরকার একথা যথাযথ অনুধাবন করল যে, নিরাপদে জাহাজ চলাচলের জন্যে ইংল্যাণ্ডের মত এদেশেও একটা আবহাওয়া বিভাগ খোলা দরকার। সুতরাং প্রয়োজন থেকেই আবহাওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি।

আঞ্চলিক কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল। এটি খুব বেশিকাল আগের কথা না হলেও, কলকাতায় আবহ পর্যবেক্ষণের সূচনা ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। তখন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ছিল পার্ক স্ট্রিটে সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অফিসে। অবশ্য ইতিপূর্বে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ কেউ কাজ করেন। ১৮০৫ থেকে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জেম্‌স কিড খিদিরপুরে হুগলি নদীতে দিবারাত্র জোয়ার-ভাটার খবর রাখতেন। ১৮১৬ থেকে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হার্ডউইক দমদমে বৃষ্টিপাত এবং বায়ুর চাপের হিসাব রাখেন। ১৮৩১ থেকে ১৮৩৮ পর্যন্ত আর এভারেস্ট আবহাওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ের খবরাখবর রাখতে শুরু করেন। কিন্তু আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন পিডিংটন। ১৮৫৬-এ পিডিংটন প্রথম সার্ভে অব ইণ্ডিয়া থেকে নির্দিষ্ট সময় ধরে পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করেন। সামুদ্রিক ঝড় বোঝাতে গ্রিক শব্দ 'সাইক্লোন' ইনিই প্রথম প্রয়োগ করেন। সাইক্লোন অর্থ সাপের কুণ্ডলী। নিজের প্রচেষ্টায় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের নানা ব্যবস্থা করা ছাড়াও ১৮৩৯ থেকে ১৮৫১ পর্যন্ত ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক ঝড়ের বিস্তারিত তথ্য নাবিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে পিডিংটন নথিভুক্ত করেন।

পরবর্তিকালে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলকাতার বুকের উপর দিয়ে একটি মারাত্মক সাইক্লোন ঝড় বয়ে যায়। তাতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে জাহাজ কোম্পানিগুলি দাবী জানাতে থাকে। আবহাওয়া সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার জন্যে ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পরবর্তী দশ বছরে দেশে পাঁচটি প্রাদেশিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বাংলার কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৮৬৭-তে। এটির

প্রথম 'রিপোর্টার' ছিলেন এইচ এফ ব্লানফোর্ড। রিপোর্টারের কাজ সরকারের কাছে আবহ-সংবাদ সরবরাহ করা এবং তদনুসারে পরামর্শ দেওয়া। ব্লানফোর্ড তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করতেন এবং 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এর একজন অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। বাংলার আবহ-তথ্য সংরক্ষণ এবং বন্দরের জাহাজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাইক্লোন ঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়াই ছিল এই সংস্থার উদ্দেশ্য।

ভারতীয় আবহ-সংস্থা (India Meteorological Department) গঠিত হয় ১৮৭৫-এ। কলকাতাতেই এর কর্মকেন্দ্র। ব্লানফোর্ড ছিলেন এর 'ইম্পিরিয়াল রিপোর্টার'। কলকাতার আলিপুরে একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৮৭৭-এর ১ এপ্রিল। ক্রমে এই সংস্থা সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম শুরু হয়। ডাক মারফত আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা আরম্ভ হল ওই বছর থেকে, তার বা টেলিগ্রাফ মারফত পরের বছর। ঝড়ের সংকেত দেওয়ার কাজের সূচনা হল ১৮৮১-তে। দৈনিক মুদ্রিত আবহাওয়ার খবর প্রচার আরম্ভ করা হয় ১৮৮৩ থেকে। ভূ-কম্পন যন্ত্র প্রথম বসে ১৯১৫-তে। নিখুঁত সময় নির্ণয় এবং প্রচার শুরু হয় ১৮৭৯ থেকে। পরে ১৯৪৩-এর মার্চে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে তা অল্প কিছুদিনের জন্যে পুনেতে স্থানান্তরিত করা হয়।

যাই হোক, ব্লানফোর্ড ডিরেকটর-জেনারেল হিসাবে ছিলেন ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন সার জন ইলিয়ট। ১৮৮৯-এ ইলিয়ট ডিরেকটর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করে ওই বছরই ভারতীয় আবহ-সংস্থার কলকাতা শাখা এবং বাংলার আঞ্চলিক কেন্দ্র দুটিকে একত্রিত করেন। কলকাতায় এই দুটি মিলিতভাবে ছিল ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগের মুখ্যালয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সিমলা অফিসই মুখ্যালয় হয়ে ওঠে। ভারতীয় আবহ-সংস্থার তৃতীয় ডিরেকটর-জেনারেল সার গিলবার্ট ওয়াকার কলকাতা অফিসের দায়িত্ব দেওয়ার জন্যে একটি নতুন পদের সৃষ্টি করেন—'মিটিওরলজিস্ট, কলিকাতা' অর্থাৎ, 'আবহবিদ্, কলকাতা' নামে আংশিক সময়ের পদ। এই পদে প্রথম নিযুক্ত হন প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক পিক। অধ্যাপক পিকের নিয়োগ থেকে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপকরাই আবহবিদ্ হিসাবে নিযুক্ত হতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পদাধিকার বলে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আবহবিদ্ পদে সর্বশেষ মনোনীত হন। তিনি আলিপুরে আবহাওয়া অফিসে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬-এ কিছুদিন অবহাওয়া অফিসে কাটান। অফিস-চত্বরে বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষের তলায় বসে ওই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করেন—এই তথ্য বটবৃক্ষের তলদেশে এক ফলকে প্রোথিত আছে। কলিকাতা আবহাওয়া কেন্দ্র বর্তমানে হাওয়া অফিস নামে প্রচলিত। শোনা যায়, এই নামকরণ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আবহাওয়া অফিস নতুন ঢংয়ে সাজানো হল। টেকনিক্যাল মূল কেন্দ্র সিমলা থেকে গেল পুনেতে, দিল্লি অফিস অনেক বড় করা হল এবং সমগ্র দেশ বিভক্ত হল ছ'ভাগে—করাচি, দিল্লি, কলকাতা, নাগপুর, বোম্বাই, মাদ্রাজ। দেশ বিভাগের পরে পাঞ্জাবের কিছু অংশের সঙ্গে করাচি চলে গেল পাকিস্তানে। এ-দেশে আঞ্চলিক অফিস রইল পাঁচটি। পূর্ব পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশও ভারতীয় আবহ-বিভাগ থেকে পৃথক হল।

কলকাতা আঞ্চলিক আবহ-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয় আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর

আগে, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল। এর দায়িত্ব শুধু পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ নেই। প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, উড়িষ্যা, সেই সঙ্গে আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ড, সিকিমের মত সন্নিহিত রাজ্যসমূহ পর্যন্ত কলকাতা কেন্দ্রের দায়িত্ব বিস্তৃত। তাছাড়া আছে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। পরিমাপের দিক থেকে এর বিস্তৃতি সাড়ে ৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের চেয়েও বেশি।

আবহ-সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্যে সমগ্র বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া এবং সতর্কীকরণ করার মত গুরু দায়িত্ব কলকাতা কেন্দ্রের উপরে ছিল। এখন পূর্ব তটরেখার পূর্বাভাসের মূল দায়িত্ব কলকাতার, কিন্তু সতর্ক করার দায়িত্ব বিভিন্ন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের উপরে দেওয়া হয়েছে।

আজ সমগ্র দেশে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বাভাস উপগ্রহ মারফত প্রেরিত মেঘের ছবি এবং স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে।

বোর্ড অব সায়েণ্টিফিক এন্‌ড্ ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ

আজকের কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক এন্‌ড্ ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (Council of Scientific and Industrial Research) অর্থাৎ সংক্ষেপে CSIR-এর সূচনা কলকাতা শহরেই। আলিপুর সরকারি টেস্ট হাউসে বোর্ড অব সায়েণ্টিফিক এন্‌ড্ ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ নামে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ১ অগাস্ট। সংস্থার প্রথম অধিকর্তা ডঃ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর। বছর দুই বাদে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সংস্থাটি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ল্যাবোরেটরিতে স্থানান্তরিত হয়। এর পরেই এর নামকরণ করা হল ডিরেক্টরেট অব সায়েণ্টিফিক এন্‌ড্ ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (Directorate of Scientific and Industrial Research), সংক্ষেপে DSIR। ভাটনগরই রইলেন এর অধিকর্তা। দিল্লীতে থাকার সময়েই ইংল্যাণ্ডের CSIR-এর অনুরূপ গঠনে DSIR CSIR-এ পরিণত হয় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দেই।

প্রাক-স্বাধীন ভারতবর্ষে যথার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগার হিসাবে স্বীকৃত না হলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি বিদ্বদ্‌সমাজ সংগঠিত হয় চার্নক কলকাতায়। এর মধ্যে এগ্রি-হর্টিকালচার সোসাইটি একটি পুরাতন সংস্থা। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে, প্রতিষ্ঠা করেন উইলিয়াম কেরি।

বিজ্ঞান বিষয়ে অন্যান্য বিদ্বদ্‌সমাজের মধ্যে অধিকাংশের সূচনা বিংশ শতাব্দীতে। এদের মধ্যে ক্যালকাটা ম্যাথ্‌মেটিক্যাল সোসাইটি (উদ্বোধনী সভা ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ ; প্রথম সভাপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়), দ্য মাইনিং এন্‌ড্ জিওলজিক্যাল ইন্‌সটিটিউট অব ইণ্ডিয়া (প্রাথমিক সভা ১০ নভেম্বর, ১৯০৫, প্রথম সভাপতি জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার তৎকালীন অধিকর্তা টি এইচ হল্যাণ্ড), ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস এসোসিয়েশন (প্রথম সভা ১৯১৪, প্রথম সভাপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়), দ্য ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি (প্রতিষ্ঠা ১৯২৪, প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়), ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি (প্রতিষ্ঠা ১৯৩৪, প্রথম সভাপতি অধ্যাপক ডি এম বসু) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সেন্ট্রাল গ্লাস এনড্ সিরামিক রিসার্চ ইন্‌সটিটিউট

সেন্ট্রাল গ্লাস এনড্ সিরামিক রিসার্চ ইন্‌সটিটিউট একটি জাতীয় গবেষণাগার। কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এনড্ ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর অন্তর্ভুক্ত (জাতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থা) এই গবেষণাগারটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এ-দেশে এরকম একটি সংস্থার প্রয়োজন এবং গুরুত্ব অনুভূত হয় প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ইনডাস্ট্রিয়াল কমিশন এ-দেশে কাচ সংক্রান্ত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয় এবং ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার এ রকম একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্যে অনুমতি দেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সন্নিহিত অঞ্চলে নির্মাণ-কার্যের সূচনা ১৯৪৫-এ ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তির কাজ আরম্ভ হয় ১৯৪৮-এ। তবে প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় আরো প্রায় দু বছর পরে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে অগাস্ট মাসের ২৬ তারিখে। উদ্বোধন করেন পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। প্রতিষ্ঠানটির প্রথম অধিকর্তা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ আত্মারাম।

আমাদের দেশের পক্ষে মূল্যবান কাচ, সিরামিক, এনামেল এবং অভ্রের মত বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিনির্ভর অথবা শিল্পে প্রয়োগ সম্ভাবনাপূর্ণ গবেষণাই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। ইন্‌সটিটিউটটি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই প্রয়োজনভিত্তিক গবেষণাতে মূলত ব্যাপৃত থাকে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় শিল্পের উন্নতির জন্যে ভারত সরকার যখন নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তখন প্রতিষ্ঠানটি আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কাঁচা মালের খোঁজ-খবর করার কাজ জোরদার করেন এবং তার মূল্যায়ন করতেও শুরু করেন। তাছাড়া যেসব কাঁচামাল বা দ্রব্য-সামগ্রী আমদানী করা হত, তার বিকল্প অনুসন্ধানের কাজও শুরু হয়। সেই সঙ্গে দেশজ জিনিসেরও উন্নতি করার চেষ্টা চলে। দেশে শিল্পের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের একটা সম্পর্কও স্থাপিত হয়। শিল্পের জগতে নানাবিধ প্রয়োজন দেখা দেয়, এবং সেই প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকল্পের রূপরেখারও পরিবর্তন হতে থাকে। দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন উৎপাদনের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানটিকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়।

আজ পর্যন্ত সেন্ট্রাল গ্লাস এনড্ সিরামিক রিসার্চ ইন্‌সটিটিউটের কৃতিত্বের খতিয়ান অনুল্লেখ্য নয়।

প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাসে অপটিক্যাল গ্লাস একটি অত্যন্ত মূল্যবান আবিষ্কার। মানব শরীরের পক্ষে চোখ দুটি যেমন তার সবচেয়ে বড় সম্পদ, এই চোখ ছাড়া যেমন সে অসহায় বোধ করে, তেমনি সামরিক শক্তির কাছে অপটিক্যাল গ্লাস তার দৃষ্টিস্বরূপ। পেরিস্কোপ, বাইনোকুলার, মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ, ক্যামেরা, প্রোজেকটর এবং থিওডোলাইট সর্বত্রই অপটিক্যাল গ্লাসের ব্যবহার। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটি যখন এর উৎপাদন শুরু করে তখন পৃথিবীর মাত্র সামান্য কটি দেশেই অপটিক্যাল গ্লাস উৎপাদন হত। আজ সে-সংখ্যা কিছু বাড়লেও অবস্থার যে বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। সুতরাং অপটিক্যাল গ্লাসের প্রয়োজন হলে পুরোপুরি বিদেশের উপর নির্ভর করা ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির আর কোনো উপায় ছিল না। এদিকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনোরকম বিদেশি সহযোগিতা ব্যতিরেকেই প্রতিষ্ঠানটিকে অগ্রসর হতে হয়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে এই

প্রতিষ্ঠানে প্রথম এর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০ টনের মত। প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক পর্বের বিভিন্ন কৃতিত্বের মধ্যে অপটিক্যাল গ্লাস উৎপাদন অন্যতম। বিদেশ থেকে অপটিক্যাল গ্লাসের আমদানী হ্রাস করে বিদেশি মুদ্রাব সাশ্রয় ঘটানোর ক্ষেত্রে এই উৎপাদন একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

প্রতিষ্ঠানের আর একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাব ফল লেসার গ্লাস। সামরিক সাজ-সরঞ্জামে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। রেঞ্জ-ফাইণ্ডাব, মাইক্রো-ফাইণ্ডার, আলট্রাফাইন ওয়েলডিংয়ে এর ব্যবহার তো আছেই, তাছাড়া ভঙ্গুর পদার্থ ছেদন এবং সার্জারিতেও এই লেসার গ্লাস ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিদেশি মুদ্রাব ক্ষেত্রে এই লেসার গ্লাস প্রচুর সাশ্রয় ঘটিয়েছে। নিয়োডিমিয়াম যুক্ত দুই ধরনের লেসার গ্লাস এখানে উৎপাদন করা হয়েছে এবং সামরিক বিভাগে তা সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের গবেষণার কর্মক্ষেত্র মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা চলে। ১· অপটিক্যাল গ্লাস ২· ইলেকট্রনিক সাজ-সরঞ্জাম ৩ ইঞ্জিনিয়ারিং ও উচ্চ-তাপ সহনশীল দ্রব্যাদি ৪· শক্তির সংরক্ষণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি।

প্রতিষ্ঠানটির সাম্প্রতিক কাজকর্মের মধ্যে 'অপটিক্যাল কমিউনিকেশন ফাইবার' অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে কাচ তন্তুর সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং এ-ক্ষেত্রে যোগাযোগ অনেকটা ত্রুটিমুক্ত হবে আশা করা যায়। টেলিযোগাযোগেব ক্ষেত্রে এ-রকম তন্তু ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া কমপিউটারে, গভীর সমুদ্রে জরিপের কাজে, ফোটোগ্রাফিতে, সামরিক প্রয়োজনে, খনিতেও এই যোগাযোগ ব্যবস্থা কাজে লাগানো সম্ভব।

প্রতিষ্ঠানে সিরামিক সুপার কণ্ডাকটর বিষযেও উল্লেখযোগ্য গবেষণা চলেছে।

সাধারণভাবে ব্যবহারযোগ্য নয়, এমন পদার্থকেও দুটি লাভজনক উৎপাদনেব কাজে বিশেষভাবে লাগানো হয়েছে।

ক· উচ্চ মানের সোডিয়াম সিলিকেট।

খ· তাপরোধক ইঁট।

প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য উদ্ভাবনের মধ্যে আছে সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত কাঠের বিকল্প হিসাবে অল্পমূল্যের Glass Reinforced Gypsum, অর্থাৎ সংক্ষেপে GRG, সেই সঙ্গে বাড়ি তৈরির ফাঁপা এবং সস্তার ইঁট যার ভরের শতকরা ৫০ ভাগ সাধারণ কাদামাটি এবং বাকিটা নানাবিধ বর্জ্য পদার্থ। সমস্ত ইঁটের আযতনের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ ফাঁপা কিন্তু সাধারণ ইঁটের চেযে ৫ থেকে ১০ গুণ বেশি মজবুত। সামাজিক প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে আর একটি উদ্ভাবনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি হল ওয়াটার ফিলটার ক্যানডেল, অর্থাৎ জল ছাঁকার ফিলটার। দেশজ সাধারণ জিনিসের মিশ্রণে উৎপাদিত এই ফিলটারে পরিশ্রুত জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে উৎপাদনমুখী না হয়ে অধিকতর গবেষণামুখীন। উত্তরপ্রদেশে খুর্জা এবং গুজরাটের নরোদায় এর দুটি আঞ্চলিক গবেষণাগার আছে।

সাহা ইন্‌সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌স

অটো হানের নিউক্লিয়ার ফিশন আবিষ্কারের অব্যবহিত পরের ঘটনা। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিভাগের তৎকালীন পালিত অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা

এ-দেশে নিউক্লিয় পদার্থবিদ্যা বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ গুরুত্ব অনুধাবন করেন। ফলে তাঁরই উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার এম এস সি'র পাঠক্রমে নিউক্লিয় পদার্থবিদ্যাকে একটি পঠনীয় বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একই সময়ে পালিত রিসার্চ ল্যাবোরেটরিতে নিউক্লিয় বিজ্ঞান নিয়মিত শিক্ষা এবং গবেষণাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নব রূপায়ণ কার্যকরী করা হয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে জাতীয় প্ল্যানিং কমিশন স্থাপন করেন, তখন তার সভাপতি ছিলেন জহরলাল নেহরু। তাঁর সহযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাইক্লোট্রন বসানোর উদ্দেশ্যে যন্ত্রাংশ কেনার জন্যে সার দোরাবজি টাটার কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা অর্থসাহায্য পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর সঙ্গে আরো সমপরিমাণ অর্থ যোগ করেন। উত্তর কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজ চত্বরে সাইক্লোট্রন ভবনটি ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ হয় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে।

১৯৪০-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে-তে সাইক্লোট্রনের আবিষ্কর্তা অধ্যাপক ই ও লরেন্সের গবেষণাগারে বি ডি নাগ চৌধুরী কাজ করছিলেন। তাঁকে কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ কেনার দায়িত্ব দেওয়া হল। তখন আমেরিকা থেকে সেই সব যন্ত্রাংশ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু মাঝপথে তা কোথাও হারিয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ১৯৪৭-এ বি ডি নাগ চৌধুরীর উপরে আবার নতুন করে দায়িত্ব দেওয়া হল। অধ্যাপক লরেন্স এবং সহযোগীদের প্রচেষ্টায় ১৯৪৮-এর শেষের দিকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এসে পৌঁছতে থাকে এবং সাইক্লোট্রন প্রতিষ্ঠার কাজ পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়। এই মহাদেশে এটিই প্রথম সাইক্লোট্রন।

ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার কাজ চলতে থাকে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান কাজের চাপে নূতন ভবনের প্রয়োজন অনুভূত হয় ১৯৪৫ থেকে। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান কলেজ চত্বরে সাইক্লোট্রন ভবনটির পাশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত জমিতে নূতন ভবনটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরের বছর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২১ তারিখে। এটি স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সরকারের তৎকালীন শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১১ জানুয়ারি, ১৯৫০-এ নতুন ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নোবেল পুরস্কার জয়ী ম্যাডাম কুরি জোলিও। ইনি রেডিয়াম আবিষ্কর্তা ম্যাডাম কুরির কন্যা। অনুষ্ঠানে ম্যাডাম কুরির স্বামী প্রোফেসর জোলিও উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া এই অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক রবার্ট রবিনসন, জে ডি বার্নাল এবং আরো অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যোগ দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল ডঃ কৈলাসনাথ কাট্‌জু। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট এর বিধিসমূহ গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় সরকার তা অনুমোদন করার পরে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসাবে এর প্রতিষ্ঠা ঘটে। প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক নাম ইন্‌সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মেঘনাদ সাহার মৃত্যুর পরে ঠিক করা হয় সাহার নামের সঙ্গে যুক্ত করে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্তনাম নাম 'সাহা ইন্‌সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' ১৯৫৮-এর অগাস্ট থেকে চালু আছে।

প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক পরিবর্তন করা হয় সত্তরের দশকে। ১৯৭২-এর ১ জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর হয়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ১৯৫১-এর ১২ মে'র প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

প্রতিষ্ঠানের একটা অংশ বর্তমানে সল্ট লেকে অবস্থিত। ১৯৮০-তে এখানকার ভবনটি

সম্পূর্ণ হয়। ভবিষ্যতে সমস্ত ইনসটিটিউটটি সল্ট লেকে স্থানান্তরিত হবে, ঠিক আছে।

•বহুমুখী গবেষণায় রত এই প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ডকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে : ১· বায়োফিজিক্স ২· ক্রিস্টালোগ্রাফি এনড্ মলিকিউলার বায়োলজি ৩· ইলেকট্রনিক্স এনড্ ইন্সট্রুমেন্টেশন ৪· এক্সপেরিমেন্টাল নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ৫· মাস স্পেকট্রোস্কোপ এনড আইসোটোপ সেপারেশন ৬· নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি ৭· প্লাজমা ফিজিক্স ৮· সলিড স্টেট এনড্ মলিকিউলার ফিজিক্স ৯· থিওরিটিক্যাল নিউক্লিয়ার ফিজিক্স।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে কয়েক দশক অতিবাহিত। বর্তমান কলকাতা এবং সন্নিহিত অঞ্চলে নতুন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে গবেষণাগারের হিসাবে কলকাতা অনুল্লেখ্য নয়। কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতের আমলে শিক্ষা, সভ্যতা এবং বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যে-কলকাতা ছিল শীর্ষস্থানীয় আজ জগৎ-সভায় বিজ্ঞানের গবেষণায় আমরা সেই স্থান কতটা ধরে রাখতে পেরেছি বা সেই স্থান থেকে কতটা বিচ্যুত হয়েছি তা পর্যালোচনা করে দেখার সময় হয়েছে। ভবিষ্যতে পথ-নির্দেশের জন্যে এর বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কলকাতায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা

বিনয়ভূষণ রায়

কলকাতা আজ তিনশো বছরে পদার্পণ করলেও বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার দিক থেকে পৃথিবীর বহু শহরের তুলনায় অনেক নবীন। কিন্তু এই বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ইতিহাস যথেষ্ট সমৃদ্ধ। যে-সব প্রতিষ্ঠান এই শিক্ষা ও গবেষণার প্রসারে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে সেগুলো হল, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি, হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিভিন্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

এশিয়াটিক সোসাইটি

এশিয়ার ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, কলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান নিয়ে অনুসন্ধানের জন্যই এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত। কালক্রমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে গবেষণা সেখানে শুরু হয়। তার স্রোত মোটামুটি দু'ভাগে প্রবাহিত হয়ে কলকাতা তথা বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করে। প্রথমত সরকারি কর্মচারিদের প্রচেষ্টা। সরকারি কাজে যুক্ত বিভিন্ন কর্মচারি এবং মিশনারিগণ নিজেদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে, কখনও বা সরকারের তাগিদে বহু অজানা তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই সমস্ত তথ্য সোসাইটির বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় ভাগটি হল, দেশীয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা। হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি সন্তানেরা নিজেদের গবেষণার ফলাফল সোসাইটির পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ করেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির জন্য ১৮০৮-এ প্রথমে ফিজিক্যাল কমিটি গঠিত হয়। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৪৭-এ সেটা নূতনভাবে সাজানো হয়। তার বিভিন্ন শাখাগুলি ছিল ভূতত্ত্ব ও খনিজ বিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব ও প্রকৃতি বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা ও আবহাওয়া বিজ্ঞান এবং ভূগোল ও রাশিবিদ্যা। বস্তুত প্রতিষ্ঠানগত দিক দিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগেই আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চার সূচনা এবং আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা চলে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে আধুনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানের অনুসন্ধান শুরু হলেও ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তদশ শতক থেকেই গণিতের পাঠ শুরু হয়। এর ফলে ভারতের সেনাবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেরই ওই বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল। তাই প্রথমদিকে সোসাইটির বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকৃতি বিজ্ঞানেই প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকে। অঙ্ক ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা নির্ণয়, জরিপের উন্নতি সংক্রান্ত চর্চা, চাঁদের বয়স নিয়ে গবেষণা, মুরাল চক্রের ভ্রান্তি, হ্যালির ধূমকেতু, বায়ুমণ্ডলের উপর চাঁদের প্রভাব সম্পর্কে প্রকাশিত প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া

হিন্দুদের কাল নিরূপণ বিদ্যা, ভারতীয় রাশিচক্রের প্রাচীনতা, হিন্দুদের চান্দ্র-বর্ষ সম্পর্কে সার উইলিয়াম জোন্‌স আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ সূর্যসিদ্ধান্তের প্রাচীনতা এবং প্রাচীন হিন্দুদের প্রধান প্রধান তারিখ ও যুগ সম্পর্কে জন বেণ্ট্‌লি-এর আলোচনাও সোসাইটির পত্রিকায় লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক আলোচনার ক্ষেত্রে হেনরি টমাস কোলব্রুক, উইলিয়াম হাণ্টার, অধ্যাপক জন প্লেফেয়ার এবং স্যামুয়েল ডেভিসের আলোচনাও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

আবহাওয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির ভূমিকা কম উল্লেখযোগ্য নয়। এ-বিষয়ে কর্নেল পিয়ার্সের ডায়ারি একটি প্রাথমিক সূত্র। তাঁর ডায়ারির সূত্রে ১৭৮৫-এর ১ মার্চ থেকে ১৭৮৬-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবহাওয়ার খবর জানা যায়। এর আগে হেনরি ট্রেইল-ও আবহাওয়া সম্পর্কিত একখানি ডায়ারি রাখতেন। কাশীতে থাকাকালীন জেম্‌স প্রিন্সেপ সেখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৮২৫-এর এশিয়াটিক রিসার্চেস-এ তা প্রকাশিত হয়। কলকাতায় ফিরে এসে মেজর হার্বার্টের সঙ্গে তিনি যৌথভাবে গ্লিনিংস ইন সায়েন্স (Gleanings in Science) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তিকালে হার্বার্ট লক্ষ্ণৌর মানমন্দিরের ভারপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি একাই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। ১৮৩২-এর ৭ মার্চ থেকে সেই পত্রিকাটি দ্য জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে আবহাওয়ার রকমফের নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা দেখা যায়। সেই সব আলোচনার কিছু কিছু সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সোসাইটির ফিজিক্যাল সায়েন্স কমিটির সদস্য রাধানাথ শিকদার কলকাতার সার্ভেয়ার জেনারেলের অফিসস্থ ব্যারোমিটার সারণী সঙ্কলন করেন ১৮৪২-এ এবং ১৮৬৫ থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত এবং তা সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বঙ্গোপসাগরের ঝড়, কলকাতার প্রাত্যহিক বৃষ্টিপাতের হেরফের এবং তাপমাত্রার তারতম্যের কারণ সহ আমাদের দেশের ঋতুচক্র সম্পর্কেও সোসাইটির পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এছাড়া খিদিরপুর ডকের প্রতিষ্ঠাতা জেমস কিড ১৮০৫ থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত পাঁচটি চার্টে খিদিরপুরের হুগলি নদীর প্রাত্যহিক জোয়ার-ভাটার একটি তালিকা সঙ্কলন করেন।

বৈদ্যুতিক গবেষণা সংক্রান্ত প্রবন্ধ সংখ্যায় বেশি না হলেও পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিদ্যুতের সাহায্যে টেলিগ্রাফের সংকেত প্রেরণের বিষয়ে অধ্যাপক ডব্লু বি ওয়াগনেসির প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিক জগতে সুপরিচিত। ইনি মেডিক্যাল কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্তিকালে ১৮৫২ থেকে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় টেলিগ্রাফের ডিরেকটর নিযুক্ত হন। সোসাইটির পত্রিকায় বিদ্যুৎ সংক্রান্ত আরো কিছু কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়।

ফটোগ্রাফি বিষয়টিও সোসাইটির গবেষণা থেকে বর্জিত হয়নি। ফটোগ্রাফি সম্পর্কে মেজর জে ওয়াটারহাউস এবং মেজর জেনারেল জে এফ টেনাণ্টের অবদান খুবই স্মরণীয়। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ম্যাপ ও প্ল্যানের ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফির ব্যবহার সম্পর্কে মেজর ওয়াটারহাউস একটি প্রবন্ধ লেখেন। রুরকিতে শুক্রগ্রহের কক্ষপথ নিয়ে তিনি যে-সমস্ত ছবি তোলেন, সোসাইটির পত্রিকায় সে-সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়।

ভারতীয় ভূ-তত্ত্ব সংক্রান্ত চর্চায় এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ভারতীয় ভূ-তত্ত্বের জনক এইচ ডব্লিউ ভয়জি। ইনি মধ্যপ্রদেশের পাহাড়ী এলাকার ভূ-তত্ত্ব এবং খনিজস্তর ও হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের শিলাস্তর নিয়ে পত্রিকায় আলোচনা করেন। তাছাড়া

বিভিন্ন ভূ-বিশেষজ্ঞের গবেষণালব্ধ মূল্যবান আলোচনায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিলা, জীবাশ্ম ও খনিজ দ্রব্যের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। শুধু ভূ-তাত্ত্বিক নয়, ভূকম্পন, নদীর উৎপত্তি ও হিমবাহ সম্পর্কিত কিছু কিছু প্রকাশিত প্রবন্ধও বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রাণিবিদ্যা সম্পর্কেও প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা কম নয়। নেপালের রাজদরবারের রেসিডেন্ট মিঃ ব্রায়ন হফটন হজসনের বিবরণ থেকে নেপাল, সিকিম এবং তিব্বতের পাখি ও স্তন্যপায়ী পশুদের সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। জীবাশ্ম থেকে বিভিন্ন রকমের জীবজন্তু নিয়ে বহু গবেষণাধর্মী নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সোসাইটির পত্রিকায়। ডঃ এইচ ফ্যাল্‌কনার ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউস এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত জীবাশ্ম নিয়ে কাজ করতে গিয়ে লুপ্তপ্রায় ও জীবিত জন্তুদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করাব চেষ্টা করেন। ই ব্লিথ সোসাইটির সংগ্রহশালায় রক্ষিত পাখি, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটি তালিকা সঙ্কলন করেন। উদ্ভিদবিদ্যার ক্ষেত্রে সোসাইটির ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোন্‌স উদ্ভিদ-প্রেমিক ছিলেন। ১৭৯৫-এর এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় তিনি সংস্কৃত ও দেশীয় নাম সহ ভারতীয় গাছপালা সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ লেখেন। ভারতীয় গাছপালা সম্পর্কে রকসবার্গ এবং ডঃ এন ওয়ালিচ বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। পূর্বাঞ্চল সহ সারা ভাবতেব উদ্ভিদ বিষযক বিভিন্ন প্রবন্ধে সোসাইটির পত্রিকাটি সমৃদ্ধ। গণ্ডোয়ানা ও রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলেব উদ্ভিদ-জীবাশ্ম সম্পর্কে পত্রিকায় গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লক্ষ্য করা যায়। পত্রিকায প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে ভারতীয় সমুদ্রের শৈবাল নিয়ে কালীপদ বিশ্বাস ও অরুণকুমাব শর্মার প্রকাশিত গবেষণা-নিবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

সারা ভারতবর্ষেব বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, পাকিস্তান, বর্মা, চীন ও মধ্য এশিযাব ভৌগোলিক আলোচনা সংক্রান্ত প্রবন্ধও এই পত্রিকায় নজরে আসে। এই সব প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি ভ্রমণ-কাহিনী ও কিছু গবেষণাধর্মী ভৌগোলিক আলোচনা মানচিত্রযুক্ত।

রসায়ন বিভাগেও নানা ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতার জল সরবরাহ সম্পর্কে ১৮৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে ডি ওয়ালডির তথ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ষাকালে হুগলির কর্দমাক্ত জল পরিশ্রুত করতে কলকাতা ওযাটার সাপ্লাইকে কী কী অসুবিধা ভোগ করতে হয় সে সম্পর্কে তিনি একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক এ পেডলার কলকাতার জল সরবরাহ, ভারতীয় চায়ের পেটিতে দস্তার আস্তরণ প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করেন। কলকাতার বিভিন্ন পুকুব ও কুয়া থেকে ২০০টি নমুনা সংগ্রহ করে তিনি দেখান, তার মধ্যে শতকরা ৪৪ ভাগ ড্রেনের কাদা জল, ২২ ভাগ কাদা গোলা জল, ২০ ভাগ আংশিক কাদা মিশ্রিত, ৯ ভাগ নোংরা জল এবং বাকি ৪ ভাগ মাত্র খাঁটি জল। তা ছাড়া কলকাতার ৩-৪ মাইলেব (৫-৭ কিলোমিটার) মধ্যে কখনোই খাঁটি জল পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই পলতা থেকে নদীব জল সংগ্রহ ও পরিশ্রুত করে কলকাতায় সরবরাহ করাই তাঁব মতে সব থেকে নিরাপদ। পরবর্তিকালে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতীয় খাদ্য সামগ্রীর (বিশেষত চর্বি ও তৈল জাতীয়) রাসায়নিক পরীক্ষা, পারদ ঘটিত যৌগ নিয়ে গবেষণামূলক অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

পদার্থ বিজ্ঞানে বাঙালি বিজ্ঞানীদের মধ্যে মেঘনাদ সাহা, জগদীশচন্দ্র বসুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন।

নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আদিবাসীদের নিয়ে আলোচনায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ। পত্রিকায় কুকীদের আচার-ব্যবহার, আইন-কানুন, ধর্ম নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তা ছাড়া মগ, কুকী, খাসি, সিকিমের লেপচা, লিম্বু ও অন্যান্য উপজাতি সম্পর্কেও বিভিন্ন গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া

উনিশ শতকের শুরুতেই কৃষির উন্নতির প্রতি সরকার দৃষ্টি দেয় এবং জমিদারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ইউরোপীয় কায়দায় ব্যারাকপুরে একটি খামার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অল্প খরচে সার-সংগ্রহ, জমির অধিকাংশ গোচারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার এবং গভর্নর জেনারেলের পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে এর কাজকর্ম দেখার সুবিধা থাকায় উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিদের ওই ব্যবস্থা গ্রহণে রাজী করানোই এর পিছনে সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

প্রসঙ্গত উইলিয়াম কেরির কথা উল্লেখ করতে হয়। ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতির জন্য চিন্তা-ভাবনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পেশায় মিশনারি হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ভারত-বন্ধু। মালদহে অবস্থান কালে এদেশের কৃষি ব্যবস্থার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং কৃষির উন্নতির জন্য তিনি চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। পরবর্তিকালে তাঁর সেই চিন্তা-ভাবনা প্রবন্ধাকারে এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লর্ড হেস্টিংসের অনুপ্রেরণায় তিনি কলকাতায় একটি কৃষি বিষয়ক সমাজ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। সুতরাং ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ওই সমাজ স্থাপনে উদ্দেশ্যে তিনি একখানি অনুষ্ঠান-পত্র তৈরি করেন। তাতে কৃষিবিজ্ঞানের দৌলতে ও কৃষিসমাজের প্রচেষ্টায় লণ্ডনের কৃষিকার্যের উন্নতি এবং জাতীয় সম্পদ ও ব্যক্তিগত উন্নতির উল্লেখ ছিল। জ্ঞাতার্থে ও মতামত গ্রহণের জন্যে তিনি ওই অনুষ্ঠান-পত্রটি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে পাঠান। জুলাই মাস থেকে ওই সমিতি স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। তৎকালীন 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি পত্রে চাষবাসের উন্নতির জন্য কৃষকদের পুরস্কার দান সহ একটি সমিতি স্থাপন ও সমিতির সদস্যদের ত্রৈমাসিক চাঁদা ৮ টাকা এবং আজীবন সদস্য চাঁদা ৪০০ টাকার প্রস্তাব রাখা হয়। পরবর্তিকালে কেরির উদ্যোগে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউনহলে একটি সাধারণ সভায় 'এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়।

প্রথম সাত বছর সোসাইটির বাগান ছিল টিটাগড়ে, পরে আলিপুর বজবজ রোড আরম্ভের মুখে সরকার প্রদত্ত জমিতে উঠে আসে। পরীক্ষামূলক চাষের জন্য সরকার সোসাইটিকে আরেক খণ্ড জমি দেয়। ১৮৩৬-এ শিবপুর বোটানিক গার্ডেনের মধ্যে সরকার প্রথমে ২ একর (০·৮ হেক্টর) জমি দেওয়ার পরে সোসাইটির কাজে খুশি হয়ে তা ২৫ একর (প্রায় ১০ হেক্টর) পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। সেখানে প্রায় চল্লিশ বছর অবস্থান করে ১ নং আলিপুর রোডের ৬৩ একর (প্রায় ২৫·৫ হেক্টর) জমিতে উঠে আসে। ১৮৭২-এ ভারত সরকার বেলভেডিয়র লাটভবন সংলগ্ন জমিটি সোসাইটিকে শর্তসাপেক্ষে অর্পণ করে—যতদিন এখানে সোসাইটির বাগান থাকবে, ততদিন সোসাইটি তা ভোগ করতে পারবে। পরবর্তিকালে বোটানিক গার্ডেনের কৃষি উদ্যানও এখানে স্থানান্তরিত হয়।

অবশ্য সোসাইটির অফিস ছিল অন্যত্র। মেটকাফ হল তৈরি হওয়ার পর ১৮৪৪-এ সোসাইটির অফিস সেখানে উঠে আসে। পরবর্তিকালে লর্ড কার্জনের প্রস্তাব অনুসারে তা

আলিপুর রোডে স্থানান্তরিত হয়।

১৮২০ খ্রিস্টাব্দের দোসরা অক্টোবব তেব জন সভ্য নিয়ে সোসাইটিব পরিচালক সমিতি গঠিত হয়। সদস্যদের মধ্যে জন পামার, জেম্‌স কিড, জসুয়া মার্শম্যান, রাজা বৈদ্যনাথ বায়, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, হবিমোহন ঠাকুব, চন্দ্রকুমার ঠাকুবেব নাম ছিল। কেরির প্রস্তাবে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দেব ২২ মে ডঃ ওয়ালিচ সোসাইটিব স্থায়ী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। ১৮২৯-এ কেরি ওই সোসাইটির সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। প্রথমে কেবি ছিলেন সোসাইটির অস্থায়ী সম্পাদক।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ ডব্লু লিসেস্টারের বাসভবনে সোসাইটিব যে সভা হয তাতে কেরি ভারতবর্ষের কৃষি বিষয়ে এক সমীক্ষা গ্রহণের জন্য ২০টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি প্রশ্নমালা দাখিল করেন। তার মুখবন্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কৃষির সঠিক অবস্থা নির্ণযেব জন্য তিনি সদস্যদের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। ওই সমস্ত প্রশ্নে জেলাব জল-হাওয়া, মাটির প্রকার ভেদ, উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা, বিভিন্ন প্রকার খাজনা ও রায়তদের উপর করের বোঝা, খামার, সেচ ব্যবস্থা, কৃষি-শ্রমিক, গৃহপালিত পশু, কৃষির যন্ত্রপাতি, চাষবাসের অবস্থা, পতিত জমি সম্পর্কে তথ্য জানতে চাওযা হয়। বাধাকান্ত দেব ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর ওই প্রশ্নমালার উত্তর দেন। তা থেকে তৎকালীন বাংলাব কৃষির অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ, সোসাইটির এক সভায় কেরি সোসাইটির কার্যাবলী ইংবাজি, বাংলা ও হিন্দুস্থানিতে প্রকাশ করার প্রস্তাব দেন। সেই প্রস্তাবমত ১৮২৯-এর ২১ অক্টোবর সোসাইটি তার ১৮ খণ্ড কার্যাবলী বাংলায় প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং জন ক্লার্ক মার্শম্যানকে ওই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৮৩১-এ শ্রীরামপুর প্রেস থেকে 'হিন্দুস্থানের ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষি সমাজের কৃতকর্মের বিবরণ পুস্তক' প্রকাশিত হয়। পুস্তকটির দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা হয়ে বেরোয় ১৮৩৬-এ। ওই খণ্ডের লেখকদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব ও বামকমল সেনের নাম পাওয়া যায়।

১৮৩৫-এ লর্ড বেণ্টিংক সোসাইটির সভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেন, অন্যান্য ভারতীয় বিজ্ঞানের মত কৃষিবিজ্ঞানের অবস্থা অতি শোচনীয়। ভারতীয় ব্যবস্থার যে কোনো দিকে তাকালে একই চিত্র খুজে পাওয়া যায়—তা হল দারিদ্র্য, নীচতা ও দৈন্য। সে-সবের প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে হলে জ্ঞানের প্রসারই একমাত্র পথ।

ইউরোপীয় সাহিত্যেব মধ্য দিযেই ভারতীয় কৃষির উন্নতি ঘটবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এ জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট খামার স্থাপন করে সেখান থেকে উন্নত মানের বীজ, চাবাগাছ বিতরণের পরামর্শ দেন। সেখানে সকলেই উন্নত ধরনের চাষবাস ও শস্য উৎপাদন চাক্ষুষ দেখার সুযোগ পাবে।

কৃষির উপর দেশীয় ভাষায় ভারতীয়দের উপযোগী একখানি ভাল বই লেখার জন্য সোসাইটি ১৮৪৪-এ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাতে ভাল বইযের লেখককে নগদ ৩০০ টাকা এবং একটি স্বর্ণপদক দেওয়ারও প্রস্তাব ছিল। লেখার মধ্যে বীজের বদলি করে ভাল ফল লাভ, পর্যায়ক্রমে চাষ, কৃত্রিম সার ইত্যাদি বিষয় লেখার শর্তে আরোপ করা হয়।

১৮৪৭-এ প্রথমদিকে সোসাইটির উদ্যান বিষয়ক কমিটি মালীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব কবে এবং মার্চ মাসের সোসাইটির সভায় ওই প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবশ্য উক্ত স্কুল স্থাপনের জন্য মফঃস্বলবাসীদের পক্ষ থেকেও আবেদন করা হয়েছিল।

ওই বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য বয়সেব সীমা ছিল ১২-১৫ বৎসর। শিক্ষালাভ করে অনেকেই মালির কাজ ছেড়ে দিয়ে সরকারের কাজে যোগ দিত। তাই সোসাইটি মফঃস্বল থেকে বেতন দিযে লোক আনিয়ে শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু সেই প্রচেষ্টাও সফল না হওযায় জমিদারদের কাছে তাঁদেব অধীনস্থ কৃষিজীবী লোকদের ওই স্কুলে পাঠাতে সোসাইটি অনুরোধ কবে।

ওই সমস্ত ছাত্রদেব কাছে বাংলায় গাছের বৃদ্ধি, বংশবিস্তাব ও ঋতু-পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাছের উপব এব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বক্তৃতা দেওযা হত। কিন্তু শিক্ষা-অধিকর্তাব কাছে সম্পাদকের লিখিত এক পত্র থেকে জানা যায়, এবা সেই বক্তৃতা থেকে কিছুই শিক্ষা লাভ কবেনি। তবে তাবা তাদের চিরাচবিত পদ্ধতিব পবিবর্তে নূতন এক পদ্ধতিতে কাজ করবে, সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত ছিল। অপবদিকে এদেব শিক্ষা দিতে মাসিক বায ২৫ টাকা হলেও কলকাতার বাগানে মালীদেব অভাব মিটবে, এই আশায় কর্তৃপক্ষ স্কুলটি বন্ধ কবে দেয়নি।

১৮৫০-এর প্রথম দিকে সোসাইটি বার্ষিক বিববণী বাংলায প্রকাশেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ-প্রসঙ্গে রেভাঃ জেম্‌স লঙ ও কাশীনাথ চৌধুবীব বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওই সময়ে লঙ জনশিক্ষা প্রসাবেব জন্য গ্রন্থাগাব আন্দোলনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি তাঁব গ্রন্থাগারের জন্য সোসাইটির 'ট্রানসাকশন'-এব (প্রথম ও দ্বিতীয ভাগ) বাংলা অনুবাদ চেযে ১৮৫০-এর মার্চে কর্তৃপক্ষেব কাছে এক পত্র দেন। অপবদিক কাশীনাথ চৌধুরী বিভিন্ন দেশীয় ভাষায সোসাইটির কার্যাবলী ও অন্যান্য বই প্রকাশেব জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে এক পত্র লেখেন। প্যাবীচাঁদ মিত্রেব প্রস্তাব অনুসাবে ওই চিঠি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, বাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রকে নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়।

১৮৫০-এর জুলাই মাসে ওই উপ-সমিতিব এক সভা হয। সেই সভা কার্যকবী সমিতিব কাছে প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাব অনুযায়ী সোসাইটির কার্যাবলী ও অন্যান্য বই দেশীয ভাষায অনুবাদের জন্য আরেকটি স্থায়ী উপ-সমিতি গড়ার প্রস্তাব বাখে। ১৮৫০-এব অগাস্ট মাসে কার্যকবী সমিতি ওই প্রস্তাব অনুসারে রামগোপাল ঘোষ, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, বাধানাথ শিকদার ও শিবচন্দ্র দেবকে নিয়ে একটি স্থাযী অনুবাদক উপ-সমিতিব গঠন কবে। পবে রমানাথ ঠাকুরের প্রস্তাব অনুসারে প্যারীচাঁদ মিত্রকেও ওই সমিতিতে নেওয়া হয এবং ইণ্ডিয়ান মিসেলেনি নামে বাংলায় সোসাইটির রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয।

১৮৫৪-তে ইণ্ডিয়ান মিসেলেনির প্রথম সংখ্যা এবং পব পর প্রকাশিত পাঁচটি সংখ্যা নিয়ে একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। এর অধিকাংশ লেখাই 'ট্রান্‌সাক্‌শন' ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার বাংলা অনুবাদ। বাকি লেখাগুলি অবশ্যই মৌলিক প্রবন্ধ ছিল। প্রথম সংখ্যায় জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করে সোসাইটি একটি আবেদন প্রচাব কবে। কিন্তু জনসাধারণের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় শেষ সংখ্যায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়। বিশেষ করে দেশীয় জমিদার এবং অবস্থাপন্ন লোকেরা এদিকে মোটেই কর্ণপাত করেনি। প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান মিসেলেনি বিক্রি করে ১৫২ টাকার বেশি পাওয়া যায়নি।

ইতিমধ্যে সরকারের কাছে কৃষিশিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন সুপারিশ আসে। কৃষিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

কিন্তু জনসাধারণের অর্থের অপচয় করে কৃষিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সোসাইটি সায়

দিতে পারে না। গ্রামের স্কুলে কৃষিজীবী ছাত্রদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। ফলে সোসাইটি মনে করে, গ্রামের স্কুলের ছাত্ররা কৃষিশিক্ষায় লাভবান হবে না। ইতিমধ্যে নরম্যাল স্কুলে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য সোসাইটি সুপারিশ করে।

শেষ পর্যন্ত ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে কলকাতার নরম্যাল স্কুলে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়।

সোসাইটির পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনাগুলি ভাল করে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি ও সরকারের বিভিন্ন কাজে সহায়তার দিকেই সোসাইটির গবেষণা মূলত সীমাবদ্ধ ছিল। তুলা, আখ, শণ, সিল্ক সোসাইটির গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান পায়।

তুলার চাষ বৃদ্ধি কবা হয় রপ্তানীর উদ্দেশ্য নিয়েই। আক্রা এবং কাশীপুরেব উদ্যানে তুলার চাষ নিয়ে সোসাইটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওই পরীক্ষায় সোসাইটি কৃতকার্য হয়নি।

ইংল্যাণ্ডের বাজারে তখন আখেব খুব চাহিদা ছিল বলে ১৮৩৮-এ সোসাইটির উদ্যানে আখের চাষ শুরু হয় এবং ২,২০,০০০টি আখ সেখানে উৎপন্ন হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে তা বিলি করা হয়।

শণ ও শণ জাতীয় গাছ সম্পর্কে সোসাইটির দৃষ্টি দেওয়ার কারণ, ওই ধরনের গাছের তন্তু থেকে তৈরি দড়ি সরকারের বিভিন্ন কাজে লাগত। এ-সম্পর্কে ডঃ রক্সবার্গের গবেষণা বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। এ-দেশীয় শণ ও শণ জাতীয় গাছের তন্তু থেকে তৈবি দড়ি সম্পর্কে সৈন্য ও নৌবাহিনীর রিপোর্টে বলা হয়, ইউরোপের দড়িকেও তা হার মানায়।

সিল্কের উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্যে সোসাইটি স্বর্ণপদক দিয়ে পুরস্কারের ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন প্রকার তেল উৎপাদনের দিকে সোসাইটির দৃষ্টি সেই সময়ে অনেক প্রশংসা পায়। তিসির তেলও একটি উৎপাদন। তা ছাড়া মোমবাতি ও সাবান তৈরিতে মহুয়ার তেলের ব্যবহারে নারকেল তেল থেকেও সুফল আশা কবা হয়। ইংল্যাণ্ডের বাজারেও এর বেশ চাহিদা ছিল। সোসাইটির পরামর্শ মত ওই তেল ইংল্যাণ্ডে রপ্তানী করে ব্যবসায়ীরা বেশ মুনাফা করে।

সোসাইটি শুধু ভাবতীয় বনজ সম্পদেব উপর নির্ভরশীল ছিল না। ভারতের মাটিতে বিদেশের গাছপালা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। চামড়া পাকা করার কাজে আগেকার ডিভডিভির আঠার ব্যবহারের প্রতি প্রথম ডঃ হ্যামিলটনের দৃষ্টি পড়ে এবং ১৮৩৫-এ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে তা লাগানো হয় এবং ভাল ফল পাওয়া যায়। দার্জিলিংয়েব বনজ সম্পর্কে এক রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তিকালে সিনকোনাব চাষ শুরু হয়।

খাদ্যশস্য সম্পর্কেও সোসাইটির দৃষ্টি ছিল। গম, আদা, চা, কফি, তামাক চাষে সোসাইটির উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করতে হয়। তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের জাঁতার মালিকদের কাছে কাবুলের গমের বিশেষ আদর ছিল। কিন্তু বাংলায় তখন কাশী আর পেশুর গম কাবুলের গম থেকেও অনেকাংশেই উন্নত ছিল।

আরাকানে যে-আদা চাষে ভাল ফল পাওয়া যায়নি, আদা চাষের উন্নতির জন্য সোসাইটিকে বাংলায় পশ্চিম ভারতের সেই আদা চাষের পরামর্শ দেওয়া হয়।

উইলিয়াম বেণ্টিংকের সময়ে আসামে চা গাছের আবিষ্কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তখন থেকেই সরকারি প্রচেষ্টায় দার্জিলিং ও দেশের অন্যান্য স্থানে চা-এর চাষ শুরু হয়।

হিজলির মাটি পবীক্ষা করে বাংলায় তামাক চাষের পরামর্শ দেওয়া হয়। বাংলার মাটি

কাবুলের তামাক চাষের পক্ষে উপযুক্ত ছিল মনে করা হত। হিজলির পর সিঙ্গুরের স্থান ছিল দ্বিতীয়। ডায়মণ্ডহারবার ও অন্যান্য স্থানে সেই সময়ে তামাকের চাষ শুরু হয়। বিভিন্ন প্রকারের আঠা নিয়েও সেই সময়ে সোসাইটিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে সোসাইটি প্রথমে গরুর উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দেয়। এজন্য সোসাইটি অবশ্য একটি বিশেষ উপ-সমিতি নিয়োগ করে। বাংলার জল-হাওয়া গরুর স্বাস্থ্যের অনুকূল নয় বলে সেই উপ-সমিতি মত দেয়। কিন্তু উত্তর ভারতের জল হাওয়া গরুর স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল। ঠিক একই সময়ে সোসাইটি উল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। বাংলার ভেড়ী ও ইংল্যাণ্ডের ভেড়া থেকে উদ্ভূত সঙ্কর ভেড়ার উল প্রশংসিত হয়।

সোসাইটির সভাপতি জন গ্রাণ্টের প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে আলু, ফুলকপি ও মটরেব চাষ বৃদ্ধি পায়। এর মূলে রয়েছে সোসাইটিব উদ্যোগে উদ্যান পালনেব প্রদর্শনী। এরই প্রভাবে ইউরোপে উৎপন্ন শাকসব্জির চাষ ভারতবর্ষে শুরু হয়। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে সোসাইটি কৃষির যন্ত্রপাতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ওই সময়ে সোসাইটিব উদ্যোগে গোরখপুরের চাষবাসে আমেরিকার লাঙ্গলের ব্যবহার শুরু হয়। ১৮৪৪-এ সোসাইটি বিভিন্ন ধরনের ফুলের চাষের দিকে নজর দেয়।

ভারতীয় কৃষির উন্নতিব জন্য সরকার ও সোসাইটির যৌথ প্রচেষ্টা কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষদিকে দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশ অনুসাবে সরকারি কৃষিবিভাগ স্থাপিত হওয়ায় তা ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। তখন শুধু উদ্যানচর্চা, ফল-ফুল, শাকসব্জির চাষ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমেই সোসাইটির কার্যাবলী সীমাবদ্ধ থাকে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম দিকে এ-দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা কবিরাজি ও হেকিমি মতেই প্রচলিত ছিল। বিদেশি শাসকগণ নিজেদের, বিশেষ করে সৈন্যবাহিনীর জন্য বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে ওই জন্যে কলকাতায় জেনারেল হাসপাতালের কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন হাসপাতালে ইউরোপীয় চিকিৎসকরাই চিকিৎসা করত। সরকারি ভাবে ওই সমস্ত হাসপাতালে দেশীয় ব্যক্তিদের চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ওই সমস্ত চিকিৎসকদের অধীনে দেশীয় সহকারিরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করে কালক্রমে 'নেটিভ ডাক্তার' আখ্যা লাভ করত। প্রত্যেক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে দু'জন এবং প্রতিটি সরকারি কার্যালয়ে এক বা একাধিক নেটিভ ডাক্তার থাকত। এদের সে-সময়ে কম্পাউণ্ডারের কাজ করতে হত। পরবর্তিকালে পরীক্ষা দিয়ে এরা উচ্চ পদ ও বেতন ভোগ করত।

ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ও অনেক কল-কারখানা কলকাতায় স্থাপিত হওয়ায়, দেশের বিভিন্ন স্থানের লোক শুরু থেকেই এখানে এসে ভিড় করতে থাকে। এর ফলে শ্রমিক-প্রধান এলাকায় হাড়ে চিড় ধরা ও নানা ধরনের আঘাতজনিত দুর্ঘটনা প্রায়ই দেখা দিত। প্রতিকারের জন্য ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটি নেটিভ হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর এর কাজ শুরু হয়। ১৮০৭-এর আগে পর্যন্ত প্রায় ৫০ থেকে ১০০ জন দেশীয় ব্যক্তি পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করে দেশীয় ব্যক্তিদের চিকিৎসা শুরু করে।

কালক্রমে রাজত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় সেনাবাহিনীকেও রাজত্ব রক্ষার জন্য ভাগে ভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে হয়। দেশি সেনাবাহিনীকেও বিভক্ত করে বিভিন্ন স্থানে পাঠান হয়। সেই তুলনায় চিকিৎসকদের সংখ্যা নগণ্য হওয়ায়, ওই সমস্ত সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইউরোপীয় চিকিৎসক পাওয়া যায়নি। সরকারি কাজের জায়গায় সহকারি সার্জেনের পরিবর্তে দেশীয় ব্যক্তিরাই চিকিৎসকের কাজ চালাত। ওই সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ৯ মে কোম্পানির মেডিক্যাল বোর্ড সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। তারই সূত্র ধরে ২১ জুন 'স্কুল ফর নেটিভ ডক্টর্স' স্থাপিত হয়।

মনে হয় তৎকালীন দেশীয় ব্যক্তিদের কাছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষার পক্ষে এই প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়নি। তাই ১৮২৬-এ কলকাতার সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। সংস্কৃত কলেজের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের চরক, সুশ্রুত ও অন্যান্য প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসকদের বই ও 'স্কুল ফর নেটিভ ডক্টর্স'-এর ছাত্রদের জন্য প্রকাশিত বই পড়ান হত। আবার মাদ্রাসার ছাত্রদের বইয়ের মধ্যে আরব্য চিকিৎসক ও স্কুল ফর নেটিভ ডক্টর্সের বিভিন্ন বই ছিল। উভয় স্কুলেই শবব্যবচ্ছেদের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ১৮২৮-এ ডঃ টাইটেলার সংস্কৃত কলেজে দৈহিক গঠনতন্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর সহকারি হিসাবে একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হন। সেই সভায় ছাত্ররা হাড নিয়ে নাড়াচাড়া করত এবং শিক্ষার সুবিধার জন্য প্রাণীদেহ কেটে দেখত। ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি হাসপাতাল স্থাপন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের বিভিন্ন জেলখানায় নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৩১-এ সরকারি উদ্যোগ ও রামকমল সেনের সহায়তায় সংস্কৃত কলেজের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য ৩০টি শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল স্থাপিত হয়। ওই কলেজের বয়োঃশ্রেষ্ঠ এবং মেধাবী ছাত্র নবকৃষ্ণ গুপ্ত সেই হাসপাতালের সহকারি হিসাবে নিযুক্ত হন। এরই মাধ্যমে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে ইউরোপীয় অস্ত্র চিকিৎসা ও চিকিৎসা শাস্ত্রেব যোগাযোগ ঘটানোই ছিল ওই হাসপাতাল স্থাপনের মূল লক্ষ্য। পরিকল্পনাটির অঙ্গ হিসাবেই পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত **Hooper's Anatomy vade-mecum** সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। ইতিমধ্যে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর বদল হয়। দেশীয় ব্যক্তিদেব মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চিন্তাধারার প্রসারের জন্য সরকার উন্মুখ। তাই ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানেব শিক্ষাগত মান যাচাইয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৩৩-এ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক একটি কমিটি নিয়োগ করেন। সার্জেন জে গ্রাণ্ট এব সভাপতি মনোনীত হন। ওই কমিটিতে কোন ভাষার মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে তা নিয়ে যথেষ্ট মতান্তব হয়। অবশেষে ইংরাজির মাধ্যমে শিক্ষা দেওযার পক্ষেই বেশির ভাগ সদস্য মত দেন। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসার চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভাগ এবং স্কুল ফব নেটিভ ডক্টর্স বন্ধ হয়ে যায়। নেটিভ মেডিক্যাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের নেটিভ ডাক্তার হিসাবে নিযুক্ত করার এবং অবশিষ্ট ছাত্রদের দেশীয় সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই সমস্ত ছাত্রদের নেটিভ ডাক্তার হিসাবে গণ্য কবার জন্য মেডিক্যাল অফিসারদের নিয়ে একটি বোর্ড গঠিত হয়। সেই বোর্ডের কাছে দু' বছবের মধ্যে নেটিভ ডাক্তারের উপযুক্ত বলে বিবেচিত না হলে, ওই ছাত্রদের বরখাস্ত কবা হবে স্থির কবা হয়েছিল। দেশীয় যুবকদের চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে ইংরাজিতে শিক্ষিত করে তোলার জন্য নূতন একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন এবং সেই সঙ্গে পঞ্চাশ জন যুবককে মাসিক ৭ থেকে ১২ টাকা ভাতায় ভর্তি করার সিদ্ধান্ত হয। ফলে মেডিক্যাল কলেজ অব

বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হল ওই বছরই অর্থাৎ ১৮৩৫-এ। সাবলীল গতিতে ইংরাজি পড়া ও লেখা, মিলটনের প্যারাডাইস লস্টের একটি অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণ, রবার্টসনের ইতিহাস এবং অঙ্কে জ্ঞান ভর্তির যোগ্যতা হিসাবে ধার্য হল।

ডঃ ব্রামলি এর প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং ডঃ হেনরি গুডিভ তাঁর সহকারি হিসাবে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্তকেও ওই প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা হয়। ১৮৩৬-এর ১০ জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজের এই পণ্ডিতটি সনাতনী হিন্দু কুসংস্কার অগ্রাহ্য করে নিজ হাতে শব-ব্যবচ্ছেদ করেন। তিনটি প্রতিষ্ঠানের বই ও যন্ত্রপাতিও এল এখানে। ১৮৩৫-এর শেষ ভাগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদটি প্রিন্সিপ্যাল পদে রূপান্তরিত হল। ১৮৩৭-এ প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মৃত্যুর পরে সরকার প্রিন্সিপ্যাল পদটি তুলে দেয়। তখন কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীকে নিয়ে একটি চিকিৎসা বিদ্যার কাউন্সিল তৈরি হয় এবং ডেভিড হেয়ার কলেজ সম্পাদকের পদে মনোনীত হন।

১৮৩৭-৩৮-এর ছাত্রদের জাতিগত ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পঞ্চাশ জনের মধ্যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ, পনেরোজন কায়স্থ, তিনজন বৈদ্য, দু'জন স্বর্ণকার, ছ'জন তাঁতি, আটজন বণিক এবং এগারোজন ছিল অন্যান্য জাতের। বেশ কিছু শ্রীলংকার ছাত্রও সেই সময়ে এখানে পড়তে আসে। কলকাতায় বসবাসকারী আর্মেনীয় ও ইউরোপীয় পরিবারের অনেক যুবক এখানে বিনা পয়সায় পড়াশুনা করার সুযোগ গ্রহণ করে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রেরা সাধারণত সাব-অ্যাসিসটান্ট সার্জন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় ডিসপেন্সারিতে মেডিক্যাল অ্যাটেনডেণ্টের কাজ করত। তাদের মাসিক মাহিনা ছিল ৬০ থেকে ১০০ টাকা। কর্তৃপক্ষকে কাজে সন্তুষ্ট করতে পারলে উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাবে, এমন কি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করার অনুমতিও তাদের দেওয়া হত। ইউরোপীয় চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত হলে চিকিৎসকেরা তৎকালীন অবস্থাপন্ন ঘরের গৃহচিকিৎসক নিযুক্ত হতেন। মধুসূদন গুপ্ত সে-সময়ে হলধর মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ এবং সিংহী পরিবারের গৃহ চিকিৎসক ছিলেন। ওই সমস্ত পরিবারে থেকে তিনি ২৫ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত মাসে রোজগার করতেন।

৩০ অক্টোবর, ১৮৩৮-এ ওই কলেজের ছাত্রদের প্রথম পরীক্ষা শুরু হয়। সেই পরীক্ষায় এগারোজন ছাত্র পরীক্ষা দেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন কায়স্থ, তিনজন বৈদ্য, দু'জন ব্রাহ্মণ এবং একজন ছিলেন খ্রিস্টান। পরীক্ষায় এগারোজনের মধ্যে উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে এবং নবীনচন্দ্র মিত্র, অর্থাৎ মাত্র চারজন কৃতকার্য এবং পরবর্তী পরীক্ষার জন্য মনোনীত হন। ৯ নভেম্বর, ১৮৩৮ ওই চারজন ছাত্র একত্রে শল্যবিদ্যা ও অস্ত্রোপচার বিষয়ে পরীক্ষা দেন এবং প্রাথমিক সাক্ষ্যপত্র পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে ১০০ টাকা মাসিক মাহিনায় এঁদের নিযুক্ত করার জন্য পরীক্ষকমণ্ডলী সুপারিশ করেন।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য কলেজের অধীনে একটি হাসপাতাল স্থাপনের সুপারিশ করা হয় এবং সরকার ২০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতালের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই পরিকল্পনা মত ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল কলেজ সংলগ্ন একটি হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সৈন্যবাহিনীর জন্য চিকিৎসকের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ওই চাহিদা মেটানোর জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একখানি পত্র লেখা হয়। তার উত্তরে কলেজ কাউন্সিল জানায়, তৎকালীন পরিস্থিতিতে দেশি সৈন্যবাহিনীর জন্য

চিকিৎসকের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। ছাত্রদের চিকিৎসাবিদ্যা অনুশীলন সম্পর্কে তাৎক্ষণিক কোনো মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরিভাষা অনেক ছাত্রের কাছেই দুর্বোধ্য ও ছাত্রদের সামগ্রিক উন্নতির অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু পরবর্তিকালে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্রেরা চিকিৎসাশাস্ত্রে যোগ্যতা প্রমাণ করায় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হয়।

কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সরকার বুঝতে পারে, ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে ভালভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হলেও, ইংরাজিতে অজ্ঞ জনসাধারণের প্রয়োজনে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ওই কলেজের সঙ্গে পৃথক একটি মাধ্যমিক স্কুল খোলা প্রয়োজন। তাই ১৮৩৮-এ মেডিক্যাল কলেজে হিন্দুস্থানি ভাষায় একটি চিকিৎসা বিদ্যার স্কুল খোলা হয়। শিবচন্দ্র কর্মকার, চুমন লাল এবং নবকৃষ্ণ গুপ্ত সেই স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেখানে ছাত্রদের নিজেব হাতে শব-ব্যবচ্ছেদ কবতে হত এবং পরীক্ষাগার ও হাসপাতালে কাজের মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা চলত।

১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে কলেজেব সম্পাদক পদ থেকে হেয়ার পদত্যাগ করেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর আর্থিক বদান্যতায় এবং ধাত্রীবিদ্যা ও শারীরস্থানেব অধ্যাপক ডঃ গুডিভ ও জনসাধারণের চাঁদায় উচ্চ শিক্ষার্থে চারজন ছাত্র ভোলানাথ বসু, দ্বারকানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল ও সূর্যকুমার চক্রবর্তী ডঃ গুডিভের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড যান। এই সময়ে এই প্রতিষ্ঠান ইংল্যাণ্ডের রয়েল কলেজ অব সার্জেন্স, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং লণ্ডন অ্যাপথেকারি সোসাইটির স্বীকৃতি লাভ করে। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে এই প্রতিষ্ঠানটিই সর্বপ্রথম বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পায়। এতদিন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পবীক্ষকেরাই এখানে পরীক্ষা নিতেন। ১৮৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলেজের অধ্যাপকগণ সরকার নিযুক্ত পরীক্ষকদের উপস্থিতিতে পরীক্ষা নিতে থাকেন। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে ডঃ গুডিভ ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। তাঁব সঙ্গে যে-চারজন ছাত্র লণ্ডনে যান তাঁর সকলেই ইংল্যাণ্ডের রয়েল কলেজ অব সার্জেনসের সদস্য পদ পেলেন।

এ-দিকে সরকারের প্রশাসনিক পরিধি ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হয়। কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চিকিৎসকের সংখ্যা বেড়ে ওঠেনি। তাই আশু প্রয়োজন মেটানোর জন্য ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মেডিক্যাল কলেজেহ বাংলা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্লাস শুরু হয়। প্রথমে ৫০ জন ছাত্র নিয়ে ওই ক্লাশ শুরু হলেও ক্রমে ক্রমে ছাত্রসংখ্যা ইংরাজি বিভাগকেও ছাড়িয়ে যায়। ১৮৭৩-এ ইংরাজি বিভাগের ছাত্রসংখ্যা যখন ছিল ৪৪৫ তখন বাংলা বিভাগের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৭২।

ইতিমধ্যে কলকাতার স্বাস্থ্য ও নানা প্রকার বোগেব প্রকোপ বৃদ্ধির পবিপ্রেক্ষিতে নেটিভ হাসপাতালের সার্জেন জেম্‌স রেনল্ড মার্টিন বাংলার গভর্নর লর্ড অকল্যাণ্ডের কাছে একখানি স্মারকলিপি পেশ করেন ১৮৩৫-এর ৯ এপ্রিল। তার ভিত্তিতে ১৮৩৬-এ ওই বিষয়গুলি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য ফিবার হাসপাতাল কমিটি নামে একটি অনুসন্ধান কমিটি তৈরি হয়। সেই কমিটির অন্যতম সুপারিশ ছিল মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন একটি হাসপাতাল স্থাপন। ১৮৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দে সেই হাসপাতালের কাজ শুরু হল।

শুরু থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসাবিদ্যা এবং শল্য চিকিৎসায় ডিপ্লোমা দেওয়ার অধিকার কলেজের হাতে ছিল। কিন্তু কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাবিদ্যা ও শল্য চিকিৎসার ডিগ্রি দেওয়া শুরু করে। তা ছাড়া পাঠ্যসূচিরও পরিবর্তন হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৮৬০-এ মেডিক্যাল কলেজের জন্য কিছু নিয়মাবলী তৈরি হয়। সেই নিয়ম অনুসারে সমগ্র ছাত্রদের মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা হয়।

১· প্রাথমিক শ্রেণী—পাঠ্য সময় পাঁচ বছর
২· শিক্ষানবিসী শ্রেণী—পাঠ্য সময় তিন বছর
৩· হিন্দুস্থানী শ্রেণী—পাঠ্য সময় তিন বছর
৪· বাংলা শ্রেণী—পাঠ্য সময় তিন বছর।

একমাত্র প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্ররাই চিকিৎসাশাস্ত্র ও শল্য চিকিৎসার লাইসেন্স এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার সুযোগ পেত।

ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যার জন্য স্থান সংকুলনের অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাংলা শ্রেণীটি শিয়ালদহে বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত হয়। তখন ওটির নাম ছিল ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল। মহিলাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান পাঠের সুযোগ দেওয়ার জন্য ১৮৭৬-এ এক দাবি উত্থাপিত হয়। এবং তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর সার রিচার্ড টেম্পল তা সমর্থন করেন। কালক্রমে দাবিটি সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৮৮১-এ প্রথম মহিলা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৯-এ বিধুমুখী বসু এবং সেবী মিত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরীক্ষায় প্রথম উত্তীর্ণ স্নাতক।

১৮৭৮-এ শিয়ালদহ বাংলা মেডিক্যাল স্কুলের পড়াশুনা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করে। সেই কমিটির বিভিন্ন সুপারিশের মধ্যে ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্রদের যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রমাণ-পত্র দাখিল করতে বলা হয়।

১· কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ
২· মাধ্যমিক ইংরাজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
৩· বাংলা বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা কোনো অনুমোদিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযুক্ত প্রমাণ পত্র।

এদিকে বাংলা চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি ক্রমশ ছাত্রদের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। তাছাড়া সরকারও শিক্ষা সংকোচন নীতি অনুসরণ করে। ফলে ডঃ রাধাগোবিন্দ করের উদ্যোগে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। প্রথমে তা মেছুয়াবাজার ট্রাম ডিপো অধিকৃত জমিতে ছিল, ১৯০৩-এ বেলগাছিয়ায় উঠে যায় এবং ১৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে কারমাইকাল মেডিক্যাল কলেজ বর্তমান আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে।

১৮৭৮-এ নিযুক্ত কমিটির সুপারিশ অনুসারে শিয়ালদহ মেডিক্যাল স্কুলে ইংরাজি জ্ঞানসম্পন্ন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ডিসেম্বর ১৮৯৪-এ সরকার ওই প্রতিষ্ঠানের অবস্থার পর্যালোচনার জন্য আরেকটি কমিটি নিয়োগ করে। সেই কমিটি ছাত্রদের ভর্তির শর্ত হিসাবে ইংরাজিতে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক বলে ঘোষণা করে।

১৮৭২-৭৩-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের ভর্তির জন্য শিক্ষাগত মান আরো বৃদ্ধি করে। পরবর্তিকালে বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করা হয়। পাঠের সময়কালও বাড়ানো হল। ১৯০৬-এ চিকিৎসা

বিজ্ঞান পাঠের সময়কাল ছ'বছর করা হয়। এ-নিয়ে অবশ্য একটি বিতর্ক দেখা দেয়। এক পক্ষ পাঠের সময়কাল পাঁচ বছর এবং আরেক পক্ষ ছ' বছর রাখার পক্ষে মত দেন। শেষ পর্যন্ত ম্যাট্রিক উত্তীর্ণদের ক্ষেত্রে ছ' বছর এবং উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রদের শিক্ষার সময়কাল পাঁচ বছর করা হয়। তাছাড়া ১৯২১-এ ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা যেখানে ছিল রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা সহ আই এস সি পরীক্ষায় পাশ, ১৯২৬-এ তা পরিবর্তন করে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও অঙ্ক সহ আই এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ধার্য করা হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইন্‌সটিটিউট নামে দু'টি চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্কুল স্থাপিত হয়। পরবর্তিকালে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রচেষ্টায় ওই প্রতিষ্ঠান দু'টি একত্রে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইন্‌সটিটিউট আখ্যা পায়। স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠানটির নাম চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজ রাখা হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতি রক্ষার্থে মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় ও দেশবন্ধু অছি পরিষদের উদ্যোগে ১৯২৬-এ চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এটির উদ্বোধন করেন। ১৯৪৯-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেখানে স্ত্রী ও শিশু রোগ এবং ধাত্রী বিদ্যা সংক্রান্ত উচ্চ মানের পড়াশুনা ও গবেষণার ব্যবস্থা হয়।

দেশি ও বিদেশি চিকিৎসকগণ কলকাতায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে বহু উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রকাশ করেছেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে লিওনার্ড রজার্স ও উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে কলকাতায় চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের মধ্যে অল ইণ্ডিয়া ইন্‌সটিটিউট অব পাবলিক হেলথ, ইনসটিটিউট অব চাইল্ড হেলথ, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন উল্লেখযোগ্য।

কলকাতায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম গবেষণা শুরু হয় ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে। জেম্‌স হেয়ারকে সভাপতি ও জন অ্যাডামকে সম্পাদক করে ওই সময়ে দ্য মেডিক্যাল ও ফিজিক্যাল সোসাইটি অব ক্যালকাটা নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। উনিশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত তা বর্তমান ছিল। ওই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একখানি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫-এ কলকাতায় ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রথম শাখা স্থাপিত হল। ১৮৬৭-এ প্রতিষ্ঠানটির এক সভায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে এক বক্তৃতা দেন। ১৮৮০-তে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডি বি স্মিথকে সভাপতি ও কেনেথ ম্যাকলিওড এবং রবার্ট হার্ভেকে যুগ্ম সম্পাদক করে কলিকাতা মেডিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ঘটে। সোসাইটির পক্ষ থেকে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৮৯৮-এ তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাব স্থাপিত হয়। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৬৮-এ 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ডঃ জে আর ওয়ালেসের সম্পাদনায় 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড' প্রকাশিত হয় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে।

হিন্দু ও প্রেসিডেন্সি কলেজ

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ইংরাজি সাহিত্যে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য নিয়েই ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

জীবনে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারপতি ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড যান এবং ব্রিটিশ এনড্ ফরেন স্কুল সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করে এক প্রস্থ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কলেজকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। প্রথম দিকে এই প্রতিষ্ঠানে অতি সাধারণ অঙ্ক শেখান হত। কিন্তু ১৮২৮-এ রবার্ট টাইটেলারের নিয়োগের পর অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। টাইটেলারের প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত এবং তিনি এক বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরই প্রভাবে ছাত্রেরা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইতিপূর্বে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ডি রস ১৮২৪-এ ওই কলেজে নিযুক্ত হন। ছাত্রদের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে ১৮৩১-এ জেনাবেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন মন্তব্য করে, ছাত্রদের ইংরাজিতে দক্ষতা এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ইউরোপের যে-কোনো স্কুল থেকে অনেক বেশি।

ক্রমে ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানে সমস্ত ধর্মের ছাত্রদের জন্য প্রকৃতি বিজ্ঞান ও পূর্তবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। এ-জন্য ১৮৪৩-৪৪-এ প্রতিষ্ঠানে পৃথক দুটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হল। এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই হিন্দু কলেজ ধীরে ধীরে ১৮৫৫-এ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরেও বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এটির দ্রুত অগ্রগতি লক্ষণীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ১৮৬১-এ প্রথম এফ এ পরীক্ষা শুরু হয়। ইংরাজি এবং অন্য একটি ভাষা, অঙ্ক এবং ভূগোল সহ ইতিহাস বিষয়ে তখন পরীক্ষা দিতে হত। পরবর্তিকালে ওই তালিকায় নীতিশাস্ত্র ও মানসিক দর্শন যুক্ত হয়। আরো পরে ওই দুই বিষয়ের বদলে ন্যায়শাস্ত্র এবং মনস্তত্ত্ব এফ এ পরীক্ষার তালিকাভুক্ত হয়। ১৮৭২-৭৩-এ মনস্তত্ত্বের বিকল্প হিসাবে রসায়ন শাস্ত্র পাঠের সুযোগ দেওয়া হলে বহু ছাত্র সে-সুযোগ গ্রহণ করে। এর ফলে ১৮৭৪-এ ৯৬ জন ছাত্রের মধ্যে ৮৩ জনই মনস্তত্ত্বের বদলে রসায়নশাস্ত্র পাঠের সুযোগ নেয়। অনুরূপ ভাবে বি এ (সে-সময়ে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পৃথক পৃথক বিভাগ ছিল না) পরীক্ষার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের দিকেই ছাত্রদের বেশি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

পূর্তবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজে একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হওয়ার পরে ১৮৫৬-এর নভেম্বর মাসে বর্তমান মহাকরণে ক্যালকাটা কলেজ অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নামে একটি পূর্তবিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্তও হয়। প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেশাগত উপাধি পেত। ১৮৬৮ (বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে ১৮৬৫) প্রতিষ্ঠানটি প্রেসিডেন্সি কলেজে মিশে যায়। প্রথম প্রথম ছাত্রসংখ্যা বেশি ছিল না। কিন্তু ১৮৭৪-এ পূর্ত বিভাগে অনেক পদ খালি হওয়ার সম্ভাবনায় ওই বিভাগে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

বিজ্ঞান শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উনিশ শতকের সপ্তম দশকে একটি পৃথক ভবন তৈরি হল। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে সব থেকে বেশি উন্নতি ঘটে রসায়ন বিভাগের। ওই সময়ে আলেকজাণ্ডার পেডলার রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তাঁর সঙ্গে রসায়ন বিদ্যায় ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য অনেক যন্ত্রপাতি আসে এবং ১৮৭৫-এ ওই বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষা শুরু হয়। একই সময়ে কলেজে পদার্থবিদ্যা সহ বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে পাঠদান শুরু হলেও রসায়ন শাস্ত্রের মত কর্তৃপক্ষ ওইসব বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ নজর দেয়নি। এর অন্যতম কারণ, সে-সময়ে বি এ ক্লাসের ছাত্রদের পক্ষে রসায়ন আবশ্যিক ছিল।

এর পর সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার ফলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হল। ভূতত্ত্বের অধ্যাপক পদে'টি এইচ হল্যাণ্ড ১৮৯২-এ যোগ দেন। এর আট বছর পরে জীববিদ্যা বিভাগের সূচনা।

রসায়ন বিভাগের ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য ১৮৯৩-এ একটি নূতন পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়। পুরাতন পরীক্ষাগারটির ১৮৯৭-এ পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগারে রূপান্তর ঘটে। ওই বছরই পদার্থবিদ্যার ছাত্রদের জন্য আলিপুরে একটি চুম্বকীয় মানমন্দির তৈরি হয় এবং ত্রিপুরার মহারাজার সৌজন্যে কলেজের ছাদে একটি জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত মানমন্দির তৈরির কাজের সূচনা ঘটে। এটি সম্পূর্ণ হয় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে।

কলেজগুলি পরিদর্শনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৪-এ সারদাচরণ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, জি ডব্লু কিচলার এবং এইচ আর জেম্স-কে নিয়ে একটি কমিটি নিয়োগ করে। ওই কমিটি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ পরিদর্শনে আসে। কলেজের স্থানাভাব সম্পর্কে ওই কমিটি সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে জীববিদ্যা, শারীরবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে তখনও অধ্যাপক এস সি মহলানবিশ একাই উদ্ভিদবিদ্যা ও শারীরবিদ্যা পড়াতেন। পদার্থবিদ্যা বিভাগটিও তখন সমস্ত কলেজেই বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের জন্য একটি নূতন ভবন তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯১০-এ কাজ শুরু হয়ে ১৯১৩-তে সম্পূর্ণ হয়। নরম্যান এডওয়ার্ড বেকারের প্রচেষ্টায় এই ভবনটি শুরু হয় বলে তাঁর নামেই নূতন ভবনটির নাম বেকার ল্যাবোরেটারি রাখা হয়। ক্রমে ক্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজ পূর্ণতা লাভ করে।

শুধুমাত্র পাঠের মধ্যেই এই কলেজের কর্মসূচী সীমাবদ্ধ ছিল না। কলেজের বহু অধ্যাপক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণা করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেন। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আলেকজাণ্ডার পেডলার ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়েব প্রচেষ্টায় কলেজের পরীক্ষাগার থেকে বাংলা রসায়ন গবেষণায় নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এখানেই প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পারদ সংক্রান্ত বিখ্যাত গবেষণা সম্পন্ন করেন। তাঁর প্রেরণায় প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে ভৌত রসায়নের গবেষণা শুরু হয় এবং তাঁরই কয়েকজন ছাত্র এখানে গবেষণা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। এদের মধ্যে নীলরতন ধর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন নিয়োগী, মহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই কলেজের পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগারে জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর যুগান্তকারী গবেষণাগুলি পবিচালনা করেন। ১৮৯৭-এ ইউরোপের বৈজ্ঞানিকদেব সমাবেশে প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে তৈরি যন্ত্র সহ তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন কলেজের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজেই সর্বপ্রথম ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সোসাইটি স্থাপিত হয়। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা ওই সমস্ত সোসাইটির দায়িত্ব গ্রহণ করত এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ছিল অসামান্য।

প্রেসিডেন্সি কলেজের জিওলজিক্যাল ইনসটিটিউট ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ভূবিদ্যা নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরবর্তিকালে একে একে বিভিন্ন সোসাইটিব প্রতিষ্ঠা ঘটে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে নিয়মিত পড়াশুনায় উৎসাহ দান এবং পড়াশুনার শেষে পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রদের শিক্ষাগত উপাধি দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতা সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের বয়স আজ একশো পঁচিশ বছরেবও বেশি, কিন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম পড়াশুনা ও গবেষণার বয়স অতটা নয়। কিন্তু কলকাতা সহ ভাবতেব বিজ্ঞানেব অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবি রাখে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যে প্রস্তুতি কমিটি তৈরি হয়েছিল, তাব সুপারিশে চারটি উপ-সমিতি গঠন করা হয়। সেই উপ-সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা ও পূর্তবিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিনডিকেটের সভায় গৃহীত এবং ১৮৫৯-এর ১০ ডিসেম্বর সিনেটেব সভায় অনুমোদিত কার্যাবলী থেকে দেখা যায়, সেই সময়ে এফ এ পরীক্ষার বিষয়সূচীতে অঙ্ক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের মধ্যে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, সাধারণ ত্রিকোণমিতি ও বলবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্কুল ও কলেজে পদার্থবিজ্ঞান পড়ানোব জন্য ১৮৭২-এ আইন করা হয়। ১৮৮৫ থেকে এফ এ পরীক্ষার বিষয়সূচীতে উল্লেখযোগ্য পবিবর্তন দেখা গেল। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সেখানে গণিত ও সাধারণ পদার্থবিদ্যাব দুটি বিষযেব পরীক্ষাব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হলেও ১৮৮২ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের জন্য কোনো পৃথক বিভাগ ছিল না। কলা বিভাগের অধীনেই তার বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। অথচ অঙ্ক, ভৌতবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন বদল করতে হয়েছে। প্রবেশিকা থেকে শুরু কবে এম এ পরীক্ষার বিষয়সূচীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়েব অন্তর্ভুক্তিব দাবি ক্রমেই জোরাল হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বি এ পরীক্ষার বিষযসূচী দু'ভাগে (এ-কলা ও বি-বিজ্ঞান) বিভক্ত হয়। এফ এ ও এম এ পবীক্ষার ক্ষেত্রে যদিও কোনো পরিবর্তন হয়নি তবু পরীক্ষার বিষয়সূচীতে বিজ্ঞানের বিষযেব অন্তর্ভুক্তি ক্রমেই লক্ষ্য করা যায়।

১৯০২-এ নিযুক্ত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশে উচ্চ শিক্ষার ভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্পণ করতে বলা হয়। প্রাক-স্নাতক পর্যায়ে পঠন-পাঠনেব দায়িত্ব থাকবে কলেজের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতব পঠন-পাঠনের উন্নতি বিধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগাবেবও সংস্থান রইবে। এই অবস্থায় ১৯০৬-এ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন। তাঁর আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন যুগের সূচনা হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পরীক্ষা গ্রহণের নয়, স্কুল সহ বিভিন্ন কলেজের পঠন-পাঠনের তদারকি এবং উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এদিকে সরকারি ও বেসরকাবি বিভিন্ন দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কাজ করা সহজ হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি ঘটে।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক নিয়োগের জন্য বছরে ৬৫ হাজার টাকা সরকারি অনুদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সেই টাকার অংশ থেকে গণিতের উচ্চ শিক্ষার জন্য হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। তারকনাথ পালিতও সেই সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচুর অর্থ ও জমি দান করেন।

সে-দানের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫ লাখ টাকা। সেই দান থেকে বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন এবং রসায়নের দুটি ও পদার্থবিদ্যার একটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ অগাস্ট রাসবিহারী ঘোষও বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০ লক্ষ টাকা দেন। সেই দানে ফলিত গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যার চারটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির শর্ত ছিল। আগে লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্যের জন্য সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পরবর্তিকালে সেই প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহৃত হয়। বারংবার আবেদন করেও সরকারের তরফ থেকে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। এই অবস্থায় তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের দানের উপর নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য নূতন ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মার্চ বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় রাজাবাজারে। কিন্তু ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে এবং বাংলার গভর্নর কারমাইকেলের অনুরোধে ভারত সরকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করে। সেই কমিটির সদস্যগণ শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কলেজে এম এ, এম এস সি পঠন-পাঠন বন্ধ করে দেওয়ার সুপারিশ করে। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়কে কলেজগুলির উপর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন, ভারত সবকার ওই কমিটিব সুপারিশ গ্রহণ করে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে রসায়ন বিভাগ স্থাপিত হয় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পালিত অধ্যাপক পদে (১৯১৬) এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আচার্য রায়ের সহকারি পদে যোগ দেন। ভৌত বসায়নের লেকচারার পদে নীলরতন ধর ১৯১৫-তে, অজৈব রসায়নের লেকচারার পদে পুলিনবিহারী সবকার ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে আসেন। এরপর এলেন প্রিয়দারঞ্জন বায়।

পালিত অধ্যাপক পদে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯৩৭ পর্যন্ত ছিলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর বছর। এরপর ১৯৪৪ পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি ইমারিটাস অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরই বিশেষ প্রচেষ্টায় রাজাবাজাব বিজ্ঞান কলেজে ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পঠন-পাঠনের সঙ্গে ফলিত রসায়ন যুক্ত হওয়া একটি যুগান্তকাবী ঘটনা। ১৯১৯-এ রাসবিহারী ঘোষ ফলিত রসায়ন ও ফলিত পদার্থবিদ্যার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-অর্থ দান করেন, তার ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন শুরু হয়। ১৯৩৪ পর্যন্ত ফলিত রসায়ন বিভাগটি রসায়ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অধ্যাপক হেমেন্দ্রকুমার সেন ১৯২১-এ ফলিত বসায়নের ঘোষ অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ওই বিভাগটি ক্রমশ উন্নতি করতে থাকে এবং ১৯৩৪-এ পৃথক একটি বিভাগ তৈরি হয়। এই বিভাগেই সর্বপ্রথম ভারতীয় কয়লার উপব পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োগ সম্পর্কে একটি ছোট বিভাগেব সৃষ্টি হয়। অব্যবহৃত সেলুলস থেকে অ্যালকোহল তৈরি সম্পর্কে অধ্যাপক সেনের গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক সেন লাক্ষা কেন্দ্রের অধিকর্তার পদে যোগ দিলে অধ্যাপক বি সি গুহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। পরবর্তিকালে অধ্যাপক গুহের প্রচেষ্টায় বায়ো-কেমিস্ট্রি বিভাগ স্থাপিত হয়। ভিটামিনযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত তাঁর কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিদ্যা বিভাগের সৃষ্টিও দান-নির্ভর। তারকনাথ পালিত ও

রাসবিহারী ঘোষের দানের উপর নির্ভর করে এই বিভাগের কাজ শুরু। ১৯২০-তে আবার খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিংয়ের দানে তা আরো পূর্ণতা পায়। এর প্রথম পালিত অধ্যাপক পদে সি ভি রামন (১৯১৭) এবং ঘোষ অধ্যাপক পদে দেবেন্দ্রমোহন বসু যোগ দেন। সার রামন ১৯৩৪-এ বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইন্‌সটিটিউট অব সায়েন্সের ডিরেকটর পদে যোগ দেন। সেই সময়ে দেবেন্দ্রমোহন বসু পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৮-এ তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেকটর পদে যোগ দিলে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা পালিত অধ্যাপক হন। পালিত অধ্যাপক পদে থাকাকালীন অধ্যাপক সাহা নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌সের একটি গবেষণাগার তৈরির পরিকল্পনা করেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৪৮-এ ইন্‌সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স স্থাপিত হয়। তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ডিরেকটর ছিলেন।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র প্রথম পালিত অধ্যাপকের সহকারি পদে যোগ দিয়ে ১৯২৩-এ উচ্চ শিক্ষার্থে ইউরোপ যান। সেখান থেকে ফিরে এসে খয়রা অধ্যাপক পদ অলংকৃত করেন। এরপর ১৯৩৫-এ ঘোষ অধ্যাপক পদে যোগ দিয়ে ১৯৫৫ পর্যন্ত ওই পদে আসীন ছিলেন। ১৯৪৫-এ সত্যেন্দ্রনাথ বসু খয়রা অধ্যাপক হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার গবেষণার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রমোহন বসু, মেঘনাদ সাহা, শিশিরকুমার মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বাসন্তীদুলাল নাগ চৌধুরী, শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়েব অন্যান্য বিভাগের মধ্যে প্রাণিতত্ত্ব বিভাগটি মাত্র একজন ছাত্র নিয়ে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজে শুরু হয়। ওই ছাত্রটির নাম দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়। পরবর্তিকালে নিজ বিভাগেই ইনি যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক সমরেন্দ্রনাথ মৌলিক ওই বিভাগের প্রথম অধ্যাপক এবং নীলরতন সরকার বিভাগীয় উচ্চ শিক্ষা পর্ষদের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২২-এ অধ্যাপক মৌলিক ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জীবতত্ত্ব বিভাগে যোগ দেন। পরবর্তিকালে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে পাঁচ বছরের জন্য বসন্তকুমার দাস অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৩১-এ অবসর গ্রহণ করেন। তখন হিমাদ্রীকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

গণিতেব ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তব শ্রেণীর পঠন-পাঠন ১৯১২-তে শুরু হয়। হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক পদে ডব্লু এইচ ইয়ং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে যোগ দেন। পরবর্তিকালে বিভিন্ন সময়ে গণেশ প্রসাদ (১৯২৩), ফ্রেড্রিক লেভি (১৯৩৫), হরিদাস বাগচী (১৯৫১) হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক পদ অলংকৃত করেন।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিভাগটি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজে স্থাপিত হয়। বিভাগেব প্রথম অধ্যাপক পি ব্রুহিল ওই বছরেই যোগ দেন। ইতিমধ্যে এস পি আগারকর উদ্ভিদ্‌বিদ্যার প্রথম ঘোষ অধ্যাপক পদে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে আসেন। আগারকরের অবসর গ্রহণের পরে প্রথমে পি সি সর্বাধিকারী এবং পরে ইলাবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন।

ভূতত্ত্ব বিভাগেব কাজের সূচনা হয় প্রেসিডেন্সি কলেজেব উপর নির্ভর করে। প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে শরৎলাল বিশ্বাসকে পূর্ণ লেকচারাব ও ওই কলেজের এইচ সি দাশগুপ্তকে সাম্মানিক আংশিক লেকচারার পদে নিয়োগ করে ভূতত্ত্ব বিভাগের কাজ শুরু হয়। ১৯২৬-এ অধ্যাপক নির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায় সর্বক্ষণের জন্য শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভূতত্ত্বের প্রথম অধ্যাপক পদে যোগ দেন।

শারীরবিদ্যা বিভাগের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে। ইউ এন ব্রহ্মচারী ও এস সি

মহলানবিশের সাহায্যে এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে শারীরবিদ্যার পঠন-পাঠন শুরু হয়। ১৯৫২-তে বিভাগীয় অধ্যাপক পদে প্রথম বিজনবিহারী সরকার যোগ দেন।

১৯৪১-এ প্রথম ভূগোল বিভাগটির প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৯৪৯-এ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বিভাগীয় অধ্যাপক হন। ২৪ পরগনার ভূমি সদ্ব্যবহারের সমস্যা নিয়ে প্রথম অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় কাজ করেন। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে হাওড়ার ভূমির সদ্ব্যবহার সম্পর্কে জরিপ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে জাতীয় মানচিত্র বিভাগ স্থাপন করেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে এবং এন এন সেনগুপ্তের প্রচেষ্টায় প্রথমে প্রায়োগিক মনোবিদ্যার পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৬৬-তে এই বিভাগে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন শুরু হয় এবং ১৯৩৯-এ ডঃ জি বোস বিভাগীয় অধ্যাপক মনোনীত হন।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে পরিসংখ্যান বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পঠন-পাঠন শুরু হয় এবং পূর্ণেন্দুকুমার বসু বিভাগীয় প্রধান হন। রাজচন্দ্র বসু ও সমরেন্দ্রনাথ রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি মানসিক ক্রিয়ার পরিমাপ ও নমুনা বণ্টন প্রণালী নিয়ে কাজ করেন।

১৯১১-তে কলা বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পঠন-পাঠনের অংশ হিসাবে নৃতত্ত্ব বিষয়টি চালু হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে পৃথক বিভাগ হিসাবে এর সৃষ্টি। ১৯২১-এ এল কে অনন্ত আয়ার লেকচারার-ইন-চার্জ হিসাবে বিভাগে যোগ দেন এবং ১৯৩২ পর্যন্ত ওই পদে কাজ করেন। ১৯৪০-এ ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রথম বিভাগীয় অধ্যাপক পদে যোগ দেন। বাংলা সরকারের অর্থানুকূল্যে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৫-এ বাংলার সাঁওতালদের উপর সমীক্ষা করেন। জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের প্রেরণায় নৃতত্ত্ব ও পরিসংখ্যান বিভাগের যৌথ উদ্যোগে কলকাতার ছাত্রদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কেও পরিসংখ্যান গৃহীত হয়।

কৃষিবিজ্ঞান বিভাগটিও বিশ্ববিদ্যালয়ে কম গুরুত্ব পায়নি। খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিং উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে যে-টাকা দান করেন, সেই টাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় দাতার নামে চারটি এবং তাঁর রাণীর নামে একটি অধ্যাপক পদের প্রবর্তন করেন। ওই চারটির মধ্যে একটি হল কৃষিবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদ। সেই পদে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম যোগ দেন। ১৯২১ থেকে '৩১ পর্যন্ত তিনি ওই পদে আসীন ছিলেন। পরবর্তিকালে তিনি কৃষি বিষয়ক ভারতীয় রয়াল কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৫-এ কৃষিবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক পদে নীলরতন ধর মনোনীত হন। কিন্তু তিনি ওই পদে যোগ দেননি। বরং পরবর্তিকালে কৃষি রসায়নেব অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ২ লক্ষ টাকা দেন। সেই টাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি রসায়নের অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৮-এ পবিত্রকুমার সেন কৃষিবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় পরবর্তিকালে বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজে কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পঠন-পাঠন শুরু হয়।

লেদার টেকনোলজি, দন্ত-চিকিৎসা এবং পশু চিকিৎসাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে এ-দেশ থেকে জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়ায় পশুর কাঁচা চামড়া ও ছাল রপ্তানি হত। যুদ্ধ লাগায় ওই সমস্ত ছাল পাকা করার জন্য সরকার পরীক্ষামূলক ভাবে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে একটি গবেষণাগার স্থাপন করে। ১৯২৬-এর জুন মাসে এটি বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌সটিটিউট নাম ধারণ করে। ১৯২৯-এ জুতা তৈরির শিক্ষা দিতে ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি লেদার ট্রেড স্কুল স্থাপিত হয়। কালক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এটির অন্তর্ভুক্তি ঘটে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে এবং ট্যানিংয়ে সার্টিফিকেট কোর্স সেখানে চালু হয়।

১৯৫৪-তে এটি নূতনভাবে পুনর্গঠিত হওয়ার পরে বিভিন্ন পাঠ্যক্রম শুরু হল। প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসক আর আমেদের প্রচেষ্টায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা ডেন্টাল কলেজ স্থাপিত হয়।

ভারতীয় পাট কলের মালিকদের অর্থানুকূল্যে ৩৫ নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে দ্য ইন্‌সটিটিউট অব জুট টেকনোলজির প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন পাট কলের শিক্ষানবিশি উপযুক্ত ছাত্র এখানে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়।

পশু-পক্ষীর চিকিৎসার জন্য বেলগাছিয়ায় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কেনেথ ম্যাকলিওড ভেটেরিনারি স্কুল সহ দীনেসা মানকজী পেটিট ভেটেরিনারি হাসপাতাল স্থাপিত হয়। ১৮৯৯-এ বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজ নামযুক্ত হয়ে কলেজ পর্যায়ে উন্নত হয় ও সেখানে ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রম চালু হয়। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভেটেরিনারি বিজ্ঞানে চাব বছবের ডিগ্রি কোর্স চালু হয়।

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

১৮৪৭-এ ভারত সরকার কাউন্সিল অব এডুকেশনকে বোম্বেতে ইঞ্জিনিয়ারদের একটি শাখা স্থাপন এবং সৈন্য বিভাগের দুটি পরিকল্পনা দাখিল করার নির্দেশ দেয়। সেই পরিকল্পনার উপব ভিত্তি করে লর্ড ডালহৌসি প্রতিটি প্রদেশে একটি করে পূর্তবিজ্ঞানের ক্লাস স্থাপনের জন্য ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অগাস্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে এক পত্র লেখেন। এ কোর্ট অব ডাইরেকটর্সের ডেসপ্যাচে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের দোসরা মে পূর্তবিজ্ঞানের শিক্ষার জন্য পৃথকভাবে একটি কলেজ স্থাপন করতে বলা হয়। সেই নির্দেশ মত ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান মহাকরণে ওই ক্লাশ শুরু হয়। ভর্তির যোগ্যতা হিসাবে কাউন্সিল অব এডুকেশন সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষার উপযুক্ত হওয়া অথবা কোনো সরকারি কলেজে দু' বছর পড়ার অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক বলে স্থির করে। ১৮৫৬-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২১ কিন্তু ১৮৫৭-এর এপ্রিলে তা ৩১-এ উন্নীত হয়।

ইতিমধ্যে ১৮৫৭-এর দোসরা মে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়েব সঙ্গে যুক্ত হয়। আগে যেখানে পঠন-পাঠনেব জন্যে দু' বছর নির্দিষ্ট ছিল, পরবর্তী কালে পঠন-পাঠনের জন্য পাঁচ বছর নির্ধারিত হয়। এর মধ্যে তিন বছর থিওরেটিক্যাল ক্লাশ এবং দু' বছর ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

১৮৬১-তে প্রথমবার পরীক্ষায় ছ'জন ছাত্র কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হল। তার মধ্যে চারজন প্রথম এবং দু'জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। দীননাথ সেন প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। অপর তিনজন ছাত্র হলেন মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র ঘোষ এবং এইচ এম অ্যাডাম্‌স। দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম যাদবচন্দ্র দে এবং বৈকুণ্ঠনাথ দে। এ-রকম এক অবস্থায় অর্থনৈতিক কারণে প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে কলেজটি যুক্ত হয় এবং ১৮৬৫-এর এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ এটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময়ে প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৫ এবং শিক্ষক ছয়। ক্রমে ক্রমে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৬৯-এ শিক্ষকের সংখ্যাও বাড়ে। ১৮৭০-এ আনন্দমোহন বসু অল্প কিছুদিনের জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক পদে

যোগ দেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় ও অম্বিকাচরণ চৌধুরী প্রথম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাংলা সরকার পূর্ত বিভাগের প্রয়োজনে ইঞ্জিনিযারদের প্রায়োগিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে একটি কমিটি নিয়োগ করে। তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক শিক্ষাকে একত্রে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিযে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিভাগটিকে এই ব্যবহারিক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে যুক্ত করা সঠিক কিনা তা নির্ধারণের জন্য ওই কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কমিটির সদস্যরা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা একত্রে দেওয়ার কথা বললেও তদাবকির দায়িত্ব দু'টি ভিন্ন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করার সুপারিশ করে। তাতে তাত্ত্বিক শিক্ষাব দায়িত্ব শিক্ষা বিভাগকে এবং ব্যবহারিক শিক্ষার দায়িত্ব পূর্ত বিভাগের উপব দিতে বলা হয়। আগে যেখানে শুধু সিভিল ওভারসিযার ও ইঞ্জিনিয়ারদের শিক্ষাব ব্যবস্থা ছিল পবে কমিটি সেখানে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও ওভারসিয়াবদেরও শিক্ষণের ব্যবস্থা করার সুপাবিশ কবে। ওই সুপারিশের উপর ভিত্তি করে শিবপুরে পৃথক একটি ইঞ্জিনিযারিং কলেজ স্থাপিত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল 'গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, হাওড়া'। ৭৩ জন ছাত্র নিযে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দেব ৫ এপ্রিল প্রথম ক্লাশ শুরু হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিংয়েব অধ্যাপক এস এফ ডাউনিং নব প্রতিষ্ঠিত কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কলেজের একাধিক অধ্যাপককে ওই কলেজে বদলি করা হয়। শিবপুর পূর্ত বিভাগের ওয়ার্কশপে ছাত্রদের ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।

১৮৮৩-৮৪-তে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুনের পরিবর্তন ঘটে। নূতন নিয়ম অনুসারে পুরাতন ডিপ্লোমা ও ডিগ্রির বদলে এল ই (লাইসেন্স ইন ইঞ্জিনিয়াবিং) ডিপ্লোমা এবং বি ই (ব্যাচেলার ইন ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রিও দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের পয়লা জানুয়ারি থেকে ডিগ্রি পরীক্ষার নূতন নিয়ম চালু হল। সেই নিয়ম অনুসারে ১৮৮৬-এ প্রথম ব্যাচেলার ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা হল। সেই পরীক্ষায় দু'জনের মধ্যে মাত্র একজন পার্শি ছাত্র — সরাবজী সাভাক্ষা কৃতকার্য হন। শিবপুরে কলেজ স্থানান্তরিত হওয়ার পব প্রথম ব্যাচেলার ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা হয় ১৮৮০-তে। তাতে সুরেন্দ্রকুমার বসু উত্তীর্ণ হন। পরবর্তিকালে তিনি 'বিল্ডিং মেটিরিয়ালস এনড্ কন্সট্রাকসন' নামে একটি জনপ্রিয় বই লেখেন। অনুকূলচন্দ্র মিত্র ১৮৮৭-তে বি ই ডিগ্রি লাভ করেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরির দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। গিরীশচন্দ্র দাস এখান থেকে ১৮৯১-এ বি ই পাশ করেন এবং পরবর্তিকালে মার্টিন এনড্ কোম্পানির অধীনস্থ লাইট রেলওয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হন। অমরনাথ দাস ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বি ই উত্তীর্ণ হয়ে ইণ্ডিয়ান সার্ভিস অব ইঞ্জিনিয়ার্সে যোগ দেন। পরে তিনি বাংলার চিফ ইঞ্জিনিয়ার পদে উন্নীত হন।

কলেজের পঠন-পাঠন সম্পর্কে সমীক্ষা করার জন্য ১৮৮৭-এ সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করে। তার সদস্যরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করায় সরকার তা গ্রহণ করেনি। ১৮৮৯ থেকে কলেজটি সম্পূর্ণ আবাসিক হিসাবে গণ্য হয়। ১৮৮৭-এর কমিটির সুপারিশগুলির মধ্যে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। এবং পরে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮৯৮-এর জুন মাসে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৯০৪-এ সরকার পুনায় একটি পৃথক কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই মত ১৯০৮-এ শিবপুরে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা উঠে যায়। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কলেজের ৩২২ জন ছাত্রের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র ছিল ৯১, কৃষি বিভাগে ১৬ এবং শিক্ষানবিশি

বিভাগে ছিল ২১৫ জন। ১৯০৬-এ বিশ্ববিদ্যালয় এল ই পরীক্ষা তুলে দিয়ে আই ই (ইন্টারমিডিয়েট একজামিনেসন ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং এম ই-এর বদলে ডক্টর ইন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রবর্তন করে। ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০-তে সরকারি নির্দেশনামার বলে কলেজের নূতন নাম 'বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর' রাখা হয়। ১৯২১-এর মার্চ মাসে শিবপুর কথাটি বাদ দেওয়া হল। নাম রইল বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

কলেজের বিভিন্ন বিভাগগুলি পুনর্গঠনের জন্য এই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জীকে সভাপতি করে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। সেই কমিটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নিম্নতম শ্রেণীটি তুলে দিয়ে কাঁচড়াপাড়ায় একটি টেকনিক্যাল স্কুল খোলার সুপারিশ করে। সেখানে শিক্ষানবিশিকাল সম্পন্ন হলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শুধু তাঁদের শিক্ষা দেওয়া হবে। এই সুপারিশ অনুসারে সরকার ১৯২১-এ শিক্ষানবিশি ট্রেনিংয়ের জন্য একটি বোর্ড গঠন করে। কলেজে শুধু সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল এবং মাইনিং ডিগ্রি কোর্সের পঠন-পাঠনের সুপারিশ করা হয়। ইতিমধ্যে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে এখানে টেলিগ্রাফ ট্রেনিংয়ের যে-ব্যবস্থা হয়েছিল ১৯২৫-এ তা বন্ধ হয়ে যায়। কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য মার্টিন কোম্পানির সহায়তায় ১৯২৬-এ ধানবাদে ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইন্স নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। এর ফলে ১৯২৯-এ মাইনিং ক্লাসটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৩২-এর জুলাই মাসে প্রথম মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি পাঠ্যক্রমে ছাত্রদের পরীক্ষা হয়। ১৯৩৫-৩৬-এ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি পাঠ্যক্রম চালু হল এবং ১৯৩৬-এ ওই পাঠ্যক্রমের প্রথম পরীক্ষা হয়। ১৯৩৯-এ প্রথম ভারতীয় ডঃ এ এইচ পাণ্ডে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। ১৯৩৯-৪০-এ মেটালার্জিতে ডিগ্রি কোর্স চালু হয়। ১৯৪৩-এর এপ্রিল মাসে পাণ্ডে অন্যত্র বদলি হন।

ওই বছরই কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার জন্য সরকার পুনরায় একটি কমিটি নিয়োগ করে। সেই কমিটি সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও মেটালার্জিক্যাল কোর্স ছাড়াও জাহাজ ও এরোপ্লেন তৈরি সংক্রান্ত নূতন বিষয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করে। সেই সুপারিশে শুধুমাত্র ডিগ্রি পাঠ্যক্রমের পঠন-পাঠনের দায়িত্ব কলেজে রেখে ডিপ্লোমা ও অন্যান্য পঠন-পাঠনের দায়িত্ব ক্যালকাটা টেকনিক্যাল স্কুলকে দিতে বলা হয়। এই সুপারিশ সরকার মেনে নেয়।

এর পরে ১৯৪৫-এর ২১ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা-অধিকর্তাকে সভাপতি করে সরকার পুনরায় আরেকটি কমিটি নিয়োগ করে। বাংলার উচ্চ ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনিক্যাল শিক্ষার মানের উন্নতি সাধন সম্পর্কে সুপারিশ করাই ছিল ওই কমিটির প্রধান কর্তব্য। কমিটির রিপোর্টে ছাত্রসংখ্যা ৩০০ থেকে বৃদ্ধি করে ৫২০, পাঠ্যসূচীর উন্নতি সাধন, উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং কল-কারখানার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে বলা হয়। ১৯৪৬-এর ২৫ সেপ্টেম্বর সরকার ওই কমিটির সুপারিশও গ্রহণ করে।

কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি পশ্চিমবাংলায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। মহিলাদের মধ্যে ইলা মজুমদার এখান থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি ই ডিগ্রি লাভ করেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

শিল্পবিদ্যার প্রসারের চিন্তা-ভাবনা বেসরকারি ভাবে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়। ওই বছর মার্চ মাসে কর্নেল গুডউইনকে সভাপতি ও হজসন প্রাট এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠিত হয়। প্রধান উদ্দেশ্য চিত্রবিদ্যা, কাঠ, ধাতু, প্রস্তরাদির তক্ষনবিদ্যা সহ মাটির পুতুল তৈরি শেখানোর জন্যে একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। ১৬ অগাস্ট চিৎপুরে বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতি বছর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের শিল্পকর্মের প্রদর্শনীর আয়োজন করায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ওর আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অর্থাভাবে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েই দশ বছরের মধ্যে ১৮৬৪-এর ২৯ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটি সরকারের হাতে তুলে দেন। ১৮৫৭ নাগাদ ওই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে ফটোগ্রাফি শিক্ষার দাবি গৃহীত হয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ যুবকদের মধ্যে জাতীয় শিক্ষার চিন্তা-ভাবনা ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধতে থাকে। এ-বিষয়ে সব থেকে অগ্রগণ্য ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর 'ডন' সোসাইটির মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষার চিন্তা-ভাবনা সকলের সামনে তুলে ধরতে ব্রতী হন। ১৯০২-তে ডন সোসাইটি স্থাপিত হয় এবং ১৯০৫-এ লর্ড কার্জন বাংলা বিভাগের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। উভয় ঘটনাকেই মনি-কাঞ্চন যোগ বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার চিন্তা-ভাবনা সমতালে বৃদ্ধি পায়। কারণ বঙ্গভঙ্গ রোধ করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহু ছাত্র বেরিয়ে এসে আন্দোলনে যোগ দেয়। সরকারও ওই আন্দোলন থেকে ছাত্রদের দূরে রাখার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এরই ফলে বিখ্যাত আইনজীবী সার আশুতোষ চৌধুরী বাংলার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক সভা আহ্বান করেন এবং ১৯০৫-এব ১৬ নভেম্বর, পার্ক স্ট্রিটের বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের ভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় নূতন শিক্ষা নীতির জন্য জাতীয় শিক্ষার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। তিন সপ্তাহের মধ্যে ওই চিন্তা-ভাবনার রূপ দেওয়ার জন্য রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত সহ আরো অনেক ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করা হল। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯০৬-এর পয়লা জুন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। দেশীয় শিশু ও যুবকদের ত্রিস্তরে শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা ওই পরিষদ ঘোষণা করে।

ক· প্রাথমিক : ছয় থেকে নয় বছরের শিশুদের জন্য। সেখানে প্রাথমিক ভাবে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সহ কারিগরি শিক্ষার ধারণা দেওয়া অর্থাৎ অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়।

খ· মাধ্যমিক : নয় থেকে ষোল বছর বয়সের বালকদের উপরোক্ত বিষয়ে আরো উচ্চ স্তরে পাঠ দানের সিদ্ধান্ত হয়।

গ· কলেজীয় শিক্ষা . ষোল থেকে শুরু করে চার বছর যুবকদের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার মধ্যে যে-কোনো একটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া স্থির হয়।

ওই পর্যায়ে শিক্ষা শেষ করে দু' বছরের জন্য যুবকদের গবেষণার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তও পরিষদ একই সঙ্গে গ্রহণ করে।

এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগাস্ট ১৯১/১ বৌবাজার স্ট্রিটের ভবনে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হল। অরবিন্দ ঘোষ প্রথম এটির

অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষকদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ভিক্ষু পূর্ণানন্দ, বিনয়কুমার সরকার, ভি কে পরিঞ্জপে, বি বি রানাডে, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইন্দুমাধব মল্লিক ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রযুক্তি বিদ্যার শিক্ষার জন্য পরিষদের প্রচেষ্টায় ৯২ নং আপার সার্কুলার রোডে ১৯০৬-এর ২৫ জুলাই বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনসটিটিউট স্থাপিত হয়। বিখ্যাত ভূতাত্ত্বিক প্রমথনাথ বসু কিছুদিনের জন্য অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০৯ থেকে সর্বক্ষণের জন্য শরৎকুমার দত্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯১০-এ বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের ফলিত বিজ্ঞানের বিভাগগুলিও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। গণিত ও জীববিজ্ঞান বিভাগ দুটি কেবলমাত্র বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের সঙ্গে থেকে যায়। শিক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিষদ ১৯১০-এ সাতজন ছাত্রকে আমেরিকা পাঠায়। তাঁদের মধ্যে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানে নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অর্থনীতিতে বিনয় সরকার, রসায়নে হীরালাল রায় এবং পদার্থবিদ্যায় যতীন্দ্রনাথ শেঠ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, ফলিত রসায়নে ধীরেন্দ্রকুমার সরকার ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঔষধ প্রস্তুতকরণ বিদ্যায় সুরেন্দ্রনাথ বল মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। তারকনাথ পালিত প্রদত্ত অর্থ থেকে ১৯১১-তে উচ্চশিক্ষার জন্য হিরণকুমার গুপ্ত ভূবিদ্যায় লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স ও টেকনোলজিতে এবং জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত কেমিক্যাল টেকনোলজিতে বার্লিনের ইনসটিটিউট অব দ্য রয়েল ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন।

১৯১১-১২-তে সরকার কলকাতায় একটি প্রযুক্তি বিদ্যার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব দেন। ওই প্রস্তাবটি মূলত বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনসটিটিউটকে উপলক্ষ্য করে দেওয়া হয়েছিল। ওই বিষয়ে সদস্যদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় তারকনাথ পালিত তাঁর মাসিক চাঁদা ১৯১২-এর এপ্রিল থেকে বন্ধ করে দেন এবং ৯২ নং আপার সার্কুলার রোডের জমিটা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। তাই বিপাকে পড়ে অফিস সহ ওই বিভাগটি মানিকতলার ক্যানেল ইস্ট রোডস্থ পঞ্চবটি ভিলায় ১৯১২-এ (সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে) স্থানান্তরিত হয়।

১৯১০ থেকে ইনসটিটিউট প্রযুক্তি বিদ্যাকে দু'ভাগে ভাগ করে।

১ প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক স্তর—ছাত্রদের এই বিভাগে ড্রইংয়ে সাধারণ জ্ঞান সমেত গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ফিটিং সহ কার্পেন্ট্রি, ড্রয়িং এবং সার্ভেইংয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান দেওয়া হত।

২· দ্বিতীয় স্তর—এই শ্রেণীতে ছাত্ররা মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাইং ও ব্লিচিং, ইনডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি এবং ভূবিদ্যার মধ্য থেকে যে-কোনো একটি বিষয় বেছে নিত। সেই সঙ্গে অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইংরাজি শিখত।

এছাড়া পরিষদ ইলেকট্রিক্যাল ফিটিং ও ইলেকট্রোপ্লেটিং, ফাউণ্ড্রি প্রভৃতি বিষয়ে দু' বছরের জন্য শিক্ষানবিশি পাঠ্যক্রম চালু করে। সেই সঙ্গে সার্ভে ও ড্রাফটসম্যানশিপেও দু' বছরের শিক্ষানবিশি পাঠ্যক্রম শুরু হয়। ১৯১১ থেকে দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষার সময়কাল দু' থেকে চার বছর করা হয়। প্রতিষ্ঠানের জাতীয়তাবাদী ভূমিকার জন্য তা সরকারের সুনজরে ছিল না। তবুও সরকার প্রয়োজনে উত্তীর্ণ ছাত্রদের চাকুরি দিতে কখনো কুণ্ঠা বোধ করেনি। কারণ সে-সময়ে দেশে কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা অনেক কম ছিল। ১৯১৭-এ

কারিগরি শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের আকর্ষণ কাউন্সিল উপলব্ধি করে। সেইজন্য ভবিষ্যতের কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে একটি কমিটি নিযোগ করা হয়। সেই কমিটি কাউন্সিলকে কারিগরি ও ব্যবসা-সংক্রান্ত শিক্ষার প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে পরামর্শ দেয়। বিভিন্ন সুপারিশ অনুসারে কাউন্সিল কারিগরি শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয় এবং ছাত্রসংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায়। ১৯১০-এ ছাত্রসংখ্যা ছিল ১১৪, ১৯১৫-এ ১৫০, ১৯১৯-এ ২৪৭। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বেশি সংখ্যক ছাত্র কলেজ বয়কট করে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকতে থাকে। সেই চাপ সামলানোর জন্য ১৯২১-এব ফেব্রুয়ারি মাসে নূতন একটি শাখা খোলা হয়। ওই বছর জুলাই মাসে ভর্তির জন্য ৩০০০ জন ছাত্র আবেদন করে। কিন্তু স্থানাভাবে এবং ব্যবহাবিক শিক্ষার সুযোগ যথেষ্ট না হওযায ৪৬৭ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়। ১৯২১-এর ডিসেম্বরে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৫২। একই বছরে শিল্প সংক্রান্ত রসায়নের পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন করা হয় এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংযের পাঠ্যক্রম করে এ-দেশে পরিষদ একটি নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব মেটাতে ১৯২৪-এ কাউন্সিল তিনজন শিক্ষককে উচ্চ শিক্ষার্থে জার্মানিতে পাঠায়। ১৯২৫-এ শিক্ষাগত মানের ঔৎকর্ষের জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় নিজে থেকেই বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনসটিটিউটকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৩০ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংযে অধিকতব অগ্রসর শ্রেণীর পঠন-পাঠনের সময়সূচী পাঁচ বছর এবং অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর শ্রেণীর, বিশেষ ভাবে ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সময়সূচী তিন বছর করা হয। ১৯২৮-এ ওই প্রতিষ্ঠানের নূতন নাম 'কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, বেঙ্গল' রাখা হয়।

পড়াশুনার মান পুনর্বিবেচনার জন্য ১৯৩৯-এ আরেকটি কমিটি গঠিত হয়। এটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৪১-এ পাঠ্যসূচী পুনরায ঢেলে সাজান হল। তখন ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠের সমযসূচী কমিয়ে চার বছর এবং ভর্তির যোগ্যতা আই এস সি করা হয। ১৯৩৯-এ সরকারেব প্রতিরক্ষা বিভাগ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংযের ডিগ্রিকে এবং ডাক ও তার বিভাগ ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়েব ডিপ্লোমাকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৪৪ থেকে কাউন্সিল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতকদেব বি এম ই, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াবিংয়ের স্নাতকদের বি ই ই এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়েব স্নাতকদেব বি সি এইচ ই ডিগ্রি দানেব সিদ্ধান্ত নেয।

ইতিমধ্যে ১৯৪৫-এ সরকার এই প্রদেশের ইঞ্জিনিযারিং শিক্ষাব উন্নতি বিধানেব জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করে। ১৯৪৬-এ ওই কমিটিব সুপাবিশমত কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উন্নতির জন্য পরিষদকে সরকার আর্থিক সাহায্য দিতে অঙ্গীকার করে। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ সবকারের আর্থিক অনুদানে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সহ যাদবপুর পলিটেকনিক স্থাপিত হয এবং ১৯৫৫-তে তা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য গোপালচন্দ্র সিংহ পরিষদকে ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিলে কাউন্সিল তা মেনে নেয। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত সিংহ জমিদাবি সিণ্ডিকেটকে ১ লক্ষ ২০ হাজাব টাকাব একটি সম্পত্তি লিজ দেন। প্রতি বছর সিণ্ডিকেট পরিষদকে ৪৫০০ টাকা দেবে এইরকম একটি শর্ত ওই লিজেব মধ্যে যুক্ত ছিল। কিন্তু সিণ্ডিকেট ও গোপালচন্দ্র সিংহেব মধ্যে বিতর্ক দেখা দেওয়ায় পরিষদ ওই অঙ্ক থেকে বঞ্চিত হয়। ইতিমধ্যে সিণ্ডিকেট পরিষদকে ১৯২৫-এ ৩০০০ এবং ১৯২৬-এ ১০০০

টাকা দেয়। এই অবস্থায় ৪৫০০ টাকা পেলেও পরিষদের পক্ষে নূতন বিভাগ খোলা সম্ভব হ'ত না। তাই ১৯২৬-এ পরিষদ চুঁচুড়ার এগ্রিকালচারাল স্কুলকে একটি ট্রাকটর কেনার জন্য ১২০০ টাকা দেয়। এদিকে কৃষি শিক্ষার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য পরিষদ ২৪ পরগনার জেলা বোর্ড ও কর্পোরেশনের কাছে যাদবপুরে পরিষদের জমি সংলগ্ন ১০০ বিঘা (প্রায় ১৩·৫ হেক্টর) জমির জন্য আবেদন করে। কর্পোরেশন ১৯২৯-এ ৯২ বিঘা (প্রায় ১২·৫ হেক্টর) জমি নিরানব্বই বছরের জন্য কাউন্সিলকে লিজ দেয়। শর্ত ছিল তিন বছরের মধ্যে কৃষি শিক্ষা শুরু করতে হবে। এর ফলে ১৯৩০-এ ন'জন ছাত্র সহ কৃষি শিক্ষার জন্য একটি নিম্নতম শ্রেণী শুরু হয়। ১৯৩১-এ এর ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫। ইতিমধ্যে গোপালচন্দ্র সিংহের টাকা ঠিকমতো না পাওয়ায় বাধ্য হয়েই কাউন্সিল ১৯৩৩-এ ক্লাশটি বন্ধ করে দেয় এবং দেয় জমির অর্ধাংশ কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার কাজে লাগানোর জন্য কর্পোরেশনের অনুমতি প্রার্থনা করে। ১৯৩৫-এর মার্চ মাসের মধ্যে কৃষি শিক্ষা শুরু করতে হবে এই শর্তে কর্পোরেশন ওই প্রার্থনা মঞ্জুর করে। সেই শর্ত অনুসারে ১৯৩৫-এর জুলাই মাসে এগারো জন ছাত্র সহ পুনরায় কৃষি শিক্ষার ক্লাশ শুরু হয় এবং ১৯৩৬-এ ওই শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭। এইভাবে ১৯৫৩ পর্যন্ত ওই বিষয়ে পঠন-পাঠন চলতে থাকে। বাংলার বাইরে থেকেও সেখানে ছাত্র পড়তে আসত। কিন্তু ১৯৪২-এর যুদ্ধের জন্য সরকার ওই জমির কিছু অংশ দখল করে। এই অবস্থায় কিন্তু কৃষি শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায়নি। ১৯৪৪-এ আটজন ছাত্র শ্রেণীটিতে ভর্তি হয়। ১৯৪১-এ সরকার পরিষদকে তার দখলীকৃত জমি ফেরত দেয় এবং ১৯৪৭-৪৮-এ পরিষদ কৃষি ও পশুশালা সংক্রান্ত শিক্ষা বিষয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৫৩-তে টালিগঞ্জেও কৃষি শিক্ষা শুরু হওয়ায় কাউন্সিল নিজস্ব কৃষি শিক্ষার বিভাগটি বন্ধ করে দেয়।

তিনশো বছরের ভারতীয় ইতিহাসের পটভূমিতে কলকাতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সূচনা, বিবর্তন ও বিকাশের একটি সুস্পষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায় তিন শতকের কলকাতায়। সন্দেহ নেই, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি বা বিবর্তন পরোক্ষভাবে নির্ভর করে সেই সময়ের ইতিহাসের উপরে। ইতিহাসের পটভূমির নিরিখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ঘটনাগুলি বিচার করলে তাতে বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয়। সেই কারণেই ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সূত্রটি বর্ষানুক্রমে এখানে উপস্থাপিত করা হল। ঘটনাপঞ্জীর বিভিন্ন ঘটনা নির্বাচিত হয়েছে মূলত কলকাতা বা বাংলার উপরে দৃষ্টি রেখে।

ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জীর পাশাপাশি উপস্থাপিত হয়েছে কলকাতা-কেন্দ্রিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী। এই বর্ষানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জীতে কলকাতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সূচনা, বিবর্তন ও বিকাশের মাইল-ফলকগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী সন্নিবেশ করেছেন দিব্যেন্দু হোতা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত ঘটনাপঞ্জীর সংকলক অনীশ দেব।

—সম্পাদক

	ভারতীয় ইতিহাসের পটভূমি	কলকাতাকেন্দ্রিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা
১৬৯০	জোব চার্নকের সুতানুটিতে তৃতীয়বার পদার্পণ। ইংরাজদের ব্যবসা-কেন্দ্র হিসাবে কলকাতা শহরের সূচনা।	—
১৬৯৩	জোব চার্নকের মৃত্যু।	—
১৬৯৮	ইংরাজ কোম্পানির গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও সুতানুটি গ্রামের খাজনা আদায়ের অধিকাব অর্জন।	—
১৭১৭	ফারুকসিয়ার ফারমান : মুঘল সম্রাট ফারুকসিয়ার ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে মাত্র বাৎসরিক ৩০০০ টাকার বিনিময়ে বাংলায় কোনোরকম	—

	শুল্ক ছাড়াই বাণিজ্য করার অধিকার দেন। একই সঙ্গে ইংরাজরা কলকাতার পার্শ্ববর্তী ৩৮টি গ্রামের জমিদারি কেনার অনুমতি পা⁻।	
১৭৫২	ফরাসী ভূগোলবিদ্ ডি আনভিল কর্তৃক ভারতের প্রথম প্রামাণিক মানচিত্র প্রকাশ।	—
১৭৫৬	সিবাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা অধিকার।	—
১৭৫৭	ইংরাজদের কলকাতা পুনরুদ্ধার। পলাশীর যুদ্ধে ইংবাজদের জয়লাভ।	ইংরাজবা কলকাতার টাঁকশালে প্রথম টাকা তৈবি করে।
১৭৬৪	বকসারের যুদ্ধ : ইংরাজদের হাতে বাংলার নবাব মীরকাশিম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা ও মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়। পূর্ব ভারতে ইংরাজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।	—
১৭৬৭		সার্ভে অব ইন্ডিয়া স্থাপিত হয়।
১৭৭০	বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে খ্যাত)।	—
১৭৭৩	রেগুলেটিং অ্যাক্ট প্রণয়ন।	—
১৭৭৪	কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়।	—
১৭৭৮	হলহেড লিখলেন ইংরাজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। এই বইতে প্রথম ছাপানো বাংলা হরফ ব্যবহার করা হয়। এই বাংলা হরফ শিল্পী পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় তৈরি করে দেন চার্লস্ উইলকিন্স।	—
১৭৮০	জেম্স অগাস্টাস হিকির সাপ্তাহিক পত্রিকা বেঙ্গল গেজেট-এর আত্মপ্রকাশ। ইন্ডিয়া গেজেট প্রকাশিত।	—
১৭৮১	ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত।	—
১৭৮২	হিকির পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ ; হিকির শাস্তি।	—

১৭৮৪	হেস্টিংসের নির্দেশে সরকারি কাগজ ক্যালকাটা গেজেট প্রকাশিত। কলকাতায় অবস্থিত কোম্পানির (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) প্রেসে ছাপা প্রথম বাংলা বই জোনাথান ডানকানের 'ইম্পে কোড'-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়।	এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল স্থাপিত হয়।
১৭৯৩	চার্টার অ্যাক্ট প্রণয়ন। উইলিয়াম কেরির কলকাতায় আগমন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন।	—
১৭৯৫	হেরাসিম লেবেডেফ নামে এক রুশ পর্যটকের প্রচেষ্টায় চিনাবাজারের কাছে ডোমতলায় বেঙ্গলি থিয়েটার স্থাপিত হয় এবং বাংলায় নাটক মঞ্চস্থ হয়।	—
১৮০০	খ্রিস্টান যাজকগণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানা স্থাপন করেন।	—
১৮০১	উইলিয়াম কেরি বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন।	—
১৮১৪	রামমোহন রায় কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। লর্ড ওয়েলেসলি গঠিত টাউন ইম্প্রুভমেন্ট কমিটির পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে লটারি কমিশন গঠিত।	এশিয়াটিক সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ভারতের প্রথম জাদুঘর ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম-এর প্রতিষ্ঠা।
১৮১৭	কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত।	হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। পরে ১৯৫৫-এ এই হিন্দু কলেজ দুটি ভাগে বিভক্ত হয় : হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজ।
১৮১৮	বাংলা ভাষায় সাপ্তাহিক সমাচার দর্পন ও বাংলা মাসিক পত্রিকা দিগ্‌দর্শন প্রকাশিত। জে এস বাকিংহাম প্রকাশ করেন ক্যালকাটা জার্নাল। ভারতীয় সংবাদপত্রের উপর আইনগত বাধা-নিষেধ প্রত্যাহার।	—
১৮২০	—	উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি স্থাপন।

		ডাঃ হেনরি ওয়েস্টলি ভয়জি ভারতের আংশিক ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেন।
১৮২৩	কলকাতা সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত (১৮২৪-এর ১ জানুয়ারি কলেজ শুরু হয়)	
১৮২৫	—	ঘোড়ার গাড়ির মাধ্যমে ডাক-ব্যবস্থার প্রবর্তন।
১৮২৯	অষ্টাদশ রেগুলেশন দ্বারা সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ। ভারতীয়েরা এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হওয়ার অনুমতি পায়।	
১৮৩০	—	সার্ভে অব ইন্ডিয়া-ব ম্যাং ইনস্ট্রুমেন্টস্ অফিস স্থাপিত হয়। ঘোড়ায় টানা বাস সার্ভিসের প্রবর্তন। কলকাতা থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত তিন ঘোড়ায় টানা 'অমনিবাস'-সার্ভিস চালু হয়।
১৮৩৫	লর্ড বেন্টিঙ্কের শিক্ষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা : "The great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India; and that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone."	মেডিকেল কলেজ অব বেঙ্গল (বর্তমান মেডিক্যাল কলেজ) স্থাপিত হয়।
১৮৩৬	—	প্রথম ভারতীয় হিসাবে বৈদ্যবাটি নিবাসী মধুসূদন গুপ্তের শব-ব্যবচ্ছেদ।
১৮৩৯	—	দ্বারকানাথ ঠাকুরের আর্থিক বদান্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের চারজন বাঙালি ছাত্র—ভোলানাথ বসু, দ্বারকানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল ও সূর্যকুমাব চক্রবর্তী উচ্চশিক্ষার্থে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। উচ্চশিক্ষার্থে

		কোনো ভারতীয় ছাত্রের ইংল্যান্ড যাত্রা সেই প্রথম।
১৮৪০	—	মেডিক্যাল কলেজ অব বেঙ্গল থেকে প্রথম ভারতীয় বৈদাবাটি নিবাসী মধুসূদন গুপ্তের ডিপ্লোমা লাভ।
১৮৪৩	ব্রিটিশ ভারতে ক্রীতদাস প্রথার অবসান।	এশিয়াটিক সোসাইটি-র সংগ্রহশালার যাবতীয় মুদ্রাব প্রথম মুদ্রিত তালিকা প্রকাশ।
১৮৪৬	—	তৎকালীন গ্রেট ব্রিটেনের 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব গ্রেট ব্রিটেন' থেকে ভূতত্ত্ববিদ্ ডি এইচ উইলিয়াম্‌স ভারতে আসেন। এই প্রথম কোনো ভূতত্ত্ববিদের ভারতে পদার্পণ।
১৮৪৭-৪৮	—	টালিগঞ্জের সাহিবন বাগিচার জরিপ করে মানচিত্র তৈরি করা হয়। এটিই কলকাতার কোনো অঞ্চলের প্রথম জরিপ-মানচিত্র।
১৮৫০	—	কলকাতা-রাণীগঞ্জ রেলপথের সূচনা।
১৮৫১	কলকাতা বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত।	জনগণের জন্য টেলিগ্রাফের ব্যবহার শুরু হয়।
১৮৫৩	হিন্দু পেট্রিয়েট প্রকাশিত হয়। সম্পাদক : হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।	—
১৮৫৫	ভারতে চট শিল্পের সূচনা।	বিভিন্ন দূরত্বের জন্য একই ডাকমাশুল ধার্য করার রীতির প্রচলন। প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হয়।
১৮৫৬	—	কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত।
১৮৫৭	ব্রিটিশ বিরোধী মহাবিদ্রোহ (সিপাহি বিদ্রোহ নামে খ্যাত) বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৮৫৮	ব্রিটিশ ভারত ব্রিটিশ ক্রাউনের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান।	—

	প্যারী চাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সোমপ্রকাশ পত্রিকা প্রকাশ করেন।	
১৮৫৯	—	আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম
১৮৬১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম।	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম
১৮৬২	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশ করেন ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকা। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রকাশ করেন দি বেঙ্গলি। প্রথম এম এ ডিগ্রি প্রদান করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।	
১৮৬৪	—	কলকাতায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। আবহাওয়ার পূর্বাভাষের জন্য কলকাতায় আবহাওয়া অফিস বসানোর মিলিত দাবি জানায় সমস্ত জাহাজ কোম্পানি। এই ঘূর্ণিঝড়ে আশি হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারায়।
১৮৬৫	উড়িষ্যাতে দুর্ভিক্ষ। ইউরোপের সঙ্গে টেলিগ্রাফ যোগাযোগ স্থাপিত। নবগোপাল মিত্র দ্য ন্যাশনাল পেপার প্রকাশ করেন।	কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়। কলকাতায় ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ সংকেত ঘোষণার কাজ শুরু।
১৮৬৭	—	বর্তমান জহরলাল নেহরু রোডে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম-এর স্বতন্ত্র ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।
১৮৬৯	—	উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে কোনো ভারতীয়ের লেখা প্রথম বই 'উদ্ভিদ-বিচাব' প্রকাশিত হয়। লেখক যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়।
১৮৭২	বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত। কলকাতায় প্রথম পাবলিক স্টেজ (রঙ্গমঞ্চের)-এর প্রতিষ্ঠা। সিভিল ম্যারেজ আইন পাশ।	—
১৮৭৩	—	কলকাতায় ঘোড়ায়-টানা ট্রাম চলাচলের সূচনা। প্রথম ট্রাম ছাড়ে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে এবং তার গন্তব্য ছিল আর্মেনিয়ান ঘাট।

১৮৭৫	—	কলকাতায় ইন্ডিয়া মিটিওরলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট গঠিত হয়।
১৮৭৬	—	ভারতবাসী দ্বারা পরিচালিত প্রথম ভারতীয় গবেষণাগার ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৮৭৭	—	ভারতের প্রথম ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র মুদ্রিত হয়। মানচিত্রে ব্যবহৃত স্কেল ছিল ১ ইঞ্চি = ৬৪ মাইল। ডাক মারফৎ আবহাওয়ার পূর্বাভাষের আদান-প্রদান শুরু।
১৮৭৮	—	টেলিগ্রাফ মারফৎ আবহাওয়ার পূর্বাভাষের আদান-প্রদান শুরু।
১৮৮০	—	কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামান্তরিত হয়ে গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, হাওড়া (বর্তমান নাম বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) নামে শিবপুরে স্থাপিত হয়।
১৮৮১	—	ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাষের কাজ শুরু। কলকাতায় টেলিফোন ব্যবহারের সূচনা। ভারতবর্ষের প্রথম হোমিওপ্যাথিক কলেজ কলকাতায় স্থাপিত হয়।
১৮৮৩	—	দৈনিক আবহাওযার মুদ্রিত খবব প্রচার করার কাজ শুরু হয়।
১৮৮৫	বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন।	আচার্য জগদীশচন্দ্র কেম্‌ব্রিজ থেকে ফিরে আসেন এবং ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স-এ পদার্থবিদ্যার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয়।
১৮৮৯	—	প্রথম ভারতীয় নভশ্চর রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নারকেলডাঙার ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির মাঠ থেকে 'সিটি অব ক্যালকাটা' নামধারী বেলুনে চড়ে আকাশে পাড়ি দেন।
১৮৯০	—	বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া স্থাপিত হয়।
১৮৯৩	—	মেঘনাদ সাহার জন্ম হয়।

১৮৯৪	—	বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম হয়।
১৮৯৬	—	কলকাতায় প্রথম মোটরগাড়ির আবির্ভাব।
১৮৯৯	—	প্রিন্সেপ স্ট্রিটের (বর্তমান বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট) কাছাকাছি ইমামবাগ লেন-এ প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সূচনা।
১৯০২	—	বিদ্যুৎচালিত ট্রাম প্রথম চলে এসপ্ল্যানেড থেকে খিদিরপুর পর্যন্ত।
১৯০৫	বঙ্গভঙ্গ	কলকাতায় বেঙ্গল স্মোক পলিউশান অ্যাক্ট বলবৎ হয়। পরিকল্পনাহীন ভাবে কলকাতা ভ্রমণে এসে জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কখ-এর কলেরার জীবাণু আবিষ্কার।
১৯০৬	—	মিটার-সহ ট্যাক্সি প্রচলন শুরু হয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়। আপার সার্কুলার রোডে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌সটিটিউট স্থাপিত হয়।
১৯০৭	—	ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স-এ সার সি ভি রামনের যোগদান।
১৯০৮	ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি	—
১৯১১	বঙ্গভঙ্গ রদ। দিল্লিতে অভিষেক দরবার। টাটা আয়রন ও স্টিল কোম্পানির উৎপাদন শুরু। বাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইন্‌সটিটিউট অব সায়েন্স-এর উদ্বোধন।	—
১৯১১-১২	ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত।	
১৯১৪	—	রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার তৎকালীন রাজ্যপাল লর্ড কারমাইকেল ক্যালকাটা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন ও কারমাইকেল

		হসপিটাল ফর ট্রপিক্যাল ডিজিজেস-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
১৯১৫	—	কলকাতায় ইন্ডিয়া মিটিওরলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট-এ প্রথম ভূকম্পন যন্ত্র স্থাপন। কেমব্রিজ থেকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের প্রত্যাবর্তন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে যোগদান।
১৯১৭	—	বোস ইন্‌সটিটিউট স্থাপিত হয়।
১৯২০	—	গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, হাওড়া-এর নতুন নামকরণ হয় বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর। পরের বছর নাম থেকে 'শিবপুর' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। এর বর্তমান নাম বেঙ্গল ইঞ্জিনিযারিং কলেজ (বি ই কলেজ)।
১৯২২	রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু।	ক্যালকাটা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন (বর্তমান স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন)-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং সেখান থেকে পাশ করা প্রথম ছাত্রদলের উপাধিলাভ। প্রথম মোটর-বাস চলাচল শুরু।
১৯২৪	কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে চিত্তরঞ্জন দাশের জয়লাভ এবং তিনি কলকাতায় প্রথম ভারতীয় মেয়র নির্বাচিত।	—
১৯২৫	চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু।	—
১৯২৭	—	প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকজন তরুণ গবেষকের সাহায্যে কলেজের পদার্থবিদ্যা পরীক্ষাগারে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের স্ট্যাটিসটিক্যাল ল্যাবোরেটরি গঠন। এইভাবেই ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌সটিটিউট-এর সূত্রপাত।
১৯২৮	—	ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর গবেষণাগারে স্যার সি ভি রামনের

		রামন এফেক্ট আবিষ্কার
১৯২৯	ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ করেন। যতীন দাস চৌষট্টি দিন অনশন করার পর জেলে মৃত্যু বরণ করেন।	—
১৯৩০	—	স্যার সি ভি রামনের নোবেল পুরস্কার লাভ।
১৯৩১	হিজলি জেলে বন্দী হত্যার প্রতিবাদে কলকাতায় প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগদান এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ধিক্কার।	প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী বছরে সংস্থাটি রেজিস্ট্রিকৃত হয়।
১৯৩৪	সূর্য সেনের (মাষ্টারদা) ফাঁসি।	—
১৯৩৫	—	ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট ফর মেডিকেল রিসার্চ স্থাপিত হয়। পরবর্তিকালে এর নামকরণ করা হয় ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব বায়োকেমিস্ট্রি এনড একসপেরিমেন্টাল মেডিসিন। ১৯৮১-এর এপ্রিলে দ্বিতীয় বার নাম পরিবর্তন করে এর বর্তমান নাম ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি-এর সূচনা।
১৯৩৭	—	আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যু।
১৯৪১	অন্তরীণ অবস্থায় ব্রিটিশ সশস্ত্র প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে নেতাজীর অন্তর্ধান। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু।	—
১৯৪২	—	রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ চত্বরে সাইক্লোট্রন ভবন সম্পূর্ণ।
১৯৪৩	বাংলায় মহামন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু।	—
১৯৪৪	—	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মৃত্যু।
১৯৪৫	—	কলকাতায় রিজিওন্যাল মিটিওরলজিকাল সেন্টার স্থাপিত হয়।
১৯৪৬	—	ম্যাথমেটিক্যাল ইনসট্রুমেন্ট অফিস-এর নাম বদল করে রাখা হয় ন্যাশনাল ইনসট্রুমেন্টস ফ্যাক্টরি। ১৯৫৭-এ আধুনিক নাম ন্যাশনাল ইনসট্রুমেন্টস লিমিটেড-এর সূচনা।

১৯৪৭	ভারতের স্বাধীনতা লাভ। কলকাতা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী।	
১৯৪৮	হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জন্য কলকাতায় মহাত্মা গান্ধীর শেষ অনশন।	ইন্‌সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌স-এর স্বতন্ত্র ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। অধ্যাপক বি ডি নাগচৌধুবির তত্ত্বাবধানে বিদেশি যন্ত্রাংশের সাহায্যে ভারতে প্রথম সাইক্লোট্রন তৈরির কাজ শুরু হয়।
১৯৫০	—	নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী মাদাম জোলিও-কুরি চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ইন্‌সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌স-এর নূতন ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মাদাম জোলিও-কুরি। সেন্ট্রাল গ্লাস এন্‌ড্‌ সিরামিক রিসার্চ ইন্‌সটিটিউট স্থাপিত হয়। প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসক আর আমেদের উদ্যোগে ক্যালকাটা ডেন্টাল কলেজ স্থাপিত হয়।
১৯৫৫	—	জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৫৬	—	মেঘনাদ সাহার মৃত্যু হয়।
১৯৫৭	—	চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের একটি অংশে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার স্থাপিত।
১৯৫৮	—	মেঘনাদ সাহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ইনসটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এর নূতন নামকরণ করা হয় সাহা ইন্‌সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌স।
১৯৭৪	—	বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যু হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

কলকাতার মাটি

A. B. Dasgupta, 1986. Some Problems Related to the Geology of Bengal. Assam Basin. Quart. Jour. Geol. Min. Met. Soc. Ind. V. 58, No. 3.

A. K. Roy and K. N Prasad, 1957. Some Geohydrological Observations on a Deep Tubewell at South Sinthi, Calcutta. Proc. Ind. Sci. Congress (49th session).

A. K. Saha and A. B. Biswas, 1989. Calcutta's Groundwater. Autumn Annual, Presidency College Alumni Assoc. V. XVI, 1987-88.

A. L. Coulson, 1940. Geology and Underground water of Calcutta, Bengal with special reference to tubewells. Mem. Geol. Surv. Ind. V. 76, S/R/T paper No. 1.

B. Biswas, 1959. Subsurface Geology of West Bengal, India. Proc. Symp. on the Development of Petroleum Resources of Asia and the Far East. Min. Resources Dev. Series No. 10, U. N.

Director General, Geological Survey of India, 1974. Geology and Mineral Resources of the States of India . West Bengal. G. S. I. Misc. Pub. No. 30, Pt. 1.

G. C. Chatterjee ; A. B. Biswas , S Basu and B. N. Niyogi, 1964. Geology and Groundwater Resources of the Greater Calcutta Industrial Area, W. Bengal ; Bull. Geol. Surv. Ind. Series B, No. 21.

J. Ferguson, 1863. On the Recent Changes in the Delta of the Ganges. Quart. Jour. Geol. Soc. (London). V. 17, pp. 321-354.

J. P. Morgan and W. G. Mc. Intyre, 1959. Quaternary Geology of the Bengal Basin, East Pakistan and India. Bull. Geol. Soc. Amer. V. 70, March, pp. 319-341.

L. N. Kailasam, 1959. Thickness of the Gangetic Alluvium Near Calcutta as Deduced from Reflection Seismic measurement. Curr. Science. V. 23, No. 4, pp. 113-114.

M. Banerjee and P. K. Sen, 1986. Late Holocene Organic Remains from Calcutta Peat. Proc. XI Ind. Colloquium on Micropalaeontology and Stratigraphy. Bull. Geol. Min. Met. Soc. Ind. V. 54, pp. 272-284.

N. C. Barui ; S. Chanda and K. Bhattacharya, 1986. Late

Quaternary Vegetational History of the Bengal Basin. Proc. Ind. Colloquium on Micropalaeontology and Stratigraphy. Bull. Geol. Min. Met. Soc. Ind. V. 54, pp. 197-201.

N. C. Bose, 1940. Tubewells in and around Calcutta. Mem. Geol. Surv. Ind. V. 76, W. S. paper, No. 2.

S. C. Mazumdar, 1942. Rivers of the Bengal Delta. Calcutta Univ. Press, Calcutta.

S. P. Roychoudhuri ; R. R. Agarwal ; N. R. Datta Biswas, S. P. Gupta and P. K. Thomas, 1963. Soils of India. Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

কলকাতার গাছ

A. P. Benthal, 1946. The Trees of Calcutta and its Neighbourhood. Thacker Spink & Co. Ltd., Calcutta.

B. P. Pal, 1972. Beautiful Climbers of India. ICAR, New Delhi.

H. C. Gangulee, 1970. The Need of District Records of Indian Mosses and the Moss Flora of Some Eastern Indian Districts. Bull. Botan. Soc. Bengal, V. 24, pp. 5-29.

I. H. Burkill, 1965. Chapters on the History of Botany in India. Botanical Survey of India, Calcutta.

K. Biswas, 1950. Study of the Flora of South Calcutta with Special Reference to the Flora of the University College of Science Compound, Ballygunge, Calcutta. Bot. Soc. Bengal, Spl. Pub. No. 1, pp. 1 - 40.

Manju Banerjee and P. K. Sen, 1986 a.Late Holocene Organic Remains from Calcutta Peat. Proc.XI Ind. Colloquium on Micropalaeontology and Stratigraphy. Bull.Geol. Min. Met. Soc. India. V. 54, pp. 272-284.

N. C. Barui, S. Chanda and K. Bhattacharya, 1986. Late Quaternary Vegetational History of the Bengal Basin. Proc. XI Ind. Colloquium on Micropalaeontology and Stratigraphy. Bull. Geol. Min. Met. Soc. India. V. 54, pp 197-201

N. D. Paria, 1978. A Contribution to the Flora of Ballygunge Science College Campus. Bull. Botan. Soc. Bengal. V. 31, pp. 62-73.

P. K. Sen and Manju Banerjee, 1988. Palaeoenvironment of Bengal Basin during the Holocene Period. Geog. Rev. India. V. 50(4), pp. 21-38.

R. K. Chakraverty and S. K. Jain, 1984. Beautiful Trees and Shrubs of Calcutta. Botanical Survey of India, IBG, Howrah.

Sandhya Raha, 1987. Plants of Calcutta's Gardens and Parks. Ph. D. Thesis, University of Calcutta (Supervisor: Prof. S.C. Datta), Unpublished.

S. C. Datta and N. C. Majumdar, 1966. Flora of Calcutta and Vicinity. Bull. Bot. Soc. Bengal. V. 20(2), pp. 16-120.

S. N. Banerjee, 1947. Fungous Flora of Calcutta and Suburbs. I.

Bull. Bot. Soc. Bengal. V. 1, pp. 37-54.
Stirling Macoboy, 1976. What Indoor Plant is that ? Hertfordshire, Engalnd.

এম এস রণধাবা, ১৯৬৫। পুষ্প-বৃক্ষ। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।

পূর্ণেন্দু পত্রী, ১৯৮২। জোব চার্ণক : পুরনো কলকাতার কথাচিত্র। দেজ পাবলিশিং।

সুকুমার সেন, ১৩৮৯। 'শব্দ বিদ্যার আঁচড়ে কলকাতার স্কেলিটন' · অচেনা এই কলকাতা—রমাপ্রসাদ চৌধুরী সম্পাদিত। সংবাদ প্রকাশন।

কলকাতার পাখি

Frank Finn, 1904. Birds of Calcutta. Thacker Spink & Co. Ltd., Calcutta.
I. U. C. N. Report, 1971.
Naturalist (V.I), 1984. Prakriti Samsad.
Salim Ali, 1941. Book of Indian Birds, Bombay Natural History Society.

অজয় হোম ১৩৮০। বাংলার পাখি। প্রীতি প্রকাশনী।

সত্যচরণ লাহা, ১৩৩৫। ডালচারী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড্ সন্স।

সালিম আলি/ লাইক ফতেহ্ আলি (অনুঃ)১৯৭৫। সাধারণ পাখি। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।

কলকাতার প্রাণিজগৎ

A.K. Mandal & A.K. Ghosh, 1989. Sundarban—a Socio-Biological Study. Bookland Pvt.Ltd.
A.K. Mukherjee, 1982. Endangered Animals of India. Zoological Survey of India.
A.K. Ray, 1902. A Short History of Calcutta: Town and Suburbs. Riddhi, India.
Frank Finn, 1929. Sterndale's Mammalia of India. Thacker Spink and Co. Ltd.
G.T. Tonapi, 1980. Fresh Water Animals of India, an ecological approach. Oxford and I.B.H.
H.E.A. Cotton, 1909. Calcutta: Old and New. General.
J.C. Daniel, 1983. The Book of Indian reptiles. Bombay Natural History Society.
J.J. Spillett, 1966. Population Studies of the Lesser Bandicoot Rats in Calcutta. Proc. Ind. Rodent Symp., Calcutta: 84-92.
J. Stidworthy, 1977. Encyclopedia of the Animal World, V. 15: 1349-55. Bay Books Pvt. Ltd.
K.C. Jayaram, 1981. The Freshwater Fishes of India, Pakistan, Bangladesh, Burma and Sri Lanka—a Handbook. Zoological Survey of India.
K.G. Gharpurey, 1962. Snakes of India and Pakistan. Popular Prakashan.

Malcom A. Smith, 1932. Some notes on the Monitor Lizards. J. Bomb. Nat. Hist. Soc. [in 'A Century of National History', 1983]

P.D. Gupta, 1986. The Gangetic Dolphin Platanista gangetica. Wild Life Wealth of India. Jec Press Service.

Peter D. Moore, 1986. Collins. Encyclopedia of Animal Ecology. Collins.

P. Sanyal, 1981. Sunderbans Tiger Reserve—an overview—'Cheetal' V. 23.2 pp. 5-8.

Rambramha Sanyal, 1892. A Hand Book of the Management of Animals in Captivity in Lower Bengal. Published under the Authority of the Committee for the management of the Zoological Garden, Calcutta.

Roger Tory Peterson, 1967. The Birds. Time-Life Books.

S.H. Prater, 1971. The Book of Indian Animals. Bombay Natural History Society.

1962. The Wealth of India: Raw materials. V. IV, Supplement. Fish and Fisheries; C.S.I.R.

100 years of Calcutta Zoo (1875-1975). The Centenary Celebration Committee, Zoological Garden, Alipore, Calcutta.

নিশীথরঞ্জন রায় ও অশোক উপাধ্যায়, ১৯৮৬ (১৩৯৩)। প্রাচীন কলিকাতা। সাহিত্যালোক।

নিশীথরঞ্জন রায় ও সুনীল দাস (সম্পাঃ), ১৯৮৯। পুরনো কলকাতার কথা। জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স।

পি. তঙ্কপ্পন নায়র, ১৯৮৪। কলকাতার সৃষ্টি ও জব চার্নক। এম এল দে এনড্ কোং।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩২ (১৩৩৯)। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৭৫। কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা। দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, ১৯৮৯। মাছ আর বাঙালী। আনন্দ পাবলিশার্স।

শচীন্দ্রনাথ মিত্র, ১৯৫৭। বাঙলার শিকার-প্রাণী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী, ১৯৮৯। কলকাতার মাটি খুঁড়ে। দেশ বিনোদন, ২০৩-২০৮।

সুবলচন্দ্র মিত্র (অনুঃ), ১৯৮৯। কলিকাতার ইতিহাস (The early History and Growth of Calcutta by Raja Benoy Krishna Deb Bahadur, 1908)। জে এন চক্রবর্তী এনড কোং।

স্বপনকুমার দাস, ১৯৮৯। জীববিদের চোখে কলকাতার সেকাল একাল : শারদীয়া যুবমানস, ২১০-২১২।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, ১৯১৫। কলিকাতা সেকালের ও একালের। পি এম বাগচি এনড্ কোং।

কলকাতার মানুষ ও সমাজ

Anjana Roychaudhuri, 1964 Caste and Occupation in Bhowanipur, Calcutta. Man in India V. 44, No 3, pp. 211-214.

Asok Mitra, 1963. Calcutta India's City. New Age.
Benoy Krishna Deb, 1977. The Early History and Growth of Calcutta. Edited by Subir Roychaudhury. Riddhi.
Biren Roy, 1982. Marshes to Metropolis Calcutta (1481-1981). Calcutta National Council of Education.
CENSUS OF INDIA, 1901, 1911, 1931, 1941, 1951, 1961.
James Long, 1974. Calcutta and its Neighbourhood—History of People and Localities from 1690 to 1857. Edited by Sankar Sengupta. Indian Publication.
M.K.A. Siddique, 1974. Muslims of Calcutta . a Study in Aspects of Their Social Organization. Anthropological Survey of India.
Murari Ghosh, 1983. Metropolitan Calcutta—Economics of Growth. O.P.S. Publishers.
Nirmal Kumar Bose, 1966. Calcutta: a Premature Metropolis. Scientific American. V. 213, No.3, pp. 90-102.
Nirmal Kumar Bose, 1967. 'Social and Cultural Life of Calcutta', in Culture and Society in India. Edited by P.K. Bhowmick. pp. 11-16. Puthi Pustak.
N. R. Ray, 1979. The City of Job Charnock. Calcutta : Victoria Memorial.
Prabodh Chandra Bagchi, 1939. Calcutta : Past and Present. Calcutta University.
Pradip Sinha, 1978. Calcutta in Urban History. Firma K. L. Mukhopadhyay Pvt. Ltd
Sivaprasad Samaddar, 1978. Calcutta is Calcutta. Corporation of Calcutta.

কলকাতার স্থাপত্য

A. C. Roy (?) Calcutta & Envir n. Lake Publishers.
Annual of Architecture, Structure and Town Planning. V.I (1960), V. III (1962), V. IV (1963), V. V (1964-65). Suramit.
B. E. College, 1956. Centenary Souvenir. Centenary Celebration Committee.
C. M. P. O., 1965. Calcutta's Problems : Calcutta's Future.
Maxwell Fry & Jane Drew, 1964. Tropical Architecture, B. T. Batsford Ltd., London.
Nemai Sadhan Bose, 1975. Calcutta : People and Empire. India Book Exchange.
P. Thomas, 1969. Churches in India. Publication Division, Govt. of India.
Ranabir Ray Choudhury, 1978. Glimpses of Old Calcutta. Nachiketa Publications Ltd., Bombay.
Rabindranath Tagore, 1948 My Boyhood Days. Visva-Bharati (2nd Ed. 5th Reprint)
S. N. Sen (Ed.), 1952. Calcutta. Indian Science Congress Association.

কালপেঁচা, ১৩৬০। কলকাতার কালচার। বিহার সাহিত্য ভবন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৫৪। ছেলেবেলা। বিশ্বভারতী।
রাধারমণ মিত্র, ১৯৮০। কলিকাতা দর্পণ। সুবর্ণরেখা।
শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৯৫৭। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৬। ঠাকুরবাড়ির কথা। সাহিত্য সংসদ।

কলকাতার সংগ্রহশালা

A Brief Guide to Victoria Memorial : Calcutta, 1986.
Asutosh Museum of Indian Art : An Introduction, 1969. University of Calcutta, Calcutta.
Birla Industrial & Technological Museum : Guide Book, Calcutta.
Centenary Review of the Asiatic Society (1784-1884), 1986. The Asiatic Society, Calcutta.
General Guide Book : Indian Museum, 1989. Calcutta.
Gurusaday Museum : Silver Jubilee Year (1963-1988), 1988. Calcutta.
Indian Museum, 1989. Calcutta : A Journey through 175 years, Calcutta.
Smita J. Baxi & P. Dwivedi, 1973. Modern Museum : Organisation and Practice in India, Abhinav, New Delhi.
The Asiatic Society : Bicentenary Souvenir (1784-1984), 1984. Calcutta.
পরিষদের অপহৃত বিষ্ণুমূর্তির পুনরুদ্ধার, পরিষৎ মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ১৯৭৫। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুস্তিকা, কলকাতা।
প্রাণিতত্ত্ব বীথিকা নির্দেশিকা : ভারতীয় সংগ্রহশালা, ১৯৬৭। কলকাতা।
ভারতকোষ · বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা।
ভারতীয় সংগ্রহশালা নৃতত্ত্ব বিভাগ প্রকোষ্ঠ : সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা, ১৯৬৩। কলকাতা।
ভারতীয় সংগ্রহশালার ব্যবহারিক উদ্ভিদ বিভাগের সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা, ১৯৬৩। কলকাতা।
ভূতত্ত্ব বীথিকা নির্দেশিকা. ভারতীয় সংগ্রহশালা, ১৯৬৬।
শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী, ১৯৮৩। যাচ্ছো কোথায় যাদুঘরে। ফেয়ার বুক্‌স।
সাহিত্য পরিষৎ সংখ্যা · বেতার জগৎ, ১৬-৩১ আগস্ট, ১৯৮৫।

কলকাতার যানবাহন

B. F. Solvyns, 1799. A Collection of One Hundred and Fifty Coloured Etchings. Calcutta.
C. M. D. A. Calcutta. Past, Present, Future.
C. M. D. A. (leaflet). Traffic and Transportation of Calcutta.
C. M. P. O. Plans for Rapid Transit system for Calcutta.
C. M. P. O. Traffic and Transportation Plan, 1966-1986.
C. T. C. (A typed script), 1980. A Short History of the Undertaking of the Calcutta Tramways Company Ltd.

Fanny Parks, Wanderings of a Pilgrim.
H. E. A. Cotton, 1980. Calcutta Old and New. General Printers.
Metro Railway, Building the Metro Railway at Calcutta. Metro Railway Publication.
Metro Railway, Rapid Transit system for Calcutta.
N. R. Roy (abstract of a paper presented at the seminar on Traffic and Transport of Calcutta, May 7, 1977. Transport of Calcutta : Its Past. Organised by C. M. D. A.and B. I. T. M.
R. D. Kitson, Aug. 24, 1989. Eastern Railway and the City. Eastern Railway Press Release.
Tramways & Railways World, June 1905. Tram system in Calcutta.
W. H. Carey. 1906-07. The Good Old Days of John Company. R. Cambrey & co.
100 years of Calcutta Tramways. Folder Published During the Exhibition at B.I.T.M, May 2, 1981.
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৩৭ । কলিকাতায় চলাফেরা, সেকালে আর একালে ।
নিখিলেশ মিত্র, ১৯৮৮ । সেকালের কলকাতার সেকেলে বাহন : বিশেষ কলকাতা সংখ্যা, আবর্ত ।
রাধারমণ মিত্র, ১৯৮০ : কলিকাতা-দর্পণ । সুবর্ণরেখা ।

কলকাতার বাতি-ব্যবস্থা

G. S. Brady and H. R. Clauser, 1977 Materials Hand Book, McGraw-Hill Book Co., New York.
Indian Standard Code of Practice for Lighting of Public Thoroughfares · IS-1944 (Parts I & II), First revision, 1970. Indian Standards Institution
Ibid. Part IV, 1981.
J. E Kaufman, (Ed.), 1972. IES Lighting Handbook. Illuminating Engineering Society, New York.
P Moon, 1961 The Scientific Basis of Illuminating Engineering. Dover Publications Inc., New York.
P. Thankappan Nair, 1989. Calcutta Municipal Corporation at a Glance. The Calcutta Municipal Corporation, Calcutta, 1989.
S. W. Goode, 1916. Municipal Calcutta. Corporation of Calcutta, Edinburgh.
Story of Electricity in the City of Calcutta, 1983. The Calcutta Electric Supply Corporation (India) Ltd.

কলকাতার শিল্পায়ন

Amitabha Ghosh, 1975. Introduction of Steamboats in India. Bulletin of the Victoria Memorial. V. II.
Blair B. Kling, 1981. Partner in Empire. Firma K. L. M. Pvt. Ltd.
D. R. Wallace, 1928. The Romance of Jute. W. Thacker and Company.

Economic Review, (1988—89). 1989. Government of West Bengal.
Economic Review, (1988—89). 1989. Statistical Appendix, Govt. of West Bengal.
Evan Colton, 1933. A Famous Calcutta Firm. V. 46. Bengal Past and Present.
Exhibition Tramways (Hundred Years of Calcutta Tramways). 2-17 May, 1981. Birla Industrial & Technological Museum.
H. E. A. Cotton, 1980 (Reprint). Calcutta Old and New. General Printers.
Henry T. Bernstein, 1960. Steamboats on the Ganges. Orient Longmans.
Indian Science Congress Association, 1938. The Second City of the Empire. Calcutta.
Jessop and Company, 1936. General Catalogue.
Memoirs of William Hicky (1775-1782), 1918. V. 2. London.
Prafullachandra Ray, 1932. Life and Experiences of a Bengali Chemist. Chakravarty Chatterje & Co..
Reginald C. Sterndale, 1959. An Account of the Calcutta Collectorate. Government Press.
Story of Electricity in the City of Calcutta, 1983. The Calcutta Electric Supply Corporation (India) Ltd.
Sumit Sarkar. 1973. Swadeshi movement in Bengal. People's Publishing House.
S. W. Goode, 1916. The Municipal Calcutta. Edinburgh.
রাধারমন মিত্র, ১৯৮০। কলিকাতা-দর্পণ। সুবর্ণরেখা।
সিদ্ধার্থ ঘোষ, ১৯৮৮। কারিগরি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ। দে'জ পাবলিশিং
সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৮১। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

কলকাতার পরিবেশ ও দূষণ

A. K. Saha, 16 June, 1986. Current status of Air-Pollution in West Bengal : West Bengal , pp. 219-225.
A.K. Saha and A. B Biswas. Calcutta's Ground Water ; Autumn Annual 1987-88. Presidency College Alumni Association Calcutta.
Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution, 1982. Comprehensive Pollution Survey & Studies of Ganga River Basin in West Bengal (June 1980—December 1981), prepared by Centre for study of Man & Environment.
Central Labour Institute, 1984. Data on noise-pollution collected by Mr. Mazumdar Calcutta.
D. Chakraborti and B. Raeymaekers. Calcutta Pollutants : Part III. Toxic Metals in Dust, and Characterisation of Individual Aerosol Particles : Intern. J. Environ. Anal. Chem. V. 32, pp. 121-133.

D. Chakraborti, D. Ghosh, S. Niyogi, 1987. Calcutta Pollutants : Part I : Appraisal of some Heavy Metals in Calcutta City Sewage and Sludge in Use for Fisheries and Agriculture : Intern. J. Environ. Anal Chem. V. 30, pp. 243-253.
D. Chakraborti, L. Van Vaeck and P. Van Espen. Calcutta Pollutants : Part II. Polynuclear Aromatic Hydrocarbon and Some Metal Concentration on Air Particulates During Winter 1984 . Intern J. Environ. Anal. Chem. V. 32 pp. 109-120.
S. P. Das Gupta, 1984. Basin Sub-basin inventory of Water Pollution : The Ganga Basin, Part II. Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution.
Subrata Sinha, June-July 1988. Calcutta : Problems of Growth-viable solutions. Sci-Tech Focus. pp. 13-16.
Sunilkumar Munsi, June-July 1988. Calcutta : Problems of Land-Use. Sci-Tech Focus pp. 7-11.

কলকাতার গবেষণাগার

About Us. National Instruments Limited
A Decade in Retrospect, 1976. Indian Institute of Experimental Medicine.
A. K. Bhattacharya, 1989. Calcutta School of Tropical Medicine. The National Medical Journal of India, V.2, No 1.
A Profile of Current Research, 1974. Calcutta School of Tropical Medicine.
Birth Centenary of C. V. Raman and International Conference on Raman spectroscopy, 1988. Calcutta as a Centre of Education Research and Culture Indian Association for the Cultivation of Science.
Calcutta School of Tropical Medicine, Science & Culture V. 28, pp. 312-319. July, 1962.
CSIR News, 1989. V. 39, No. 12 & 14.
Geology in the Service of the Nation, 1972. Geological Survey of India.
Golden Jubilee (1931-1981). Indian Statistical Institute.
Hundred Years of Indian Association for the Cultivation of Science, 1976. Indian Association for the Cultivation of Science.
Indian Institute for Biochemistry and Experimental Medicine.
Jagadish Chandra Birth Centenary Celebration Addresses and Twentieth Memorial Lecture, 1958. Bose Institute.
Meteorological Radar for Cyclone Detection and Warning, 1970. India Meteorological Department.
News (V. 19, Nos. 2-3), 1988. Geological Survey of India.
News letter, V. 1, Nos. 2 & 3, 1988. Central Glass & Ceramic Research Institute.

Prasantachandra Mahalanobis. Indian Statistical Institute. (Golden Jubilee Publication).
Reserch Activities, 1988. Indian Association for the Cultivation of Science.
Silver Jubilee Publication, 1970. India Meteorological Department, Regional Meteorological Centre.
Speeches by Prime Minister Jawaharlal Nehru (Golden Jubilee Publication), 1981. Indian Statistical Institute.
Sukhamoy Chakravarty, 1983. Mahalanobis and Contemporary Indian Planning. Indian Statistical Institute.
Technical Information. Central Glass & Ceramic Research Institute.
25 Years of CGCRI. Central Glass & Ceremic Research Institute.
30 Years of Saha Institute of Nuclear Physics, 1981. Saha Institute of Nuclear Physics.
150th birth day celebration of Dr. Mahendralal Sircar, 1985. Indian Association for the Cultivation of Science.

কলকাতায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা

A Bengal Civilian, 1883. Agricultural and Administrative Reform in Bengal. London.
Agricultural and Horticultural Society of India, 1837. Transactions, V. 1, Calcutta.
ibid 1844. V. 3, 1845. V. 4, 1848. V. 6, 1849. V. 7, 1867. V. 14, Journal. Calcutta.
Appendix to the Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Company dt. 16, August 1832 & Minutes and Evidence, 1833. V. 1. London.
Centenary Souvenir. 1956. Bengal Engineering College. Calcutta.
Charles Lussington, 1824. The History. Design, and Present State of the Religious Benevolent and Charitable Institutions Founded by the British in Calcutta and its Vicinity. Calcutta.
Centenary of Medical college, Bengal, 1835-1934. 1935. Calcutta.
Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal, 1784-1884. 1986 (Reprint). Calcutta.
General Report on Public Instruction in Bengal, 1863-64, 1865-66, 1893-94. Calcutta.
Hundred Years of the University of Calcutta, 1957. University of Calcutta. Calcutta.
ibid 1957. Supplement Volume. University of Calcutta. Calcutta.
Indian Agricultural Review, 1885. V. 2. Calcutta.
Indian Journal of Medical Science, 1835. V. 2. Calcutta.
Indian Medical Gazette, 1873 & 1894. Calcutta.
James Harrison, 1857. The Origin and Progress of the Bengal Medical College. Calcutta.
James Long (Revd.), 1854. Vernacular Education in Bengal.

Calcutta Review. V. 22. Calcutta.

John Clark Marshman, 1859. The Life and Times of Carey Marshman and Ward. V. 2. London.

Liberality of the Indian Government towards the Native Medical Institution of Bengal, 1826. The Oriental Herald. V. 10.

Presidency College, Calcutta. 1956. Centenary Volume, 1955. Calcutta.

Report of the Fever Hospital Committee, 1838 Calcutta.

Richard Temple, 1854. The Agricultural and Horticultural Society of India. Calcutta Review. V. 22. Calcutta.

Rules and Regulations of the Bengal Medical College, 1844. Calcutta.

Sibdas Chowdhury, 1956. Index to the Publications of the Asiatic Society, 1788-1953. 1956. Calcutta.

The Calcutta Gazette, 1792, 30 August, 1794, 14 August. Calcutta.

The Friend of India, 1841, November. Serampore.

The National Council of Education, Bengal, 1957 A History and Homage. Calcutta

William Adam, 1838. Third Report of the State of Education in Bengal. Calcutta.

William Ward, 1818. A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos ; 2nd. ed., V 1. Serampore.

W. C. B. Eatwell, 1860. On the Rise and Progress of Rational Medical Education in Bengal. Calcutta.

চিকিৎসা সম্মেলনী, (৬ খণ্ড) ১২৯৬। কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল। কলিকাতা।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ১৩৪১ : সংস্কৃত কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ, প্রবর্তক, ১৯ বর্ষ, ২ খণ্ড, ৪ সংখ্যা, পৃ. ৩৫৩-৩৬৭ : কলিকাতা।

বিনয়ভূষণ রায়, ১৯৮৭। উনিশ শতকের বাংলায় বিজ্ঞান সাধনা। সুবর্ণরেখা।

ভারতবর্ষীয় কৃষি বিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ, ১ বালম। ১৮৫৭। কলিকাতা।

যোগেশচন্দ্র বাগল, ১৩৬৬। কলকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র। কলকাতা।

তদেব, ১৯৫৮। বাংলার নব্য সংস্কৃতি। কলকাতা।

সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫২, ১৮৫৪। কলকাতা।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ১৮৫২। কলকাতা।

সমাচার দর্পণ। ১৮২০, ২০ জুলাই। কৃষি কর্মাদি বিষয়ে নিযুক্ত হওনের সংবাদ। শ্রীরামপুর।

সম্বাদ ভাস্কর। ১৮৫৪। কলকাতা।

হিন্দুস্থানের ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষি সমাজের কৃত কর্মের বিবরণ পুস্তক, ১ বালম। ১৮৩১। শ্রীরামপুর।

নির্দেশিকা

অকল্যান্ড, জর্জ ১৯৬
অকল্যান্ড, লর্ড ১১৩, ২৫৬
অকল্যান্ড সার্কাস ১১৩
অক্টাবলোনি, ডেভিড ১১৪, ১১৬
অক্টারলোনি মনুমেন্ট ১১৫, ১১৯
অক্ষয়কুমার ধর ১৯৫
অঘোরনাথ দত্ত ৭২
অটো হান ২৪৩
অতুল বসু ১২৮
অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য ২৬৭
অনুকূলচন্দ্র মিত্র ২৬৬
অবলা বসু ২৩৪
'অমনিবাস' সার্ভিস ১৪৬, ১৪৮
অমরনাথ দাস ২৬৬
অমলেন্দু বসু ১৩৭
অমূল্য উকিল ১৯০
অমূল্যচরণ বসু ১৮৯
অমৃতলাল সরকার ২৩২
অম্বিকাচরণ চৌধুরী ২৬৬
অম্বিকা মন্দির ১১৮
অয়েল এনড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন ৯
অয়েল পাম ২৩
অরবিন্দ ঘোষ ২৬৮-৬৯
অরুণকুমার শর্মা ২৪৮
অর্জুন ২৫
অর্জুন জ্যোতি ৩১
অর্ডোভিসিয়ান যুগ ১৮
অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব পাবলিক হেল্থ ২৫৮
অলিগো-মায়োসিন যুগ ৩
অলিগোসিন যুগ ৯, ১৮
অলিগোসিন-মায়োসিন যুগ ৮
অশোক ২৫
অশোক সেন ১৯১
'অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' ১২৮
আ্যাংলো ইন্ডিয়ান ডোমেস্টিক লাইফ ১৮৪
অ্যাডানসোনিয়া ২৬
অ্যাডাম, জন ২৫৮
অ্যান্টিগোনন ৩৫
অ্যানভিল, ডি ২২২
অ্যাবারকোম্বি (লেফটেন্যান্ট) ১৬০
আইন-ই-আকবরী ১৩৫
আইস হাউস ১১২
আওরংজেব ১১৫
আকাশ নিম ২৬
আকাশমণি ২৬
আজিমুশ্বান ১১৫
আটঘুড়ি ১৪৫
আত্মারাম ২৪২
আনন্দমোহন বসু ২৬৫
আবহাওয়া অফিস ২৪০
আবুল ফজল ১৩৫
আমহার্স্টিয়া ২৬
আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ২৫৭
আর আমেদ ২৬৫
আর এন সেন ১৯৩
আর টি ভট্টাচার্য ১৯৫
আর্কিয়ান অধিযুগ ৩, ৫, ১৮
আর্কিয়ান-প্রোটারোজয়িক অধিযুগ ৪
আর্চবোল্ড, ই সি ১৩০
আর্ট-গ্যালারি ১২৮
আর্মেনিয়ান গির্জা ১১২
আর্মেনীয় ৯২, ৯৪, ৯৭, ৯৮, ১০১, ১০৪
আর্য ফ্যাক্টরি ১৯৪
আশুতোষ গুহঠাকুরতা ২৩৫
আশুতোষ চৌধুরী ২৬৮
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১২০, ১২৮, ১৩৪, ২২১, ২৩০, ২৪১, ২৬১-৬২, ২৬৪
আসগর মণ্ডল ১৮৯

ইংলিশম্যান (পত্রিকা) ১৬০, ২৩৫
ইউ এন ব্যানার্জী এনড কোং ১৯১
ইউ এন ব্রহ্মচারী ২৬৩
ইউনাইটেড বেঙ্গল হোসিয়ারি ১৯৫
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (শিবপুর) ১৮৬
ইডেন, এমিলি ১১৩
ইডেন গার্ডেনস ১১৩, ১৬২
ইড্স্, এডওয়ার্ড ১৪৩
ইন্দর চন্দর সিং ২৩০
ইন্দুমাধব মল্লিক ২৬৯
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪
ইন্ডিয়ান ইনডাস্ট্রিয়াল এসোসিয়েশন ১৯৩
ইন্ডিয়ান ইনডাস্ট্রিয়াল কমিশন ২৪১
ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব একসপেরিমেন্টাল মেডিসিন ২৩৮
ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি ২২১, ২৩৭-৩৮
ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব বায়োকেমিস্ট্রি এনড্ এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন ২৩৮
ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চ ২৩৭-৩৮
ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স (বাঙ্গালোর) ২৩২, ২৬৩
ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য

কালটিভেশন অব সায়েন্স ·২২১, ২২৮-২৯, ২৩১-৩৩
ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি ২৪১, ২৬২
ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস ১৯৫
ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি ২৪১
ইন্ডিয়ান মিসেলেনি ২৫১
ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট ২৫৮
ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড ২৫৮
ইন্ডিযান ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ১৯৫
ইন্ডিয়ান লাইম জুস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং ১৯৫
ইন্ডিযান সাগো পাম ২৩
ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস এসোসিয়েশন ১৯৪-৯৫, ২৪১
ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউট ২২১, ২৩৬
ইন্ডিযান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউট অ্যাক্ট ২৩৭
ইন্ডিযান স্ট্যান্ডার্ডস ইনসটিটিউসন ১৬৮
ইন্দিরা গান্ধী ১৫০
ইনসটিটিউট অব চাইল্ড হেলথ ২৫৮
ইনসটিটিউট অব জুট টেকনোলজি ২৬৫
ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস ২৪৪
ইপ্রেস টাউন হল ১১৪
ইম্পিরিযাল মিউজিযাম ১১২, ১২৭
ইম্পিরিয়াল রিপোর্টরি ২৪০
ইয়ং, ডবল্যু এইচ ২৬৩
ইয়ং বেঙ্গল ২২৮
ইয়েলো এলডার ২৭
ইয়োসিন যুগ ৩, ৮, ১৮
ইরাবর্দি ১৮৩
এরিয়েল ১৮২
এলিস গুইনিনসিস ২৩
ইলাবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৩
ইলা মজুমদার ২৬৭
ইলিয়ট, জন ২৪০
ইলেকট্রিক সাপ্লাই এসোসিয়েশন ১৬৬
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ২০, ২৩, ৩৪, ৯২, ৯৩, ৯৫, ১২৭, ১৮১, ২০০, ২২০, ২৬৫
ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস ১৯১
ইস্ট ইন্ডিয়া সিগারেট কোম্পানি ১৯৪

ঈগল, কালো ৫৩
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (গুপ্তকবি) ৮৫, ১১১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২২৮
ঈশ্বর (লেদম্যান) ১৮৬

উইলসন (ডঃ) ১২৭
উইলিয়ামস, ডি এইচ ২২৬
উট ১৪৪
উড, মার্ক ২২২
উডবার্ন, জন ২৩১
উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ১২৮, ২৫৮
উপেন্দ্রনাথ সেন ১৯৪
উমাচরণ শেঠ ২৫৫
উমেশচন্দ্র ঘোষ ২৬৫

এইচ এন ঘোষ ২৩৮
এইচ এম নাগ এনড কোম্পানি ১৯৫
এইচ বোস ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার ১৮৯
এইচ সি দাশগুপ্ত ২৬৩
এইলানমাস ২৭
এ এইচ গজনাভি ১৯৪
এ এইচ পাণ্ডে ২৬৭
একক্কা গাড়ি ১৪৫
এগানোসমা ৩৫

এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া ২৬, ১৮৫, ২৪৬, ২৪৯-৫৩
এ টমসন এনড় কোম্পানি ১৮৯
এডিনানথেরা ২৭
এডিনোক্যালিম্মা ৩৫
এডিসন, টমাস আলভা ১৫৬
এন এন সেনগুপ্ত ২৬৪
এন কে মজুমদার এনড় কোং ১৯৪
এন ডি সরকার এনড় কোং ১৯৫
এন্টনি ফিরিঙ্গি ১০১, ১১৮
'এন্টারপ্রাইজ' ১৮৩
এ পি ঘোষ ১৯৩
এফ এন গুপ্ত ১৯৪
এভারেস্ট, আর ২৩৯
এভারেস্ট, জর্জ ১৮৬-৮৮, ২২৩
এ ভি বোস এনড় কোং ১৯৫
এল এম বক্ষিত ১৯৪
এল কে অনন্ত আয়ার ২৬৪
এলিজাবেথ, কুইন ২২২
এশিয়াটিক রিসার্চেস ২৪৭, ২৪৯
এশিযাটিক সোসাইটি (সংগ্রহশালা) ১২৫
এশিয়াটিক সোসাইটি ৮৭, ১২৯, ১৮৯, ২২০, ২৪০, ২৪৬-৪৮
এস এম বোস ১৯৩
এস দত্ত এনড কোং ১৯৫
এস পি আগাবকব ২৬৩
এস বোস এনড কোং ১৯৫
এস সি মহলানবিশ ২৬০, ২৬৩-৬৪
এস সি বায ১৯৫
এস হোসেন এনড় সন্স ১৯৫
এ সি উকিল ২৩৮
এ সি ঘোষ এনড কোং ১৯১
'এ হ্যান্ড বুক অব দ্য ম্যানেজমেন্ট অব অ্যানিমালস ইন ক্যাপটিভিটি ইন লোয়াব বেঙ্গল' ৭৫

ওবরাজাইলাম ২৭
ওয়াকার, গিলবার্ট ২৪০
ওয়াগনেসি, ডবল্যু বি ২৪৭
ওয়াজিদ আলি শা (নবাব) ১২১
ওয়াট (ক্যাপটেন) ১১৩
ওয়াট, জর্জ ১৩১
ওয়াট, জেমস ১৮১
ওয়াটসন, কর্নেল হেনরি ১৮১-৮২
'ওয়াটারউইচ' ১৮২
ওয়াটারহাউস, জে ২৪৭
ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড (ইন্ডিয়া) ৫১
ওয়ালড়ি, ডি ১৪৮

ওয়ালডি, ডেভিড ১৮৯
ওয়ালফোর্ড কোম্পানি ১৪৮
ওয়ালিচ, এন ২৪৮
ওয়ালিচ (ডঃ) ২৫০
ওয়ালিচ, ন্যাথানিয়েল ২১, ২৬ ১২৬-২৭
ওয়ালেস, জে আর ২৫৮
ওয়েলিংটন মিল ১৯৬
ওয়েলেসলি, লর্ড ১১৩-১৪, ১৪১-৪২, ২০০
ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স ইনডাস্ট্রি ডেভলাপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড **WBEIDC** ১৯৭
ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ১৫৯
ওয়েস্টার টাউন হল ১১৩
ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি ১৬১-৬৪, ১৬৬-৬৭, ১৯০, ১৯২
ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরি ১৯৪
ওলন্দাজ ৯২, ৯৪
ওল্ডহ্যাম, টমাস ২২৫-২৬

কংকর ৩, ৫, ১০-১৪
কংগ্লোমারেট ৩
কদম ২৭
কনক চাঁপা ৩৩
কনক পাখি ৪৮
কপারস্মিথ (পাখি) ৪৮
করঞ্জ ২৮
কর্নওয়ালিস (লর্ড) ১৪৩
কলকাতা পৌর সংস্থা ১৬
কল, টমাস ২২২
কলভিলিয়া ২৮
কলিকাতা ১৯, ৯৪, ৯৫, ৯৮, ১১২, ১১৫, ১৯৯
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১২০, ১৩৫-৩৬, ২২১, ২২৯, ২৩৪, ২৪৪, ২৪৬, ২৫৬-৬২, ২৬৪-৬৫, ২৬৯
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (আশুতোষ সংগ্রহশালা) ১৩৫
কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাব ২৫৮
কলিকাতা মেডিক্যাল সোসাইটি ২৫৮
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ২২১
কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এনড্ টেকনোলজি, বেঙ্গল ২৭০
কাউন্সিল অব এডুকেশন ২৬৫
কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এনড্ ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ১৩৭, ২৩৮, ২৪১-৪২
কাজল পাখি ৪৬
কাঞ্চন ২৮
কাঠচাঁপা ২৮
কাঠঠোকরা, ছোট সোনালি ৪৬
কাঠঠোকরা, সোনালি পিঠ ৪৭
কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ২৫৭
কানিংহ্যাম, আলেকজান্ডার ১৩০
কার টেগোর কোম্পানি ১৮৬
কারমাইকাল মেডিক্যাল কলেজ ২৫৭
কারমাইকেল, লর্ড ২৩৫, ২৬২
কারমাইকেল হাসপাতাল ২৩৫
কার্জন, লর্ড ১১৩-১৪, ১৩৫, ২৪৯, ২৬৮
কার্টরাইট, র‍্যাফল ৯৩
কার্তিকচন্দ্র বোস ১৮৯
কার্বনিফেরাস-পার্মিয়ান যুগ ৪
কার্বনিফেরাস যুগ ১৮
কালিচরণ সিং ১৮৮
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ২২৯-৩০
কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ১২৭
কালীঘাট মন্দির ১১৭
কালীপদ বিশ্বাস ২৪৮
কাশিপুর জেনারেটিং স্টেশন ১৯৩
কাশীনাথ চৌধুরী ২৫১
কাঁকরা ১৯
কিং, জি (ডঃ) ৮৭
কিংস কলেজ লাইব্রেরি ২৩৬
কিচলার, জি ডবলু ২৬০
কিড, আলেকজান্ডার ২২২
কিড জেমস ১৮২-৮৩, ২৩৯, ২৪৭, ২৫০
কিড, রবার্ট ২০
কিয়া ৫৩
কিলবার্ন এনড কোম্পানি ১৫৫, ১৬৬
কিলবিলি ২৮
কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় ১৯৩
কীর্নন্ডার ১৪৩
কুইসকুয়ালিস ইন্ডিকা ৩৫
কুকী ২৪৯
কুচবিহারের মহারাজা ২৩১
কুটুম পাখি ৪৮
'কুব্জিকানতম' ১২৮
কুবো ৪৬
কুমির ৭২-৭৩, ৮৩ ১২৭
কুমুদনারায়ণ ভুপ ২৩০
কুরি, ম্যাডাম ২৪৪
কুরি, ম্যাডাম জোলিও ২৪৪
কুর্চি ২৮
কুলনস এনড কোং ১৪৬
কৃষ্ণচূড়া ২৯
কে এস কৃষ্ণান ২৩২
কেওড়া ১৯, ২৫
কেডলেস্টন হল ১১৩
কেনেথ ম্যাকলিওড ভেটেরিনারি স্কুল ২৬৫
কেন্দ্রীয় দূষণ নিবারক বোর্ড ২০৮
কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদ ২৩৮
কে ভট্টাচার্য এনড কোং ১৯৫
কেমব্রিয়ান যুগ ১৮
কেয়া ২৩
কেরি, উইলিয়াম ২১, ১২৭, ২৪১, ২৪৯-৫০
কে সি দাস ১৯৩
কে সি বোস এনড্ কোং ১৯৫
কৈলাসচন্দ্র বসু ১৯০, ২৩৫
কৈলাসনাথ কাটজু ২৪৪
কোবে, ক্যাপটেন ১৮৪
কোবচে বক ৪৭
কোলব্রুক, এইচ ১২৮
কোলব্রুক, রবার্টহাইট ২২২
কোলব্রুক, হেনরি টমাস ২৪৭
কোস্টার, অ্যানা ১২১
কোঁচবক ৪৬, ৪৭
ক্যাকটাস ৩৬
ক্যাননবল ট্রি ৩০
ক্যানা ২৩
ক্যামেরন ২২১
ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল ২৫৭
ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (সি আই টি) ১১

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক লাইটিং অ্যাক্ট ১৫৫
ক্যালকাটা উইভিং কোম্পানি ১৯৪
ক্যালকাটা (মিউনিসিপ্যাল) কর্পোরেশন ২২, ১৫৯-৬২, ১৬৪-৬৫, ১৬৮-৬৯, ১৭২, ১৭৪-৭৬, ১৭৮, ১৯৩, ২০০, ২০২
ক্যালকাটা কলেজ অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ২৫৯
ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি ১৯০, ১৯৩
ক্যালকাটা গেজেট ১৮৫
ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন ২২৮, ২৫৮
ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানি ১৮২
ক্যালকাটা ডেন্টাল কলেজ ২৬৫
ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস ১৯৩-৯৪
ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডিস্ট্রিক্ট (সি এম ডি) ২০২-০৩, ২১১, ২১৩-২১৫
ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ২২
ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন ২২
ক্যালকাটা ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি ২৪১
ক্যালকাটা হোসিয়ারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং ১৯৫
ক্যাসিয়া জোড়োসা ২৯
ক্যাসেল কাইজার ১৩১
ক্রফোর্ড, চার্লস ২২২
ক্রম্পটন এন্ড কোম্পানি লিমিটেড ১৫৫
ক্রিটেশাস যুগ ২, ৩, ১৮
ক্রেপ ফ্লাওয়ার ৩০
'ক্রোকোডাইল' ১২৫
ক্রুদ, জর্জেস ১৫৭
ক্লাইভ, লর্ড ৮০, ১১৫, ২২২
ক্লার্ক, উইলিয়াম ১৯৩
ক্লিফ, কর্নেল ১১৪
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪৫
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৬৪
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ২৬৯
খগেন্দ্রচন্দ্র দাশ ১৯০
খঞ্জন ৪৬, ৪৮
খলিস ১৯
খামো ১৯
খাসি ২৪৯
খুন্তেহাঁস ৫১

গণেশপ্রসাদ ২৬৩
গণ্ডোয়ানা যুগ ৪, ৮
গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর ২৬৬
গভর্নমেন্ট গান ফাউন্ড্রি, কাশিপুর ১৮৩-৮৪
গভর্নমেন্ট ডক ইয়ার্ড, খিদিরপুর ১৮৫
গভর্নমেন্ট হাউস ১১৩-১৪
গরাণ ১৯
গরিয়া ১৯
গরুড় ৫৩
গরুড় চাঁপা ২৮
গরুর গাড়ি ১৪৪, ১৪৯
গর্জন ১৯
গাইবক ৪৭
গাজিউদ্দিন হায়দার ১২৮
গান্ধী স্মারক সংগ্রহশালা ১৩৯
গার্স্টিন, জন ২২২
গিবন ১২৭
গিরিয়া হাঁস ৫০, ৫১
গিরীশচন্দ্র দাস ২৬৬
গুইডো ১২৮
গুডউইন, কর্নেল ১১৫, ২৬৮
গুড, পিটার ২৩
গুডিভ (ডঃ) ২৫৬
গুরু জোনসের কারখানা ১৮৬
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৮
গুরুপ্রসাদ সিং ১২০, ২৬৩-৬৪
গুরুসদয় দত্ত ১৩৬
গুরুসদয় দত্ত লোকশিল্প সমিতি ১৩৬
গুরুসদয় সংগ্রহশালা ১৩৬-৩৭
গুলগ্যা ২৪
গুলমোহর ২৮, ২৯
গেঁও ১৯
গোপালচন্দ্র শীল ২৫৬
গোপালচন্দ্র সিংহ ২৭০-৭১
গোপেশ্বর পাল ১২২
গোবক ৪৬-৪৭
গোবিন্দপুর ১৯, ৭২, ৯৩-৯৫, ৯৮-৯৯, ১০৯, ১১২, ১১৫, ১৪১, ১৯১
গোবিন্দরাম মিত্র ৯৫, ১১৯
গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্স ২৩৩
গোলপাতা ১৯, ২৩, ২৪
গোলোকচন্দ্র ১৮৫
গোল্ডসবরো ১১১
গো শালিক ৪৬
গৌরীপুর জুট ফ্যাক্টরি ১৯৬
গ্যাঞ্জেস ১৮৩
গ্রান্ট, কোলসওয়ার্দি ১৮৪
গ্রান্ট, জে ২৫৪
গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া ২২৬
গ্রেটার ৭৫
গ্র্যান্ড জুরি রুম ১২৫-২৬
গ্রানভিল, ওয়াল্টার ১১৪
গ্রানভিল, ডব্লিউ এল ১২৯
গ্লকোনাইট ৩
'গ্লিনিংস ইন সায়েন্স' ২৪৭
গ্লিরিসিডিয়া ২৯
গ্লোব সিগারেট কোম্পানি ১৯৪

ঘোড়ার গাড়ি ১৪৫-৪৬
ঘোষ অধ্যাপক ২৬২-৬৩
ঘোষ ব্রাদার্স এনড কোম্পানি ১৯৫

চক্ররেল ১৫০
চন্দ্রকুমার ঠাকুর ১৫০
চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ি ১৯০
চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন ২৩২, ২৩৭
চরক ২৫২
চায়না পাম ২৩
চারুব্রত রায় ১৯০
চিতা বাঘ ৭৪, ৭৫
চিত্তরঞ্জন দাশ ২৫৮
চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজ ২৫৮
চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ২৫৮
চিত্তেশ্বরী দেউল ১১৭
চিত্তেশ্বরী মন্দির ১১১
চিনে পাম ২৪
চিন্তামণি দেশমুখ ২৩৭
চুটকি ৪৬
চুমনলাল ২৫৬

চুম্বকীয় মানমন্দির ২৬০
চেম্বার্স, রবার্ট ১২৫
চেরোট ১৯১
চোর-পাখি ৪৮
চৌঘুড়ি ১৪৫
চৌরমহল ৭৪

ছয়ঘুড়ি ১৪৫
ছাতিম ২৯
ছাতুবাবুর কালীমন্দির ১১৮
ছ্যাকরা গাড়ি ১৪৫ ১৪৯

জগদীশচন্দ্র বসু ১৩৮-৩৯, ২২১, ২৩০, ২৩৩-৩৫, ২৪৮, ২৬০
জগদীশচন্দ্র বসু সংগ্রহশালা ১৩৯, ২৩৪
জগন্নাথ ঘাট ১১৯
জগৎ শেঠ ৯৫, ১১১
জনস্টন ১৮৩
জলদূষণ নিবারণ আইন ১০২
জহরলাল নেহেরু ২২১, ২৩৭-৩৮, ২৪২
জাতীয় গবেষণাগার ২৩৮
জাতীয় গ্রন্থাগার ৩৪
জাতীয় প্ল্যানিং কমিশন ২৪৪
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ২৬৮
জারুল ৩০
জাহাঙ্গীর ৯১
জিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট ২৬০
জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া ৭৯, ১২৭, ১২৯ ১৩২, ২২০ ২২৫-২৭, ২৪১
জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ব্রিটেন ২২৬
জিগ ১৪৫
জি বোস ২৬৪
জুড়ি ১৪৫
জুরাসিক যুগ ১৮
জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া ৫১, ৮৩, ১৩২
জে কার এনড কোং ১৪৬
জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনসট্রাকশন ২৫৯
জেনারেল পোস্ট অফিস ১১৫
জেমস, এইচ আর ২৬০
জেসপ এনড কোম্পানি ১৮৩-৮৪
জেসপ, হেনরি ১৮৪
জে সি রায় (ডঃ) ২২১, ২৩৭-৩৮
জোনস, উইলিয়াম ১২০, ১২৫-২৬, ১২৮, ২২০ ২৪৭, ২৪৮
জোনস, মার্ক ১৮৫
জোব চার্নক ১৯, ৯২-৯৪, ১০৯, ১১১-১২ ১১৫, ১৪০-৪১ ১৮১, ১৯৯ ২২০, ২৮১
জোলিও, প্রোফেসর ২৪৪
জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ২৬০, ২৬৪
জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ২৬০
জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৪০ ২৩২
জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৬০ ২৬২
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪৭

ঝুঁটি শালিক ৪৬

টমটম ১৪৫
টাইরেনোসরাস রেক্স ২৪
টাইটেলার, রবার্ট (ডঃ) ২২৮ ২২৯
টাউন ক্যালকাটা ১০৯ ১১৫
টাউন হল ১১২ ১৪, ১৪৬, ২৪৯
টাকা চোর (পাখি) ৪৮
টাটা সেন্টার ১২২
টার্শিয়ারী অধিযুগ ১৮
টাঁকশাল ১৮১, ১৮৩
টিউলিপ ট্রি ৩০
টিটাগড় জেনারেটিং স্টেশন ১৯৭
টিপু সুলতান ২১ ১১৮, ১৩৫
টুনটুনি ৪৬
টেনান্ট, জে এফ ২৪৭
টেম্পল, রিচার্ড ২২৩, ২৫৭
টেস্ট হাউস ২৪১
ট্যাক্সি ১৪০, ১৪৮ ৫০
ট্রানসাকসান সোসাইটি ২৫১
ট্রাম ১৪০ ১৪৬-৫০
ট্রাম কোম্পানি ১৯১
ট্রায়াসিক-জুরাসিক যুগ ৪
ট্রায়াসিক যুগ ১৮
'ট্রি অব হেভেন' ২৭
ট্রেইল, হেনরি ২৪৭
ট্রেলার বাস ১৪৯
ট্র্যাভেলার্স ট্রি ২৫

ঠিকাগাড়ি ১৪৫

ডন সোসাইটি ২৮
ডবল ডেকার ১৪৮
ডালিভেরা আন্টনি ১৮৮
ডাউনিং, এস এফ (অধ্যাপক) ২৬৬
ডাওলিন, ব্যারন ১১২
ডাক্সারফিল্ড, এফ ১২১
ডায়না ১৮৩
ডালহৌসি লর্ড ১১৩, ২৬৫
ডি এম বসু ২৪১
ডিরেকটরেট অব সায়েন্টিফিক এনড ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ২৪১
ডিহি কলকাতা ৯৫ ১১১
ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অব ম্যামালস এনড কয়েনস ইন দা মিউজিয়াম অব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৫
ডেভি ২৩৪
ডেভিস, স্যামুয়েল ২৪৭
ডেভোনিয়ান যুগ ১৮
ডালহৌসি ১১৪, ১২৮ ১৪৪
ড্রাসিনা ২৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৩২
ঢেঁকি ৫৩

তামাক ২৫১
তাম্বুলীন পান মশলা ১৮৯
তারকনাথ পালিত ১২০, ২৬১ ৬২, ২৬৯
তালচোচ ৪৯
তুলা ২৫২
তোসামাক' ২০১
ত্রিপুরার মহারাজা ২৬০

থানবারজিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা ৩৫

দক্ষিণেশ্বর ১১৭, ১১৯
দক্ষিণেশ্বর কেমিক্যাল ওয়ার্কস ১৮৯
দিগহাঁস ৫০-৫২

দীননাথ দত্ত ৭৪
দীননাথ সেন ১১৫, ২৬৫
দীনেসা মানকজী পেটিট ভেটেরিনারি হাসপাতাল ২৬৫
দুঘুড়ি ১৪৫
দুর্গা টুনটুনি ৪৮
দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় ২৬৩
দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিং ৯৭
দেবকাঞ্চন ২৮
দেবপ্রসাদ ঘোষ ১৩৬
দেবেন্দ্রমোহন বসু ২৩৪, ২৬৩
দে ব্রাদার্স ১৯৫
দেলখোস সেন্ট ১৮৯
দেশবন্ধু অস্থি পরিষদ ২৫৮
দেশি বাদাম ৩০
দোয়েল ৪৬, ৪৮
দোরাবজী টাটা ২৩৫, ২৪৪
দ্বারকানাথ গুপ্ত ২৫৫
দ্বারকানাথ ঠাকুর ১০০, ১১১-১২, ১২০, ১৭২, ১৮৬, ২৫৬
দ্বারকানাথ বসু ২৫৬
দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং ১২০
দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ২৩১, ২৩৭
দ্য ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড ১৫৫
দ্য ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম ১২৮
দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি ১২৫, ১২৬-৩৮
দ্য ওরিয়েন্টাল ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ১৯৪
দ্য ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড ১৫৫, ১৬৬-৬৭, ১৯২
দ্য ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ অ্যাক্ট ১৪৭
দ্য ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ লিমিটেড কোম্পানি ১৪৭
দ্য জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ২৪৭
দ্য ফিজিক্যাল সোসাইটি অব ক্যালকাটা ২৫৮
দ্য বুক অব ইন্ডিয়ান অ্যানিম্যাল্স ৭৫
দ্য মাইনিং এনড্ জিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া ২৪১
দ্য মেডিক্যাল সোসাইটি অব ক্যালকাটা ২৫৮
দ্য স্টেটসম্যান ১৫৪

ধানপাখি ৪৭
ধীরেন্দ্রকুমার সরকার ২৬৯

নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৬৪
নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩৪
নগেন্দ্র সেন ১৮৯
'ননসাচ' ১৮২
নন্দরাম ৯৫
নন্দলাল বসু ১২২
নবকৃষ্ণ গুপ্ত ২৫৪, ২৫৬
নবকৃষ্ণদেব রাজা ১১১, ১৪২
নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় (ডঃ) ২৩৮
নবজীবীয় অধিযুগ ১, ২ ৪, ৮, ৯, ১৮
নবরত্ন ১১৯, ১২২
নবীনচন্দ্র মিত্র ২৫৫
নবম্যাল স্কুল ২৫২
নরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯২
নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২৬৯
নরেন্দ্রপুর অভয়ারণ্য ৫১
নাকটা ৫০, ৫১
নাখোদা মসজিদ ১০২
নাগলিঙ্গম ৩০
নানাভাই ধুনজি এনড কোং ১৪৬, ১৯১
নারায়ণ (জেলম্যান) ১৮৬-৮৭
নিখিলরঞ্জন সেন ২৩৬
নির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৬৩
নিশীথরঞ্জন রায় ৮১
নীলরতন ধর ২৬০, ২৬২, ২৬৪
নীলরতন সরকার ১৮৯ ৯০, ১৯৪, ২৩০, ২৩৪, ২৩৭, ২৬৩
নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ২৫৭
নুমুলাইট ৩
নেচার পত্রিকা ২৩২
নেটিভ মেডিক্যাল স্কুল ২৫৪
নেটিভ হাসপাতাল ২৫৩
নেতাজী মিউজিয়াম ১৩৯
নোবেল পুরস্কার ২৩২, ২৪৪
নৃতত্ত্ব সংগ্রহশালা ১৩৯

ন্যাশনাল ইনসট্রুমেন্টস ১৮৮
ন্যাশনাল ইনসট্রুমেন্টস ফ্যাক্টরি ২২৪
ন্যাশনাল ইনসট্রুমেন্টস লিমিটেড ২২০, ২২৩-২৫
ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনসটিটিউট ২০৭
ন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটরি ১৩৭
ন্যাশনাল ট্যানারি ১৯৪
ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনসটিটিউট, কলকাতা ২৫৮
ন্যাশনাল সোপ ফ্যাক্টরি ১৯৪
ন্যাশনাল স্কুল অব উইভিং ১৯৫
ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে ২৩০
ন্যাশনাল হোসিয়ারি ১৯৫

পটস, জন ২৩
পঞ্চানন নিয়োগী ২৬০
পদ্মজা নাইডু ৫০, ১২৮
পবিত্রকুমার সেন ২৬৪
পরাশ ৩১
পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২২
পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ২০২
পরেশনাথ মন্দির ১১৯
পর্তুগিজ চার্চ ১১০
পলতে মাদার ৩১
পলাশীর যুদ্ধ ২২, ১১২, ১৪১ ২২২
পলিয়ার, কর্নেল ১১০
পল্লী শিল্পশালা ১৯৫
পশ্চিমবঙ্গ জলদূষণ নিবারণ পর্ষদ ২১৫
পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তর ৫০
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ১৭৪
পাতারি হাঁস ৫০, ৫১
পাথুরিয়া গির্জা ১১৩
পানকৌড়ি, ছোট ৪৬, ৪৭
পাম্বুপাদপ ২৩, ২৫
পামার, জন ২৫০
পার্কস, মিস ফ্যানি ৮৫, ১৪৪
পার্পল বিথ ৩৫
পার্মিয়ান-জুরাসিক যুগ ৮
পার্মিয়ান যুগ ১৮

পালকি ১৪২-৪৫, ১৪৯
পালিত অধ্যাপক ২৬২-৬৩
পালিত রিসার্চ ল্যাবোরেটরি ২৪৪
পাস্তুর ক্লিনিক্যাল ল্যাবোরেটরি ২৩৮
পি এন দত্ত ১৯৫
পি এম বাগচি ১৮৯, ১৯৫
পিকক কেমিক্যাল ওয়ার্কস ১৯৫
পিক (অধ্যাপক) ২৪০
পিট ৫-৭, ১৩, ১৪
পিট্রিয়া ভলিউবিলিস ৩৫
পি ডব্লিউ ডি ১৬৮-৬৯, ১৭২, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৮-৭৯
পিডিংটন ২৩৯
পি ডি গুপ্তা ৮৩
পিয়াবসন কার্ল ২৩৬
পিয়ার্স (কর্নেল) ২৪৭
পি শেঠ এনড কোম্পানি ১৮৯
পি সি বোস এনড কোং ১৯৪
পি সি সর্বাধিকারী ২৬৩
পীং হাঁস ৫১
পীকক বার্নেস ১২৯
পীতাম্বর (লেদম্যান) ১৮৬ ৮৭
পুত্রঞ্জীব ৩১
পুরাজীবীয় অধিযুগ ১৮
পুলিনবিহারী সরকার ২৬২
পুঁটে কালীবাড়ি ১১৮
পূর্ণেন্দুকুমার বসু ২৬৪
পেডলার, আলেকজান্দার ২৫৯-৬০
পেডলার, এ ২৪৮
পেলটোফোরাম ৩১
পোরান (পুরান মিস্ত্রি) ১৮৭
প্যাট্রিক, ক্লার্ক ৭৪
প্যারিস, আলফ্রেড ১৪৭
প্যারিস, দিলউইন ১৪৭
প্যারীচাঁদ মিত্র ২৫১
প্রজাপতি ৭৩
প্রতাপচন্দ্র সিংহ ২৫১
প্রতাপাদিত্য (রাজা) ৯৬
প্রতাবচাঁদ সিং (রাজা) ১১২
প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য (পি সি রায়) ১২০, ১৮৯, ১৯৩, ২৩০, ২৩৭-৩৮, ২৪১, ২৪৮, ২৬০, ২৬২
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৬
প্রমথনাথ বসু ২৬৯
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ২২১, ২৩৪, ২৩৬-৩৭, ২৪৮, ২৬০
প্রাইভেট বাস ১৪৯
প্রাক-বর্তমান যুগ ২, ৩, ৯, ১৮
প্রাট, হজসন ২৬৮
প্রিন্সেপ ১২৮
প্রিন্সেপ, জেমস ১২৮, ২৪৭
প্রিয়দারঞ্জন রায় ২৬২
প্রেসিডেন্সি কলেজ ১২০, ২২১, ২৩০, ২৩৪, ২৩৬, ২৪০, ২৪৬, ২৪৮, ২৫৮-৬০, ২৬৩, ২৬৫-৬৬
প্রোটারোজয়িক অধিযুগ ৩, ১৮
প্রোটারোজয়িক শিলা ৮
প্লায়ো-প্লায়োস্টোসিন যুগ ৩, ৮
প্লায়োসিন যুগ ৪, ১৮
প্লায়োস্টোসিন যুগ ৪, ৮, ১৮
প্লাসটেড ২২১
প্লেফেয়ার, জন ২৪৭

ফকস, সি এস (ডঃ) ৬
ফসিল ২, ৭৯, ৮৭, ৮৮
ফারমোবিয়া ১৩২
ফিজিক্যাল কমিটি ২৪৬
ফিজিক্যাল সায়েন্স কমিটি, এশিয়াটিক সোসাইটি ২৪৭
ফিটন ১৯১
ফিটনগাড়ি ১৪৫
ফিন, ফ্র্যাঙ্ক ৪৫
ফিবার হসপিটাল ১১২
ফিবার হাসপাতাল কমিটি ২৫৫
ফিরিঙ্গি কালীমন্দির ১১৮
ফেয়ার, জে ৮৭
ফোবামিনিফার ৩
ফোর্ট উইলিয়াম ৭, ১৩, ১৫, ২০, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১২৯, ১৪১, ২২০
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১২৮
ফোর্বস, উইলিয়াম নেয়ার্ন ১৮৩
ফ্যারাডে ২৩৪
ফ্যালকনার, এইচ ২৪৮
ফ্রান্সিস ড্রেক ১১০
ফ্লোরা ইন্ডিকা ২১

বকুল ৩১
বগি ১৪৫, ১৯১
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস ১৯৪
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৩-৩৫
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ চিত্রশালা ১৩৩
বটকৃষ্ণ পাল ১৮৯
বটল পাম ২৩, ২৪
বটল ব্রাশ ৩২
বটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া ১৩২
বড়ু চণ্ডীদাস ১৩৪
বদ্বীপ ১, ২, ৬, ৭৪, ২১৪
বনসাই ৩৬
বন্দেমাতরম ম্যাচ ফ্যাক্টরি ১৯৪
বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি ৪৫
বরানগর জুট মিল ১৯৬
বর্তমান (ভূতত্ত্বীয়) যুগ ২, ৩, ৪, ৮, ৯, ১৮
বলদেওদাস বিড়লা ১৩৭
বসন্তকুমার দাশ ২৬৩
বসন্ত বৌরি ৪৮
বসন্ত বৌরি, ছোট ৪৬
বসাক (গোবিন্দপুর) ৯৩, ৯৪, ৯৭
বসু বিজ্ঞান মন্দির ৩৪, ১০৯, ১২০, ২২১, ২২৩, ২৩৪-৩৫, ২৬৩
বাইন ১৯
বাওবাব ২৬
বাংলা বাদাম ৩০
বাংলা মেডিক্যাল স্কুল ২৫৭
বাকিংহাম হাউস ১১৩
বাঘ ৭২-৭৫, ৮৭
বাতাসি ৪৬, ৪৯
বাবুরাম ঘোষ ১৮৮
বামুনিয়া হাঁস ৫১
'বায়োমেট্রিকা' ২৩৬
বারো, হেনরি ১৮৬-৮৭, ২২৩-২৪
বার্টলেট ১৪৬
বার্ন এনড় কোম্পানি ১৫৪
বার্নাল, জে ডি ২৪৪
বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ ২৬৩-৬৪
বালিহাঁস ৫০, ৫১
বাস ১৪০, ১৪৮-৫০
বাঁদর লাঠি ৩১
বি এন ঘোষ ২৩৮

বিগনোনিয়া ভেনাসটা ৩৫
বিজনবিহারী সরকার ২৬৪
বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ২৩৭
বিজ্ঞান কলেজ ১২০, ২৩৪, ২৬২
বিজ্ঞান কলেজ, বাজাবাজার ২৬৪
বিজ্ঞানানন্দ (স্বামী) ১২১
বিডন, সিসিল ২২৬
বি ডি নাগচৌধুরী (বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুবী) ২৪৪, ২৬৩
বিড়লা শিল্প ও কাবিগবি সংগ্রহশালা ১৩৭
বিড়লা শিল্প ও সংস্কৃতি অকাদেমি ১৩৯
বিধানচন্দ্র রায ১৩৭, ১৫০, ১৯০, ২৩৩, ২৪২
বিধুমুখী বসু ২৫৭
বিনয়কুমাব সবকাব ২৬৯
বিনয়কৃষ্ণ দত্ত ২৩৫
বিনয়কৃষ্ণ দেব ৮১, ১৩৩
বিনয় সবকাব ২৬৯
বি বি বানাডে ২৬৯
বিবেকানন্দ ৭৬, ১১৭, ১২১
বিবাজমোহন দাস ১৯৪
বিলাতি শিরীষ ৩২
বিল্ডিং মেটিবিয়ালস এনড কন্সট্রাকসন ২৬৬
বিশপ্‌স কলেজ ১৮৬
বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০০
বিশ্বময বিশ্বাস ৪৫ ৫৪
বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ২০৭, ২০৯
বি সি গুহ (ডঃ) ২৩৮, ২৬১
বিহাবীলাল মিত্র ২৩২
বীণা সোপ ফ্যাক্টবি ১৯৫
বীম্‌স, জন ১৩৩
বীবেন্দ্রনাথ মৈত্র ১৯০
বুক এনড কোং ১৪৬
বুখানন, ফ্রান্সিস ২১
বুলটন, জন ১৪৬
বুলবুল, কালো ৪৬
বুলবুল, চিনে ৪৬
বেকাব, নরম্যান এডওয়ার্ড ২৬০
বেকার ল্যাবোবেটাবি ২৬০
বেগম সামরু ১২৭
বেঙ্গল আর্টিফিসিয়াল স্টোব কোং ১৯৫
বেঙ্গল অ্যাটলাস ১২২
বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ২৪৬, ২৬৫, ২৬৭
বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি ১৯০-৯১
বেঙ্গল ইমিউনিটি রিসার্চ ইনসটিটিউট ১৯০
বেঙ্গল একাডেমি অব লিটাবেচব ১৩৩
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ১৯৩
বেঙ্গল কন্সালটেশান্স ৭২
বেঙ্গল কেমিক্যাল এনড ফার্মাসিউটিক্যাল ওযার্কস ১৮৯-৯০, ১৯১, ১৯৩
বেঙ্গল কোল কোম্পানি ১৮৬
বেঙ্গল টাইল ফ্যাক্টরি ১৯৫
বেঙ্গল টেকনিকাল ইনসটিটিউট ২৬৯-৭০
বেঙ্গল ট্যানিং ইনসটিটিউট ২৬৪
বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ২৬৯
বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল ২৬৮
বেঙ্গল পটাবি ওয়ার্কস ১৯৫
বেঙ্গল বাটন ফ্যাক্টবি ১৯৪
বেঙ্গল ভেটেবিনারি কলেজ ২৬৫
বেঙ্গল লেদাব ম্যানুফ্যাকচাবিং কোং ১৯৫
বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডাস এসোসিয়েশন ২৬৮
বেঙ্গল ল্যাম্প ১৯৭
বেঙ্গল সিগাবেট ম্যানুফ্যাকচাবিং কোম্পানি ১৯৪
বেঙ্গল সিল্ক মিল্‌স ১৯৪
বেঙ্গল সোপ কোম্পানি ১৯৪
বেঙ্গল হবকরা ১৪৪, ১৫২
বেঙ্গল হোসিয়াবি ১৯৪
বেঙ্গল হোসিযাবি কোম্পানি ১৯৪
বেন্টিঙ্ক, উইলিযাম (লর্ড) ১৪০, ২৫০, ২৫২, ২৫৪
বেন্টলি, জন ২৪৭
বেথুন স্কুল ১১২, ১২০
বেনে বউ ৪৬, ৪৮
বেলগাছিয়া ভিলা ১২০
বেলুড মঠ ১১৭, ১২১
বৈকুণ্ঠনাথ ১৯৪
বৈকুণ্ঠনাথ দে ২৬৫
বৈদ্যনাথ রায ২৫০
গার্ডেন, শিবপুব ৫১
বোতল বুরুশ ৩২
বোধিসত্ত্ব পদ্মপানির মূর্তি ১২৭
বোর্ড অব সায়েন্টিফিক এনড ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিসার্চ ২৪১
বোলা ৩২
বোল্টন এনড্ ওযাট কোম্পানি ১৮১
ব্রতচারী আন্দোলন ১৩৬
ব্রতচারী সমিতি ১৩৬
ব্রহ্মপুত্র ১৮৩
ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন ১২৭
ব্রাউনবেরি ১৯১
ব্রাউনবেরি ডাকগাড়ি ১৪৫
ব্রাম্ভো ১৪৬
ব্রামলি (ডঃ) ২৫৫
ব্রিটিশ এনড ফবেন স্কুল সোসাইটি ২৫৯
ব্রিটিশ মিউজিয়াম ২৪৮, ২৬৩
ব্রিটিশ মেডিকাল এসোসিয়েশন ২৫৮
ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল ২৩৫
ব্রুহাম ১৯১
ব্রুহাম গাড়ি ১৪৫
ব্রুহিল, পি ২৬৩
ব্লাইথ, এডওয়ার্ড ৪৫, ৪৬
ব্লানফোর্ড, এইচ এফ ২৪০
ব্লিথ, ই ২৪৮
ব্লিথ, এডওযার্ড ১২৭
ব্রেকিনড়েন, ক্যাথলিন ৮৩
ব্ল্যাক টাউন ১০৯, ১১১

ভবতাবিণী মন্দিব, দক্ষিণেশ্বব ১১৯
ভয়জি, এইচ ডবলিউ ২২৬, ২৪৭
ভাইকস এনড কোম্পানি ১৯১
ভাবতীয় আবহ সংস্থা ২৪০
ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, শিবপুব ১৯-২১, ২৬
ভাবতীয় জরিপ বিভাগ ১৮৬
ভাবতীয় মানক সংস্থা ১৬৮, ১৭০
ভাবতীয় বযাল কমিশন (কৃষি বিষয়ক) ২৬৪
ভাবহুত ১৩০
ভি কে পরিঞ্জপে ২৬৯
ভিক্টোরিয়া, মহাবাণী ১৩৫, ১৯১
ভিক্টোরিয়া অধ্যাপক ২৩১

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ১০৯, ১২১, ২০১
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালা ১৩৫
ভিক্টোরিয়া হাউস ১৫৫
ভিক্ষু পূর্ণানন্দ ২৬৯
ভিজিয়ানাগ্রাম ল্যাবোরেটারি ২৩০, ২৩২
ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা ২৩০
ভূতনাথ পাল ১৮৯
ভূতিহাঁস ৫১
ভূপেন্দ্রনাথ বসু ২৩৪, ২৬০
ভেশাল্ট ও ব্রাউন কোং ১৪৬
ভোলানাথ বসু ২৫৬
ভ্যালেন্টাইন ১১০

মকান (মিস্টার) ৭৪
মগ ২৪৯
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ১৯৪
মতিলাল নেহেরু ২৫৮
মথুরানাথ ১২৭
মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় ২৬৫
মধ্যজীবীয় অধিযুগ ১-৪, ১৮
মধুসূদন গুপ্ত ২৫৪-৫৫
মদনমোহন মন্দির ১১৯
মদনমোহন মালব্য ২৩৭
মন, ফিলিপ ৪৬
মমি ১২৭, ১৩০
ময়েনদি বারুদগড় ১৮৮
মহম্মদ কুদরত-ই-খুদা ২৬০
মহাকরণ ২৬৫
মহাজাতি সদন ১১৭
মহাত্মা গান্ধী ২৫৮
মহানিম ২৭
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১৩৫
মহুয়া ৩২
মহীশূর ঘাট ১১৯-২০
মহেঞ্জোদারো ১৩১-৩২
মহেন্দ্রনাথ দত্ত ৭৬, ৮০, ৮১
মহেন্দ্রলাল সরকার ২২১, ২২৮-৩২, ২৫৮
মাছরাঙা, ছোট ৪৬, ৪৭
মাছরাঙা, সাদাবুক ৪৬, ৪৭
মাদ্রাসা ১২০, ২৫৪
মায়োসিন যুগ ৪, ৮, ৯, ১৮
মার্টিন এনড কোম্পানি ২৬৬
মার্টিন, জেম্‌স রেনল্ড ২৫৬
মার্টিন বার্ন ১২০-২১
মার্শম্যান, জন ক্লার্ক ২৫০
মার্শম্যান, জসুয়া ২৫০
মার্সম্যান ১১৮
মালতী ৩৫
মিউনিসিপাল সংগ্রহশালা ১৩৯
মিটিওরলজিস্ট, কলিকাতা ২৪০
মিনজিরি ৩২
মিন্ট ১৮৩-৮৪
মিলটন ২৫৫
মিলটন এনড কোং ১৪৬
মিলনে, জেমস ৭৪
মীর আলি আকবর ৯৪
মীরজাফর ২২, ১১২
মুকুন্দরাম শেঠ ৯৫
মুচকন্দ ৩৩
মুলাজোড় জেনারেটিং স্টেশন ১৯৩
মেগ', জে ডবলিউ ডি ২৩৬
মেঘনাদ সাহা ২৩২ ২৪৩-৪৪, ২৪৮, ২৬৩
মেটকাফ হল ১১২, ২৪৯
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট ১৫০
মেট্রোরেল ২, ১৫০-৫১
মেডিক্যাল কলেজ ১১৫, ২৪৭ ২৫৪-৫৮
মেডেনহল, জন ৯২
মৌটুসি ৪৬
ম্যাককাউলে ২৩৬
ম্যাকলিওড, কেনেথ ২৫৮
ম্যাগনোলিয়া ৩৪
ম্যাট্রিক ২৫৮
ম্যাথমেটিক্যাল ইনসট্রুমেন্ট মেকার ২২৩-২৪
ম্যাথমেটিক্যাল ইনসট্রুমেন্টস অফিস ১৮৮, ২২২, ২২৪
ম্যাথমেটিক্যাল ইনসট্রুমেন্টস ডিপার্টমেন্ট ১৮৬-৮৭
ম্যানগ্রোভ ৭৪, ৭৯
ম্যান্টল ৫, ৮

যতীন্দ্রনাথ শেঠ ২৬৯
যাদবচন্দ্র দে ২৬৫
যাদবপুর পলিটেকনিক ২৭০
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ২৩৮ ২৪২, ২৪৬, ২৬৮, ২৭০
যাদুঘর ১২৮-২৯, ১৩১-৩৩
যাভা ক্যাসিয়া ২৯, ৩৩

রক্তকমল ২৭
রক্তকাঞ্চন ২৮
রকসবার্গ, উইলিয়াম ২১, ২৪৮, ২৫২
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১
রজার্স, লিওনার্দ ২৩৫-৩৬, ২৫৮
রঞ্জনা ২৭
রতনবাবুর ঘাট ১১৯-২০
রতন সরকার ৯৩
রবার্টসন ২৫৫
রবিনসন, রবার্ট ২৪৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৪, ১১১, ১৫২, ১৬৮, ২০১, ২০৪, ২১৪, ২২১, ২৩৪, ২৩৭, ২৪০
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়াম ১৩৯
রমানাথ ঠাকুর ২৫১
রয়াল অবসারভেটরি ২২৩
রয়াল আর্মি মেডিক্যাল কলেজ ২৩৫
রয়াল ইনসটিটিউসন (সোসাইটি) ২৩৪
রয়াল কলেজ অব সর্জেন্স, ইংল্যান্ড ২৫৬
রয়াল পাম ২৩, ৩২৪
রয়াল বোটানিক গার্ডেন ২০, ২৬
রয়াল সোসাইটি ২৩৪
রস, ডি ২৫৯
রসুনলতা ৩৫
রাইটার্স বিল্ডিংস ১০৯, ১১২, ১১৪-১৫
রাক্ষুসে কাঁক ৫৩
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪
রাজকৃষ্ণ দে ২৫৫
রাজচন্দ্র বসু ২৩৭, ২৬৪
রাজভবন ১১৩
রাজশেখর বসু ১৯০
রাজহাঁস ৫৩
রাজেন মল্লিক ১১১
রাজেন্দ্রনাথ (সার) ১২১

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৩৫-৩৬, ২৬৭
রাজেন্দ্রনাথ সেন ১৯০
রাজেন্দ্র মল্লিক ১২৭
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১২৯, ২২৮, ২৬৮
রাজ্য প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা ১৩৯
রাণী রাসমণি ১১৭, ১১৯
রাধাকান্ত দেব ১২৭, ২৪৭, ২৫০
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ২৬৯
রাধাগোবিন্দ কর (ডঃ) ১৮৯, ২৫৭
রাধাচূড়া ২৮, ২৯
রাধানাথ (মিস্ত্রি) ১৮৭
রাধানাথ শিকদার ২২৩, ২৫১
রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ৮৫, ৮৬
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫০
রামকমল সেন ১২৭, ২৫০, ২৫৪
রামকৃষ্ণ ১২১
রামকৃষ্ণ ঘোষ ১৮৮
রামকৃষ্ণ মন্দির, বেলুড় ১১৯
রামগোপাল ঘোষ ২৫১, ২৫৫
রামদুলাল দে ১০০
রামনাথ মণ্ডল ১১৭
রামব্রহ্ম সান্যাল ৭৫, ৭৭, ৮০, ৮৭
রামমোহন ২২৮
রাম সোনা ১৮৭
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩৪
রামেশ্বর সিং ১২০
রাসবিহারী ঘোষ ১২০, ১৯৪, ২৬২-৬৩, ২৬৮
রিকশা ১৪০, ১৪৯
রিচার্ডসন, উইলিয়াম ২২৩
রিজিওন্যাল মিটিওরলজিক্যাল সেন্টার ২২১, ২৩৯
রিজিওন্যাল সফিসটিকেটেড ইনসট্রুমেন্টেশন সেন্টার ২৩৪
রিপন, লর্ড ২৩০-৩১
রুবেন্স ১২৮
রুবেল (কুমারী) ১২১
রুস্তমজী কাওয়াসজী ১৮২
রেড ব্রেস্টেড ম্যারগানসার ৫৩
রেন ট্রি ৩২
রেনেল, জেমস ২২২
রেনোল্ডস ১২৮
রোমলি ১৪৫

লক্ষ্ণৌ মানমন্দির ২৪৭
লক্ষ্মীনারায়ণ দেবগৃহ ১১৯
লঙ, জেম্স ২৫১
লঙ, রেভারেন্ড জেম্স ৭২, ৮৩
লটারি কমিটি ১১২, ১৪২, ২০০
লন্ডন অ্যাপথেকারি সোসাইটি ২৫৬
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ২৫৬
লরেন্স, ই ও ২৪৪
লাইট রেলওয়ে ২৬৬
লাক্ষা কেন্দ্র ২৬২
লা ফোঁ, রেভারেন্ড ফাদার ২২৮
লা মার্টিনিয়ার ২৩০
লালদীঘি ১০৯, ১১১-১৩, ১২৭
লালশির, ছোট ৫১
লিগনাইট ৩
লিসেস্টার, ডবলু ২৫০
লুই, জোসেফ ১৫৫
লেডল ২২৬
লেদার ট্রেড স্কুল ২৬৪
লেভি, ফ্রেড্রিক ২৬৩
লো, ব্রাউন ১৪৪-৪৫
ল্যাটেরাইট ৩, ৪
ল্যান্ডো ১৪৫, ১৯১
ল্যান্ডোলেট ১৪৫

শঙ্কর মিস্ত্রি ১৮৭
শচীন্দ্রনাথ মিত্র ৭৭, ৭৮, ৮৩-৮৫
শচীমোহন মুখোপাধ্যায় (ডঃ) ২৩৯
শণ ২৫২
শবব্যবচ্ছেদ ২৫৪, ২৫৬
শরৎকুমার দত্ত ২৬৯
শরৎলাল বিশ্বাস ২৬৩
শরাল ৫০-৫২
শান্তিস্বরূপ ভাটনগর (ডঃ) ২৪১
শিকারী চিতা ৭৪, ৭৫
শিবচন্দ্র কর্মকার ২৫৬
শিবচন্দ্র দাস ১২৭
শিবচন্দ্র দেব ২৫১
শিবচাঁদ মিস্ত্রি ১৮৭
শিবনাথ শাস্ত্রী ১১০
শিবপুর আয়রন ওয়ার্কস ১৯৩
শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন ২৪৯, ২৫২
শিবপ্রসাদ ঘোষ ১৮৬, ২২৪
শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৬৪
শিমূল ৩৩
শিয়ালদহ মেডিক্যাল স্কুল ২৫৭
শিল্প বিপ্লব ১৮১
শিশাগড় ১৮৮
শিশিরকুমার মিত্র ২৬৩
শীতলনাথজীর মন্দির ১১৯
শুভেন্দুশেখর বসু ২৩৭
শেখ মকসুদ আলি ১৪৬, ১৯১
শেঠ (গোবিন্দপুর) ৯৩, ৯৪, ৯৭
শেভ্রুল, ইউজিন ১৫৫
শোভান, আবদুস ১৯৪
শোভান, এ ১৪৮
শোভারাম বসাক ১০০, ১১১, ১১৯
শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় ২৬৩
শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় ২৬৪
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৪৪
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১৩৪
শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনারি ১৮৫
শ্রীরামপুর মিশন ২১, ২২১

সংস্কৃত কলেজ ২৫৪-৫৫
সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র সংগ্রহশালা ১৩৯
সখারাম গণেশ দেউস্কর ২৬৯
সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ১৯০
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৬৮-৬৯
সতীশরঞ্জন দাশ ২৩৪
সত্যসুন্দর দেব ১৯৩-৯৪
সত্যেন্দ্রনাথ বসু ২৩৭, ২৬৩
সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ২৩৪
সমর রায় ২৩৭
সমরেন্দ্রনাথ মৌলিক ২৬৩
সমরেন্দ্রনাথ রায় ২৬৪
সমাচার দর্পণ ৭৩, ৭৬, ১৮৩, ২৪৯
সমাচার সুধাবর্ষণ ১৯২
সরকারি কারিগরি ও বাণিজ্য সংগ্রহশালা ১৩৯
সরস্বতী লেড পেনসিল ফ্যাক্টরি ১৯৫
সরাবজী সাভক্ষা ২৬৬

সলভিন্স্, বি এফ ১৪৩
সাইক্লোট্রন ভবন ২৪৪
সাউট্রর ১৪৭
সাকনাল ৫৩
সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় ২৬৬
সাদার্ন জেনারেটিং স্টেশন ১৯৩
সাপ ৭৩, ৮৪, ৮৫
সাবর্ণ চৌধুরি ৯৬, ১০৯, ১১১-১২, ১১৭-১৮
সায়েন্স এসোসিয়েশন ২৩২
সারদাচরণ মিত্র ১৩৪, ২৬০
'সারপ্রাইজ' ১৮২
সারাঙ্গা ২৯
সারাবান ১৪৫
সার্ভে অব ইন্ডিয়া ৪৬, ২২০-২১, ২২৩, ২৩৯-৪০
সার্ভেয়ার জেনারেল ২২২-২৪
সালিম আলি ৪৫, ৫৩
সাহা ইনসটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ২২১, ২৪৩-৪৪
সিংহী (জোড়াসাঁকো) ১০০
সি আই টি ১৬৭-৬৯, ১৭৪, ১৭৬-৭৮
সি আর রাও ২৩৭
সি ই এস সি লিমিটেড ১৫৫, ১৫৯, ১৭৪, ১৭৭-৭৮
সি এম ডি এ ৪৬, ৫২, ১৪৯, ১৬৮-৬৯, ১৭২, ১৭৪, ১৭৬-৭৭
সি এম পি ও ১৫০-৫১
সি কে সেন ১৮৯
সিদ্ধেশ্বরী দেউল ১১৯
সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ১১৭-১৮
সিপাহী বিদ্রোহ ৭৪, ১২৮, ১২৭
সি ভি রামন ২৬৩
সিম্পসন, প্রোফেসার ১৮৯
সিরাজ ১১১
সিরিয়াল হাউস ১২১
সিলভার ওক ৩৩
সিলুরিয়ান যুগ ১৮
সুতানুটি ১৯, ৯৪-৯৬, ৯৮, ১০৯, ১১২, ১১৫, ১৪০-৪১, ১৯৯
সুধাংশুমোহন বসু ২৩৪
সুনডেভাল, কার্ল ৪৬
সুনীল দাস ৮১
সুন্দরবন ৭৪, ৭৫, ৭৯, ৮০, ৮৫, ৮৮
সুপ্রিম কোর্ট ১১৪
সুবাবুল ৩৪
সুভাষচন্দ্র বসু ১১৭, ২৩৭
সুরেন কয়াল ৫১
সুরেন্দ্রকুমার বসু ২৬৬
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৫
সুরেন্দ্রনাথ বল ২৬৯
সুরেন্দ্রনাথ রায় ১৯৪
সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী ১৮৯
সুলভ সমাচার ১৯২
সুশ্রুত ২৫৪
'সুসান' ১৮২
সুঁদরী গাছ ৬, ৭, ১৯
সূর্যকুমার চক্রবর্তী ২৫৬
সূর্যসিদ্ধান্ত ২৪৭
সেগুন ৩৪
সেটান কুক ১৪৬
সেনেট (হল) ১১২-১৩, ১১৫, ১২০, ১৩৬
সেনোজয়িক অধিযুগ ১৮
সেন্ট অ্যানস্ চার্চ ১১২
সেন্ট জন চার্চ ১১২-১৩, ১১৫, ১৪৩
সেন্ট জেমস চার্চ ১১৫
সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল ২৯, ১১৫, ১২১, ১৮৩
সেন্ট পলস্ গির্জা ১১৩
সেন্ট্রাল গ্লাস এনড্ সিরামিক রিসার্চ ইনসটিটিউট ২২১, ২৪২
সেলুলস ২৬২
সেরী মিত্র ২৫৭
সৈয়দ মীর মহসিন হোসেন ১৮৭-৮৮, ২২৪
সোনা ২৭
সোনাঝুরি ২৬
সোনাপট্টি ২৭
সোসিয়েবল ১৪৫
সোঁদাল ৩১
স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন এনড্ হাইজিন, কলকাতা ২২১, ২৩৫, ২৫৮
স্কুল ফর নেটিভ ডক্টর্স ২৫৪
স্টার্নভেল ১৮৮
স্টিফেন হাউস ১১, ১২
স্টুয়ার্ট এনড্ কোম্পানি ১৪৬, ১৯১
স্টুয়ার্ট, জেম্স ১৪৬
স্টেগোডন, গণেশ ১৩২
স্টেট বাস ১৪৯
স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউট ২৩৭
স্ট্যাটিসটিক্যাল ল্যাবোরেটরি ২৩৬
স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস ২৩৮
স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানি ৯
স্ট্যাথাম (মিস্টার) ১৬০
স্ট্যাফোর্ড ৯৩
স্ট্রিকল্যান্ড, এইচ ৪৬
স্বদেশি সিগারেট কোং ১৯৫
স্বর্গীয় পাখি ২৩, ২৫
স্বর্ণচাঁপা ৩৪
স্মিথ (মিঃ) ৭৫
স্মিথ, এম আর ২১
স্মিথ, ডি বি ২৫৮
স্মিথ, ম্যালকম ৮৪
স্মিথ স্টেনস্ট্রিট এনড কোম্পানি ২৩৫
স্মোক নুইসান্স অ্যাক্ট ২০১
হকিন্স ৯২, ৯৩
হগ মার্কেট ১১২
হজসন, ব্রায়ন হফটন ২৪৮
হরপ্পা ১৩১-৩২
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২৯
হরিদাস বাগচী ২৬৩
হরিমোহন ঠাকুর ২৫০
হরিশচন্দ্র বোস (এইস বোস) ১৪৬, ১৯১, ১৯৩
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ৭২
হলওয়েল ৯৫, ১১৩
হলওয়েল, জে জেড ১১২
হলওয়েল মনুমেন্ট ১১২
হলদেগুড়ি ৪৮
হলদে শিমূল ৩৪
হলধর (মিস্ত্রি) ১৮৭
হলধর মল্লিক ২৫৫
হলুদ পাখি ৪৮
হলোসিন যুগ ১৮
হল্যান্ড, এইচ ২৪১, ২৬০
হাইকোর্ট ১১২, ১১৪

হাওড়া ব্রিজ ২, ৭
হাওয়া অফিস ২৪০
হাড়গিলে, বড় ৫৩
হাড়গোজা ১৯
হান্টার এন্‌ড্‌ কোং ১৪৬
হান্টার, উইলিয়াম ২৪৭
হাতি ১৪৪
হাতোয়ার মহারাণী ২৩৫
হার্ট ব্রাদার্স ১৪৬
হার্ডউইক ২৩৯
হার্ডিঞ্জ, লর্ড ২৬২
হার্ডিঞ্জ (অধ্যাপক পদ) ২৬১, ২৬৩
হার্বার্ট, মেজর ২৪৭
হার্ভে, রবার্ট ২৫৮
হাঁড়িচাচা ৪৬, ৪৮
হিন্দু কলেজ ২২১, ২৪৬, ২৫৮-৫৯
হিন্দু স্কুল ১২০
হিমচাঁপা ৩৪
হিমাদ্রীকুমার মুখোপাধ্যায় ২৬৩
হিরণকুমার গুপ্ত ২৬৯
হীরালাল রায় ২৬৯
হুইটমান ১৪৪
হুইস্কি গাড়ি ১৪৫
হুতোম প্যাঁচার নকশা ১৫৩, ১৬২
হেকেল, আরনেস্ট ২০০
হেজেস, উইলিয়াম ১০৯
হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ২৬০, ২৬৯
হেমচন্দ্র সেন ১৯৪
হেমেন্দ্রকুমার সেন ২৬২
হেমেন্দ্রমোহন বসু ১৮৯
হেয়ার ১২০, ২৫৬
হেয়ার, জেম্‌স ২৫৮
হেয়ার, ডেভিড ১৪৩, ২৫৫
হেয়ার স্কুল ১২০
হেস্টিংস ১৮২
হেস্টিংস, ওয়ারেন ৭২, ৯৭, ১২৫
হেঁতল ১৯
হ্যামিলটন (ডঃ) ২৫২
হ্যামিলটন ৭২, ১২৮
'হোর্টাস বেঙ্গলেন্সিস' ২১
হোম, রবার্ট ১২৮
হ্যালিডে, গভর্নর ১১৫
Alexander, Sir ১৫৪
Bathgate, Mr. ১৫২
'Collins Encyclopedia of Animal Ecology' (The) ৭৬
Cotton, H.E.A. ৭২
C S I R ২৩৮, ২৪১
D S I R ২৪১
'Fever in the Tropics' ২৩৫
Hooper's Anatomy Vade-mecum ২৫৪
India Meteorological Department ২৪০
Mackenzie, Lady ১৫৪
Peter, D. Moore ৭৬
Statham, Mr. ১৬০
Statistical analysis of the Stature of Anglo-Indians ২৩৬